দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস

(ঊনবিংশ শতাব্দী)

২য় খণ্ড

প্রধান সম্পাদক
ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
সম্পাদকমণ্ডলী
কমলকুমার সান্যাল, অজিত পূততুণ্ড ও শচীন দাস
নির্বাহী সম্পাদক
নিতাই দাস

নবধারা
প্রযত্নে ও পরিবেশনায়
অমৃতধারা
৮ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

'দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস'-২য় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে মোট পাঁচটি উপন্যাস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে চারটি উপন্যাস দুষ্প্রাপ্য। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি সহজ লভ্য। কিন্তু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা', চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সম্বাদ' এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' — এই চারটি উপন্যাস এখন আর সহজে পাওয়া যায় না। সেইদিক থেকে বিচার করলে এই খণ্ডের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে সংশয়াতীত।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ মূলতঃ নাট্যকার। তাঁর উপন্যাসটি গুণ-মানের বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে পড়ে না। তথাপি কেন সংকলনে সংযোজিত হলো? এর উত্তরে বলব, গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি মাত্র উপন্যাসই লিখেছেন। আর সেটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। নাম - 'চন্দ্রা'। কালের অমোঘ নিয়মে 'চন্দ্রা' আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। শুধু তাই না, বহু পাঠক জানেনই না যে, গিরিশচন্দ্রের 'চন্দ্রা' নামে একটি উপন্যাস আছে। তাই 'চন্দ্রা'কে পাঠকের দরবারে তুলে ধরার জন্যেই সংকলনভুক্ত করা হয়েছে। এখানে আমরা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে 'চন্দ্রা'র বিচার করব না। শুধু দুষ্প্রাপ্যতার নিরিখে 'চন্দ্রা'র অন্তর্ভুক্তি - এই কথাটি আমরা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

নানারকম অসুবিধার মধ্যে ২য় খণ্ডটি প্রকাশের সামান্য বিলম্ব হওয়ায় আমরা দুঃখিত। এই খণ্ডটিও ১ম খণ্ডটির মতো পাঠকদের হৃদয়গ্রাহী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

নমস্কারান্তে—
নিতাই দাস

ভূমিকা

১

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে কোনো একটিকে বেছে না নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে থেকেই একটিকে বেছে নেওয়া হলো। উপন্যাস-শিল্পকর্মটির বাস্তব জীবন সম্মত হয়েই সাহিত্যে এসেছে। সে দিক থেকে পারিপার্শ্বিক জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসকেই বেছে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের কম-বেশি উপাদান দিয়ে যে কাহিনী রচনা করেছেন তাঁর প্রথম বাঙলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে শুরু করে, তাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যিক প্রতিভা অনেক বেশি ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। হতে পারে, উপন্যাসের সবটা তাঁর নয়। কিন্তু যেটুকু উপাদান তিনি পেয়েছেন তা যদি পড়ি তাহলে দেখবো ইতিহাসের সামান্য তথ্য এবং অনেক সময় বিশুদ্ধ তথ্যজাল থেকে তিনি যেভাবে কাহিনী তৈরি করে দিয়েছেন, কাহিনীর গতিবৃদ্ধি করেছেন, পরিবেশ ও চরিত্রের অভূতপূর্ব অলঙ্করণ করেছেন, চিরকালীন মানব সংকট তৈরি করেছেন, তার গভীর আনন্দ বা দুঃখবোধকে অসীম ক্ষমতায় প্রকাশ করেছেন এবং সংকট-দীর্ণ মুখোমুখি দুটি মানুষের সংলাপ রচনায় তাদের উপলব্ধির গভীরতাকে টেনে আনতে পেরেছেন, তাতে এখনও পর্যন্ত তাঁর তুলনা পাওয়া কঠিন বলে আমার মনে হয়েছে। সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসগুলিতেও তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু সে দক্ষতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার একটা অংশ। সেটা হলো ওই সংকট-দীর্ণ মানব-মানবীর চরিত্রে তাদের মুগ্ধতার অনুভবে, জ্বালা-যন্ত্রণার মর্মভেদী হাহাকার, আত্মবিচার কিংবা আক্ষেপ। কিন্তু ব্যাপক পটভূমিতে বিচিত্র কাহিনী-সূত্র টেনে এনে জাল বিস্তার করে, পরিবেশ ও বিচিত্র চরিত্রকে চালনা করে, তার সঙ্গে ভাষার অভিজাত ও লৌকিক স্তর ও মাত্রাকে পাশপাশি রেখে, ধ্বনির বিচিত্র সঙ্গতে পরিবেশকে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে চাক্ষুষ করিয়েছেন এবং তার মধ্যে গভীর মানব-সংকটের নাটকীয়তাকে এনে (যে সংকট তাঁর সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসের সবচেয়ে বড় গুণ) তিনি যে মহাকাব্যিক ব্যাপক অথচ সংহত বয়ন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে মনে হয়েছে, তাঁর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলিই তাঁর কাহিনীরচনা দক্ষতার অনেক বড় প্রমাণ। তুলনায় তাঁর সামাজিক-পারিবারিক কাহিনীগুলি তাঁর প্রতিভার একটি টুকরো অংশমাত্র।

'রাজসিংহের' ঐতিহাসিকতা নিয়ে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার কিংবা সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত নানা আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ'কে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে দাবি করেছেন। আমরা এ তর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। কেননা, ঐতিহাসিকতা এবং ঔপন্যাসিকতার মধ্যে সব সময়ে ঘনিষ্ঠতা রেখে চলা সম্ভব নয়। ইতিহাসের ঘটনার ঝোঁকটা কোনদিকে সেটা যেমন ঔপন্যাসিককে বুঝতে হয়, তেমনি পরস্পরবিরোধী ঐতিহাসিক তথ্য এবং এক ঐতিহাসিকের তথ্য অন্য ঐতিহাসিকের মধ্যে অনুল্লিখিত থাকলে ঔপন্যাসিককেই ঠিক করতে হয় কোন তথ্য অনুযায়ী তিনি কল্পনার রাশ ছাড়বেন বা টানবেন। এই সমস্যার কথা বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তুলেছিলেন। তথ্য থেকে কোন্ ঐতিহাসিক সত্যে তিনি আস্থা রাখতে চাইছেন তাও বলেছিলেন। এবং শেষপর্যন্ত আমরা একথা বলতে বাধ্য যে, ঐতিহাসিক 'সম্ভাব্যতার' প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র সব সময় লক্ষ্য রাখেন নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেবের চরিত্র একটু বদলে ফেলেছেন। কিন্তু এও ঠিক, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যাই বলুন, ঔরঙ্গজেব অক্ষম না হলেও তাঁর অপশাসন খুব একটা দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়না। তাঁব রঙমহলেব ব্যভিচার, ব্যভিচার দূর করার অক্ষমতা, তাঁর কূটনীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ ইত্যাদি কাবণেই তাঁর সময থেকেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনেব সূচনা হয়। এসবই ঐতিহাসিক সত্য। মানুচী ও যদুনাথ সরকারেব বিবরণ থেকেই এই তথ্য সমর্থিত হয। যাই হোক, 'বাজসিংহ' উপন্যাসটিকেই বেছে নেবাব কারণ, এইটিই সংশোধিত উপন্যাস এবং ১৮৮২ সালে তিরাশি পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণ বাজসিংহ উপন্যাস যখন ১৮৯৩ সালেব চতুর্থ সংস্কবণে চাবশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠা হলো তখন মৃত্যুর প্রায় একবছর আগে পুনর্লিখিত এটিকেই তাঁব শেষ স্বাধীন উপন্যাসেব মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিক তথ্যেব পরিমাণ সম্পর্কে সচেতনতা, তথ্য ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা, ঔপন্যাসিকের প্রতিপাদ্য ('হিন্দুর বাহুবল') অনুযায়ী 'ঔপন্যাসিকতা' বা কল্পনার আশ্রয় নেবার স্বাধিনতা এবং যে গুণ তাঁব অন্য উপন্যাসেও আছে—সেই মুগ্ধ বিপন্ন মানুষেব গম্ভীর সংলাপ সবই যেন বহুগুণ সমন্বিত হয়ে দেখা দিয়েছে। আর ভাষা যে কতখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিবেশের interior decoration হিসেবে কাজে লাগতে পারে তার চূড়ান্ত প্রমাণ (উদাহরণ স্বরূপ, উপন্যাসেব সপ্তমখণ্ডের 'তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাদশাহ বহিচক্রে' উল্লেখ করা যেতে পারে) এই উপন্যাসে আছে। হয়তো তুলনামূলক বিচারে তাঁর কোনো উপন্যাসই কম যায় না। তবু এই উপন্যাসে বর্ণনাব অনুপম নাটকীয়তায় কাহিনী ও পরিবেশকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেবার ক্ষমতা খুবই প্রশংসার যোগ্য।

ভূমিকায বেশি কিছু বলবাব সুযোগ নেই। গল্প উপন্যাসেব অনুরাগী সাধাবণ পাঠকেব কথা ভেবে উপন্যাসটির সম্পর্কে দু-একটি কথা সংক্ষেপে বলি। প্রতিপাদ্য হিন্দুর বাহুবল হলেও চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র কবে বাজসিংহ ও ঔরংজেবের সংগ্রাম উপন্যাসের ঐতিহাসিক সত্তাতে যেমন একাধাবে ব্যপক ও সূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছে তেমনি যুদ্ধেরই মধ্যে মাঝে মাঝে ঔবঙ্গজেব-নির্মলকুমারীর সাক্ষাতের দৃশ্য বা রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারীর সাক্ষাতের দৃশ্য গভীব মানব সম্পর্কেরই চিরকালীন রূপ। রূপমুগ্ধ ঔরঙ্গজেব নির্মলকুমারীর কাছে নিবেদন করে প্রত্যাখাত হয়ে আবাব যে যুদ্ধে মন দিয়েছেন সে দৃশ্যটি অবিস্মবণীয। প্রত্যাখাত কিন্তু যুদ্ধবিব্রত ঔবঙ্গজেবেব প্রতিক্রিযা বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পী বলছেন, 'বুড়াব উপব যতটুকু কন্দর্পের অত্যাচাব হইতে পাবে, বোধহয় তাহা হইয়াছিল। ঔবঙ্গজেব প্রেমান্ধের মত বিচ্ছেদ শোকে শোকাকুল না হইয়া একটু বিষণ্ণ হইলেন মাত্র। ঔরঙ্গজেব এখানে শিল্পীর তুলিতে বড় বিষণ্ণ, পাষাণের গাযে রেখা পড়ার মতোই। অন্যদিকে উদয়পুরে রাজসিংহ যখন চঞ্চলকুমারীব মন বুঝবার চেষ্টা করছেন তখন ঔবঙ্গজেবের বিপরীত এক প্রবীণ সংকুচিত রাজাব দেখাপাই যাব মধ্যে মুগ্ধতা আছে কিন্তু বেপবোযা ভাবটা একেবারেই নেই, বিবেচনা বোধ খুবই প্রবল। রাজকার্য আছে, অন্যমহিষী আছে, নিজের বার্ধক্যও একটা বড় বাধা। তবু রাজসিংহ যখন বলেন, 'তুমি এমন অদ্বিতীযা রূপবতী বলিযাই তোমাকে মহিষী কবিতে সংকুচিত হইয়াছি'। তখন চঞ্চলকুমাবী একটু হেসে বলেছিলেন, 'উদযপুবেব মহিষীগণ সকলেই কি কুরূপা?' অন্য মহিষীদেব সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য না কবে একটু সাবধানেই রাজসিংহ বলেছিলেন, 'তোমার মত কেহই সুরূপা নহে'। কিন্তু এরও উত্তর দিতে গিয়ে চঞ্চলকুমাবী উদ্দীপ্ত হয়ে বলেছেন, 'আমাব বিনীত নিবেদন, কথাটা মহিষীদিগের কাছে বলিবেন না। মহাবাণা রাজসিংহেরও ভয়ের স্থান থাকিতে পাবে'। একদিকে প্রবীণ প্রেমিকেব সংকোচ, অন্যদিকে একেবারেই তরুণীর এই উদ্দীপ্ত কৌতুক, একদিকে মুগ্ধতা অন্যদিকে শ্রদ্ধান্বিত আত্মসমর্পণের এই ছবি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আগেকাব কোন উপন্যাসে পাই নি। একমাত্র লবঙ্গলতার সঙ্গে তার বৃদ্ধ স্বামীর পূর্বপ্রণয় থাকলে এমন দৃশ্য সম্ভব ছিল। কিন্তু সেরকম সম্ভবনা ঘটে নি। শৈবলিনীর মধ্যেও এই কৌতুকবোধ ছিল না।

ঐতিহাসিকতার মধ্যেও শিল্পীর এই জাতীয় উপভোগ্য মানবিক দৃশ্যগুলির অবতারণা যেমন দক্ষতার প্রমাণ, তেমনি শিল্পী যেখানে ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁব কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন সেখানেও তিনি শেষবারের মতোই অবিস্মবণীয় দক্ষতার পরিচয়

দিয়েছেন এবং সেহলো জেবউন্নিসার-মবারক-দরিয়ার কাহিনী। জেব-উন্নিসা ঝানু বাজনীতিকের মতোই চঞ্চলকুমারীর হঠকারীতার সুযোগ নিয়ে যে চাল চলেছে তাতে এই কাহিনীটিরও গতি বেড়েছে। চঞ্চলকুমারীকে আনবার জন্যে ঔরঙ্গজেব যে বাহিনী পাঠিয়েছেন তাতে মবারককে সঙ্গী হতে হয়েছে এবং এই অভিযানে স্ত্রী দবিয়াব মূল্য মবারক বুঝেছে। জেব-উন্নিসা মবারকের উপর আধিপত্য হারিয়েছে। তাতে জেব-উন্নিসা যে ঈর্ষার বিষ ছড়িয়েছে সে দিকে দরিয়া জ্বলেছে। মবারক মরেছে। এবং মবারক মরে রাজসিংহ-ঔরঙ্গজেবের কাহিনীতে জড়িয়ে পড়েছে। মবারককে 'হত্যা' কবে জেব-উন্নিসার অনুতাপ চরমে উঠেছে এবং সেই অনুতাপে দহনে নতুন করে মবাকের স্ত্রী জেব-উন্নিসা জন্ম হয়েছে। এই মিলনে আবাব দরিযাব ছায়া পড়েছে, প্রতিহিংসা পরয়ানা দরিয়ার হাতে মবারকের মৃত্যু হয়েছে।

এই কহিনীব সঙ্গে মানিকলাল নির্মলকুমারীর কাহিনীও জুড়ে গেছে। ঔরঙ্গজেবকে পবাস্ত কবার ক্ষেত্রে মানিকলালের চাতুর্যই ছিল রাজসিংহেব সম্পদ। মবারকেও সে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। অন্যদিকে, নির্মলকুমারী চঞ্চলকুমারীকে সাহায্য করেছে এবং জেব-উন্নিসার কাছে মবারকের মহত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে পবোক্ষে সে মবারকের পরিণতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধে নির্মলকুমারী মানিকলালকে নানাভাবে সাহায্য করেছে এবং বাদশাহের মতো প্রণয়কাঙ্ক্ষী পেয়েও সে মানিকলালকেই স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই সব ঘটনাকেই ছাপিয়ে গেছে জেব-উন্নিসা-মবারকের কাহিনী যার অন্তিম পরিণতি মবারকের মৃত্যুতে-দরিয়ারই গুলিতে। তিনদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে মোগলসেনা যখন নিছক বীরত্বের মহিমাতেই যুদ্ধ করছে তখন মৃত্যুর ছায়ার বিষন্ন মবারক উন্মাদ্বিনী দবিয়ার গুলিতে। এই মৃত্যু সংবাদ শুনে জেব-উন্নিসা তার বেশভূষা ফেলে দিয়ে উদয় সর্দারেব প্রস্তর কঠিন ভূমির ওপর কাঁদতে লাগলো। কূটকৌশলী রাজনীতিজ্ঞ চতুর জেব-উন্নিসাব এই 'বসুধালিঙ্গন' বিলাপেই মোগল-রাজদূতের সংশ্রব শেষ হয়েছে। উপন্যাসের বহু পরিচ্ছেদের নামকরণে দেখি, কেবলই আগুন আর দহনজ্বালার উল্লেখ। এই অগ্নিপটেই মবারকের অনিবার্য মৃত্যু আর জেব-উন্নিসার কান্না 'একটি রক্তিম মরীচিকা'র মতোই ভেসে ওঠে। মোগল-রাজদূতের প্রতি মবারকের দ্বিধা বিভক্ত আনুগত্য শেষপর্যন্ত মোগল রাজ্য ধ্বংসের উপায় করে দিয়েছে, অন্যদিকে দারিয়াকে ছেড়ে জেব-উন্নিসার প্রতি তার পূর্ণজাগ্রত ভালোবাসা তার মধ্যে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত দুদিক থেকেই আত্মগ্লানি জানিয়েছিল। দরিয়ার গুলি সেই আত্মগ্লানিরই তীক্ষ্ণ মৃত্যুবাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের বেশির ভাগ উপন্যাসেই দেখি যে নীতিতে চরিত্র অধিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠিত দুর্বার প্রেমের

মুগ্ধতা বা ব্যর্থতা সেই প্রতিষ্ঠা থেকে চরিত্রকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এবং সেই মুগ্ধতার আবেদন বা ব্যর্থতার জ্বলা ফোটাতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প সৃষ্টি ক্ষমতা এখনও ঈর্ষার যোগ্য।

২

মানুষ হিসেবে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যেমন দুঃসাহসী রোমাঞ্চ-প্রেমিক adventurous type ছিলেন তেমনি তাঁর শিল্পসৃষ্টিতেও সেই ঝোঁক রয়েছে। ঝোঁক থাকা খুবই স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক he is a terrible fellow. He know how to write and how to fight and how to slight all things divine'- তা শুধু কৌতুকের কথা নয়, খুব খাঁটি কথা। তাঁর খুবই অল্পবয়সে লেখা 'দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমন' (১৮৫৮) পড়লে বোঝা যায়, একেবারেই তরুণ এই শিল্পীর ঝোঁক কোন দিকে। কাহিনী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'দুরাকাঙ্খ' নায়ক বলেছেন, আমি খ্রীষ্টান হইয়া যে সকল আশা সিদ্ধ করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহার একটিও সফল হইল না। কোন বিবিই প্রণয়িভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বাঙ্গালি বলিয়া ইংরাজেরা ঘৃণা, এবং ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া স্বজাতীয়েরা পরিহার করিতে লাগিলেন। তথাপি আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ হইল না। প্রমেন্দরত মানস ও স্ফুর্তিযুক্ত শরীরের সাহায্যে আমার প্রফুল্লতার কোন হানি হয নাই।' কাজেই দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্য 'to slight all things divine' লেখকের সম্পর্কে শুধু নয়। তাঁর কল্পিত নায়ক সম্পর্কেও খাটে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে 'দি রোমান্স অব হিস্ট্রি' থেকে তাঁর উপন্যাসের কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন সেই বইটিরই The Parish নামে একটি গল্পের সূত্র ধরে (একথা অক্ষয়চন্দ্র সরকারই প্রথম বলেন।) 'দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ' রচিত। গল্পে এক অস্পৃশ্য পারিয়া নারী ও তার অধর্গতি মেয়ের কথা আছে। কৃষ্ণকমলের কাহিনীতেও এইরকম একটি পারিয়া মা ও তার মেয়ের গল্প আছে। কিন্তু তার বেশি কিছু নেই। পুরো গল্পটাই নায়কের মুখে আত্মজীবন কাহিনীর মতো বলে যাওয়া। বঙ্কিমপূর্বযুগের রোমান্স-, কাহিনীর এই আত্মকথন ভঙ্গি অবশ্যই নতুন। গতশতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষে প্যারীচাঁদ লিখেছেন শিথিলবদ্ধ কাহিনী সূত্রে সে সময়কার সমাজের একটি বিশেষ শ্রেনীর গল্প। ভূদেব লিখেছিলেন ঐতিহাসিক চরিত্রভিত্তিক রোমান্সের গল্প। আর সমকালেই কৃষ্ণকমল লিখেছেন পরস্পর সম্পর্কহীন কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প। কিছুটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে হায়দর-টিপুসুলতান ও মালোয়ার সিন্ধিয়ার রাজ্যকালের ঘটনায়। বাকিটা খানিক অভিজ্ঞতা, খানিক কল্পনার মিশ্রণ।

প্রথম ঘটনা, সমুদ্রযাত্রায ফরাসী মেযে জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম। রোমাঞ্চের অনুভব পূর্ণ হতে না হতেই সামুদ্রিক ঝড়ে জুলিয়ার মৃত্যু। নায়ক অচেতন অবস্থায় বোটে ভেসে এসেছে ত্রিবাঙ্কুব সমুদ্রতটে একটি অন্তরীন পাহাড়ের ধারে দুটি অবলার আশ্রয়ে। একটি তরুণী, আরেকজন প্রবীণা। দ্বিতীয় ঘটনাব শুরু এখানেই। তরুণীব নাম কমলাদী। পার্বত্য অঞ্চলে প্রপাত, অর্ন্তদেশ ও পাহাড়ী নদীর ধারে তরুণীব সঙ্গে তার প্রণয ও বিবাহ হয়েছে। এই ধরনের পরিবেশ কৃষ্ণকমলের অনুবাদ করা একটি বিখ্যাত ফরাসী বোমানস্ পৌলভর্জিনীতেও আছে (যে রোমানস্ পড়ে অল্পবয়সে ববীন্দ্রনাথ তাঁব মুগ্ধতার স্মৃতিটুকু অম্লান করে রেখেছেন 'জীবনস্মৃতি'-তে।) কিন্তু কমলাদী অন্তঃসত্ত্বা হলে নিষ্ঠুব ভাবেই তাকে ফেলে চলে গেল নায়ক। এখানেই তৃতীয় ঘটনাব শুরু। নায়ক পালিযে এসে হায়দারের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিল। কিন্তু টিপুর সঙ্গে বিরোধ হওয়াতে টিপু তাকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেবার চক্রান্ত করলো। নায়ক আবার পালালো। চতুর্থ ঘটনা শুরু হচ্ছে যখন নায়ক মালোয়ায় এসে সিন্ধিযাব সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সেখানে বাজকুমাবী তাব প্রতি আকৃষ্ট হযেছে। এই সুযোগে নায়ক তাব বাজ্যলাভের রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণ করতে গেলে ক্রুদ্ধ রাজকুমাবী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পঞ্চম ঘটনায় দেখি, বিপন্ন নায়ক তখন পালিয়ে গিয়ে বিন্ধ্যারণ্যের আদিবাসী জীবনে ঘুরতে ঘুরেত বন্যযুবতীর ভালোবাসার অত্যাচাব থেকে পালিযে উড়িষ্যা পৌঁছালো। ষষ্ঠ এবং শেষ ঘটনায় দেখি, জগন্নাথ মন্দির থেকে কিছু দূরে পাহাড়ী নির্জনতায় এক পাবিয়ার কুটীরে এক পারিয়া বৃদ্ধের কন্যাকে বিবাহ করে দুরাশ্বেব বৃথা ভ্রমন শেষ হয়েছে। উচ্চাশা ত্যাগ করে সাধারণ একটি অবহেলিত জাতের মেয়েকে বিয়ে করে ভবঘুবে নায়ক সুখী হওয়াতে ভ্রমণ একেবাবে 'বৃথা' হযেছে বলবো না। আত্মকথনের ভঙ্গিতে বলা বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারের সূত্রে গাঁথা এই কাহিনী ইয়োরোপীয পিকারেস্ক্-জাতীয় রোম্যান্সকেই মনে করিয়ে দেয়। প্রধানত বর্ণনাত্মক বঙ্কিম-পূর্বযুগের এই রচনার মধ্যে উপন্যাসের বিচিত্র রস ফোটাবার ক্ষমতায় বিস্মিত হতে হয়। বিস্মিত হতে হয় লেখকের সাধু ও চলিত ভাষায় শব্দের মিশ্রনের ক্ষমতায় এবং বোম্যান্টিক অনুভব প্রকাশেব দক্ষতায়। কিন্তু সংলাপের দক্ষতায় প্রমাণ দিতে পারেননি তাই। অবশ্য একটু বাস্তব ভিত্তিতে হয়তো আছে নাযকের জীবন যাপনের ভঙ্গিতে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে। কিন্তু ধর্মবোধহীন মূল্যবোধহীন নিছক ইহ-সর্বস্ব এক নায়ক তার উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের শেষে পারিয়ার কুঠীরে এসে পবমেশ্বরের নাম কবেই পারিয়া কন্যার দায়িত্ব নিয়েছে। এই রূপান্তরটিও লক্ষ্য কববার মতো।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক খ্যাতি যখন চূড়ান্ত, 'বঙ্গদর্শন' যখন শিক্ষিত পাঠকের অধীর অপেক্ষার বস্তু সেই সময়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর গার্হস্থ্যজীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যে এক ধরনের নৈতিক বোধ সঞ্চার করে গল্প-উপন্যাসের পাঠককে মুগ্ধ করেছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪)। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র যে ধরনের বিষয় বস্তু নিয়ে কাহিনী রচন ও চরিত্রসৃষ্টি, নাটকীয় পরিস্থিতি ও আবেগময় ভাষার সম্পদ নিয়ে বাঙালী পাঠকের মন জয় করেছিলেন রবীন্দ্রযুগে। বঙ্কিমযুগে অনেকটা সজাতীয় জনপ্রিয়তাই পেয়েছিলেন তারকনাথ। যৌথ পরিবারে দুটি বিপরীত স্বভাবের ভাই শশিভূষণ ও বিধুভূষণ, আবও দুটি বিপরীত স্বভাবের স্ত্রী যথাক্রমে প্রমদা ও সরলা। ছোটভাইয়ের লেখাপড়া হয়নি, বড় ভাই প্রতিষ্ঠিত। তবু ভ্রাতৃবিরোধ প্রথমটা হয় নি। অসম আয়ের দুটি ভাই একটি সংসারে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু দুটি দম্পতি থাকলে প্রায়শ মুশকিল হয়ে পড়ে। বড় বৌ প্রমদার পরামর্শে বুদ্ধিমান অথচ স্ত্রৈণ শশিভূষণ ভাই বিধুভূষণকে আলাদা করে দিলেন। রোজগারহীন হয়ে বিধুভূষণ স্ত্রী পুত্র এবং একটি পরিচারিকাকে রেখে জীবিকার সন্ধানে কলকাতা গেলেন। তারপর ঘটনাচক্রে শশিভূষণের চাকরিতে উন্নতি যেমন হলো তেমনি অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। অন্যদিকে, বিধুভূষণের স্ত্রী সরলা দারিদ্রের মর্মান্তিক জ্বালায় মারা গেলেন। কিন্তু বিধুভূষণের ছেলে গোপাল পড়াশোনার জন্যে কলকাতায় এসে যে বাড়িতে কাজ নিয়েছিল সে বাড়ির আশ্রয়দাতা হেমচন্দ্রের স্নেহ পেল, হেমচন্দ্রের মেয়ে স্বর্ণলতার ভালোবাসাও পেলো। কিন্তু স্বর্ণকে পাবার আগে স্বর্ণকে বিয়ে করবার ব্যাপারে নানা ষড়যন্ত্র ও দুর্বিপাকের মধ্যে দিয়ে গোপালকে যেতে হলো। ওদিকে শশিভূষণ মোকদ্দমায় পড়ে সর্বস্ব খুঁটিয়েছিলেন। প্রমদাকে পিত্রালয়ে যেতে হয়েছিল। পুত্র কন্যা নিয়ে শশী গোপালের বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। শেষে দেখি বিধুভূষণ ছেলের সংসারেই থাকেন, গোপাল ও স্বর্ণলতা ছেলের তিনি খেলার সঙ্গী।

অসৎ ও অন্যায়কারীর শাস্তি এবং সৎলোকের পুরস্কার প্রাপ্তির এই কাহিনী সাধারণ পাঠকের পক্ষে স্বস্তিকর। পারিবারিক কলহ, বিধুভূষণের ভাগ্যান্বেষণের পথে নানা অভিজ্ঞতা এবং ভাগ্যক্রমে অন্যায়ের শাস্তি ও ধার্মিকের পুরস্কার এই বাস্তব-কাহিনীটিকে নীতিকথায় পৌঁছে দিয়েছে। হয়তো প্রাত্যাহিকতার রস বঙ্কিমযুগের তীব্রগতি রোম্যান্স্ ও কল্পনাশক্তির বিপরীতে বৈচিত্র্য এনেছিল। কিন্তু সৌভাগ্য

বা দৈবানুগ্রহকে তারকনাথ কাহিনীচালনার নিয়ন্ত্রণ শক্তি হিসেবে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে বিধবার সঙ্গে প্রণয়ে যে দ্বন্দ্ব ও পাপবোধ এসেছে তা উনিশ শতকের নতুন মূল্যবোধের ফল। যতখাদই থাক, বঙ্কিমচন্দ্রের ওই দুটি উপন্যাসে ওই মূল্যবোধের দ্বন্দ্বই বাস্তবতা। স্বর্ণলতার প্রাত্যাহিকতার বাস্তবতা তার থেকে আলাদা। তবু বঙ্কিমী গঠনভঙ্গি এবং পাঠকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বক্তার বঙ্কিমী কথনভঙ্গি তারকনাথকে প্রভাবিত করলেও নানা তীক্ষ্ণ মন্তব্যে। জটিল কাহিনী চালনায়, চরিত্রবৈচিত্র্যে ও কৌতুকরসপ্রকাশে (গদাধর ও নীলকমল) তারকনাথ একটু বিলম্বিত ভঙ্গির কাহিনীতে ভবিষ্যৎ সামাজিক উপন্যাসের দিক্ নির্দেশ করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র যেমন চরিত্রের স্বভাবে নানা 'ভালো-মন্দ' বৈশিষ্ট্য মিশিয়ে পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসে জটিলতা আনতে পারতেন তারকনাথের চরিত্রসৃষ্টিতে সেই জটিলতা অবশ্য ছিল না। খানিকটা রূপকথার মতোই 'ভালো অথবা মন্দ' চরিত্রই তাঁর প্রত্যাহিক জীবনের বাস্তব কাহিনীতে রূপকথা রোম্যানসের স্পর্শটুকু রেখে গেছে।

৪

ঠিক আলালের ঘরের দুলাল না হলেও কলকাতার কাছে গোধনপুর নামে একটি গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে পশুপতি বাপ-মা-র আদরে কীভাবে নষ্ট হয়ে গিয়ে কলকাতার বাবু সমাজে দেশরক্ষার জন্যে সভা-সমিতি করে বেড়াতে লাগলো তার ব্যঙ্গাত্মক ছবি আছে চন্দ্রনাথ বসুর ছোট উপন্যাস 'পশুপতি সম্বাদ' (বাং ১২৯০) এর মধ্যে। ''আলালের ঘরের দুলাল' যেমন শেষ পর্যন্ত সৎও সংযত হবার নীতিকথাকেই তুলে ধরেছে এখানে সেরকম কোনো চেষ্টা নেই। ব্যঙ্গের তীব্রতা এখানে একটু বেশি আবার, 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' যেমন রূপকের আকারে ফ্যানটাসি-মেশানো ব্যঙ্গাত্মক নক্শা, এখানে তেমন কোনো বাইরের আবরণও নেই। এখানে বর্ণনার ভঙ্গিতেই খানিকটা উপভোগ্য অতিশয্য এনে বাবু সমাজের দেশপ্রেমিক ও দেশরক্ষকের মুখোশটি খুলে দেওয়া হয়েচে। উনিশ-শতকের নব্যসংস্কৃতির ধাক্কায় শহর এবং গ্রাম---দুয়েরই যে পরিবর্তন আসছিল তারই উপভোগ্য নক্শা এই রচনাটি। শহর কলকাতায় জোলো দুধ চালান দিয়ে গোধনপুরের গ্রামের গোয়ালারা যে সম্পত্তি করেছে তাতে তুলনায় গরিব চাষী এবং ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের ঘরে অশান্তি দেখা দিয়েছে। কলকাতা এখন বিত্তলাভের মহাতীর্থ। লেখকের কথায়, 'প্রকৃত religion এর পুরুষোত্তম London, Paris তাহার বৃন্দাবন, কলিকাতা তাহার গয়া'। পশুপতি

পাঠশালায় পড়াশোনা করে না, বাবা সঙ্গতিহীন উমাপতি পণ্ডিতবংশের নির্বোধ ছেলে বলে পশুপতির নানা দুষ্কার্যের খবরে বিশ্বাস করেন না। ভাবেন, তাঁর ছেলে দিগ্‌গজ হবেই। কিন্তু পশুপতির গুরুমশাই কেবলই উত্যক্ত হন। গুরুমশাই এর সঙ্গে যে সাবিত্রী গোয়ালিনীর অবৈধ সম্পর্ক আছে তা পশুপতির চোখে পড়েছে। তাতে পশুপতির ওপর সন্ত্রস্ত গুরুমশাইয়ের স্নেহদৃষ্টি বেশি করে পড়েছে। তাতে পশুপতির আদরও বেড়েছে। গ্রামে পশুপতির যাবতীয় কুকীর্তির খবর রটে। কিন্তু গ্রামের ন্যায়বাগীশ মশাই গুরুমশাই- এর মাথার ওপর পশুপতি ডিগবাজি তত্ত্বের ব্যাখা দিয়ে বলেন, পশুপতি হলো পবননন্দনের আধুনিক অবতার। কাজেই কলকাতায় পড়ালে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। পটলডাঙ্গায় এসে কাঙালীচরণের বাড়িতে থেকে পশুপতি নকল করে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় ছাত্রবৃত্তি পেলো। তারপর পণ্ডিত পশুপতির রূপবতী স্ত্রী এলো ঘরে। 'অতএব তিনি একটা মানুষ' কাঙালীচরণকে 'কেয়ার' না করেই নিজের লেখাপড়ার বদলে দেশোদ্ধারে লাগলো। পশুপতি কাঙালীচরণের বিধবা কন্যাকে গোপনে পড়াতে লাগলো। গোপনে, কারণ সকলে উপকারের কথা জানতে পারলে 'ধর্মনিষ্কাম না হইয়া স্বার্থদূষিত হয়। যাই হোক, এতেই থেমে না থেকে পশুপতি ধর্ম, দেশ, জাতি, বিধবা, বালিকাবধূ সবেরই উদ্ধারে এগিয়ে গেলো। এমনকি, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘোর দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে বঙ্কিমবাবুর নবন্যাসের' 'শ্রাদ্ধ' করলো। হেমচন্দ্রকে চোর বললো। পশুপতি যা বলে সকলেই 'হিয়ার' 'হিয়ার' বলে। সভার পরেই মদ্যপানের জন্যে এদিক-ওদিক চলে যায়। সভায় রবীন্দ্রবাবু পর্যন্ত সকলেরই একদিন শ্রাদ্ধ হলো। ইন্দ্রনাথবাবুর ভারতোদ্ধারই একমাত্র বাইবেল বলে গণ্য হলো। একদিন আরেক সভ্য প্রমদাচরণকে বাবার খুব অসুখ হলে পটলডাঙা থেকে চলে এসে পশুপতি পতিতা পাড়ায় গেলেন। সঙ্গে কাঙালীচরণের বিধবাকন্যা। পটলডাঙা ডিবেটিং ক্লাবের সভ্যরা সকলেস সেই বিধবার উদ্ধারে এমনভাবে লাগলো যে, বিধবা কন্যাটি আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করলো।

ওদিকে গ্রামে বৃদ্ধ উমাপতি ছেলের আশায় থেকে মারা গেলেন। পিতার সম্পত্তি পেয়ে গ্রামে এসে (কলকাতায় কাঙালীচরণের কাছে মুখ দেখবার উপায় নেই বলে এবং ছাত্রবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেছে বলে) সবজাতের লোকজনকে ডেকে পশুপতি গ্রামোদ্ধারে ব্রতী হলেন। মেয়েদের নৈশবিদ্যালয় হলো, পাবলিক লাইব্রেরী হলো। বঙ্কিমবাবুর জনপ্রিয়তাকে উড়াইয়া দিবার জন্যে পশুপতি নিজেই গ্রন্থলেখক হলেন। বই কাটছে না দেখে টাইটেল পেজ ছিঁড়ে চতুর্থ সংস্করণ লিখে দেওয়া হলো। ছাপতে গিয়ে সম্পত্তি বিক্রিও করলেন পশুপতি। তবু ছাপখানার দেনা শোধ হলো না। শেষে

কপিরাইট বিক্রি করে মাত্র ছ'টাকা নিয়ে দেশে ফিরলেন। পাওনাদারেরা মামলা করলে হাকিমের সামনে পশুপতি বললেন, পেট্রিয়ট পোষার খরচ, দেশোদ্ধারের কাব্য ছাপার খরচ তো দেশের লোকই দেবে। এমন যুক্তিতে পশুপতির জেল হলো। খবর পেয়ে গ্রামের গুরুমশাই-এর রক্ষিতা সাবিত্রী গয়লানী জোলো দুধের টাকায় কেনা গহনা বেচে পশুপতিকে খালাস করলো। পশুপতি তাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলে দেশোদ্ধার সম্পূর্ণ হলো।

এই ভাবেই দেশোদ্ধারব্রতী বাবু সমাজের মুখোস খুলেছেন চন্দ্রনাথ। নিছক কৌতুকরস নক্‌শা জাতীয় এই ছোট উপন্যাসের কাহিনীতে কমই, তীব্র বিদ্রুপই একাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীর বক্তা যে লেখক সেই বক্তাকে মাঝে বাবুদের মিটিং এ দেখা গেছে দর্শকের ভূমিকায়। সভ্যদের গতিবিধির ওপর মাঝে মাঝেই নজর রেখেছেন। বক্তৃতার অনেক কথাই নোট করে রেখেছেন। তখনকার কাহিনী কথনের প্রচলিত প্রথায় কাহিনী বলার ঢঙে একটু নতুনত্ব আছে সন্দেহ নেই।

৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' উপন্যাসটি 'কুসুমলালা' মাসিক পত্রিকায় ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সিপাহীবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লেখা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটির কাহিনী শুরু থেকে তৃতীয় বিভাগ না আসা পর্যন্ত কাহিনীর সঙ্গে যে ইতিহাসের যোগ আছে তা বোঝা যায় না। সে যোগ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়। মনে হয়, উত্তর কলকাতার গঙ্গার ধারে শ্মশান-সংশ্লিষ্ট (বাবাজার!) কোনো অঞ্চলে কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটছে। রামচাঁদ নামে নেশা-ভাঙ খাওয়া ব্রাহ্মণ শীতের নির্ঘুম রাত্রে গঙ্গার ধারে ঘুরতে ঘুরতে ফেলে যাওয়া একটি ছেলে কুড়িয়ে পেলো। এ খবর পৌঁছে গেল পাড়ার নীলরতনবাবুর পুত্রসন্তান প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে জমে-যাওয়া একটি আড্ডায়। শ্মশান থেকে ছেলে আনায় লোকে অবাক হয়েছে। চুরি-ডাকাতি সব কিছুর দোষে দোষী করে রামচাঁদকে। রামচাঁদ ছেলেটিকে তার স্বর্গত শালীর বলে চালাতে চায়। ব্যর্থ হয়। বিশ্বাস হারায়। বড়লোকের বাড়ির বৃত্তিটুকুও তার বন্ধ হয়। তবু অনটন হলেও ছেলেটিকে রামচাঁদ ও তার স্ত্রী ছাড়ে না। ভিক্ষে করেই চালাবে ঠিক করে। কিন্তু ভিক্ষে করতে গিয়ে বিপত্তি। এক পুলিসের জমদ্দারের কাছে ভিক্ষে চাইতেই সে সোনার বালা দিলে। কিন্তু পেছনে পেছনে রামচাঁদের বাসা চিনে এলো। তারপর রামচাঁদ গ্রেপ্তার। কারণ, চোর দরকার। জেলে একজনের সঙ্গে আলাপ হয় যে গুরু হিসেবে শিষ্যের পুত্রটিকে খুইয়েছে আর তার গলার

পদকটি নিজের ছেলেব গলায় পরিয়েছে বলে পুলিসের অভিযোগ। ওদিকে রামচাঁদেব স্ত্রী শান্ত নীলরতনবাবুদের বাড়িতেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে হারানকে নিয়ে বারো বছব কাটায়। তারপর নীলরতনবাবুর খানসামাব সঙ্গে ঝগড়ায় চুবিব অপবাদেব ভযে হাবান পালিযে যায়। পালিয়ে যেতে গিয়ে এক সন্ন্যাসীব সঙ্গে দেখা হয। এদিকে শান্ত হারানকে খুঁজতে গিযে আমবাগানে ছেলে পালানো বামচাঁদকে দেখতে পেযে অবাক হয়। খানসামার কাছে মার খেযে হারান পালিযেছে শুনে ওই বাগানেই খানসামা স্বরূপকে মাবধোর করে বামচাঁদ পালিয়ে যায়।

এদিকে শান্ত-র সামনেই বামচাঁদ স্বরূপকে মেরেছে বলে স্বরূপ শান্তকে জেবা কবে। শান্ত পলাতক আসামী স্বামীর নাম বলতে পারে না। কাজেই স্বরূপ শান্তকে দুশ্চবিত্রা বলে অভিযুক্ত করে। অপবাদ মাথায় নিয়ে শান্ত বেবিয়ে পড়ে নীলবতনবাবুব বাড়ি থেকে। পলতাব কাছে রমেশ ঘোষাল নামে একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হয যাব স্ত্রী বোট থেকে গঙ্গাব ধাবে নেমে উন্মাদিনীব মতো হাবানো সন্তানকে খুঁজতে থাকে। শান্ত তাকে সান্ত্বনা দেয়। বমেশ ঘোষাল শান্তকে মাতৃসম্বোধনে ডেকে তাব অবস্থা শুনে তাকে নিযে যায়।

পরদিন ওই আমবাগানেই রাত্রে শান্ত-র সঙ্গে বামচাঁদের দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু অপেক্ষা করতে গিয়ে মালীর কাছে শান্ত-ব খবর শুনে যখন সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবছে এক ডাকাত দলের সঙ্গে পরিচিত হযে সে দলে ভিড়ে যায়। লুঠ করতে গিয়ে ডাকাত-সর্দার জখম হলো এবং তারই নির্দেশে তার রক্ষিত ধনদৌলত নিয়ে রামচাঁদ ডাকাতদলের সর্দার হলো। এই পর্যন্ত গল্পটি বলাব কাবণ, আগেই বলেছি, গল্পটি এইখান থেকেই হঠাৎই একধাপে তৃতীয় পবিচ্ছেদে কলকাতার গঙ্গার ধাবে গিযে পড়েছে। দুর্গেব সিপাহীবা রান্না করছে আব এক পথিক সন্ন্যাসী গান গাইতে গাইতে তাব দিকে যাচ্ছে। তারই মুখে ম্লেচ্ছজাতিব পায়ে বিকিয়ে দেওয়া ভাবতীয হিন্দুর জন্যে বিলাপ শুনি। ব্যারাকপুব, নাগপুর, ঝাঁসি, বোরালি, সম্বলপুর, দিল্লী, কানপুর, ফতেপুর, সর্বত্রই ইংরেজদের অত্যাচারেব খবরে সিপাহীরা উত্তেজিত। তারপর অজস্র চরিত্রের ভীড়। সোমনাথ, চন্দ্রা, গোঁসাই, ভিখারিনী, রমানাথ, সন্ন্যাসী সকলেই সিপাহী-বিদ্রোহের সাহায্যকারী। কেবল আমাদের বর্ণিত গল্পের রামচাঁদ খ্রীষ্টীযদের পক্ষ নিয়েছে। ভাবভঙ্গিতে এরা আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মতো। বিশেষ কবে চন্দ্রাকে কেন্দ্র করে সোমনাথ ও রামনাথের আকর্ষণ। ব্যর্থপ্রেমিক হিসেবে রমানাথেব করুণ আত্মনিবেদনটি হুবহু আনন্দমঠের সন্ন্যাসী ভবানন্দের মতো। 'সংসাবে আমার কিছুই নাই। তুমি আমার হইবে, তোমায় পাইব,

এই আমার আশা। কি নিমিত্ত পশ্চিমে আসিয়াছি শোন, -যে সন্ন্যাসী তোমার প্রেমের পাত্র, তার পদে তোমায় ভিক্ষা লইব, এই ভবসায় বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। চন্দ্রা, তুমি কি আমার হইবে, বারানসীর কেদারনাথ মন্দিরের পটভূমিতে রমানাথের এই আত্মনিবেদনের ভাষা গিরিশচন্দ্রের কলমে বঙ্কিমই অব্যর্থভাবে যুগিয়েছেন। কানপুরে পাণ্ডুনদীর তীরে ইংরেজদের জয়ের তোপধ্বনিরি মধ্যে মরণাপন্ন পিপাসার্ত রমানাথ সোমানাথকে বলেছিল, 'ভালোবাসার প্রতিদান না পাইলে কি যন্ত্রণা—আমি বুঝিয়াছি। চন্দ্রা তোমায় ভালবাসে। চন্দ্রা সতী, তুমি তাহাকে গ্রহণ করিও। যদি কথা না রাখ, একটি অনুরোধ রাখিও। বলিও, মৃত্যুকালে তার নাম আমার মুখে শুনিয়াছ।' এই দৃশ্য যেমন বঙ্কিমী ভঙ্গীর অব্যর্থ স্মারক, তেমনি সিপাহী পক্ষের রামচাঁদের হারিয়ে যাওয়া পুত্র সোমনাথ-রূপী হারাণ, ইংরেজ সমর্থক পিতা রামচাঁদ আর হারিয়ে যাওয়া রামচাঁদের স্ত্রীর শান্ত-র মর্মান্তিক মিলনদৃশ্যটি গিরিশচন্দ্রের স্বকীয় প্রশংসনীয় কল্পনা। মর্মান্তিক মিলন, কারণ এই মিলনের মুহূর্তেই নানাসাহেবের গুলিতে ইংরেজসমর্থক রামচাঁদের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, চন্দ্রাও হারানের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। উপন্যাসের শেষে হারান গঙ্গার ঠিক সেই জায়গাটিতেই হাজির হয়েছে যেখানে তাকে শৈশবে ফেলে যাওয়া হয়েছিল। আর সেই মুহূর্তে এক নারী তার সঙ্গের পুরুষটির হাত ছাড়িয়ে এসে হারানকে ধরে চলেছে এই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র'। সঙ্গে সঙ্গে একটি ছবি সে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। হারান অবাক্ হয়ে দেখছে, তারই প্রতিমূর্তি। নিচে লেখা 'চন্দ্রা'। এই নাটকীয় পরিণতি গিরিশচন্দ্রের উপন্যাস রচনার দক্ষতা অবশ্যই প্রমাণ করে, প্রমাণ করে সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনীর পটভূমিতে কজে মার্টন রহস্যময় প্লটে রচনার ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছিলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র আর ঠিক নাটকের অসচ্ছলদৃশ্যের বিভাগের মবোট উপন্যাসের কাহিনীকে চমৎকার উদ্ধৃতির সাহায্যে বিভাগের-পরিচ্ছেদ ভাগ করে কী অসাধারণ দক্ষতায় ঘটনাগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে গুটিয়ে আনতে পেরেছিলেন। কেবল, ঘটনার অতিদ্রুত গতি, স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার যুক্তি সঙ্গত সময়-মাত্রা, লঙ্ঘন, চরিত্রগুলির প্রায় 'দৈব' উপস্থিতি দেখাসাক্ষাতের রোম্যান্স-সুলভ আকস্মিকতা এবং রহস্যের উন্মোচনের অতিনাটকীযতায় পাঠককে হতচকিত হতে হয়। তাছাড়া আনন্দমঠের বঙ্কিমী-কল্পনা ভঙ্গির মধ্যে যে স্পষ্ট সাংগঠনিক রূপটি চোখে পড়ে 'চন্দ্রা'তে গিরিশচন্দ্র সে রূপটি আনতে পারেন নি। মনে হয়েছে, এক অদৃশ্য কোনো পরিচালক এই সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী বিদ্রোহকে অবিশ্বাস্য ক্ষমতায় চালনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। অন্যান্য অনেক কারণ ছাড়াও সংহত চালনাশক্তির অভাবে

যেমন সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল উপন্যাসেও যেন তারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু কীভাবে তা ব্যর্থ হলো তার কারণগুলি দেখাতে পারলে শিল্পরূপের সার্থকতার একটি নজির অন্তত দেখতে পাওয়া যেতো।

৭ই আগষ্ট, ১৯৯২

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা সার্থক উপন্যাস রচয়িতা। গঠনকৌশল, কাহিনীর ঠাস বুনন ও বিন্যাস এবং চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন উপন্যাস কি! উপন্যাসের প্রকৃতি কিরকম হওয়া উচিত তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তিনি তুলে ধরেছিলেন। ছোট বড় মিলিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, তাঁর কোন্ উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠ? সাধারণ ভাবে দেখা যায় তাঁর চারটি উপন্যাস পাঠকমনে ভালো বলে বিবেচিত হয়। উপন্যাস-গুলি হলো—'কপালকুণ্ডলা, 'বৃষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', এবং 'রাজসিংহ'। কিন্তু এর মধ্যে কোনটিকে শ্রেষ্ঠ বলা চলে? আমাদের বিচারে 'রাজসংহ'-ই শ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের ছাত্র, সমালোচক, এবং গবেষকদের কাছে রাজসিংহের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই।

'কপালকুণ্ডলা'য় রোমান্সের সম্পূর্ণতা থাকলেও উপন্যাসটি কাব্যধর্মী। কাহিনীর বিন্যাসে খুব একটা অসংগতি নেই। নাটকীয় পরিস্থিতির উপস্থাপনা আছে কিন্তু মতিবিবির উপকাহিনী অপ্রাসঙ্গিক। নবকুমারের রূপজমোহ কপালকুণ্ডলা বা মৃন্ময়ীর সংগে তার মিলন ঘটিয়েছে। এই রূপজমোহ নবকুমারের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। কিন্তু নবকুমারের মধ্যে পৌরুষত্ব ছিল না। কাপালিক ও মতিবিবির ষড়যন্ত্রের কথা কপালকুণ্ডলা জানত না এবং গৃহবধূর পক্ষে পরপুরুষের সংগে কথা বলা (সেকালে) যে শোভন নয় এ বোধ তার ছিল না। থাকার কথাও নয়। সে গৃহবন্ধহীন উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ। সংসার ধর্ম এবং প্রেম-পরিণয় তার মধ্যে পরিস্ফুটই হয়নি। তাই নবকুমারের প্রতি তার খুব একটা টান ছিল না। মতিবিবির স্বামী ফিরিয়ে দেবার আবেদনে সে অন্তরে নবকুমারের অবস্থান অনুভব করেনি। স্বামীর এবং ননদ শ্যামাসুন্দরীর উপদেশ যে হৃদয়গ্রাস করতে পারেনি। তবে নবকুমার রূপোন্মাদনায় আকুল না হলে হয়তো বা কপালকুণ্ডলার মধ্যে নারীত্বের বিকাশ ঘটতে পারতো। নবকুমারের সন্দেহপ্রবণ মানসিকতাই এবং রূপোন্মাদনাই একটি নাবালিকাকে আত্মত্যাগে বাধ্য করেছে। কাপালীকের চরিত্র প্রথম দিকে জীবন্ত হলেও পরে সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পড়ে। নবকুমার কপালিকের হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার ফলেই কপালকুণ্ডলার জীবনের ট্রাজেডি ঘনিয়ে আসে।

এই চরিত্রটি স্বাভাবিক ভাবেই পরিকল্পিত হয়েছে। কপালকুণ্ডলার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নারীত্বের বিকাশ ঘটানোর কোন সুযোগ উপন্যাসে নেই। কাব্যধর্মী এই উপন্যাসটি হৃদয়গ্রাহী কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে উপন্যাসটির মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে। লেখক নিজেও এর বেশী এগোতে চান নি।

এর পর আসে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর কথা। এই দুটি উপন্যাসকে সামাজিক বলা হলেও মূলতঃ উপন্যাসদুটি পারিবারিক। বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার কাহিনী—উপন্যাস দুটির মধ্যে নেই। উপন্যাসদুটি পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ।

সমাজ গড়ে ওঠে মানুষ ও বিভিন্ন পরিবার নিয়ে কিন্তু সেই সমাজ-চিত্রণ এখানে দুটির মধ্যেই অনুপস্থিত। একটি মাত্র সামাজিক বিষয় দুটি উপন্যাসেই বর্তমান কিন্তু সেই সামাজিক বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, স্বীকৃতিও দেওয়া হয়নি। বিষয়টি হলো, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ।

দুটি উপন্যাসের নায়ক নব্য ধনিকতন্ত্রের প্রতিনিধি। দুটি উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। নবচেতনার আলোকের ফলেই স্বাধীন প্রেমের বিকাশ দেখান সম্ভব হয়েছে। আবার বিষবৃক্ষের গৃহবধূ এবং কন্যা ইংরেজ মহিলার কাছে লেখা পড়া শেখে। বিবাহিত নগেন্দ্রনাথ রূপের মোহে কুন্দনন্দিনীর প্রেমে পড়ে এবং তাকে বিবাহ করে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহকে কোনদিনই ভালো চোখে নেন নি। তাই কুন্দনন্দিনীকে নীরবে আত্মত্যাগের পথ বেছে নিতে হয়েছে। নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্যমুখীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। নগেন্দ্রনাথের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্ব তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। ফলে স্ত্রীর কাছেই তাকে বলতে গেলে আত্মসমর্পণ করতে হয়। আর এই আত্মসমর্পণের আগেই ঘটে কুন্দনন্দিনীর জীবনের ট্র্যাজেডি। উপন্যাসের দেবেন্দ্র-হীরার উপকাহিনীর মধ্যে অসংগতি নেই। চরিত্র দুটিও জীবন্ত। কিন্তু বঙ্কিম মূলত; দাম্পত্য প্রেমের আদর্শে বিশ্বাসী বলে কোন সমাজ সংস্কারকে ভালো চোখে নিতে পারেন নি।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' মূক কুন্দ অনেকটাই মুখরা হয়ে ওঠে রোহিণীর মধ্যে। এখানেও রোহিণী বিধবা। কিন্তু গোবিন্দলালের নজর পড়ে বিধবা রূপসী রোহিণীর প্রতি। এই বিধবা নারীর প্রতি গোবিন্দলালের অন্তরে প্রেম যতটা না ছিল তার চাইতে বেশী ছিল সম্ভোগচিন্তা। শেষ পর্যন্ত এই নারীকেও মৃত্যু পথের যাত্রী হতে হয় গোবিন্দলালের গুলির আঘাতে। তবে গোবিন্দলালের চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রোহিণী চরিত্রও জীবন্ত তুলনায় ভ্রমর কিছুটা নিষ্প্রভ। এখানেও সেই দাম্পত্যপ্রেমের জয় দেখান হয়েছে। বিবাহিত পুরুষের অন্য-নারীর প্রতি আসক্তি খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। এটি নব চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু রূপমোহ দুটি উপন্যাসের নায়ককেই কলঙ্কিত করেছে। সত্য সত্যই ত্রিভুজ প্রেমের ঘটনা দেখালে উপন্যাস দুটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যেত। বঙ্কিম চন্দ্র উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে প্রথম দিকে কিছু প্রগতির পরিচয় দিলেও পরবর্তী সময়ে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতকেই শক্ত করেছেন। সমাজ প্রগতির ধারায় তিনি নতুন চিন্তার আলো দেখাতে পারেননি। একটা সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা লেখকের মধ্যে বিদ্যমান। এই কারণেই তাঁর অনেক সম্ভাবনাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে 'চন্দ্রশেখরের' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসটিতে ত্রিভুজ প্রেমের ঘটনা পরিবেশিত হলেও দুটি পুরুষ চরিত্রের কেউই (চন্দ্রশেখর ও প্রতাপ) ততটা বলিষ্ঠ পৌরুষত্বের অধিকারী নয়। বরং শৈবলিনি চরিত্রের মধ্যে একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী নারীর পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সংগে চরিত্রটির উন্মেষ থেকে পরিণতি পর্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা বজায় আছে। কিন্তু উপন্যাসটির মধ্যে অলৌকিকত্ব, তুক-তাক, তন্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি

ঘটনায় সন্নিবেশ উপন্যাসটির গুরুত্ব অনেকাংশে লঘু করে দিয়েছে। নবচেতনার আলোক প্রাপ্ত লেখকেবব পক্ষে কোনভাবেই এবকম চিন্তাধারা প্রগতির পবিচয় বহন কবে না। এইসব নানাবিধ কাবণে উপন্যাসগুলির কোনটিকেই শ্রেষ্ঠত্বেব আখ্যা দেওযা যায় না।

শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবেই নয, বঙ্কিমেব সমস্ত উপন্যাসেব মধ্যে 'রাজসিংহ'-ই বিশিষ্ঠ তথা শ্রেষ্ঠ। ইতিহাসাশ্রিত অন্যান্য উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক রোমান্স। এইসব উপন্যাসে ইতিহাস দূর দিগন্তরেখাব মতো আবেষ্টন কবেছে মাত্র। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে রাজসিংহের ইতিহাস যথাযথভাবে প্রতিফলিত হযেছে। মূলতঃ ইতিহাসেব কাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। শুধু ইতিহাসেব বিচারে নয, এব আকর্ষণ অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে মনোহারী কাহিনীব টানে। রাজসিংহের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে দুটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র রাজসিংহ ও আওবংজেবেব মধ্যে দিয়ে। এই উপন্যাসটিতে বহু মানুষের কোলাহল প্রতিধ্বনিত হযেছে। যুদ্ধ-অস্ত্রেব ঝনঝনানি-মৃত্যু উপন্যাসটিতে বর্তমান। এই সংগে একটি অসাধারণ প্রেমেব কাহিনীও বর্ণিত হযেছে। এই প্রেমেব নাযক মবাবক এবং নায়িকা জেবউন্নিসা। দুটি রাজপবিবাবেব বিবাদ-যুদ্ধবিগ্রহ- অস্ত্রের আস্ফালন প্রভৃতিব মধ্যেও এই দুই নাযক নাযিকাব প্রেমকাহিনী অসামান্য নীপুনতাব সংগে চিত্রিত হযেছে। দুটি চবিত্রই স্বাভাবিক এবং জীবন্ত। এমন প্রেম চিত্রণ বঙ্কিমেব অন্য কোন উপন্যাসে পবিলক্ষিত হয না। যদিও এই প্রেমের পবিণতি হৃদযবিদাবক। লেখকেব নিজেবি উক্তি—

> ''বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনি
> বিললাপবিকীর্ণমূর্ধজা।''

জীবিত মানুষেব মিলনের মধ্যে দিযে নয, মৃত্যুর মধ্যে দিযে উভয়েব মিলন ঘটেছে। এই করুণ কাহিনীটিকে এমনভাবে পবিবেশিত করা হয়েছে যা পাঠকের হৃদযকে স্পর্শ করে।

একটিমাত্র চরিত্র নির্মলকুমাবী অনৈতিহাসিক। কিন্তু এই চরিত্রটির সংগে আওরংজেবেব কথোপকথনেব মধ্যে একটি অনাবিষ্কৃত দিক দেখতে পাওয়া যায। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট প্রাণখুলে নির্মলকুমাবীর সংগে বাক্যালাপ কবেছে। এবং এও বলতে চেযেছে, নির্মলকুমারীব মতো মেযে পেলে সে বিবাহ কবত। এব মধ্যে লেখক আওবাংজেবেব একটি মানবিক আচবণের দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। এর ফলে লেখকেব শিল্পী সুলভ মনোভাবেব পরিচয় পাওযা যায। মবাবক এবং জেবউন্নিসাব প্রেমেব সংগে আওবংজেবেব এই সামান্য বাক্যালাপ সত্য সত্যই উপন্যাসটিব গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিযেছে।

উপন্যাসটিব মধ্যে লক্ষিত হয, ঘটনাব ঘনঘটা। অবশ্য এটি প্রথম দিকেব উপন্যাসেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। নাটকীয় পরিবেশ, অকষ্যাৎ ঘটনার পবিবর্তন, Melodramatic Senssional elements উপন্যাসটির মধ্যে ছড়িযে আছে। তথাপি সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে ঘটনাব মনোহারীত্ব, প্রেমচিত্রণেব অসামান্য দক্ষতা, এবং কাহিনী ও চরিত্রেব

বিন্যাসে। ঘটনা-স্থান-কাল প্রভৃতির দিক দিয়েও প্রতিটি চরিত্রই স্বাভাবিক ভাবে বিন্যস্ত।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ' ঠিক উপন্যাস নয়, একটি আখ্যায়িকা মাত্র। এটির মধ্যে স্বদেশ প্রেমের কথা বেশ উচ্চ স্বরে ঘোষিত হয়েছে। এই আখ্যায়িকার মধ্যে দেশপ্রেমের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঐতিহাসিক রোমান্সের জগৎ রচনায় ব্যস্ত সেই সময় আরো কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল যা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করতে তো পারেইনি বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ঠিক এই সময় তারকনাথ বিপরীত ধর্মী সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। বাস্তব জগৎ থেকে তিনি কাহিনী আহরণ করেন এবং সেই কাহিনীকে উপন্যাসের আকারে পরিবেশন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পাত্র-পাত্রীরা উচ্চ বংশজাত। কিন্তু তারকনাথের পাত্র-পাত্রীরা সাধারণ ঘরের মানুষ। উপন্যাস রচনার সময় তিনি চার্লস ডিকেন্সের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তারকনাথ উপন্যাস রচনা করেছিলেন তিনটি। এর মধ্যে 'স্বর্ণলতা'ই তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'হরিষে বিষদে' এবং 'অদৃষ্ট' উপন্যাসে বাস্তবতার ছোঁয়া থাকলেও কাহিনী তেমন জমে ওঠেনি এবং চরিত্র গুলি অনেকটা নিষ্প্রভ। বাংলা সাহিত্যে 'স্বর্ণলতাই' প্রথম বাস্তবধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনী দীর্ঘও নয় আবার জটিলও নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কাহিনী অবলম্বন করে তিনি 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। কাহিনীর মূল উপজীব্য ভ্রাতৃ কলহ। কাহিনীটিতে দুটি স্পষ্ট বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ভাগে স্থান পেয়েছে শশিভূষণ ও বিধুভূষণের গৃহ কলহ। ফলে একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগ্যান্বেষণে বিদেশ যাত্রা করে। বিদেশে বিধুভূষণ অর্থ উপার্জন করে এবং সেই অর্থ বাড়িতে পাঠায়। কিন্তু শশিভূষণের স্ত্রী প্রমদার চক্রান্তে গদাধর সেই অর্থ আত্মসাৎ করে এবং সরলার জীবনে নেমে আসে দারিদ্র ও লাঞ্ছনা। এ এক করুণ কাহিনী। এই ভাগের শেষে দেখা যায় বিধুভূষণের গ্রামে আগমন, গদাধরের হাজতবাস এবং সরলার মৃত্যু। দ্বিতীয় ভাগে দেখা যায় বিধুভূষণের পুত্র গোপাল স্বর্ণলতা-হেমচন্দ্র-শশাঙ্কশেখর-শ্যামা প্রভৃতি প্রসঙ্গ। নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন, পরে শ্যামার সাহায্যে কলকাতায় আগমন, এবং হেমচন্দ্রের আশ্রয় লাভ। সেই সূত্রে স্বর্ণলতার সংগে গোপালের পরিচয় এবং পরিণয়। এরমাঝে শশাঙ্কশেখরের খলতার কাহিনীও পরিবেশিত হয়েছে। পরিশেষে লেখক পাপের পরিণাম দেখিয়েছেন। শশিভূষণ এবং প্রমদা সর্বস্বান্ত হয়ে বিধুভূষণের আশ্রয়ে এসে ওঠে। উপন্যাসের প্রথম অংশটি-মনোমুগ্ধকর। উপন্যাসের মধ্যে আর একটি করুণ কাহিনী লেখক অঙ্কন করেছেন নীলকমল চরিত্রটির সাহায্যে। নীলকমল অনেকটা যাযাবরের মতো। সে যেন পথিক। কোথাও থেমে থাকতে জানে না। তবে চিত্রটি বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ। কিন্তু উপন্যাসের সঙ্গে এই চরিত্রটির যোগ প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যান্য চরিত্রগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। বিধুভূষণ ও গোপালের জীবন সংগ্রামের মধ্যে মর্মস্পর্শিতা থাকলেও উপন্যাসটিতে তেমন

বৈচিত্র্য নেই। তবে নাবীব দুই আর্দশ-কষ্ট সহিষ্ণু, দাবিদ্রপিড়ীত এবং স্বার্থপর ও অর্থ-গাবত চরিত্র অঙ্কিত করেছেন। বাঙালী জীবনের এই চিরপরিচিত ছবি উপন্যাসটিতে দীপ্যমান। কোথাও সত্যকে অস্বীকার করা হয়নি। প্রতিটি চরিত্রেকেই Flat চরিত্র বলা চলে। তথাপি উপন্যাসটির মধ্যে জীবননিষ্ঠর পরিচয় পাওয়া যায়।

চন্দ্রনাথ বসু এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ দুজনেই একটি করে উপন্যাস রচনা কবেছেন। সুতবাং এখানে শ্রেষ্ঠাত্ব বিচারের প্রশ্ন ওঠে না। চন্দ্রনাথ বসুব 'পশুপতি সম্বাদ' একটি ব্যঙ্গ বচনা। এব মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের 'কল্পতরু' উপন্যাসটিব অনুকরণ বর্তমান। আব গিবিশচন্দ্র ঘোষ 'চন্দ্রা' নামে যে ঐতিহাসিক উপন্যাসটি রচনা কবেছেন তা খুবই সাধারণ মানেব।

কমলকুমার সান্যাল

রাজসিংহ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

চিত্রে চরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : তসবিরওয়ালী

রাজস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই—রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিংহের আরও সবিশেষ পরিচয় পশ্চাৎ দিতে হইবে।

সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী; ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত। গালিচার অনুকরণে শ্বেতকৃষ্ণ-প্রস্তররঞ্জিত হর্ম্ম্যতল; শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত নানা বর্ণের রত্নরাজিতে রঞ্জিত কক্ষপ্রাচীর; তখন তাজমহল ও ময়ূরতক্তের অনুকরণই প্রসিদ্ধ, সেই অনুকরণে ঘরের দেওয়ালে সাদা পাথরের অসম্ভব পক্ষী সকল, অসম্ভব রকমে অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতির ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল ভোজন করিতেছে। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্ত্রীলোক, দশ জন কি পনর জন। নানা রঙের বস্ত্রের বাহার; নানাবিধ রত্নের অলঙ্কারের বাহার; নানাবিধ উজ্জ্বল কোমল বর্ণের কমনীয় দেহরাজি,—কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্ব্বাদলশ্যামা,—খনিজ রত্নরাশিকে উপহসিত করিতেছে। কেহ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে—কেহ বা নাকের বড় বড় মতিদার নথ দুলাইয়া ভীমসিংহের পদ্মিনী রাণীর উপাখ্যান বলিতেছেন, কেহ বা কাণের হীরকজড়িত কর্ণভূষা দুলাইয়া পরনিন্দায় মজলিস জাঁকাইতেছেন। অধিকাংশই যুবতী; হাসি টিটকারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে—একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে।

যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তিদন্তনির্ম্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি; প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণমধ্য হইতে বাহির করিতেছিল; যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার তসবির আয়ি?"

প্রাচীনা বলিল, "এ শাহজাদা বাদশাহের তসবির।"

যুবতী বলিল, "দূর মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুর দাদার দাড়ি।"

আর একজন বলিল, "সে কি লো? ঠাকুর দাদার নাম দিয়া ঢাকিস্ কেন? ও যে তোর বরের দাড়ি।" পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল, "ঐ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়াছিল—সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।"

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল, "এখানা জাহাঁগীর বাদশাহের ছবি।"

দেখিয়া রসিকা যুবতী বলিল, "ইহার দাম কত?"

প্রাচীনা বড় দাম হাঁকিল।

রসিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "এ ত গেল ছবির দাম। আসল মানুষটা নূরজাঁহা বেগম কতকে কিনিয়াছিল?"

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল; বলিল, "বিনামূল্যে।"

রসিকা বলিল, "যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কাড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।"

আবার একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল হাসিতে মা, তসবির কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন, তবে আমি তসবির দেখাইব। আর তাঁরই জন্য এ সকল আনিয়াছি।"

তখন সাত জন সাত দিক্ হইতে বলিল, "ওগো, আমি রাজকুমারী! ও আয়ি বুড়ী আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল, আবার আর একট হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ হাসির ধুম কম পড়িয়া গেল—গোলমাল একটু থামিল—কেবল তাকাতাকি আঁচাআঁচি এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাসি। চিত্রস্বামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একখানি দেবী-প্রতিমা দাড় করাইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা অনিমেষলোচনে সেই সর্ব্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিতপ্রায় প্রতিমা পানে চাহিয়া রহিল—কি সুন্দর! বুড়ী বয়োদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ ত প্রস্তরের বর্ণ নহে, নিজ্জীবের এমন সুন্দর বর্ণ হয় না। পাথর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারুবর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ বুঝি পুতুল নয় ঐ অতিদীর্ঘ কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বুড়ী অবাক্ হইল—এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল—কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্ত রসিকা রমণীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হাঁ গা, তোমরা বল না গা?"

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না—রসের উৎস উছলিয়া উঠিল—হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল—যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বলা বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আয়ি, কাঁদিস্ কেন গো?"

তখন বুড়ী বুঝিল যে, এটা গড়া পুতুল নহে। আদত মানুষ—রাজমহিষী বা রাজকুমারী হইবে। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে—এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে, বুড়ী যে সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চিত্রদলন

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী যাবে দেখিয়া চিত্রবিক্রেত্রী প্রণত হইল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?'

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তসবির বেচিতে আসিয়াছেন।

চঞ্চলকুমারী বলিল "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতাটা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তসবির আনিয়া দেখাইতেছিল—তাই আমরা হাসিতেছিলাম—আমাদের রাজ-রাজড়ার ঘরে শাহজাঁহা বাদশাহ, কি জাহাঁগীর বাদশাহর তসবির কি নাই?"

বৃদ্ধা কহিল, "থাক্‌বে না কেন মা? একখানা থাকিলে কি আর একখানা নিতে নাই? আপনারা নিবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরীব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তসবির সকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তসবিরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আক্‌বর বাদশাহ, জাহাঁগীর, শাহজহাঁ, নূরজহাঁ নূরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন

—বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবির আছে। হিন্দুরাজার তসবির আছে?"

"অভাব কি?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই, পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পসন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল, দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে ঘটিয়াছে—অন্য তসবিরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তসবির যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুশমনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তসবির?

বুড়ী। (সভয়ে) রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তসবির লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্ফারিত হইল। একজন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল—রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ। দেখিবার যোগ্য বটে।"

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহে—তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনাফা করিল। তার পর লোভ পাইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! যদি বীরের তসবির লইতে হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে?"

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার চেহারা?"

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন, "এসো, একটু আমোদ করা যাক্।"

রঙ্গপ্রিয়া বয়স্যাগণ বলিল, "কি আমোদ বল! বল!"

রাজপুত্রী বলিলেন, "আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।"

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী! কাক পক্ষীতে শুনিলেও, রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না।"

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটিতে রাখিলেন, "কে নাতি মারিবি মার্।"

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্মল নাম্নী একজন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।"

চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড় মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ! কি করিলে!" বলিয়া সখীগণ শিহরিল।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনই মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।" তার পর নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সখি নির্ম্মল! ছেলেদের সাধ মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর-সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—"

নির্ম্মল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন, কথাটা সমাপ্ত হইল না—কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—এমন প্রাণসংহারক কথাবার্ত্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে! এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবিরের মূল্য আসিয়া পৌঁছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্ম্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া তাহার হাতে একটি আশরফি দিয়া বলিল, "আয়ি বুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই—এখনও উঁহার ছেলে বয়স।"

বুড়ী আশরফিটি লইয়া বলিল, "তা এ কি আর বল্‌তে হয় মা! আমি তোমাদের দাসী —আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি?"

নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চিত্রবিচারণ

পরদিন চঞ্চলকুমারী ক্রীত চিত্রগুলি একা বসিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন। নির্ম্মলকুমারী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া চঞ্চল বলিল, "নির্ম্মল! ইহার মধ্যে কাহাকেও তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে?"

নির্ম্মল বলিল, "যাহাকে আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিত্র ত তুমি পা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ।"

চঞ্চল। ঔরঙ্গজেবকে!

নির্ম্মল। আশ্চর্য্য হইলে যে?

চঞ্চল। বদ্‌জাতের ধাড়ি যে? অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মে নাই!

নির্ম্মল। বদ্‌জাতকে বশ করিতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষিতাম? আমি একদিন না একদিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিব ইচ্ছা আছে।

চঞ্চল। মুসলমান যে?

নির্ম্মল। আমার হাতে পড়িলে ঔরঙ্গজেবও হিন্দু হবে।

চঞ্চল। তুমি মর।

নির্ম্মল। কিছুমাত্র আপত্তি নাই—কিন্তু ঐ একখানা কার ছবি তুমি পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছ, সে খবরটা লইয়া তবে মরিব।

চঞ্চলকুমারী তখন আর পাঁচখানা চিত্রের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে করস্থ চিত্রখানি মিশাইয়া দিয়া বলিল, "কোন্ ছবি আবার পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছিলাম? মানুষে মানুষের একটা কলঙ্ক দিতে পারিলেই কি হয়? কোন্ ছবিখানা পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছিলাম?"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "একখানা তসবির দেখিতেছিলে, তার আর কলঙ্ক কি? রাজকুমারি, তুমি রাগ করিলে বলিয়া আমার কাছে ধরা পড়িলে। কার এমন কপাল প্রসন্ন, তসবিরগুলা দেখিলে আমি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।"

চঞ্চলকুমারী। আকব্বর শাহের।

নির্ম্মল। আকব্বরের নামে রাজপুতনী ঝাড়ু মারে। তা ত নহেই।

এই বলিয়া নির্ম্মলকুমারী তসবিরের গোছা হাতে লইয়া খুঁজিতে লাগিল। বলিল, "তুমি যেখানি দেখিতেছিলে, তাহার উল্‌টা পিঠে একটা কালো দাগ আছে দেখিয়াছি।" সেই

চিহ্ন ধরিয়া, নির্ম্মলকুমারী একখানা ছবি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিল, বলিল, "এইখানি।"

চঞ্চলকুমারী রাগ করিয়া ছবিখানা ফেলিয়া দিল। বলিল, "তোর আর কিছু কাজ নেই, তাই তুই লোককে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করেছিস্। তুই দূর হ।"

নির্ম্মল। দূর হব না। তা, রাজকুমার! এ বুড়ার ছবিতে দেখিবার তুমি এত কি পেয়েছ?

চঞ্চল। বুড়ো! তোর কি চোখ গিয়েছে না কি?

নির্ম্মল চঞ্চলকে জ্বালাইতেছিল, চঞ্চলের রাগ দেখিয়া টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। নির্ম্মল বড় সুন্দরী. মধুর সরস হাসিতে তাহার সৌন্দর্য্য বড় খুলিল। নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "তা ছবিতে বুড়া না দেখাক্—লোকে বলে, মহারাণা রাজসিংহের বয়স অনেক হয়েছে। তাঁর দুই পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে।"

চঞ্চল। ও কি রাজসিংহের ছবি? তা অত কে জানে সখি?

নির্ম্মল। কাল কিনেছ—আজ কিছু জান না সখি? তা মানুষটার বয়সও হয়েছে. এমন যে খুব সুপুরুষ, তাও নয়। তবে দেখিতেছিলে কি?

চঞ্চল।

গোরী সম্ঝে ভসমভার,
পিয়ারী সম্ঝে কালা।
শচী সম্ঝে সহস্রলোচন,
বীর সম্ঝে বীরবালা॥

গঙ্গাগর্জ্জন শম্ভুজটপর,
ধরণী বৈঠত বাসুকীফণ্মে।
পবন হোয়ত আগুন-সখা,
বীর ভজত যুবতী মন্মে॥

নির্ম্মল। এখন, তুমি দেখিতেছি, আপনি মরিবার জন্য ফাঁদ পাতিলে। রাজসিংহকে ভজিলে, রাজসিংহকে কি কখন পাইতে পারিবে?

চঞ্চল। পাইবার জন্য কি ভজে? তুমি কি পাইবার জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহকে ভজিয়াছ?

নির্ম্মল। আমি ঔরঙ্গজেবকে ভজিয়াছি, যেমন বেড়াল ইন্দুর ভজে। আমি যদি ঔরঙ্গজেবকে না পাই, তা নয় আমার বেড়ালখেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল। তোমারও কি তাই?

চঞ্চল। আমারও না হয়, সংসারের খেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল।

নির্ম্মল। বল কি রাজকুমার? ছবি দেখিয়া কি এত হয়?

চঞ্চল। কিসে কি হয়, তা তুমি আমি কি জানি? কি হইয়াছে, তাই কি জানি?

আমরাও তাই বলি। চঞ্চলকুমারীর কি হইয়াছে, তা ত বলিতে পারি না। শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা ত জানি না। অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবিছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? তা আঠার বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব বা বুঝাইব?

চঞ্চলকুমারীর মন যাই হোক্, মনের আগুনে এখন ফুঁ দিয়া সে ভাল করে নাই। কেন না, সম্মুখে বড় বিপদ্। কিন্তু সে সকল বিপদের কথা বলিতে আমাদের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বুড়ী বড় সতর্ক

যে বুড়ী ছবি বেচিয়াছিল, সে ফিরিয়া বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী আগ্রা। সে চিত্রগুলি দেশে বিদেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে আগ্রা গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া, বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যদি নির্ম্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয়, বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তখন বুড়ীর মন কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না—রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ করিল যে, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল—বুড়ী ছেলের সান্‌কির উপর একটু রসাল কাবাব তুলিয়া দিয়া বলিল, "খা! বাবাজান! খা খা লেও। য়ৈসা কাবাব রূপনগরসে আনেকে বক্‌ত এক রোজ বানা থা --ঔর কভী নেহিন্ বনা।"

ছেলে খাইতে খাইতে বলিল, "আম্মাজী! রূপনগরকা যো কেস্‌সা আপ্ ফরমায়েঙ্গে বোলী থী।"

মা বলিল, "চুপ্! বহ বাত্ মুহ্‌মে মৎ লও বাপ্‌জান্। মেয়্‌নে কিয়া বোলী থী? খেয়াল্‌মে বোলী থী শায়েদ্!"

বুড়ী এখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, পূর্ব্বে এক সময়ে চঞ্চলকুমারীর কথাটা তাহার উদরমধ্যে অত্যন্ত দংশন আরম্ভ করায়, তিনি পুত্রের সাক্ষাতে একটু উঃ আঃ করিয়াছিলেন। এবারকার উত্তর শুনিয়া ছেলে বলিল, "চুপ রহেঙ্গে কাহে মাজী? য়ৈসা কিয়া বাত্ হোগী?"

মা। শুন্‌নেকা মাফিক বাত্ নেহিন্, বাপ্‌জান্!

ছেলে। তব্ রহ্‌নে দিজিয়ে।

মা। ঔর কুছ্ নেহিন্, রূপনগরওয়ালী কুমারীন্‌কি বাত্।

ছেলে। বহ কুমারীন্ বড়া খুব্ সুরত? য়েহ য়ৈসা পুষিদা বাত্?

মা। সো নেহিন্—বাঁদীকি বড়া দেমাগ। ইয়া আল্লা! মেয়্‌নে কিয়া বোল্ চুকা!

ছেলে। কাঁহা রূপনগর গড়, কাঁহা ও'হাকা রাজকুমারীন্‌কি দেমাগ—ইয়ে বাত্ আপ্‌কা বোলনাই কিয়া জরুর্—হামাবা শুননাই কিয়া জরুর্?

মা। স্রেফ্ দেমাগ বাপজান্! লৌণ্ডীনে বাদ্‌শাহে আলম্‌কো নেহিন্ মান্‌তী!

ছেলে। বাদ্‌শাহে আলম্‌কো গালি দিই হোগী?

মা। গালি—বাপ্‌জান্! উস্‌সে ভী জবর কুছ!

ছেলে। উস্‌সে ভী জবর! কিয়া হো সক্‌তা? বাদ্‌শাহ আলম্‌কো ঔর মাব সক্‌তা নাই!

মা। উস্‌সে ভী জবর।

ছেলে। মার্ সে ভী জবর?

মা। বাপ্‌জান্—ঔর পুছিও মৎ—মেয়্‌নে উস্‌কী নিমক্ খাইন্।

ছেলে। নিমক্ খায়ে হো! কিস্‌তরে মা?

মা। আশরফি দিন্।

ছেলে। কাহে মাজী?

মা। উস্‌কী গুণাহ্‌কে বাত কিসিকা পাস্ বোল্‌না মনাসেব নেহিন্, এস্ লিয়ে।

ছেলে। আচ্ছা বাত হৈ। মুঝ্‌কো একঠো আশরফি বখ্‌শিশ ফর্‌মাইয়ে।

মা। কাহে রে বেটা?

ছেলে। নেহিন্ ত মুঝ্‌কো বোল দিজিয়ে বাত্‌ঠো কিয়া হৈ?

মা। বাত্ ঔর কিয়া, বাদ্‌শাহকা তসবির—তোবা! তোবা! বাত্‌ঠো আব্‌হী নিক্‌লী থী।

ছেলে। তসবির ভাঙ্গ্‌ডালা?

মা। আরে বেটা, লাথ্‌সে ভাঙ্গ্‌ডালা! তোবা! মেয়নে নিমকহারামী কর্ চুকা!

ছেলে। নিমকহারামী কিয়া হৈ ইস্‌মে,—তোম্ মা, মেয়্নে বেটা! হামরা বোল্‌নেসে নিমকহারামী কিয়া হৈ?

মা। দেখিও বাপ্‌জান্‌, কিস্‌ইকো বলিও মৎ।
ছেলে। আপ্‌ খাতেরজমা রহিয়ে—কিস্‌ইকো পাস্‌ নেহিন্‌ বোলেঙ্গে।
তখন বুড়ী বিলক্ষণ রসরঞ্জিত করিয়া চিত্রদলনের ব্যাপারটা সমস্ত বলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দরিয়া বিবি

বুড়ীর পুত্রের নাম খিজির সেখ। সে তসাবর আঁকিত। দিল্লীতে তাহার দোকান। মার কাছে দুই দিন থাকিয়া, সে দিল্লী গেল। দিল্লীতে তাহার এক বিবি ছিল। সেই দোকানেই থাকিত। বিবির নাম ফতেমা। খিজির, মার কাছে রূপনগরের কথা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সমস্তই ফতেমার কাছে বলিল। সমস্ত কথা বলিয়া, খিজির ফতেমাকে বলিল যে, "তুমি এখনই দরিয়া বিবির কাছে যাও। এই সংবাদ বেগম সাহেবাকে বেচিয়া আসিতে বলিও। কিছু পাওয়া যাইবে।"

দরিয়া বিবি পাশের বাড়ীতেই বাস করে। ঘরের পিছন দিয়া যাওয়া যায়। অতএব ফতেমা বিবি, বেপরদা না হইয়াও, দরিয়া বিবির গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খিজির বা ফতেমার বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু দরিয়া বিবির বিশেষ পরিচয় চাহি। দরিয়া বিবির আসল নাম, দরীর-উন্নিসা কি এমনই একটা কিছু, কিন্তু সে নাম ধরিয়া কেহ ডাকিত না—দরিয়া বিবি বলিয়াই ডাকিত। তার বাপ মা ছিল না, কেবল জ্যেষ্ঠা ভগিনী আর একটা বুড়ী ফুফু, কি খালা, কি এমনই একটা কি ছিল। বাড়ীতে পুরুষমানুষ কেহ বাস করিত না। দরিয়া বিবির বয়স সতের বৎসরের বেশী নহে—তাহাতে আবার কিছু খর্ব্বাকার, পনের বছরের বেশী দেখাইত না। দরিয়া বিবি বড় সুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মত, সর্ব্বদা প্রফুল্ল।

দরিয়া বিবির ভগিনী অতি উত্তম সুর্‌মা ও আতর প্রস্তুত করিতে পারিত। তাহাই বিক্রয় করিয়া তাহাদের দিনপাত হইত। আপনারা এক্কা বা দোলা করিয়া বড়মানুষের বাড়ী গিয়া বেচিয়া আসিত। দুঃখী মানুষ, রাত্রি হইলে পদব্রজেও যাইত। বাদশাহের অন্তঃপুরে কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না—বাহিরের স্ত্রীলোকেরও না—কিন্তু দরিয়া বিবির সেখানে যাইবারও উপায় ছিল। তাহা পরে বলিতেছি।

ফতেমা আসিয়া দরিয়া বিবিকে চঞ্চলকুমারীর সংবাদ বলিল, এবং বলিয়া দিল যে, ঐ সংবাদ বিক্রয় করিয়া অর্থ আনিতে হইবে।

দরিয়া বিবি বলিল, "রঙ্‌মহালের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে—পরওয়ানাখানা কোথায়?"

ফতেমা বলিল, "তোমারই কাছে আছে।" দরিয়া বিবি তখন পেটারা খুলিয়া একখানা কাগজ বাহির করিল। তাহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "এইখানা বটে!"

দরিয়া বিবি তখন কিছু সুরমা লইয়া ও পরওয়ানা লইয়া বাহির হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

নন্দনে নরক

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ অদৃষ্টগণনা

জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত-সৈকত-পুলিনমধ্য-বাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকূলে নগরী-গণপ্রধানা মহানগরী দিল্লী, প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে—সহস্র সহস্র মর্ম্মরাদিপ্রস্তরনির্ম্মিত মিনার গম্বুজ বুরুজ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অতিদূরে কুতবমিনারের বৃহচ্চূড়া, ধূমময় উচ্চস্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল, নিকটে জুম্মা মসজিদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা; বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্পবিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিকজনপরিহিত পুষ্পরাজির গন্ধ, আতর-গোলাপের সুগন্ধ, গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরীগণের কখন উচ্চ, কখন মধুর হাসি, অলংকার-শিঞ্জিত,—এই সমস্ত একত্রিত হইয়া, নরকে নন্দনকাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে। ফুলের ছড়াছড়ি, আতর-গোলাপের ছড়াছড়ি,—নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তসুরের আরোহণ-অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা, কমনীয় কামিনী-করতল-কলিত তালের চট-চটা; মদ্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষবহ্নি-প্রবাহ; খিচুড়ি পোলাওয়ের রাশি রাশি; বিকট, কপট, মধুর, চতুর, চতুর্ব্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদধ্বনি, দোলার বাহকের বীভৎস ধ্বনি, হস্তীর গলঘণ্টার ধ্বনি, একার ঝন্‌ঝনি—শকটের ঘ্যান্‌ঘ্যাননি।

নগরের মধ্যে বড় গুল্‌জার চাঁদনী-চৌক। সেখানে রাজপুত বা তুর্কী অশ্বারূঢ় হইয়া স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছে। জগতে যাহা কিছু মূল্যবান্, তাহা দোকান সকলে থরে থরে সাজান আছে। কোথাও নর্ত্তকী রাস্তায় লোক জমাইয়া, সাবঙ্গের সুরে নাচিতেছে, গায়িতেছে; কোথাও বাজিকর বাজি করিতেছে, প্রত্যেকের নিকট শত শত দর্শক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছে। সকলের অপেক্ষা জনতা "জ্যোতিষী"দিগের কাছে। মোগল বাদশাহদিগের সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের যেরূপ আদর ছিল, এমন বোধ হয়, আর কখনও হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানে তাঁহাদের তুল্য আদর করিতেন। মোগল বাদশাহেরা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অতিশয় বশীভূত ছিলেন; তাঁহাদিগের গণনা না জানিয়া অনেক সময়ে অতি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকব্বর রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন। পঞ্চাশ হাজার রাজপুত সেনা তাঁহার সহায় ছিল; ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া আকব্বর সৈন্যযাত্রায় বিলম্ব করিলেন, ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব কৌশল করিয়া তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল করিলেন।

দিল্লীর চাঁদনী-চৌকে, জ্যোতির্ষিগণ রাজপথে আসন পাতিয়া, পুথি পাঁজি লইয়া, মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া বসিয়া আছেন—শত শত স্ত্রীপুরুষ আপন আপন অদৃষ্ট গণাইবার জন্য তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া আছে; পরদানশীন বিবিরাও মুড়িসুড়ি দিয়া যাইতে সঙ্কোচ করেন না। একজন জ্যোতিষীর আসনের চারি পাশে বড় জনতা। তাহার বাহিরে একজন অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোতিষীর কাছে যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহস করিয়া জনতা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—ইতস্ততঃ দেখিতেছে। এমন সময়ে সেই স্থান দিয়া, একজন অশ্বারোহী পুরুষ যাইতেছিল।

অশ্বারোহী যুবা পুরুষ। দেখিয়া আহেলে-বিলায়ত মোগল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী, মোগলের ভিতরও এরূপ সুশ্রী পুরুষ দুর্লভ। তাঁহার বেশভূষার অতিশয় পারিপাট্য। দেখিয়া একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হয়। অশ্বও সম্ভ্রান্তবংশীয়।

জনতার জন্য অশ্বারোহী অতি মন্দভাবে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। যে যুবতী ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই, নিকটে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইল। বলিল, "খাঁ সাহেব—মবারক সাহেব—মবারক!"

মবারক—অশ্বারোহীর ঐ নাম—জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

যুবতী বলিল, "ইয়া আল্লা! আর কি চিনিতেও পার না?"
মবারক বলিল, "দরিয়া?"
দরিয়া বলিল, "জী।"
মবা। তুমি এখানে কেন?
দরিয়া! কেন, আমি ত সকল জায়গায় যাই। তোমার ত নিষেধ নাই। তুমি বারণ কর কি?
মবা। আমি কেন বারণ করিব? তুমি আমার কে?
তার পর মৃদুতর স্বরে মবারক বলিল, "কিছু চাই কি?"
দরিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিল. "তোবা! তোমার টাকা আমার হারাম! আমরা আতর সুরমা করিতে জানি।"
মবা। তবে আমাকে পাকড়া করিলে কেন?
দরিয়া। নাম, তবে বলিব।
মবারক ঘোড়া হইতে নামিল। বলিল, "এখন বল।"
দরিয়া বলিল, "এই ভিড়ের ভিতর একজন জ্যোতিষী বসিয়া আছেন। ইনি নূতন আসিয়াছেন। ইঁহার মত জ্যোতির্ব্বিদ্ কখন নাকি আসে নাই। ইঁহার কাছে তোমাকে তোমার কেস্‌মৎ গণাইতে হইবে।"
মবা। আমার কেস্‌মৎ জানিয়া তোমার কি হইবে? তোমার গণাও।
দরিয়া। আমার কেস্‌মৎ আমি জানিতে চাহি না। না গণাইয়াই তাহা জানিতে পারিয়াছি। তোমার কেস্‌মৎ জানাই আমার দরকার।
এই বলিয়া দরিয়া, মবারকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। মবারক বলিল, "আমার ঘোড়া ধরে কে?"
গোটাকতক ছেলে রাজপথে দাঁড়াইয়া লাড্ডু খাইতেছিল। মবারক বলিল, "তোমরা কেহ এক লহমা আমার ঘোড়াটা ধরিয়া রাখ। আমি আসিয়া, তোমাদের আরও লাড্ডু দিব।"
এই বলিবামাত্র দুই তিনটা ছেলে আসিয়া ঘোড়া ধরিল। একটা প্রায় নগ্ন—সে ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল। মবারক তাহাকে মারিতে গেলেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না—ঘোড়া একবার পিছনের পা উঁচু করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল। তাহাকে ভূমিশয্যাগত দেখিয়া, অপর বালকেরা তাহার হাতের লাড্ডু কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিল। তখন মবারক নিশ্চিন্ত হইয়া অদৃষ্ট গণাইতে গেলেন।
মবারককে দেখিয়া অপর লোক সকল পথ ছাড়িয়া দিল। দরিয়া বিবি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। জ্যোতিষীর কাছে মবারক হাত পাতিয়া দিলেন। জ্যোতিষী অনেক দেখিয়া শুনিয়া বলিল, "আপনি গিয়া বিবাহ করুন।" পশ্চাৎ হইতে, ভিড়ের ভিতর লুকাইয়া দরিয়া বিবি বলিল, "করিয়াছে।"
জ্যোতিষী বলিল. "কে ও কথা বলিল?"
মবারক বলিলেন, "ও একটা পাগলী। আপনি বলিতে পারেন, আমার কি রকম বিবাহ হইবে?"
জ্যোতিষী বলিল. "আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন।"
মবারক বলিল, "তাহা হইলে কি হইবে?"
জ্যোতিষী উত্তর করিল. "তাহা হইলে, আপনার খুব পদবৃদ্ধি হইবে।"
ভিড়ের ভিতর হইতে দরিয়া বিবি বলিল, "আর মৃত্যু।"
জ্যোতিষী বলিল, "কে ও?"
মবা। সেই পাগলী।
জ্যোতিষী। পাগলী নয়। ও বোধ হয় মনুষ্য নয়। আমি আর আপনার হাত দেখিব না।
মবারক কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জ্যোতিষীকে কিছু দিয়া, ভিড়ের ভিতর দরিয়ার অন্বেষণ করিলেন। কিছুতেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন কিছু বিষণ্ণভাবে, অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক, দুর্গাভিমুখে চলিলেন। বলা বাহুল্য. বালকেরা কিছু লাড্ডু পাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জেব-উন্নিসা

দরিয়ার সংবাদ-বিক্রয়ের কি হইল? সংবাদ-বিক্রয় আবার কি? কাহাকেই বা বিক্রয় করিবে? সে কথাটা বুঝাইবার জন্য, মোগলসম্রাটের অবরোধের কিছু পরিচয় দিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে, কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ বা ক্যাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ। মোগলসম্রাট্‌দিগের কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত। কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা রাজনীতিবিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগবিলাস-পরায়ণ ছিল। ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী, জাঁহানারা ও রৌশন্‌বারা। জাঁহানারা শাহজাঁহার বাদশাহীর প্রধান সহায়। শাহজাঁহা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে সফল ও যশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।

রৌশন্‌বারা পিতৃদ্বেষিণী, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাঁহানারার মত রাজনীতিবিশারদ এবং সুদক্ষ ছিলেন, এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাঁহানারার ন্যায় বিচারশূন্য, বাধা-শূন্য, এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার রাজ্য অপহরণে ঔরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রৌশন্‌বারা তাঁহার প্রধান সহায়। ঔরঙ্গজেবও রৌশন্‌বারার বড় বাধ্য ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশন্‌বারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন।

কিন্তু রৌশন্‌বারার দুরদৃষ্টক্রমে তাঁহার একজন মহাশক্তিশালিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিল। ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। কনিষ্ঠা দুইটির সঙ্গে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের তিনি বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা জেব-উন্নিসা* বিবাহ করিলেন না। পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পিসী ভাইঝি উভয়ে অনেক স্থলেই, মদন-মন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন। সুতরাং ভাইঝি পিসীকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পিসীর মহিমা তিনি পিতৃসমীপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, রৌশন্‌বারা পৃথিবী হইতে অদৃশ্যা হইলেন, জেব-উন্নিসা তাঁহার পদমর্য্যাদা ও তাঁহার পদানতগণকে পাইলেন।

পদমর্য্যাদার কথা বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। বাদশাহের অন্তঃপুরে খোজা ভিন্ন কোন পুরুষ প্রবেশ করিত না, অন্ততঃ করিবার নিয়ম ছিল না। অন্তঃপুরে পাহারার কাজের জন্য একটা স্ত্রীসেনা নিযুক্ত ছিল। যেমন হিন্দুরাজগণ যবনীগণকে প্রতিহারে নিযুক্ত করিতেন, মোগল বাদশাহেরাও তাই করিতেন। তাতারজাতীয়া সুন্দরীগণ মোগলসম্রাটের অবরোধে প্রহরিণী ছিলেন। এই স্ত্রীসৈন্যের একজন নায়িকা ছিলেন; তিনি সেনাপতির স্থানীয়া। তাঁহার পদ উচ্চপদ বলিয়া গণ্য, এবং বেতন ও সম্মান তদনুযায়ী। এই পদে রৌশন্‌বারা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সহসা অপার্থিব অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলে জেব-উন্নিসা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যিনি এই পদে নিযুক্ত হইতেন, তিনি রাজান্তঃপুরের সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্রী হইতেন। সুতরাং জেব-উন্নিসা রঙ্‌মহালের† সর্ব্বকর্ত্রী ছিলেন। সকলেই তাঁহার অধীন; প্রতিহারিগণ, খোজারা, বাঁদীরা, দৌবারিকগণ, বাহকগণ, পাচকগণ, সকলেই তাঁহার অধীন। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে মহাল মধ্যে আসিতে দিতে পারিতেন।

দুই শ্রেণীর লোক, তাঁহার কৃপায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিত; এক প্রণয়ভাজন ব্যক্তিগণ —অপর যাহারা তাঁহার কাছে সংবাদ বেচিত।

* মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জয়েব্‌-উন্নিসা নামে পরিচিতা। পাদ্রি কণ্ডু বলেন, ইঁহার নাম ফখর-উন্নিসা।

† বাদশাহের অন্তঃপুরকে রঙ্‌মহাল বা মহাল বলিত।

বলিয়াছি, জেব-উন্নিসা একজন প্রধান politician, মোগলসাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল, এক প্রকার তাঁর হাতে। তিনি মোগলসাম্রাজ্যের 'নিয়ামক নক্ষত্র' বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। জানা আছে, "politician" সম্প্রদায়ের একটা বড় প্রয়োজন—সংবাদ। কোথায় কি হইতেছে, গোপনে সব জানা চাই। দুর্ম্মুখের মুনিব রামচন্দ্র হইতে বিস্মার্ক পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রমাণ। জেব-উন্নিসা এ কথাটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। চারি দিক্ হইতে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে তসবির-ওয়ালা খিজির একজন। তার মা নানা দেশে তসবির বেচিতে যাইত। খিজির তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দরিয়া বিবির ভগিনীও আতর ও সুর্মা বিক্রয়ের উপলক্ষে দিল্লীর ভিতর ভ্রমণ করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিত। এই সকল সংবাদ দরিয়া জেব-উন্নিসার কাছে দিয়া আসিত। জেব-উন্নিসা প্রতি বার কিছু কিছু পুরস্কার দিতেন। ইহাই সংবাদ-বিক্রয়। সংবাদ-বিক্রয়ার্থ দরিয়া মহাল মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা না পান, তজ্জন্য জেব-উন্নিসা তাঁহাকে একটা পরওয়ানা দিয়াছিলেন। পরওয়ানার মর্ম্ম এই, "দরিয়া বিবি সুর্মা বিক্রয়ের জন্য রঙ্মহালে প্রবেশ করিতে পারে।"

কিন্তু দরিয়া বিবি রঙ্মহালে প্রবেশকালে হঠাৎ বিঘ্ন প্রাপ্ত হইল। দেখিল—মবারক খাঁ রঙ্মহাল মধ্যে প্রবেশ করিল। দরিয়া তখন প্রবেশ করিল না—একটু বিলম্ব করিয়া প্রবেশ করিল।

দরিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, যেখানে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ, মবারক সেইখানে গেল। দরিয়া একটা বৃক্ষবাটিকার ছায়ার মধ্যে লুকাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঐশ্বর্য্য-নরক

দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজ-প্রাসাদমালার ভিতর, অল্প ভূমিমধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপরাশি, এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল না। রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙ্মহাল। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য,—চন্দ্র সূর্য্য তথায় প্রবেশ করে না; যম গোপনে ভিন্ন তথায় যান না; বায়ুরও গতিরোধ। তথায় গৃহসকল বিচিত্র; গৃহসজ্জা বিচিত্র; অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র। এমন রত্নখচিত, ধবলপ্রস্তর-নির্ম্মিত কক্ষরাজি কোথাও নাই; এমন নন্দনকানননিন্দিনী উদ্যান-মালা আর কোথাও নাই—এমন উর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভার গর্ব্বখর্ব্বকারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নাই, এত ভোগবিলাস জগতে আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ আর কোথাও নাই।

ইহার মধ্যে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ আমাদের উদ্দেশ্য।

অতি মনোহর বিলাসগৃহ। শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তরের হর্ম্ম্যতল। শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত কক্ষপ্রাচীর; পাথরে রত্নের লতা, রত্নের পাতা, রত্নের ফুল, রত্নের ফল, রত্নের পাখী, রত্নের ভ্রমর। কিয়দ্দুর উর্দ্ধে সর্ব্বত্র দর্পণমণ্ডিত। তাহার ধারে ধারে সোণার কামদার বীট। উর্দ্ধে রূপার তারের চন্দ্রাতপ, তাহাতে মতির ছোট ঝালর; এবং সদ্যোনির্চিত পুষ্পরাশির বড় ঝালর। হর্ম্ম্যতলে নববর্ষাসমাগমোদ্গত কোমল তৃণরাজি অপেক্ষাও সুকোমল গালিচা পাতা; তাহার উপর গজদন্তনির্ম্মিত রত্নালঙ্কৃত পালঙ্ক। তাহার উপর জরির কামদার বিছানায় জরির কামদার মখমলের বালিশ। শয্যার উপর বিবিধ পাত্রে রাশি রাশি সুগন্ধি পুষ্প, পাত্রে পাত্রে আতর-গোলাপ; সুগন্ধি, যত্ন-প্রস্তুত তাম্বুলের রাশি। আর পৃথক্ সুবর্ণপাত্রে সুপেয় মদ্য। সকলের মধ্যে, পুষ্পরাশিকে, রত্নরাশিকে ম্লান করিয়া, প্রৌঢ়া সুন্দরী জেব-উন্নিসা, পানপাত্র-হস্তে, বাতায়নপথে, নিশীথ-নক্ষত্রশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, মৃদু পবনে পুষ্পমণ্ডিত মস্তক শীতল করিতেছিলেন, এমন সময়ে মবারক খাঁ তথায় উপস্থিত।

মবারক জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া বসিলেন, এবং তাম্বুলাদি প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইলেন।

জেব-উন্নিসা বলিল, "না খুঁজিতে যে আসে, সেই ভালবাসে।"

মবারক বলিল, "না ডাকিতে আসিয়াছি, বেআদবি হইয়াছে। কিন্তু ভিক্ষুক না ডাকিতেই আসিয়া থাকে।"

জেব-উন্নিসা। তোমার কি ভিক্ষা প্রাণাধিক!

মবারক। ভিক্ষা এই যে, যেন মোল্লার হুকুমে ঐ শব্দে আমার অধিকার হয়।

জেব-উন্নিসা হাসিয়া বলিল, "ঐ সেই পুরাতন কথা! বাদশাহজাদীরা কখন বিবাহ করে?"

মবা। তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীগণ ত বিবাহ করিয়াছে।

জেব। তাহারা শাহজাদা বিবাহ করিয়াছে। বাদশাহজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না। বাদশাহজাদীরা দুইশতী মনসবদারকে কি বিবাহ করিতে পারে?

মবা। তুমি মালেকে মুলুক। তুমি বাদশাহকে যাহা বলিবে, তিনি তাহাই করিবেন, ইহা সর্ব্বলোকে জানে।

জেব। যাহা অনুচিত, তাহাতে আমি বাদশাহকে অনুরোধ করিব না।

মবা। আর এই কি উচিত, শাহজাদী?

জেব। এই কি?

মবা। এই মহাপাপ।

জেব। কে মহাপাপ করিতেছে?

মবারক মাথা হেঁট করিল। শেষ বলিল, "তুমি কি বুঝিতেছ না?

জেব-উন্নিসা। যদি ইহা পাপ বলিয়া বোধ হয়, আর আসিও না।

মবারক সকাতরে বলিল, "আমার যদি সে সাধ্য থাকিত, তবে আমি আর আসিতাম না। কিন্তু আমি ঐ রূপরাশিতে বিক্রীত।"

জেব। যদি বিক্রীত—যদি তুমি আমার কেনা—তবে যা বলি, তাই কর। চুপ করিয়া থাক।

মবা। যদি আমি একাই এ পাপের দায়ী হইতাম, না হয় চুপ করিয়া থাকিতাম। কিন্তু আমি তোমাকে আপনার অধিক ভালবাসি।

জেব-উন্নিসা উচ্চ হাসি হাসিল। বলিল, "বাদশাহজাদীর পাপ!"

মবারক বলিল, "পাপপুণ্য আল্লার হুকুম।"

জেব। আল্লা এ সকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন—কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।

মবারক একেবারে আকাশ হইতে পড়িল—এরূপ কদর্য্য কথা সে কখনও শুনে নাই। সেই পাপস্রোতোময়ী দিল্লীতেও কখনও শুনে নাই। অন্য কেহ এ কথা তাহার সম্মুখে বলিলে, সে বলিত, "তুমি বজ্রাহত হইয়া মর।" কিন্তু জেব-উন্নিসার রূপের সমুদ্রে সে ডুবিয়া গিয়াছিল —তাহার আর দিশ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। সে কেবল বিস্মিত হইয়া রহিল।

জেব-উন্নিসা বলিতে লাগিল, "ও কথা যাক। অন্য কথা আছে। ও কথা যেন আর কখনও না শুনি। শুনি যদি—"

মবারক। আমাকে ভয় দেখাইবার কি প্রয়োজন? আমি জানি, তুমি যাহার উপর অপ্রসন্ন হইবে, এক দণ্ড তাহার কাঁধে মাথা থাকিবে না। কিন্তু ইহাও বোধ হয় তুমি জান যে, মবারক মৃত্যুকে ভয় করে না।

জেব-উন্নিসা। মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই?

মবা। আছে—তোমার বিচ্ছেদ।

জেব-উন্নিসা। বার বার অসঙ্গত কথা বলিলে তাহাই ঘটিতে পারে।

মবারক বুঝিলেন যে, একটা ঘটিলে দুইটাই ঘটিবে। তিনি যদি পাপিষ্ঠা বলিয়া জেব-উন্নিসাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চিত নিহত হইতে হইবে। জেব-উন্নিসা মোগল রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। খোদ ঔরঙ্গজেব তাঁহার আজ্ঞাকারী। কিন্তু সেজন্য মবারক দুঃখিত নহেন। তাঁহার দুঃখ এই যে, তিনি বাদশাহজাদীর রূপে মুগ্ধ, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার কিছুমাত্র সাধ্য নাই; এই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইবার তাঁহার শক্তি নাই।

অতএব মবারক বিনীত ভাবে বলিল, "আপনি ইচ্ছাক্রমে যতটুকু দয়া করিবেন, তাহাতেই আমার জীবন পবিত্র। আমি যে আরও দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি—তাহা দরিদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। কোন্ দরিদ্র না দুনিয়ার বাদশাহী কামনা করে?"

তখন প্রসন্ন হইয়া শাহজাদী মবারককে আসব পুরস্কার করিলেন। মধুর প্রণয়সম্ভাষণের পর তাহাকে আতর ও পান দিয়া বিদায় করিলেন।

মবারক রঙমহাল হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই, দরিয়া বিবি আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল। অন্যের অশ্রাব্য স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইল?"

মবারক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?"

দরিয়া। সেই দরিয়া!

মবা। দুশমন! শয়তান! তুই এখানে কেন?

দরিয়া। জান না, আমি সংবাদ বেচি?

মবারক শিহরিল। দরিয়া বিবি বলিল, "রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ কি হইবে?"

মবা। রাজপুত্রী কে?

দরিয়া। শাহজাদী জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবা। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নহে?

মবা। আমি তোকে এইখানে খুন করিব।

দরিয়া। তবে আমি হাল্লা করি।

মবা। আচ্ছা, না হয়, খুন না-ই করিলাম। তুই কার কাছে খবর বেচিতে আসিয়াছিস্ বল্।

দরিয়া। বলিব বলিয়াই দাঁড়াইয়া আছি। হজরৎ জেব-উন্নিসা বেগমের কাছে।

মবা। কি খবর বেচিবি?

দরিয়া। যে আজ তুমি বাজারে জ্যোতিষীর কাছে, আপনার কিসমত জানিতে গিয়াছিলে। তাতে জ্যোতিষী তোমাকে শাহজাদী বিবাহ করিতে বলিয়াছে। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

মবা। দরিয়া বিবি! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমার উপর এই দৌরাত্ম্য করিতে প্রস্তুত?

দরিয়া। কি করিয়াছ? তুমি আমার কি না করিয়াছ? তুমি যাহা করিয়াছ, তার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট কি আছে?

মবা। কেন পিয়ারি! আমার মত কত আছে।

দরিয়া। এমন পাপিষ্ঠ আর নাই।

মবা। আমি পাপিষ্ঠ নই। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া এত কথা চলিতে পারে না। স্থানান্তরে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি সব বুঝাইয়া দিব।

এই বলিয়া মবারক আবার জেব-উন্নিসার কাছে ফিরিয়া গেল। জেব-উন্নিসাকে বলিল, "আমি পুনর্ব্বার আসিয়াছি, এ বেআদবি মাফ্ করিতে হইতেছে। বলিতে আসিয়াছি যে, দরিয়া বিবি হাজির আছে—এখনই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। সে পাগল। সে আপনার কাছে, আমার কোন নিন্দাবাদ করিলে আমার উত্তর না লইয়া আমার প্রতি আপনি কোপ করিবেন না।"

জেব-উন্নিসা বলিলেন, "তোমার উপর কোপ করিবার আমার সাধ্য নাই। যদি তোমার উপর কখন রাগ করি, তবে আমিই দুঃখ পাইব। তোমার নিন্দা আমি কাণে শুনি না।"

"এ দাসের উপর এইরূপ অনুগ্রহ চিরকাল রাখিবেন" এই বলিয়া মবারক পুনর্ব্বার বিদায় গ্রহণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সংবাদ-বিক্রয়

যে তাতারী যুবতী, অসিচর্ম্ম হস্তে লইয়া, জেব-উন্নিসার গৃহের দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত, সে দরিয়াকে দেখিয়া বলিল, "এত রাত্রে কেন?"

দরিয়া বিবি বলিল, "তা কি পাহারাওয়ালীকে বলিব? তুই খবর দে।"

তাতারী বলিল, "তুই বেরো—আমি খবর দিব না।"

দরিয়া বলিল, "রাগ কর কেন, দোস্ত? তোমার নজরের লজ্জাতেই কাবুল পঞ্জাব ফতে হয়

তার উপর আবার হাতে ঢাল-তরবার—তুমি রাগিলে কি আর চলে?—এই আমার পরওয়ানা দেখ— আর এত্তেলা কর "

প্রহরিণী, রক্তাধরে একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমাকেও চিনি, তোমার পরওয়ানাও চিনি। তা এত রাত্রিতে কি আর হজরৎ বেগম সাহেবা সুর্‌মা কিনিবে? তুমি কাল সকালে এসো। এখন খসম থাকে, খসমের কাছে যাও—আর না থাকে যদি—"

দরিয়া। তুই জাহান্নামে যা। তোর ঢাল-তরবার জাহান্নামে যাক্—তোর ওড়্না পায়জামা জাহান্নামে যাক্—তুই কি মনে করিস্, আমি রাত দুপুরের কাজ না থাকিলে, রাত দুপুরে এয়েছি?

তখন তাতারী চুপি চুপি বলিল, "হজরৎ বেগম সাহেবা এস্ বক্ত কুচ মজেমে হোয়েঙ্গী।"

দরিয়া বলিল, "আরে বাঁদী, তা কি আমি জানি না? তুই মজা করিবি? হাঁ কর্।"

তখন দরিয়া, ওড়্নার ভিতর হইতে এক শিশি সরাব বাহির করিল। প্রহরিণী হাঁ করিল—দরিয়া শিশি ভোর তার মুখে ঢালিয়া দিল—তাতারী শুষ্ক নদীর মত, এক নিশ্বাসে তাহা শুষিয়া লইল। বলিল 'বিস্‌মেল্লা' তোফা সরবৎ! আচ্ছা, তুমি খাড়া থাক, আমি এত্তেলা করিতেছি।"

প্রহরিণী কক্ষের ভিতর গিয়া দেখিল, জেব-উন্নিসা হাসিতে হাসিতে ফুলের একটা কুকুর গড়িতেছেন,—মবারকের মত তার মুখটা হইয়াছে—আর বাদশাহদিগের সেরপেঁচ কলগার মত তার লেজটা হইয়াছে। জেব-উন্নিসা প্রহরিণীকে দেখিয়া বলিল, "নাচ্‌নেওয়ালী লোগ্‌কো বোলাও।"

রঙ্‌মহালের সকল বেগমদিগের আমোদের জন্য এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী নিযুক্ত ছিল। ঘরে ঘরে নৃত্যগীত হইত। জেব-উন্নিসার প্রমোদার্থ একদল নর্ত্তকী ছিল।

প্রহরিণী পুনশ্চ কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "যো হুকুম্। দরিয়া বিবি হাজির, আমি তাড়াইয়া দিয়াছিলাম—মানা শুনিতেছে না।"

জেব। কিছু বখ্‌শিশও দিয়াছে?

প্রহরিণী সুন্দরী লজ্জিতা হইয়া ওড়্নায় আকর্ণ মুখ ঢাকিল। তখন জেব-উন্নিসা বলিল, "আচ্ছা, নাচ্‌নেওয়ালী থাক্—দরিয়াকে পাঠাইয়া দে।"

দরিয়া আসিয়া কুর্ণিশ করিল। তার পর ফুলের কুকুরটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া বেগম সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হয়েছে দরিয়া?"

দরিয়া ফের কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "ঠিক মন্‌সবদার মবারক খাঁ সাহেবের মত হইয়াছে।

জেব। ঠিক! তুই নিবি?

দরিয়া। কোন্‌টা দিবেন? কুকুরটা, না মানুষটা?

জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিল। পরে রাগ সামলাইয়া হাসিয়া বলিল, "যেটা তোর খুসী।"

দরিয়া। তবে কুকুরটা হজরৎ বেগম সাহেবার থাক্—আমি মানুষটা নিব।

জেব। কুকুরটা এখন হাতে আছে—মানুষটা এখন হাতে নাই। এখন কুকুরটাই নে।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা আসব-সেবন-প্রফুল্লচিত্তে যে ফুলে কুকুর গড়িয়াছিল, সেই ফুলগুলো দরিয়াকে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। দরিয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া ওড়্নায় তুলিল—নহিলে বেআদবি হইবে। তার পর সে বলিল, "আমি হুজুরের কৃপায় কুকুর মানুষ দুই পাইলাম।"

জেব। কিসে?

দ। মানুষটা আমার।

জেব। কিসে?

দ। আমার সঙ্গে সাদি হয়েছে।

জেব। নেকাল হিঁয়াসে।

জেব-উন্নিসা কতকগুলা ফুল ফেলিয়া সবলে দরিয়াকে প্রহার করিল।

দরিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "মোল্লা গোওয়া সব জীবিত আছে! না হয় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।"

জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমার হুকুমে তাহারা শূলে যাইবে।"

দরিয়া কাঁপিল। এই ব্যাঘ্রীতুল্যা মোগল-কুমারীরা সব পারে, তা সে জানিত। বলিল, "শাহজাদী! আমি দুঃখী মানুষ, খবর বেচিতে আসিয়াছি—আমার সে সব কথার প্রয়োজন নাই।"

জেব। কি খবর—বল্।

*দরিয়া। দুইটা আছে। একটা এই মবারক খাঁ সম্বন্ধে। আজ্ঞা না পাইলে বলিতে সাহস হয় না।

জেব। বল্।

দরিয়া। ইনি আজ রাত্রে চৌকে গণেশ জ্যোতিষীর কাছে আপনার কিসমত গণাইতে গিয়াছিলেন।

জেব। জ্যোতিষী কি বলিল?

দরিয়া। শাহজাদী বিবাহ কর। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

জেব। মিছা কথা। মন্‌সবদার কখন্ জ্যোতিষীর কাছে গেল?

দরিয়া। এখানে আসিবার আগেই।

জেব। কে এখানে আসিয়াছিল?

দরিয়া একটু ভয় খাইল। কিন্তু তখনই আবার সাহস করিয়া তস্‌লীম দিয়া বলিল, 'মবারক খাঁ সাহেব।'

জেব। তুই কেমন করিয়া জানিলি?

দরিয়া। আমি আসিতে দেখিয়াছি।

জেব। যে এ সকল কথা বলে, আমি তাহাকে শূলে দিই।

দরিয়া শিহরিল। বলিল, "বেগম সাহেবার হুজুরে ভিন্ন এ সকল কথা আমি মুখে আনি না।"

জেব। আনিলে, জল্লাদের হাতে তোমার জিব কাটাইয়া ফেলিব। তোর দোস্‌রা খবর কি বল্।

দরিযা। দোস্‌রা খবর রূপনগরের।

দরিয়া তখন চঞ্চলকুমারীর তসবির ভাঙ্গার কাহিনীটা আদ্যোপ্রান্ত শুনাইল। শুনিয়া জেব-উন্নিসা বলিলেন, "এ খবর আচ্ছা। কিছু বখ্‌শিশ পাইবি।"

তখন রঙ্‌মহালের খাজনাখানার উপর বখ্‌শিশের পরওয়ানা হইল। পাইয়া দরিয়া পলাইল।

তাতারী প্রতিহারী তাহাকে ধরিল। তরবারিখানা দরিয়ার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল, "পালাও কোথা সখি?"

দ। কাজ হইয়াছে—ঘরে যাইব।

প্রতিহারী। টাকা পাইয়াছ—আমায় কিছু দিবে না?

দ। আমার টাকার বড় দরকার, একটা গীত শুনাইয়া যাই। সারেঙ্গ আন।

প্রতিহারীর সারেঙ্গ ছিল—মধ্যে মধ্যে বাজাইত। রঙ্‌মহালে গীতবাদ্যের বড় ধুম। সকল বেগমের এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী ছিল, যে অপরিণীতা গণিকাদিগের ছিল না, তাহারা আপনা আপনি সে কার্য্য সম্পন্ন করিত। রঙ্‌মহালে রাত্রিতে সুর লাগিয়াই ছিল। দরিয়া তাতারীর সারেঙ্গ লইয়া গান করিতে বসিল। সে অতিশয় সুকণ্ঠ, সঙ্গীতে বড় পটু। অতি মধুর গায়িল। জেব-উন্নিসা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গায়?"

প্রতিহারী বলিল, "দরিয়া বিবি।"

হুকুম হইল, "উহাকে পাঠাইয়া দাও।"

দরিয়া আবার জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া কুর্ণিশ করিল। জেব-উন্নিসা বলিলেন, "গা। ঐ বীণ আছে।"

বীণ লইয়া দরিয়া গায়িল। গায়িল অতি মধুর। শাহজাদী অনেক অপ্সরোনিন্দিত, সঙ্গীতবিদ্যাপটু, গায়ক-গায়িকার গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এমন গান কখন শুনেন নাই। দরিয়ার গীত সমাপ্ত হইলে, জেব-উন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি মবারকের কাছে কখন গায়িয়াছিলে?"

দরিয়া। আমার এই গীত শুনিয়াই তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জেব-উন্নিসা একটা ফুলের তোর্‌রা ফেলিয়া দরিয়াকে এমন জোরে মারিলেন যে, দরিয়ার কর্ণভূষায় লাগিয়া, কাণ কাটিয়া রক্ত পড়িল। তখন জেব-উন্নিসা তাহাকে আরও কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। বলিলেন, "আর আসিস্ না।"

দরিয়া তস্‌লীম দিয়া বিদায় হইল। মনে মনে বলিল, "আবার আসিব—আবার জ্বালাইব—আবার মার খাইব—আবার টাকা নিব! তোমার সর্ব্বনাশ করিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ উদিপুরী বেগম

ঔরঙ্গজেব জগৎপ্রথিত বাদশাহ। তিনি জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজেও বুদ্ধিমান, কর্ম্মদক্ষ পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজগুণে গুণবান্ ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই জগৎপ্রথিতনামা রাজাধিরাজ, আপনার জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

ইহার একমাত্র কারণ, ঔরঙ্গজেব মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধূর্ত্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক দুই একজন মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটাচারী সম্রাট্ জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন—কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকা-পরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত।

তাঁহার মহিষীও অসংখ্য—আর সরার বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্যা বেতনভোগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য। এই পাপিষ্ঠাদিগের সঙ্গে এই গ্রন্থের সম্বন্ধ বড় অল্প। কিন্তু কোন কোন মহিষীর সঙ্গে এই উপখ্যানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মোগল বাদশাহেরা যাঁহাকে প্রথম বিবাহ করিতেন, তিনিই প্রধানা মহিষী হইতেন। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের দুর্ভাগ্যক্রমে একজন হিন্দুকন্যা তাঁহার প্রধানা মহিষী। আকব্বর বাদশাহ রাজপুত রাজগণের কন্যা বিবাহ করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম অনুসারে, সকল বাদশাহেরই হিন্দুমহিষী ছিল। ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম।

যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না। যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী, সে একজন খ্রিষ্টিয়ানী; উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। উদয়পুরের সঙ্গে ইঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইঁহার নাম উদিপুরী নহে। আসিয়া খণ্ডের দূরপশ্চিম-প্রান্তস্থিত যে জর্জিয়া এখন রুষিয়া রাজ্যভুক্ত, তাহাই ইঁহার জন্মস্থান। বাল্যকালে একজন দাসব্যবসায়ী ইঁহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইঁহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইলেন। বলিয়াছি, উদিপুরী মুসলমান ছিল না, খ্রিষ্টিয়ান। প্রবাদ আছে যে, দারাও শেষে খ্রিষ্টিয়ান হইয়াছিলেন।

দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তবে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসিতে পাইযাছিলেন। দারাকে পরাস্ত করিয়া, ঔরঙ্গজেব প্রথমে তাহাকে বন্দী করিয়া, পরে বধ করেন। দারাকে বধ করিয়া নরাধম ঔরঙ্গজেব এক আশ্চর্য্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। উড়িয়াদিগের কলঙ্ক আছে যে, বড় ভাই মরিলে ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া তাহার শোকাপনোদন করে। এই শ্রেণীর একজন উড়িয়াকে আমি একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা এমন দুষ্কর্ম্ম কেন কর?" সে ঝটিতি উত্তর করিল, "আজ্ঞে, ঘরের বৌ কি পরকে দিব?" ভারতেশ্বর ঔরঙ্গজেবও বোধ হয়, সেইরূপ বিচার করিলেন। তিনি কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ইস্‌লাম্ ধর্ম্মানুসারে তিনি অগ্রজপত্নী বিবাহ করিতে বাধ্য। অতএব দারার দুইটি প্রধানা মহিষীকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী হইতে আহূত করিলেন। একটি রাজপুতকন্যা; আর একজন এই উদিপুরী মহাশয়া। রাজপুতকন্যা এই আজ্ঞা পাইয়া যাহা করিল, হিন্দুকন্যা মাত্রেই সেই অবস্থায় তাহা করিবে, কিন্তু আর কোন জাতীয়া কন্যা তাহা পারিবে না,—সে বিষ খাইয়া মরিল। খ্রিষ্টিয়ানীটা সানন্দে ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠলগ্না হইল। ইতিহাস এই গণিকার নাম কীর্ত্তিত করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন, আর যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিষ পান করিল, তাহার নাম লিখিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছেন। ইতিহাসের মূল্য এই!

উদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমনি অতুল্য মদ্যাসক্তি। দিল্লীর বাদশাহেরা মুসলমান

হইয়াও অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের পৌরবর্গ এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুগামী হইতেন। রঙ্‌মহালেও এ রঙ্গের ছড়াছড়ি! এই নরকমধ্যেও উদিপুরী নাম জাহির করিয়া তুলিয়াছিল।

জেব-উন্নিসা হঠাৎ উদিপুরীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না। কেন না, ভারতেশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী মদ্যপানে প্রায় বিলুপ্তচেতনা; বসনভূষণ কিছু বিপর্য্যস্ত, বাঁদীরা সজ্জা পুনর্বিন্যস্ত করিল; ডাকিয়া সচেতন ও সাবধান করিয়া দিল। জেব উন্নিসা আসিয়া দেখিল, উদিপুরীর বাম হাতে সট্‌কা, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, অধরবান্ধুলীর উপর মাছি উড়িতেছে, ঝটিকাবিভিন্ন ভূপতিত বৃষ্টিনিষিক্ত পুষ্পরাশির মত উদিপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে।

জেব-উন্নিসা আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "মা! আপনার মেজাজ উত্তম ত?"

উদিপুরী অর্দ্ধজাগ্রতের স্বরে, রসনার জড়তাব সহিত বলিল, "এত রাত্রে কেন?"

জে। একটা বড় খবর আছে।

উ। কি? মারহাট্টা ডাকু মরেছে?

জে। তারও অপেক্ষা খোশ খবর।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা গুছাইয়া বাড়াইয়া রঙ ঢালিয়া দিয়া, চঞ্চলকুমারীর সেই তসবিব ভাঙ্গার গল্পটা করিলেন। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "এ আর খোশ খবর কি?"

জেব-উন্নিসা বলিল, "এই মহিষের মত বাঁদীগুলা হজরতেব তামাকু সাজে, আমি তাহা দেখিতে পারি না। রূপনগরের সেই সুন্দরী রাজকুমারী আসিয়া হজরতের তামাকু সাজিবে, বাদশাহের কাছে এই ভিক্ষা চাহিও।"

উদিপুরী না বুঝিয়া, নেশার ঝোঁকে বলিল, "বহুত আচ্ছা।"

ইহার কিছু পরে রাজকার্য্যপরিশ্রমক্লান্ত বাদশাহ শ্রমাপনয়ন জন্য উদিপুরীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। উদিপুরী নেশার ঝোঁকে চঞ্চলকুমারীর কথা, জেব-উন্নিসার কাছে যেমন শুনিয়াছিল, তেমনই বলিল। "সে আসিয়া আমার তামাকু সাজিবে," এ প্রার্থনাও জানাইল। বলিবামাত্র ঔবঙ্গজেব শপথ করিয়া স্বীকার করিলেন। কেন না, ক্রোধে অস্থির হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : যোধপুরী বেগম

পরদিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদ্বিতীয় কুটিলতা ভয়ে জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিম শাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্ব্বদা শশব্যস্ত—যে দুর্ভেদ্য কুটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চাতুর্য্যাগ্রগণ্য শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন—এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতাপ্রসূত। তাহাতে লিখিত হইল যে, "বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবৃত্তান্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাওসাহেবের সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজকন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন; শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।"

এই সংবাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যা দান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ—যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই—তিনি জামাতা হইবেন,—চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন—ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী দেবমন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিলেন; রাজা এই সুযোগে কোন্ ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন, তাহার ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীজন নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ সম্বন্ধে মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।

সংবাদটা অবশ্য দিল্লীতেও প্রচার হইল। বাদশাহী রঙ্‌মহালে প্রচারিত হইল। যোধপুরী বেগম শুনিয়া বড় নিরানন্দ হইলেন। তিনি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাঁহার সুখ ছিল না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানী রাখিতেন। হিন্দু পরিচারিকা দ্বারা তিনি সেবিতা হইতেন; হিন্দুর পাক ভিন্ন ভোজন করিতেন না—এমন কি, ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। বিখ্যাত দেবদ্বেষী ঔরঙ্গজেব যে এতটা সহ্য করিতেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকেও একটু অনুগ্রহ করিতেন।

যোধপুরী বেগম এ সংবাদ শুনিলেন। বাদশাহের সাক্ষাৎ পাইলে, বিনীতভাবে বলিলেন, "জাঁহাপনা! যাঁহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে—এক সামান্যা বালিকা কি তাঁহার ক্রোধের যোগ্য?"

রাজেন্দ্র হাসিলেন—কিন্তু কিছু বলিলেন না। সেখানে কিছুই হইল না।

তখন যোধপুর-রাজকন্যা মনে মনে বলিলেন, "হে ভগবান্! আমাকে বিধবা কর! এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দুনাম লোপ হইবে।"

দেবী নামে তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিল। সে যোধপুর হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন দেশছাড়া, এখন অধিক বয়সে, আর সে মুসলমানের পুরীর মধ্যে থাকিতে চাহে না। অনেক দিন হইতে সে বিদায় চাহিতেছিল, কিন্তু সে বড় বিশ্বাসী বলিয়া যোধপুরী তাহাকে ছাড়েন নাই। যোধপুরী আজ তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি অনেক দিন হইতে যাইতে চাহিতেছ, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে। কাজটি বড় শক্ত, বড় পরিশ্রমের কাজ, বড় সাহসের কাজ, আর বড় বিশ্বাসের কাজ। তাহার খরচ-পত্র দিব, বখ্‌শিশ দিব, আর চিরকালের জন্য মুক্তি দিব। করিবে?"

দেবী বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

যোধপুরী বলিলেন, "রূপনগরের রাজকুমারীর সংবাদ শুনিয়াছ। তাঁর কাছে যাইতে হইবে। চিঠি-পত্র দিব না, যাহা বলিবে, আমার নাম করিয়া বলিবে, আর আমার এই পাঞ্জা দেখাইবে, তিনি বিশ্বাস করিবেন। ঘোড়ায় চড়িতে পার, ঘোড়ায় যাইবে। ঘোড়া কিনিবার খরচ দিতেছি।"

দেবী। কি বলিতে হইবে?

বেগম। রাজকুমারীকে বলিবে, হিন্দুর কন্যা হইয়া মুসলমানের ঘরে না আসেন। আমরা আসিয়া নিত্য মরণ কামনা করিতেছি। বলিবে যে, তসবির ভাঙ্গার কথাটা বাদশাহ শুনিয়াছেন, তাঁকে সাজা দিবার জন্যই আনিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, রূপনগরওয়ালীকে দিয়া উদিপুরীর তামাকু সাজাইবেন। বলিও, বরং বিষ খাইও, তথাপি দিল্লীতে আসিও না।

"আরও বলিও, ভয় নাই। দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা মোগলের হাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্রিত হইতেছে। জেজিয়ার জ্বালায় সমস্ত রাজপুতানা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানায় গোহত্যা হইতেছে। কোন্ রাজপুত ইহা সহিবে? সব রাজপুত একত্রিত হইতেছে: উদয়পুরের রাণা, বীরপুরুষ। মোগল তাতারের মধ্যে তাঁর মত কেহ নাই। তিনি যদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইয়া অস্ত্রধারণ করেন—যদি এক দিকে শিবজী, আর এক দিকে রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয় দিন টিকিবে?"

দেবী। এমন কথা বলিও না, মা! দিল্লীর তক্ত, তোমার ছেলের জন্য আছে। আপনার ছেলের সিংহাসন ভাঙ্গিবার পরামর্শ আপনি দিতেছ?

বেগম। আমি এমন ভরসা করি না যে, আমার ছেলে এ তক্তে বসিবে। যত দিন রাক্ষসী জেব-উন্নিসা আর ডাকিনী উদিপুরী বাঁচিবে, তত দিন সে ভরসা করি না। একবার সে ভরসা করিয়া, রোশন্‌আরার কাছে বড় মার খাইয়াছিলাম।* আজিও মুখে চোখে সে দাগ-জখমের চিহ্ন আছে।

এইটুকু বলিয়া যোধপুরকুমারী একটু কাঁদিলেন। তার পর বলিলেন, "সে সব কথায় কাজ নাই। তুমি আমার সকল মতলব বুঝিবে না—বুঝিয়াই বা কি হইবে? যাহা বলি, তাই করিও।

* কথাটা ঐতিহাসিক। রোশন্‌আরা যোধপুরীর নাক-মুখ ছিঁড়িয়া দিয়াছিল।

রাজকুমারীকে রাজসিংহের শরণ লইতে বলিও। রাজসিংহ রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তিনি রাণার মহিষী হউন। মহিষী হইলে যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, উদিপুরী তাঁর তামাকু সাজিবে—রৌশন্‌আরা তাঁকে পাখার বাতাস করিবে।

দেবী। এও কি হয় মা?

বেগম। সে কথার বিচার তুমি করিও না। আমি যা বলিলাম, তা পারিবে কি না?

দেবী। আমি সব পারি।

বেগম তখন দেবীকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও পুরস্কার এবং পাঞ্জা দিয়া বিদায় করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : খোদা শাহজাদী গড়েন কেন?

আবার জেব-উন্নিসার বিলাস-মন্দিরে, মবারক রাত্রিকালে উপস্থিত। এবার মবারক, গালিচার উপর জানু পাতিয়া উপবিষ্ট—যুক্তকর, ঊর্দ্ধমুখ। জেব-উন্নিসা সেই রত্নখচিত পালঙ্কে, মুক্তাপ্রবালের ঝালরযুক্ত শয্যায় জরির কামদার বালিশের উপর হেলিয়া, সুবর্ণের আলবোলায়, রত্নখচিত নলে, তামাকু সেবন করিতেছিল। পাশ্চাত্য মহাত্মগণের কৃপায়, তামাকু তখন ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

জেব-উন্নিসা বলিতেছেন, "সব ঠিক বলিবে?"

মবারক যুক্তকরে বলিল, "আজ্ঞা করিলেই বলিব।"

জেব। তুমি দরিয়াকে বিবাহ করিয়াছ?

মবা। যখন স্বদেশে থাকিতাম, তখন করিয়াছিলাম।

জেব। তাই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নেকা করিতে চাহিয়াছিলে?

মবা। আমি অনেক দিন হইল, উহাকে তাল্লাক্ দিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।

জেব। কেন পরিত্যাগ করিয়াছ?

মবা। সে পাগল। অবশ্য তাহা আপনি বুঝিয়া থাকিবেন।

জেব। পাগল বলিয়া ত আমার কখনও বোধ হয় নাই।

মবা। সে আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন্য হুজুরে হাজির হয়। কাজের সময়ে আমিও তাহাকে কখন পাগল দেখি নাই। কিন্তু অন্য সময়ে সে পাগল। আপনি তাহাকে খান্‌খা কোন দিন আনাইয়া দেখিবেন।

জেব। তুমি তাহাকে পাঠাইয়া দিতে পারিবে? বলিও যে, আমার কিছু ভাল সুরমার প্রয়োজন আছে।

মবা। আমি কাল প্রভাতে এখান হইতে দূরদেশে কিছু দিনের জন্য যাইব।

জেব। দূরদেশে যাইবে? কৈ, সে কথা ত আমাকে কিছু বল নাই!

মবা। আজ সে কথা নিবেদন করিব ইচ্ছা ছিল।

জেব। কোথায় যাইবে?

মবা। রাজপুতনায় রূপনগর নামে গড় আছে। সেখানকার রাও সাহেবের কন্যাকে মহিষী করিবার অভিপ্রায় শাহান্‌ শাহের মরজি মবারককে হইয়াছে। কাল তাঁহাকে আনিবার জন্য রূপনগরে ফৌজ যাইবে। আমাকে ফৌজের সঙ্গে যাইতে হইবে।

জেব। সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। কিন্তু আগে আর একটা কথার উত্তর দাও। তুমি গণেশ জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্য গণাইতে গিয়াছিলে?

মবা। গিয়াছিলাম।

জেব। কেন গিয়াছিলে?

মবা। সবাই যায়, এই জন্য গিয়াছিলাম, এ কথা বলিলেই সঙ্গত উত্তর হয়; কিন্তু তা ছাড়া আরও কারণ ছিল। দরিয়া আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

জেব। হুঁ!

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা কিছুকাল পুষ্পরাশি লইয়া ক্রীড়া করিল। তার পর বলিল "তুমি গেলে কেন?"

মবারক ঘটনাটা যথাযথ বিবৃত করিলেন। জেব-উন্নিসা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতিষী কি বলিয়াছিল যে, তুমি শাহজাদী বিবাহ কর, তাহা হইলে তোমার শ্রীবৃদ্ধি হইবে?"

মবা। হিন্দুরা শাহজাদী বলে না। জ্যোতিষী, রাজপুত্রী বলিয়াছিল।

জেব। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নয়?

মবা। নয় কেন?

জেব। তাই কি তুমি সে দিন বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলে?

মবা। আমি কেবল ধর্ম্ম ভাবিয়া সে কথা বলিয়াছিলাম। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি গণনার পূর্ব্বে হইতে এ কথা বলিতেছি।

জেব। কৈ, আমার ত স্মরণ হয় না। তা যাক্-সে সকল কথাতে আর কাজ নাই। তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাতে তুমি গোসা করিও না। তোমার গোসায় আমার বড় দুঃখ হইবে। তুমি আমার প্রাণাধিক,—তোমাকে যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ আমি সুখে থাকি। তুমি পালঙ্কের উপর আসিয়া বসো—আমি তোমাকে আতর মাখাই।

জেব-উন্নিসা তখন মবারককে পালঙ্কের উপর বসাইয়া স্বহস্তে আতর মাখাইতে লাগিল। তার পর বলিল, "এখন সেই রূপনগরের কথাটা বলিব। জানি না, রূপনগরীর পিতা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কি না। ছাড়িয়া না দেয়, তবে কাড়িয়া লইয়া আসিবে।"

মবারক বলিল, "এরূপ আদেশ ত বাদশাহের নিকট আমরা পাই নাই।"

জেব। এ স্থলে আমাকেই না হয় বাদশাহ মনে করিলে? যদি বাদশাহের এরূপ অভিপ্রায় না হইবে, তবে ফৌজ যাইতেছে কেন?

মবা। পথের বিঘ্ননিবারণ জন্য।

জেব। আলমগীর বাদশাহের ফৌজ যে কাজে যাইবে, সে কাজে তাহারা নিষ্ফল হইবে? তোমরা যে প্রকারে পার, রূপনগরীকে লইয়া আসিবে। বাদশাহ যদি তাহাতে নাখোশ হন, তবে আমি আছি।

মবা। আমার পক্ষে সেই হুকুমই যথেষ্ট। তবে, আপনার এরূপ অভিপ্রায় কেন হইতেছে, জানিতে পারিলে আমার বাহুতে আরও বল হয়।

জেব-উন্নিসা বলিল, "সেই কথাটাই আমি বলিতে চাহিতেছিলাম। এই রূপনগরওয়ালীকে আমার কৌশলেই তলব হইয়াছে।"

মবা। মতলব কি?

জেব। মতলব এই যে, উদিপুরীর রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। শুনিলাম, রূপনগরওয়ালী আরও খুবসুরৎ। যদি হয়, তবে উদিপুরীর বদলে সেই বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি, ইহা জানিলে, রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকিবে। তা হ'লেই আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তাহা দূর হইবে। তা, তুমি যাইতেছ, ভালই হইতেছে। যদি দেখ যে, সে উদিপুরী অপেক্ষা সুন্দরী—

মবা। আমি হজরৎ বেগম সাহেবাকে কখনও দেখি নাই।

জেব। দেখ ত দেখাইতে পারি—এই পরদার আড়ালে লুকাইতে হইবে।

মবা। ছি!

জেব-উন্নিসা হাসিয়া উঠিল, বলিল, "দিল্লীতে তোমার মত কয়টা বানর আছে? তা যাক্—আমি তোমায় যা বলি শুন। উদিপুরী না দেখ, আমি তাহার তসবির দেখাইতেছি। কিন্তু রূপনগরীকে দেখিও। যদি তাহাকে উদিপুরীর অপেক্ষা সুন্দরী দেখ, তবে তাহাকে জানাইবে যে, আমারই অনুগ্রহে সে বাদশাহের বেগম হইতেছে। আর যদি দেখ, সেটা দেখিতে তেমন নয়—"

জেব-উন্নিসা একটু ভাবিল। মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "যদি দেখি, দেখিতে ভাল নহে, তবে কি করিব?"

জেব। তুমি বড় বিবাহ ভালবাস; তুমি আপনি বিবাহ করিও। বাদশাহ যাহাকে অনুমতি দেন, তাহা আমি করিব।

মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসাও নাই?

জেব। বাদশাহজাদীদের আবার ভালবাসা!

মবা। আল্লা তবে বাদশাহজাদীদিগকে কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন?

জেব। সুখের জন্য! ভালবাসা দুঃখ মাত্র।

মবারক আর শুনিতে ইচ্ছা করিল না। কথা চাপা দিয়া কহিল, "যিনি বাদশাহের বেগম হইবেন, তাঁহাকে আমি দেখিব কি প্রকারে?"

জেব। কোন কল-কৌশলে।

মবা। শুনিলে বাদশাহ কি বলিবেন?

জেব। সে দায়-দোষ আমার।

মবা। আপনি যা বলিবেন, তাই করিব। কিন্তু এ গরীবকে একটু ভালবাসিতে হইবে।

জেব। বলিলাম না যে, তুমি আমার প্রাণাধিক?

মবা। ভালবাসিয়া বলিয়াছেন কি?

জেব।। বলিয়াছি, ভালবাসা গরীব-দুঃখীর দুঃখ। শাহজাদীরা সে দুঃখ স্বীকার করে না।

মর্ম্মাহত হইয়া মবারক বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড

বিবাহে বিকল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বক ও হংসীর কথা

নির্ম্মল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র, নির্ম্মলের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিয়া বলিল, "এখন উপায় ?"

চঞ্চল। উপায় যাই হউক—আমি মোগলেব দাসী কখনই হইব না।

নির্ম্মল। তোমার অমত, তা ত জানি, কিন্তু আলমগীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে, অন্যথা করেন ? উপায় নাই, সখি'—সুতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়। যোধপুর বল, অম্বর বল; রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, সুবা যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তাহার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না ? পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন ?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্ম্মল দেখিল, ও পথে কিছু হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার যদি করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল, "আমি যেন উঠিয়া গেলাম—কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ ?"

চঞ্চল। ভাবিযাছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাথা থাকিবে না—রূপনগরের গড়েব একখানি পাতর থাকিবে না, তা ভাবিয়াছি—আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি।

নির্ম্মল প্রসন্ন হইল। বলিল, "আমিও সেই পরামর্শই দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবাব ভ্রূভঙ্গী করিলেন—বলিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব ? হংসী কি বকের সেবা করে ?"

নির্ম্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি করিবে ?".

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটি অঙ্গুরীয় নির্ম্মলকে দেখাইল; বলিল, "দিল্লীর পথে বিষ খাইব।" নির্ম্মল জানিত, ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।

নির্ম্মল বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই ?"

চঞ্চল বলিল, "আব উপায় কি সখি ? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমায় উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে ? রাজপুতানার কুলাঙ্গার সকলই মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে না প্রতাপ আছে ?"

নির্ম্মল। কি বল রাজকুমারি ! সংগ্রাম, কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন ? পরের জন্য কেহ সহজে সর্ব্বস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, রাজসিংহ আছে—কিন্তু তোমার জন্য রাজসিংহ সর্ব্বস্ব পণ করিবে কেন ? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরাণা।

চঞ্চল। সে কি ? বাহুতে বল থাকিলে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই ? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্ম্মল। আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম, প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না ?

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উল্টাইলেন—নির্ম্মল দেখিল, সে রাজসিংহের মূর্ত্তি। চিত্র দেখিয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, "দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক ? আমি যদি ইঁহার শরণ লই, ইনি কি রক্ষা করিবেন না ?"

নির্ম্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী—চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্ম্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারি! যে বীর তোমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?"

রাজকুমারী বুঝিলেন। কাতর অথচ অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি দিব সখি! আমার কি আর দিবার আছে? আমি যে অবলা!"

নির্ম্মল। তোমার তুমিই আছে।

চঞ্চল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর হ!"

নির্ম্মল। তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে। তুমি যদি রুক্মিণী হইতে পার, যদুপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন।

চঞ্চলকুমারী মুখাবনত করিল। যেমন সূর্য্যোদয়কালে মেঘমালার উপর আলোর তরঙ্গের পর উজ্জ্বলতর তরঙ্গ আসিয়া পলকে পলকে নূতন সৌন্দর্য্য উন্মেষিত করে, চঞ্চলকুমারীর মুখে তেমনই পলকে পলকে সুখের, লজ্জার, সৌন্দর্য্যের নবনবোন্মেষ হইতে লাগিল। বলিল, "তাঁহাকে পাইব, আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি? আমি বিকাইতে চাহিলে তিনি কি কিনিবেন?"

নির্ম্মল। সে কথার বিচারক তিনি—আমরা নই। রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি, বল আছে; তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না? গোপনে—কেহ না জানিতে পারে, এরূপ দূত কি তাঁহার কাছে যায় না?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাসে? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা করিবে।"

এমন সময়ে সখীজন সংবাদ লইয়া আসিল যে, একজন মতিওয়ালী মতি বেচিতে আসিয়াছে। রাজকুমারী বলিলেন, "এখন আমার মতি কিনিবার সময় নহে। ফিরাইয়া দাও।" পুরবাসিনী বলিল, "আমরা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ফিরিল না। বোধ হইল যেন, তার কি বিশেষ দরকার আছে।" তখন অগত্যা চঞ্চলকুমারী তাহাকে ডাকিলেন।

মতিওয়ালী আসিয়া কতকগুলা ঝুটা মতি দেখাইল। রাজকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই ঝুটা মতি দেখাইবার জন্য তুমি এত জিদ করিতেছিলে?"

মতিওয়ালী বলিল, "না। আমার আরও দেখাইবার জিনিস আছে। কিন্তু তাহা আপনি একটু পুষিদা না হইলে দেখাইতে পারি না।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমি একা তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না; কিন্তু একজন সখী থাকিবে। নির্ম্মল থাক, আর সকলে বাহিরে যাও।"

তখন আর সকলে বাহিরে গেল। দেবী—সে মতিওয়ালী দেবী ভিন্ন আর কেহ নয়—যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা দেখাইল। দেখিয়া, পড়িয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পাঞ্জা তুমি কোথায় পাইলে?"

দেবী। যোধপুরী বেগম আমাকে দিয়াছেন।

চঞ্চল। তুমি তাঁর কে?

দেবী। আমি তাঁর বাঁদী।

চঞ্চল। কেনই বা এ পাঞ্জা লইয়া এখানে আসিয়াছ?

দেবী তখন সকল কথা বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া নির্ম্মল ও চঞ্চল পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন।

চঞ্চল, দেবীকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন।

দেবী যাইবার সময়ে যোধপুরীর পাঞ্জাখানি লইয়া গেল না। ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গেল। মনে করিল, "কোথায় ফেলিয়া দিব,—কে কুড়াইয়া নিবে!" এই ভাবিয়া দেবী চঞ্চলকুমারীর নিকট পাঞ্জা ফেলিয়া গেল। সে গেলে পর চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "নির্ম্মল! উহাকে ডাক; সে পাঞ্জাখানা ফেলিয়া গিয়াছে।"

নির্ম্মল। ফেলিয়া যায় নাই—বোধ হইল যেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গিয়াছে।

চঞ্চল। আমি নিয়া কি করিব?

নিৰ্ম্মল। এখন রাখ, কোন সময়ে না কোন সময়ে যোধপুরীকে ফেরৎ দিতে পারিবে।

চঞ্চল। তা যাই হোক, বেগমের কথায় আমার বড় সাহস বাড়িল। আমরা দুইটি বালিকায় কি পরামর্শ করিতেছিলাম—তা ভাল, কি মন্দ—ঘটিবে কি না ঘটিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এখন সাহস হইয়াছে। রাজসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল।

নিৰ্ম্মল। সে ত অনেক কাল জানি।

এই বলিয়া নিৰ্ম্মল হাসিল। চঞ্চলও মাথা হেঁট করিয়া হাসিল।

নিৰ্ম্মল উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র ভরসা হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অনন্ত মিশ্র

অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্যানির্ব্বিশেষে, চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিতদ্বার। পথিমধ্যে নিৰ্ম্মল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্যবদন সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিৰ্ম্মল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে, কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্ত্তি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী,—আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন?"

চঞ্চল। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহ নাই যে, আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত-বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না—পথখরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আশরফি ভরা। পুরোহিত পাঁচটি আশরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "পথে অন্নই খাইতে হইবে—আশরফি খাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি?"

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কি আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা—পুরস্ত্রী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জাবই বা স্থান কই? লিখিব।"

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে?

চঞ্চল। আপনি বলিয়া দিন।

নিৰ্ম্মল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলি বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্র ঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশপর্য্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছু প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্য্যন্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নিৰ্ম্মল দুই জনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী একটা কৌটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মুক্তাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এই

রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুতকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্র ঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মিশ্র ঠাকুরের নারায়ণস্মরণ

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে?" মিশ্র ঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন; বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাস্বরূপ শীতলবারি-প্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্র ঠাকুর ভৃত্য সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মনে করিলে অনেক লোক সঙ্গে লইতে পারিতেন, কিন্তু অধিক লোক থাকিলে কাণাকাণি হয়, এজন্য লইলেন না।

পথ অতি দুর্গম—বিশেষ পার্ব্বত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আশ্রয়শূন্য। একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সে দিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল—ব্রাহ্মণের নিকট রত্নবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে, তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারি জন বণিক্ ঐ দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কত দূর?" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজ সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুরে পোঁছিতে পারিব। এ সকল স্থান রাণার রাজ্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্ব্বত্য পথ, অতিশয় দুরারোহণীয় এবং দুরবরোহণীয়, সচরাচর বসতিশূন্য। কিন্তু এই দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল—এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্ব্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুই পার্শ্বে অনতি-উচ্চ পর্ব্বতদ্বয়, হরিত-বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেন জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনানীর অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক্ হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্ব্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক্ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঠাঁই টাকা-কড়ি কি আছে?"

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, রত্নবলয় রক্ষার্থ বণিক্দিগকে দিই; আবার ভাবিলেন, ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি? এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বিপৎকালে যে ইতস্ততঃ করে, সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে, অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাঁহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিল—এবং তাঁহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। মিশ্র ঠাকুরের ভৃত্যটি তৎক্ষণাৎ কোন্ দিকে পলায়ন করিল, কেহ দেখিতে পাইল না।

মিশ্র ঠাকুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর একজন, তাঁহার গাঁটরি কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারী-প্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র, এবং আশরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর একজন দস্যু বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজকাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য—তাঁহার শাসনে বীরপুরুষে আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এই গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্র ঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া, পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদত্ত রত্নবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা, অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না, পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্ব্বতীয়া প্রবাহিণীর তটবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্য-সমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছু দূর গিয়া, এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার ভিতর খাদ্যদ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি, কলসীপূর্ণ জল পর্য্যন্ত ছিল। দস্যুগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল এবং একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।"

মাণিকলাল বলিল, "মালের কথাই আগে হউক।"

তখন আশরফি কয়টি কাটিয়া চারিভাগ করিল। এক একজন এক এক ভাগ লইল। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না—তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, "কাগজে আর কি হইবে—উহা পোড়াইয়া ফেল।" এই বলিয়া পত্র দুইখানি সে মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্র দুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয় আনন্দিত হইল। বলিল, "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি? কি?" বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চল-কুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চোরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ, এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্ব্বোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা এ পত্র কোথায় পাইলে, তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে—এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব—বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায়, আমি জানি। আর ইহাতে—"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইল না। কথা মুখে থাকিতে থাকিতে তাহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মাণিকলাল

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিল, চারি জনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পোঁছে নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত

ব্লাইয়া বলিল, "বিজয়! এখানে থাকিও- আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্র ঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারি জনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না, পথের আলাপ; তাহারা বলে 'আমরা বণিক্।' এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "একগাছি মুক্তার বালা, কয়টি আশরফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন্ দিকে গেল, আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারি জন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিল, "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে, অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, চারি জনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না; নয় ঐ পর্ব্বততলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটি গুহা আছে; গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারি জন—তিনি একা; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না? যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারি জনে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই একজন অবশ্য মরিবে; যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়? তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, উহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কোষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধারণ করিলেন; বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল, সেই সময়ে রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত অন্য দুই জনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন, সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে, রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন, দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া মাণিকলালের চুল ধরিলেন, এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবনদান করুন—রক্ষা করুন—আমি শরণাগত!"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে; আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মরিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখনও দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, "মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?"

দস্যু বলিল, "এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।"

রাজসিংহ বলিলেন, "মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে—তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।"

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি এবং আশরফি চারি ভাগ আনিয়া দিল। বলিল, "ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন, "মাণিকলাল—পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস—তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে, দস্যু একবারও তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না—বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণা তটিনীতীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : চঞ্চলকুমারীর পত্র

তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে সুমন্দ মধুর বায়ু, এবং স্বরলহরী-বিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমগণধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্য কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্ব্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে! তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। এইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তার পর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ;—

"রাজন্—আপনি রাজপুত-কুলের চূড়া—হিন্দুর শিরোভূষণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা—নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস মার্জ্জনা করিবেন।

"যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন—আমি রাজপুতকন্যা। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য—তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাজপুত—রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্যা না হই—রাজপুতকন্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না, আপনি রাজপুতপতি—রাজপুতকুলতিলক।

"অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ্ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে, দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুতকন্যা, ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা—কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশাইব? রাজকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্ব্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

"মহারাজাধিরাজ! আমাকে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে, আমি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কন্যা—যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না—কলঙ্ক মনে করা দূরে থাক, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের কাছে কোন্ ছার? আমার এ অহঙ্কার কেন, এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ! সূর্য্যদেব অস্ত গেলে খদ্যোত কি জ্বলে না? শিশিরভরে নলিনী মুদ্রিত হইলে, ক্ষুদ্র কুন্দকুসুম কি বিকশিত হয় না? যোধপুর, অম্বর কুলধ্বংস করিলে রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না? মহারাজ, ভাটমুখে শুনিয়াছি যে, বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজ মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই; বলিয়াছিলেন, "যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে, তাহার সহিত ভোজন করিব না।" সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে, এই সম্বন্ধ রাজপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোক পরলোকে ঘৃণাস্পদ? মহারাজ! আজিও আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে

পারিল না কেন? আপনারা বীর্য্যবান্ মহাবলপরাক্রান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহাবলপরাক্রান্ত রুমের বাদশাহ কিংবা পারস্যের শাহ দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে উদয়পুরেশ্বর কেবল তাহাকে কন্যাদান করেন না কেন? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজপুত। মহারাজ! প্রাণত্যাগ করিব, তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

"প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসর্জ্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে? আমার পিতার ত কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে, আলমগীরের সঙ্গে বিবাদ করেন? আর যত রাজপুত রাজা ছোট হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য—সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি—রাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন—কেবল উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই যে,—এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে—আমি আপনার শরণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না?

"কত বড় গুরুতর কার্য্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমত নহে। আমি কেবল বালিকাবুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি, এমত নহে। দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে, তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় পরাজিত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন—আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা হীনবল? শুনিয়াছি না কি, মহারাষ্ট্রে এক পার্ব্বতীয় দস্যু আলমগীরকে পরাভূত করিয়াছে—সে আলমগীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য?

"আপনি বলিতে পারেন, 'আমার বাহুতে বল আছে—কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য কেন এত কষ্ট করিব? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্য প্রাণিহত্যা করিব?—ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব?' মহারাজ! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম্ম নহে? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম্ম নহে?"

এই পর্য্যন্ত পত্রখানি রাজকন্যার হাতের লেখা। বাকি যেটুকু, সেটুকু তাঁহার হাতের নহে। নির্ম্মলকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল; রাজকন্যা তাহা জানিতেন কি না, আমরা বলিতে পারি না। সে কথা এই—

"মহারাজ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগলহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাণ্ডব দ্রৌপদীলাভ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলীসমক্ষে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ভীষ্মদেব রাজকন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্! রুক্মিণীর বিবাহ মনে পড়ে না? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীর—আপনি কি বীরধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন?

"তবে, আমি যে আপনার মহিষী হইবার কামনা করি, ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা বটে। যদি আমি আপনার গ্রহণযোগ্যা না হই, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অন্যবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিবারও কি ভরসা করিতে পারি না? অন্ততঃ যাহাতে সেরূপ অনুগ্রহও আমার অপ্রাপ্য না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া গুরুদেবহস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন—তার পর, আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব।"

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন, পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, "মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে?"

মাণিক। যাহারা জানিত, মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ মাতাজীকি জয়!

রাণা অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশ্বারোহীর যোদ্ধৃবেশ এবং তীব্র দৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন—কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন চঞ্চলকুমারীর আশা ভরসা হারাইয়াছেন--আর কি বলিয়া তাঁহার কাছে মুখ দেখাইবেন? ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, পর্ব্বতের উপরে দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন, মনে করিলেন, আবার নূতন দস্যুসম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল নাকি? সে বার—নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্যুরা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল এবার যদি ইহারা তাহাকে ধরে, তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিবেন? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তিরা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণের যে কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল—ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্ব্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্ব্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল—দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন "ধর্ ধর্" করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—ব্রাহ্মণও ছুটিলেন—অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি "নারায়ণ নারায়ণ" স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইলেন। যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে শেষে আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তাহারা অপর কেহই নহে—মহারাণার ভৃত্যবর্গ। মহারাণার সহিত এ স্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে। রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ। অদ্য মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ সর্ব্বদা প্রহরিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। কখন কখন অনুচরবর্গকে দূরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ করিতেন।

অদ্য মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি অনুচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে। রাজা দস্যুকৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মস্ব উদ্ধারের জন্য ছুটিয়াছিলেন। যাহা দুঃসাধ্য এবং বিপৎপূর্ণ, তাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এ দিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতরণকালে দেখিল, রাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহারা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল। আশঙ্কা করিল যে, রাণার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নিম্নে শিলাখণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাহারা নামিতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরজী নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী। এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

এ দিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহিগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশ ব্যাপ্ত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, তিন লম্ফে অবতরণ করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র

রুধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে, একটা কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, "এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল; সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছিলে?"

যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা বলিল, "মহারাজ, সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।"

রাণা। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভৃত্যগণ তখন সবিশেষ কথা বুঝিয়া নিবেদন করিল যে, "আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।"

অশ্বারোহিগণ মধ্যে রাণার পুত্রদ্বয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আর সকলকে বলিলেন, "প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে; তোমাদিগের সকলের ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। এই পার্ব্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে, আমার সঙ্গে আইস—আমি, এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদযপুরে ফিরিয়া যাও।"

এই বলিয়া রাণা পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি "জয় মহারাণাকি জয়! জয় মাতাজীকি জয়!" বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে উঠিয়া "হর! হর!" শব্দে, রূপনগরের পথে ধাবিত হইল। অশ্বক্ষুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : নিরাশা

এদিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই রূপনগরে মহাধুম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্ম্মলের মুখ শুকাইল; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখি?"

চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে?"

নির্ম্মল। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ত ঠাকুরজী উদয়পুর গিয়াছেন--এখনও তাঁর পোঁছিবার বিলম্ব আছে। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে--কি হইবে সখি?

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ—সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ করিব—যদি মোগলসেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, "আমি জন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যসখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমত সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাত দিন মোগলসেনা এইখানে অবস্থিতি করুক। আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন। বলিলেন, "দেখি, সেনাপতিকে অনুরোধ করিব, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না, বলিতে পারি না।"

রাজা অঙ্গীকার মত মোগলসেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই—বলিয়া দেন নাই যে, এত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না; ভবিষ্যৎ বেগমের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও পারিলেন না। আর পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

এদিকে উদয়পুর হইতে কোন সংবাদ আসিল না—মিশ্র ঠাকুর ফিরিলেন না। তখন চঞ্চলকুমারী ঊর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব ' অবলাকে বধ করিও না।"

রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুই জনে দুই জনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্ম্মল বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব।' কয় দিন ধরিয়া সে এই কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।" নির্ম্মল বলিল, "আমিও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই কি আমি বাঁচিব?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না—আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?" নির্ম্মল বলিল, "তুমি আমাকে লইয়া যাও বা না যাও আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব—কেহ রাখিতে পারিবে না।"

দুই জনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : মেহেরজান

যে কয় দিন, মোগল সৈনিকেরা রূপনগরে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন, সে কয় দিন বড় আমোদ প্রমোদে কাটিল। মোগল সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর দল ছুটিত, যখন যুদ্ধ না হইত, তখন তাম্বুর ভিতর নাচ-গানের ধূম পড়িত। সৈনিকদিগের রূপনগরে আসা কেবল আনন্দ করিতে আসা। সুতরাং রাত্রিতে তাম্বুতে নৃত্য-গীতের বড় ধূম।

নর্ত্তকীদিগের মধ্যে সহসা একজনের নাম অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিল, দিল্লীতে কেহ কখন মেহেরজানের নাম শুনে নাই—কিন্তু যাহাদের নাম প্রসিদ্ধ, তাহারাও রূপনগরে আসিয়া মেহেরজানের তুল্য যশস্বিনী হইতে পারিল না। মেহেরজান আবার নর্ত্তকী হইয়াও সচ্চরিত্রা, এজন্য সে আরও যশস্বিনী হইল।

মোগল সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলি তাহার সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু মেহেরজান প্রথমে স্বীকৃত হইল না। বলিল 'আমি অনেক লোকের সাক্ষাতে নৃত্যগীত করিতে পারি না।" সৈয়দ হাসান আলি স্বীকার করিলেন যে, বন্ধুবর্গ কেহ উপস্থিত থাকিবে না। নর্ত্তকী আসিয়া তাঁহাকে নৃত্যগীত শুনাইল। তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া নর্ত্তকীকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কিন্তু নর্ত্তকী তাহা লইল না। বলিল, "আমি অর্থ চাহি না। যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি যে পুরস্কার চাই, তাহাই দিবেন। নহিলে কোন পুরস্কার চাহি না।"

সৈয়দ হাসান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও?"

মেহেরজান বলিল, "আমি আপনার অশ্বারোহিসৈন্যভুক্ত হইবার ইচ্ছা করি।"

হাসান আলি অবাক্—হতবুদ্ধি হইয়া মেহেরজানের সুন্দর সুহাস্য মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মেহেরজান তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, "আমি ঘোড়া, হাতিয়ার, পোষাকের দাম দিব।"

হাসান আলি বলিল, 'স্ত্রীলোক অশ্বারোহী সৈনিক?"

মেহেরজান বলিল, "ক্ষতি কি? যুদ্ধ ত হইবে না। যুদ্ধ হইলেও পলাইব না।"

হাসান আলি। লোকে কি বলিবে?

মেহেরজান। আপনি আর আমি জানিলাম, আর কেহ জানিবে না।

হাসান আলি। তুমি এ কামনা কেন কর?

মেহেরজান। যে জন্যই হৌক—বাদশাহের ইহাতে ক্ষতি নাই।

হাসান আলি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু মেহেরজানও কিছুতেই ছাড়িল না। শেষে হাসান আলি স্বীকৃত হইল। মেহেরজানের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

মেহেরজান, সেই দরিয়া বিবি।

নবম পরিচ্ছেদ : প্রভুভক্তি

এই সময়ে, একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল। মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমে আবার সেই পর্ব্বতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দস্যুতা করিবে, এমন বাসনা ছিল না; কিন্তু পূর্ব্ববন্ধুগণ মরিল, কি বাঁচিল, তাহা দেখিবে না কেন? যদি কেহ

একেবারে না মরিয়া থাকে, তবে তাহার শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহাপ্রবেশ করিল।

দেখিল, দুই জন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাভ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষণ্ণচিত্তে বন হইতে এক রাশি কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিল—তদ্দ্বারা দুইটি চিতা রচনা করিয়া, দুইটি মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া অগ্ন্যুৎপাদনপূর্ব্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপে সঙ্গীদিগের অন্তিম কার্য্য করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত মিশ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই। দেখিল, স্বচ্ছসলিলা পার্ব্বত্য নদীর জল একটু সমল হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাখা, লতা, গুল্ম, তৃণাদি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্নে মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয়, অনেক লোক আসিয়াছিল। তার পর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকগুলি অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ অশ্বের ক্ষুরে যেখানে লতা-গুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, সেখানে অর্দ্ধগোলাকৃত চিহ্নসকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল যে, এখানে অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল, অশ্বারোহিগণ কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে—কোন্ দিকে গিয়াছে। দেখিল, কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে—কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতক দূর মাত্র দক্ষিণে গিয়া চিহ্নসকল আবার উত্তরমুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল, অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্য্যন্ত আসিয়া, আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ দুই তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে, কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইল। তখন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যা ক্রোড়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসীর ননদের জায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সৌজন্যবশতঃই হউক, আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত।

মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল। ডাকিল, "পিসী গা?"

পিসী বলিল, "কি বাছা মাণিকলাল! কি মনে করিয়া?"

মাণিকলাল বলিল, "আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার পিসী?"

পিসী। কতক্ষণের জন্য?

মাণিক। এই দুমাস ছমাসের জন্য?

পিসী। সে কি বাছা! আমি গরীব মানুষ—মেয়েকে খাওয়াব কোথা হইতে?

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব? তুমি কি নাতনীকে দুমাস খাওয়াতে পার না?

পিসী। সে কি কথা? দুমাস একটা মেয়ে পুষিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি সে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে দুমাস রাখ। আমি উদয়পুরে যাইব—সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি।

এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদত্ত আশরফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল; এবং কন্যাকে তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যা! তোর দিদির কোলে গিয়ে বস্।"

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে, এক মোহরে ঐ শিশুর এক বৎসর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে—মাণিকলাল কেবল দুই মাসের করার করিতেছে; অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তার পর, মাণিক রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে—চাহি কি, বড়মানুষ হইতে পারে, তা হইলে কি পিসীকে কখন কিছু দিবে না? মানুষটা হাতে থাকা ভাল।

পিসী তখন মোহরটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তার আশ্চর্য্য কি বাছা—তোমার মেয়ে মানুষ করিব, সে কি বড় ভারি কাজ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আয় রে জান্ আয়!" বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্তচিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল এইরূপ বিচার করিতেছিল,—"ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন? ঐখানে রাণাও একাকী ভ্রমিতেছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এত দূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী। তার পর দেখা গেল, উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে—উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল—বোধ হয়, রাণা মৃগয়া বা বনবিহারে গিয়া থাকিবেন—উদয়পুরে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহারা উদয়পুরে যায় নাই। উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে কেন? উত্তরে ত রূপনগর বটে। বোধ হয়, চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজপুতপতি নাম মিথ্যা। আমি তাঁহার ভৃত্য—আমি তাঁহার কাছে যাইব—কিন্তু তাঁহারা অশ্বারোহণে গিয়াছেন—আমার পদব্রজে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরসা, পার্ব্বত্য পথে অশ্ব তত দ্রুত যায় না এবং মাণিকলাল পদব্রজে বড় দ্রুতগামী।" মাণিকলাল দিবারাত্র পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে সে রূপনগরে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল যে, রূপনগরে দুই সহস্র মোগল অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে, কিন্তু রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল, পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্র সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না। মনে মনে বলিল, মোগল পারিবে না—কিন্তু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।

একজন নাগরিককে মাণিক বলিল, "আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার? আমি কিছু বখ্‌শিশ দিব।" নাগরিক সম্মত হইয়া, কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিল। পরে দিল্লীর পথে, চারি দিক্ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশ্বারোহিগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছু দূর পর্য্যন্ত মাণিকলাল রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে এক স্থানে দেখিল, পথ অতি সংকীর্ণ হইয়া আসিল। দুই পার্শ্বে দুইটি পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে—মধ্যে কেবল সংকীর্ণ পথ। দক্ষিণ দিকের পর্ব্বত অতি উচ্চ—এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বাম দিকে পর্ব্বত, অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা, এবং পর্ব্বতও অনুচ্চ। এক স্থানে ঐ বাম দিকে একটি রন্ধ্র বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া একটু সূক্ষ্ম পথ আছে।

নাপোলিয়ন্ প্রভৃতি অনেক দস্যু সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্যু বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে—সুতরাং আমরা তাহাকে দস্যু বলিতে বাধ্য। কিন্তু রাজ-দস্যুদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দস্যুরও সেনাপতির চক্ষু ছিল। পর্ব্বতনিরুদ্ধ সংকীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন, তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগল সৈন্য এই সংকীর্ণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্ব্বতশিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বজ্রের ন্যায় তাহাদিগের মস্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণ দিকের পর্ব্বত দুরারোহণীয়; অশ্বারোহিগণের আরোহণ ও অবতরণের অনুপযুক্ত, অতএব সেখানে রাজপুতসেনা থাকিবে না—কিন্তু বামের পর্ব্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ। মাণিকলাল তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে করিল খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চিনে না; আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয় হউক।"

এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র চারি পাঁচ জন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল এবং তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

একজন বলিল, "মারিও না।" মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণা।

রাণা বলিলেন, "মারিও না। এ আমাদিগের স্বজন।" যোদ্ধৃগণ তখনই আবার লুক্কায়িত হইল।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভৃত স্থলে তাহাকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং সেইখানে বসিলেন। রাজা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

মাণিকলাল বলিল, "প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কার্য্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা দুই সহস্র—মহারাজের সঙ্গে এক শত। আমি কিপ্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন—একদিনেই কি তাহা ভুলিব?"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছি, তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

মাণিকলাল তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। শুনিয়া রাণা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ—আমি তোমার মত সুচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি—পারিবে?"

মাণিকলাল বলিল, "মনুষ্যের যাহা সাধ্য, তাহা করিব।"

রাণা বলিলেন, "আমরা এক শত যোদ্ধা মাত্র; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার—আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া, পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন। তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই আজ্ঞা করুন।"

রাণা বলিলেন, "তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগলসেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এবং যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা করিতে হইবে।" রাণা তাহাকে সবিস্তার উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিল, "মহারাজের জয় হউক! আমি কার্য্য সিদ্ধ করিব। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটি ঘোড়া বখ্‌শিশ করুন।"

রাণা। আমরা এক শত যোদ্ধা, এক শত ঘোড়া। আর ঘোড়া নাই যে, তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না, আমার ঘোড়া লইতে পার।

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথা পাইব? যাহা আছে, তাহাতে আমাদের কুলায় না। কাহাকে নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। আমি কিছুই দিব না।

মাণিক। মহারাজ! তবে অনুমতি দিউন, আমি যে প্রকারে হউক, এ সকল সংগ্রহ করিয়া লই।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "চুরি করিবে?"

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। বলিল, "আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কার্য্য করিব না।"

রাণা। তবে কি করিবে?

মাণিক। ঠকাইয়া লইব।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধকালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি—চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও।"

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ রসিকা পানওয়ালী

মাণিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিকলাল দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়! দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে—নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুল করিতেছে—পুষ্প, পুষ্পমালা থরে থরে নয়ন রঞ্জিত, এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য—অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া, তাম্বূলান্বেষণে গেল।

দেখিল, একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। দেখিল, দোকানে বহুসংখ্যক দীপ বিচিত্র ফানুষমধ্য হইতে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজ মোড়া—নানা প্রকার বাহারের ছবি লট্‌কান--তবে চিত্রগুলি একটু বেশী মাত্রায় রঙ্গদার, আধুনিক ভাষায় "Obscene" প্রাচীন ভাষায় "আদিবসাশ্রিত।" মধ্যস্থানে কোমল গালিচায় বসিয়া—দোকানের অধিকারিণী, তাম্বূলবিক্রেয়ী—বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ গৌর, চক্ষু বড় বড়, চাহনি বড় চঞ্চল, হাসি বড় রঙ্গদার—সে হাসি অনিন্দ্য দন্তশ্রেণীমধ্যে সর্ব্বদাই খেলিতেছে--হাসির সঙ্গে সর্ব্বালঙ্কার দুলিতেছে -অলঙ্কার কতক রূপা, কতক সোণা—কিন্তু সুগঠন ও সুশোভন। মাণিকলাল, দেখিয়া শুনিয়া, পান চাহিল।

পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না—সম্মুখে একজন দাসীতে পান সাজিতেছে ও বেচিতেছে --পানওয়ালী কেবল পয়সা কুড়াইতেছে--এবং মিষ্ট হাসিতেছে।

দাসী একজন পান সাজিয়া দিল; মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর রূপের প্রশংসা করিলে পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এজন্য প্রথমে তাহার দোকানসজ্জা ও অলঙ্কারগুলির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালীও একটু ভিজিল। পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল তখন দোকানে উঠিয়া বসিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হুকা কাড়িয়া লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে মাণিকলাল পান খাইয়া দোকানের মসলা ফুরাইয়া দিল। দাসী মসলা আনিতে অন্য দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল পানওয়ালীকে বলিল, "মহারাজিয়া! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলাম; আমার একটি দুশমন আছে—তাহাকে একটু জব্দ করিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তবে এক আশরফি পুরস্কার করিব।"

পান। কি করিতে হইবে?

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়া--তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল, "আশরফির প্রয়োজন নাই—রঙ্গই আমার পুরস্কার!"

মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল। দাসী তাহা নিকটস্থ বেনিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পত্র লিখিল, "হে প্রাণনাথ! তুমি যখন নগরভ্রমণে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি, তোমরা কাল চলিয়া যাইবে—অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুরি দিব। যে পত্র লইয়া যাইতেছে—তাহার সঙ্গে আসিও—সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।"

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, "মহম্মদ খাঁ।"

পানওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও ব্যক্তি?"

মা। একজন মোগল সওয়ার।

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনকেও চিনিত না। কাহারও নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, দুই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য একজন মহম্মদ আছেই আছে—আর সকল

মোগলই "খাঁ।" অতএব সাহস করিয়া "মহম্মদ খাঁ" লিখিল; লেখা হইলে মাণিকলাল বলিল, "তাহাকে এইখানে আনিব?"

পানওয়ালী বলিল, "এ ঘরে হইবে না। আর একটা ঘর ভাড়া লইতে হইবে।"

তখনই দুই জনে বাজারে গিয়া আর একটা ঘর লইল। পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনাজন্য তাহা সজ্জিতকরণে প্রস্তুত হইল—মাণিকলাল পত্র লইয়া মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইল। শিবিরমধ্যে মহাগোলযোগ--কোন শৃঙ্খলা নাই—নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে। রঙ্গ তামাসা রোশনাইয়ের ধুম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, "মহম্মদ খাঁ কে মহাশয়? তাঁহার নামে পত্র আছে।" কেহ উত্তর দেয় না—কেহ গালি দেয়;—কেহ বলে, "চিনি না"—কেহ বলে, "খুঁজিয়া লও।" শেষ একজন মোগল বলিল, "মহম্মদ খাঁকে চিনি না। কিন্তু আমার নাম নূর মহম্মদ খাঁ। পত্র দেখি, দেখিলে বুঝিতে পারিব, পত্র আমার কি না।"

মাণিকলাল সানন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল--মনে জানে, মোগল যেই হউক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল—পত্র যারই হউক, আমি কেন এই সুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ, পত্র আমারই বটে। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" এই বলিয়া মোগল তাম্বুমধ্যে প্রবেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া গন্ধদ্রব্য মাখিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ভৃত্য, সে স্থান কত দূর?"

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর, অনেক দূর! ঘোড়ায় গেলে ভাল হইত।"

"বহুত আচ্ছা" বলিয়া খাঁ সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমন সময় মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, 'হুজুর! বড় ঘরের কথা—হাতিয়ারবন্দ হইয়া গেলেই ভাল হয়।"

নূতন নাগর ভাবিলেন, সে ভাল কথা—জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব? তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, "এই স্থানে উতারিতে হইবে। আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন।"

খাঁ সাহেব নামিলেন—মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। খাঁ বাহাদুর সশস্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে, হাতিয়ারবন্দ হইয়া রমণীসম্ভাষণে যাওয়া বড় ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অস্ত্রগুলি রাখিয়া গেলেন। মাণিকলালের আরও সুবিধা হইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ সাহেব দেখিলেন যে, তক্তাপোশের উপর উত্তম শয্যা; তাহার উপর সুন্দরী বসিয়া আছে—আতর গোলাবের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে, চারি দিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে, এবং সম্মুখে আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু প্রস্তুত আছে। খাঁ সাহেব, জুতা খুলিয়া, তক্তাপোশে বসিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাষণ করিলেন—পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া, ফুলের পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং আলবোলার নল মুখে পুরিয়া সুখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন। বিবিও তাঁহাকে দুই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল।

তামাকু ধরিতে না ধরিতে মাণিকলাল আসিয়া দ্বারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, "কে ও?"

মাণিক বিকৃতস্বরে বলিল, "আমি।"

তখন চতুরা রমণী অতি ভীতকণ্ঠে খাঁ সাহেবকে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আমার স্বামী আসিয়াছেন—মনে করিয়াছিলাম, তিনি আজ আর আসিবেন না। তুমি এই তক্তাপোশের নীচে একবার লুকাও। আমি উঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।'

মোগল বলিল, "সে কি? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব; যে হয় আসুক না; এখনই কোতল করিব।"

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, 'সে কি? সর্ব্বনাশ! আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার অন্নবস্ত্রের পথ বন্ধ করিবে? এই তোমাকে ভালবাসার ফল? শীঘ্র তক্তাপোষের নীচে যাও। আমি এখনই উঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

এদিকে মাণিকলাল পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল, অগত্যা খাঁ সাহেব তক্তাপোশের

নীচে গেলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল—কি করে—প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়। সে স্থূল মাংসপিন্ড তক্তাপোশতলে বিন্যস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্ব্বশিক্ষামত বলিল, "তুমি আবার এলে যে? আজ আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে?"

মাণিকলাল পূর্ব্বমত বিকৃতস্বরে বলিল, "চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি।"

পানওয়ালী চাবি খোঁজার ছল করিয়া, খাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটি হস্তে লইল। পোষাক লইয়া দুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া, শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। খাঁ সাহেব তখন তক্তাপোশের নীচে মূষিকদিগের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

তাঁহাকে গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুসলমানশিবিরে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

চতুর্থ খণ্ড

রন্ধ্রে যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : চঞ্চলের বিদায়

প্রভাতে মোগল সৈন্য সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহদ্বার হইতে, উষ্ণীষ-কবচ-শোভিত, গুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত, অস্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহিদল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহীর এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে; ভ্রমরশ্রেণীসমাকুল ফুল্লকমলতুল্য তাহাদের বদনমণ্ডল সকল শোভিতেছিল। তাহাদের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে সুন্দর, বল্গাবোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল, অশ্বশ্রেণী শরীরভরে হেলিতেছে, দুলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিবার উপক্রম করিতেছে।

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল, চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রুজল চক্ষুঃমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, "রত্নালঙ্কার পরাই সখি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।" চঞ্চল বলিল, 'পরাও! পরাও! নির্ম্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি, রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্য্যের মত কোন্ রাজ্য? রাজত্ব কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায়? পরা।" নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল, সে কুসুমিততরুবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চল তার পর বলিল "নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না! কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করিলেন! দেখ, ক্ষুদ্র কাঁটার গাছ যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে, আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না!"

নির্ম্মল বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না, তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।"

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব।

নির্ম্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে।

চঞ্চল। সে কি নির্ম্মল? কি প্রকারে তুমি যাইবে?

নির্ম্মল কিছু বলিল না। চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চলকুমারী বেশভূষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্যব্রত শিবপূজা ভক্তিভাবে করিলেন। পূজান্তে বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব! মরিতে চলিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বালিকার মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন? প্রভু? আমি বাঁচিলে কি তোমার সৃষ্টি চলিত না? যদি এতই মনে ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে?"

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল! পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল! পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল! তার পর একে একে সখীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গণ্ডগোল করিল। চঞ্চল কাহাকে অলঙ্কার, কাহাকে খেলনা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না—আমি আবার আসিব।" কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না—দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি।" কাহাকেও বলিলেন, "কাঁদিও না—"কাঁদিও না—কাঁদিলে যদি দুঃখ যাইত, তবে আমি কাঁদিয়া রূপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।"

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, চঞ্চলকুমারী দোলারোহণে চলিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দোলার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে· এক সহস্র পশ্চাতে। রজতমণ্ডিত, রত্নখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র সুবর্ণ-খচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে; আসাসোঁটা লইয়া চোপদার বাগ্‌জালে গ্রাম্য দর্শকবর্গকে আনন্দিত করিতেছে। চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলে, দুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল; কুসুম ও লাজাবলীতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; সেনাপতি

চলিবার আজ্ঞা দিলেন; তখন অকস্মাৎ মুক্তপথ তড়াগের জলের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল। বল্গা দংশিত করিয়া, নাচিতে নাচিতে অশ্বশ্রেণী চলিল—অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের ঝঞ্চনা বাজিল।

অশ্বারোহিগণ প্রভাতবায়ুপ্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার পশ্চাতেই যে অশ্বারোহিগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী একজন গায়িতেছিল—

"শরম্ ভরম্‌সে পিয়ারী,
সোমরত বংশীধারী,
  ঝুরত লোচনসে বারি!
ন সমুঝে গোপকুমারী,
যোহিন্ বৈঠত মুরারি,
  বিহারত রাহ তুমারি॥"

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! যদি সওয়ারের গীত সত্য হইত!" রাজকুমারী তখন রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, আঙ্গুল-কাটা মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে এই গীত গায়িতেছিল। মাণিকলাল, যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নির্ম্মলকুমারীর অগাধ জলে ঝাঁপ

এদিকে নির্ম্মলকুমারীর বড় গোলমাল বাধিল। চঞ্চল ত রত্নখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেল—আগে পিছে দুই সহস্র কুমারপ্রতিম অশ্বারোহী আল্লার মহিমার শব্দে রূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্তু নির্ম্মলের কান্না ত থামে না। একা—একা—একা—শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা। নির্ম্মল উচ্চ গৃহচূড়ার উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল—দেখিতে লাগিল, পাদক্রোশ-পরিমিত অজগর সর্পের ন্যায় সেই অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী পার্ব্বত্য পথে বিসর্পিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে—প্রভাতসূর্য্যকিরণে তাহাদিগের ঊর্দ্ধোত্থিত উজ্জ্বল বর্শাফলক সকল জ্বলিতেছে। কতক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া, ছাদের উপর হইতে নামিল। নির্ম্মল একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে অলঙ্কার সকল খুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থমধ্যে কতিপয় মুদ্রা নির্ম্মল গোপনে সংগ্রহ করিল। কেবল তাহাই লইয়া নির্ম্মল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। পরে দৃঢ়পদে অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রণপণ্ডিত মবারক

বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অশ্বারোহী সেনা পার্ব্বত্য পথে চলিল। যে রন্ধ্রপথের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশমান মহোরগের ন্যায় সেই অশ্বারোহি-শ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। অশ্বসকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি পর্ব্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের মৃদু শব্দ একত্র সমুত্থিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হ্রেষারব—আর সৈনিকের ডাক-হাঁক। পর্ব্বততলে যে সকল লতা-গুল্ম ছিল—শব্দাঘাতে তাহার পাতা সকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্য পশু পক্ষী কীট যাহারা সে বিজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে দ্রুত পলায়ন করিল। এইরূপে সমুদয় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম্ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল,

পর্ব্বতশিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ব্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে, আর একজন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি, তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে, আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল—এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে দশ, পঁচিশ—তখনই একেবারে শত শত ছোট বড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল—বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত, কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সংকীর্ণ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্ব সকল আরোহী লইয়া পলায়নের জন্য বেগবান্ হইল—কিন্তু অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ—অশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল—সৈনিকেরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল—শৃংখলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈন্যমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

"কাহার লোগ্ হুসিয়ার! বাঁ রাস্তা!" মাণিকলাল হাঁকিল। যেখানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত—অশ্ব সকল পাছু হটিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পার্ব্বত্য পথের বাম দিক্ দিয়া একটি অতি সংকীর্ণ রন্ধ্রপথ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একেবারে একটিমাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পেঁৗছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা লইয়া সে পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ সৈনিকেরা দেখিল যে, প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ; তখন আর একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে, শব্দে পার্ব্বত্য প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে, আসিয়া সেই রন্ধ্রমুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসান আলি খাঁ মনসবদার, তখন সৈন্যের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথমুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সংকীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। পরে সমুদয় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্ব্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহা গোলযোগ করিয়া পিছু হটিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে না। তখন সৈনিকগণকে ভৎর্সনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন—এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রগামী হইয়া ব্যাপার কি, দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ পর্ব্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তর অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহির করিয়া, পঞ্চাশ জন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপরের চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া, আপন আপন সম্মুখে একটি ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিম্নস্থ অশ্বারোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবার পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলেও দুরারোহণীয় পর্ব্বতশিখরস্থ শত্রুগণের প্রতি কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে —অতএব মোগলেরা পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়নপূর্ব্বক রন্ধ্রমুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

পঞ্চাশ জন রাজপুত দক্ষিণ পার্শ্বের উচ্চ পর্ব্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল—আর পঞ্চাশ জন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বাম দিকের অনুচ্চ পর্ব্বতশিখরে লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল।

যেখানে শিলাবর্ষ্টিনিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি, সেখানে মবারক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যগণকে সশৃঙ্খলের সহিত পার্ব্বত্য পথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, ক্ষুদ্রতর রন্ধ্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজনমাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল, অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সে পথ বন্ধ করিল—তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপার আর কিছুই নহে—কোন দুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উদ্যম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন—"প্রাণ যায়, সেও স্বীকার! শত সওয়ার দোলার পিছু পিছু যাও। ঘোড়া ছাড়িয়া পাঁওদলে, এই পাথর টপকাইয়া যাও—চল, আমি যাইতেছি।" মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত সওয়ার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্ব্বতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্র পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রন্ধ্রপথমধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া বজ্রের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া, তাহাদের নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অশ্ব সহিত মোগল সওয়ারগণের উপর পড়িল—নীচে যাহারা ছিল, তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশ জন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল সওয়ারের বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়া, সেই শৃঙ্খলাশূন্য মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল, কেহ তাহা দেখিতে পাইল না।

যে মুখে মোগলেরা সেই পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, মাণিকলাল সেই পথে নির্গত হইল। যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল, সে পলাইতেছে। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া, তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনরুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আজ্ঞা দিলেন, "এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপর উঠ। দস্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।" তখন পাঁচ শত মোগলসেনা, "দীন্! দীন্!" শব্দ করিয়া অশ্ব সহিত বাম দিকের সেই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা ছোট তোপ—সেটাকে মোগলেরা টানিয়া, শিকলে বাঁধিয়া, হাতী লাগাইয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্ব্বত্য রন্ধ্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জয়শীলা চঞ্চলকুমারী

তখন "দীন্! দীন্!" শব্দে পঞ্চশত মোগল অশ্বারোহী কালান্তক যমের ন্যায় পর্ব্বতে আরোহণ করিল। পর্ব্বত অনুচ্চ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—শিখরদেশে উঠিতে তাহাদের বড় কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্ব্বতোপরি নাই। যে রন্ধ্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এখন মবারক বুঝিলেন যে, সমুদয় দস্যু—মবারকের বিবেচনায় তাহারা রাজপুত দস্যু ভিন্ন আর কিছুই নহে—সেই রন্ধ্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া, তাহাদিগের বিনাশ-সাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। হাসান আলি অপর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই ভাবিয়া, তিনি সেই রন্ধ্রের ধারে ধারে সৈন্য লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন—চল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত, শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে, অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধ্রদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্ব্বত হইতে নামিয়াছিল, সেইরূপ অন্য পথ

দেখিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল, পরে নামিয়াছে, তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক রাজপুতদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্ব-সকল তীরবেগে চালাইয়া পর্ব্বততলে নামিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিলেন। রাজপুতেরা রন্ধ্রের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল—সুতরাং তাহারা আগে রন্ধ্রমুখে পৌঁছিতে পারিল না। মোগলেরা পথরোধ করিয়া রন্ধ্রমুখে কামান বসাইল; এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার বজ্রনাদ একবার শুনাইল—"দীন্! দীন্!" শব্দের সঙ্গে পর্ব্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। শুনিয়া উত্তরস্বরূপ রন্ধ্রের অপর মুখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল—তাহাদের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোন মতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্যের বিশগুণ সেনা, পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে—পথান্তর নাই—কেবল যমমন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন, সেই পথে যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্তঃকরণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ্ ঘটিয়াছে—পর্ব্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এই গলির দুই মুখ বন্ধ- দুই মুখেই কামান শুনিতেছি! দুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে—সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর? সকলেই মরিব—একজনও বাঁচিব না—কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে দুইজন মোগল না মারিয়া মরিবে—সে রাজপুত নহে। রাজপুতেরা শুন—এ পথে ঘোড়া ছুটে না—সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো, আমরা তরবারি হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে—তার পর দেখা যাইবে, কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, একত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া "মহারাণাকি জয়" বলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, প্রাণরক্ষা না হউক—একটি রাজপুতও হটিবে না। সন্তুষ্টচিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, "দুই দুই করিয়া সারি দাও।" অশ্বপৃষ্ঠে সবে একে একে যাইতেছিল—পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল—রাণা সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। আজ আসন্নমৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত।

এমন সময়ে সহসা পর্ব্বতরন্ধ্র কম্পিত করিয়া, পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুতসেনা শব্দ করিল, "মাতাজীকি জয়! কালীমায়ীকি জয়!"

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুই পার্শ্বে রাজপুতসেনা সারি দিয়াছে—মধ্যে বিশাললোচনা, সহাস্যবদনা কোন দেবী আসিতেছেন। হয় কোন দেবী মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মূর্ত্তিতে গঠিয়াছেন—রাজপুতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুতকুলরক্ষিণী ভগবতী এ সংকটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন—এ ত মানবী, কিন্তু সামান্যা মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দোলা কোথায়?"

একজন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এই দিকে আছে।"

রাণা বলিলেন, "দেখ, দোলা খালি কি না?"

সৈনিক বলিল, "দোলা খালি। কুমারীজী মহারাজের সামনে।"

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারি—আপনি এখানে কেন?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি—এখন একটি ভিক্ষা চাহি। আমি মুখরা—স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা, তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি—তাহাতে নিরাশ করিবেন না।"

চঞ্চলকুমারী হাস্য ত্যাগ করিয়া, যোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে এই কথা বলিলেন। রাজসিংহ

বলিলেন, "তোমারই জন্য এত দূর আসিয়াছি—তোমাকে অদেয় কিছুই নাই—কি চাও, রূপনগরের কন্যে?"

চঞ্চলকুমারী আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি নিজের মন আপনি বুঝিতে পারি নাই। আমি এখন মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন—আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি নাই—কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে করিবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক – তার পর তুমি যাইও। আর তোমার মনের কথা যে বুঝি নাই, তাহা মনে করিও না। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে না। যোওয়ান্ সব—আগে চল।"

তখন চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া, মর্ম্মভেদী মৃদু কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি-স্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বাম হস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "মহারাজ! এই আঙ্গটিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব।"

রাজসিংহ তখন হাসিলেন—বলিলেন, "অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি রাজকুমারী—রমণীকুলে তুমি ধন্যা। কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না; আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে—নহিলে রাজপুতনামে বড় কলঙ্ক হইবে। আমরা যতক্ষণ না মরি—ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।"

চঞ্চলকুমারী হাসিল—অতিশয় প্রণয়প্রফুল্ল, ভক্তিপ্রমোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "বীরচূড়ামণি! আজি হইতে আমি তোমার দাসী হইলাম! যদি তোমার দাসী না হই—তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না!" প্রকাশ্যে বলিল, 'মহারাজ! দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল সৈন্যসম্মুখে চলিলাম—কাহার সাধ্য রাখে দেখি?"

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী—জীবন্ত দেবীমূর্ত্তি, রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ্রমুখে চলিল। তাঁহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? এজন্য কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, সেই স্বর্ণমুক্তাময়ী প্রতিমা রন্ধ্রমুখে চলিয়া গেল।

একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্বলিত বহ্নিতুল্য রুষ্ট, সশস্ত্র পঞ্চ শত মোগল অশ্বরোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান—মনুষ্যনির্ম্মিত বজ্র, অগ্নি উদ্গীর্ণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—তাহার সম্মুখে, রত্নমণ্ডিতা লোকাতীতা সুন্দরী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল—পর্ব্বতনির্ব্বাসিনী পরী আসিয়াছে।

মনুষ্যভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে ভ্রম ভাঙ্গিল।—বলিল, "এ সেনার সেনাপতি কে?"

মবারক স্বয়ং রন্ধ্রমুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধমের অধীন। আপনি কে?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "আমি সামান্যা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে—যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।"

মবারক বলিলেন, "তবে রন্ধ্রমধ্যে আগু হউন।" চঞ্চলকুমারী রন্ধ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন—মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অন্যে শুনিতে পায় না, এমন স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "আমি রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন—এ কথা বিশ্বাস করেন কি?"

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—ধর্ম্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।—তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম—আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশ জন মাত্র সিপাহী লইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের বলবীর্য্য ত দেখিলেন?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি—পঞ্চাশ জন সিপাহী এত মোগল মারিল?"

চঞ্চল। বিচিত্র নহে—হলদীঘাটে ঐ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাহাই হউক—রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন—যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিল, "বুঝিয়াছি, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা?"

চ। সেও কি সম্ভবে? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।

ম। তাহা পারি। কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। আমি তাঁহাদের বন্দী করিব।

চ। সব পারিবেন—সেটি পারিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—মরিবেন।

ম। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন, ইহা স্থির?

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাততঃ যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিব কি না, সন্দেহ।

ম। সে কি?

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না?

ম। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শত্রু আছে?

চ। আমি নিজে—

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে—আপনার?

চ। বিষ।

ম। কোথায় আছে?

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে হইত, নয়ন ছাড়া আর কোথাও বিষ আছে কি? কিন্তু মবারক সে ইতরপ্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, "মা, আত্মঘাতিনী কেন হইবেন? আপনি যদি যাইতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি, আপনাকে লইয়া যাই? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না—আমরা কোন্ ছার? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে—আমি মোগলসেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের ক্ষমা করি?"

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই—যুদ্ধ করুন।

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন—তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ করুন—রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আপনার কোমরে যে তরবারি দুলিতেছে, রাজপ্রসাদস্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক!"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।" এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নির্ম্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন।

দেখিয়া মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারী কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "উদয়পুরের বীরেরা কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "যত দিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তত দিন হইতে রাজপুত-কন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।" তখন রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু। ক্ষুদ্র সৈনিকদিগের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধের আমার সময়ও নাই। বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই—পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল।"

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল—প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত কেহই

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া "মাতাজীকি জয়!" শব্দে রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগল সেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা "আল্লা—হো—আক্‌বর!" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া—স্থিরমূর্ত্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া—সরিতেছে না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ না এক পক্ষ নিবৃত্ত হয়——ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে না!"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার এ অকর্ত্তব্য। স্বহস্তে তুমি রাজপুতকুলে কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে, আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিল।'

চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল—তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চল নড়িল না—মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল—নামাইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, "মোগল বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না—অতএব বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা, ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে। আমি রাণাকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সে বার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।"

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন। মবারক তখন তাঁহার নিকটে অশ্বে আরোহণ করিতেছেন মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব! আমাকে ফেলিয়া যাইতেছেন কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি লইয়া না যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন?"

মবারক বলিল, "বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।"

চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে?

মবারক। মবারক আলি, ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন --আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাতে একেবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবার শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ্!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল

মাণিকলাল পার্ব্বত্য পথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে; জমী করিত; ডাক-হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি-সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেনা আসিলে রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক-হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহাদিগকে ডাকিবার কারণ, মোগলসৈন্যের সম্মান ও খবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায়—যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন উপদ্রব উপস্থিত করে, তবে তাহার নিবারণ। ডাকিবামাত্র রাজপুতেরা ঢাল, খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল--রাজা তাহাদিগকে অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন। তাহারা নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগলসৈনিকদিগের সহিত হাস্য পরিহাস ও রঙ্গরসে কয় দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তখন তাহারা অশ্ব সজ্জিত করিল এবং অস্ত্র সকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল। রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া স্নেহসূচক বাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমত সময়ে আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হইলেন।

মাণিকলালের সেই মোগলসৈনিকের বেশ। একজন মোগলসৈনিক অতিত্রাস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাধিয়াছে, পাঁচ হাজার দস্যু আসিয়া রাজকুমারীকে ঘিরিয়াছে। জনাব্ হাসান আলি খাঁ বাহাদুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন—তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসুন। দস্যুরা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার। আরও কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

স্থূলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল; রাজা আরও সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক সেই রূপনগরের সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিল।

পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিল। পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে—বোধ হয় যেন পীড়িতা। অশ্বারোহী সৈন্য প্রধাবিত দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল—দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল—বোধ হয় পলাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পারিল না। বল নাই, ইহা দেখিয়া মাণিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা, এখানে এ প্রকারে পড়িয়া আছ?"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাহার ফৌজ?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি রাণা রাজসিংহের ভৃত্য।"

যুবতী বলিল, "আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।"

মাণিক। তবে এখানে এ অবস্থায় কেন?

যুবতী। রাজকুমারীকে দিল্লী লইয়া যাইতেছে। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজি হয়েন নাই। ফেলিয়া আসিযাছেন। আমি তাই হাঁটিয়া তাঁহার কাছে যাইতেছিলাম।

মাণিকলাল বলিল, "তাই পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছ?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "অনেক পথ হাঁটিয়াছি—আর পারিতেছি না।"

পথ এমন বেশী নয়—তবে নির্ম্মল কখনও পথ হাঁটে না, তার পক্ষে অনেক বটে।

মাণিক। তবে এখন কি করিবে?

নির্ম্মল। কি করিব—এইখানে মরিব।

মাণিক। ছি! মরিবে কেন? রাজকুমারীর কাছে চল না কেন?

নির্ম্মল। যাইব কি প্রকারে? হাঁটিতে পারিতেছি না, দেখিতেছ না?

মাণিক। কেন, ঘোড়ায় চল না?

নির্ম্মল হাসিল, বলিল, "ঘোড়ায়?"

মাণিক। ঘোড়ায়। ক্ষতি কি?

নির্ম্মল। আমি কি সওয়ার?

মাণিক। হও না।

নির্ম্মল। আপত্তি নাই। তবে একটা প্রতিবন্ধক আছে—ঘোড়ায় চড়িতে জানি না।

মাণিক। তার জন্য কি আটকায়? আমার ঘোড়ায় চড় না?

নির্ম্মল। তোমার ঘোড়া কলের? না মাটির?

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব।

নির্ম্মল, লজ্জারহিতা হইয়া রসিকতা করিতেছিল—এবার মুখ ফিরাইল। তার পর ভ্রূকুটি করিল; রাগ করিয়া বলিল, "আপনি আপনার কাজে যান আমি আমার গাছতলায় পড়িয়া থাকি। রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার কাজ নাই।"

মাণিকলাল দেখিল, মেয়েটি বড় সুন্দরী। লোভ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "হাঁ গা! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

রহস্যপরায়ণা নির্ম্মল মাণিকলালের রকম দেখিয়া হাসিল, বলিল, "না।"

মাণিক। তুমি কি জাতি?

নির্ম্মল। আমি রাজপুতের মেয়ে।

মাণিক। আমিও রাজপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই। আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে? আমায় বিবাহ করিবে? তা হইলে আমার সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়ায় কোন আপত্তি হয় না।

নির্ম্মল। শপথ কর।

মাণিক। কি শপথ করিব?

নির্ম্মল। তরবার ছুঁইয়া শপথ কর যে, আমাকে বিবাহ করিবে।

মাণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, "যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, তবে তোমাকে বিবাহ করিব।"

নির্ম্মল বলিল, "তবে চল, ঘোড়ায় চড়ি।"

মাণিকলাল তখন সহর্ষচিত্তে নির্ম্মলকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া, সাবধানে তাহাকে ধরিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল।

বোধ হয়, কোর্ট্‌শিপ্‌টা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—"হে প্রাণ!" "হে প্রাণাধিক!" সে সব কিছুই নাই—ধিক্!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ফলভোগী রাণা

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে নির্ম্মলকে নামাইয়া দিয়া, তাহাকে সেইখানে বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া, মাণিকলাল, যেখানে রাজসিংহের সঙ্গে মবারকের যুদ্ধ হইতেছিল, একেবারে সেইখানে, মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল।

মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে, তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রন্ধ্রপথে রাজসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে, মোগলেরা রন্ধ্রের এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে রূপনগরে সৈন্য সংগ্রহার্থে গিয়াছিল, এবং সেই জন্য সে প্রথমেই এই দিকে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বুঝিল যে, রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয়—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দস্যু! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, "উহারা যে মুসলমান!"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত দুষ্ক্রিয়াকারী? মার।"

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল।

মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহস্র অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। মোগলেরা ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। যে যে দিকে পারিল, সে সেই দিকে পলায়ন করিল। মবারক রাখিতে পারিলেন না। তখন রাজপুতেরা "মাতাজীকি জয়!" বলিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, রূপনগরের সেনা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। মবারক সেনা ফিরাইতে গিয়া, সহসা অশ্বসমেত অদৃশ্য হইলেন।

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন, রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান?"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "জানি। যখন আমি দেখিলাম যে, মহারাজ রন্ধ্রপথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। প্রভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নূতন জুয়াচুরি করিতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, যদি কখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে। আজ মুসলমানকে দেখাইতাম যে, রাজপুত কেমন করিয়া মরে!"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে। এখন উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করুন।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন ও দিকের পাহাড়ের উপরে আছে—তাহাদের নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারীর সহিত উদয়পুরাভিমুখী যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : স্নেহশালিনী পিসী

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যে যেখানে পাইল, পলায়ন করিল। তখন মাণিকলাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, "শত্রুদল পলায়ন করিয়াছে—আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ? কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" সৈনিকেরাও দেখিল—তাও বটে, সম্মুখশত্রু আর কেহ নাই। মাণিকলাল যে একটা কারসাজি করিয়াছে, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল। হঠাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই দেখিয়া, তাহারা লুঠপাটে প্রবৃত্ত হইল। এবং যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে, হাসিতে হাসিতে, বাদশাহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয়গর্ব্বে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দণ্ডকাল মধ্যে পার্ব্বত্য পথ জনশূন্য হইল—কেবল হত ও আহত মনুষ্য ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল। দেখিয়া, উচ্চ পর্ব্বতের উপরে প্রস্তরসঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও কাহাকেও না দেখিয়া, রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়পুর যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া, তাহারাও তাঁহার সন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন।

সকলে জুটিল—কেবল মাণিকলাল নহে। মাণিকলাল, নির্ম্মলকে লইয়া বিব্রত। সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়া, নির্ম্মলের কাছে আসিয়া জুটিল। তাহাকে কিছু ভোজন করাইয়া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোলা লইয়া আসিল। দোলায় নির্ম্মলকে তুলিয়া, যে পথে রাণা গিয়াছেন, সে পথে না গিয়া ভিন্ন পথে চলিল—বমাল সমেত ধরা পড়ে, এমন ইচ্ছা রাখে না।

মাণিকলাল নির্ম্মলকে লইয়া পিসীর বাড়ী উপস্থিত হইল। পিসীমাকে ডাকিয়া বলিল, "পিসীমা, একটা বউ এনেছি।" বধূ দেখিয়া পিসীমা কিছু বিষণ্ণ হইলেন—মনে করিলেন,—লাভের যে আশা করিয়াছিলাম, বধূ বুঝি তাহার ব্যাঘাত করিবে। কি করে, দুইটা আশরফি নগদ লইয়াছে—একদিন অন্ন না দিয়া বধূকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। সুতরাং বলিল, "বেশ বউ।"

মাণিকলাল বলিল, "পিসী, বহুর সঙ্গে আমার আজিও বিবাহ হয় নাই।"

পিসীমা বুঝিলেন, তবে এটা উপপত্নী। যো পাইয়া বলিলেন, "তবে আমার বাড়ীতে—"

মাণিকলাল। তার ভাবনা কি? বিয়ে দাও না? আজই বিবাহ হউক।

নির্ম্মল লজ্জায় অধোবদন হইল।

পিসীমা আবার যো পাইলেন বলিলেন, 'সে ত সুখের কথা—তোমার বিবাহ দিব না ত কার বিবাহ দিব? তা বিবাহের ত কিছু খরচ চাই?

মাণিকলাল বলিল "তার ভাবনা কি?"

পাঠকের জানা থাকিতে পারে, যুদ্ধ হইলেই লুঠ হয়। মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিবার সময়ে নিহত মোগল সওয়ারদিগের বস্ত্রমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—ঝনাৎ করিয়া পিসীর কাছে গোটাকত আশরফি ফেলিয়া দিলেন পিসীমা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া পেটরায় তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বাহির হইলেন। বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে ফুল চন্দন ও পুরোহিত সংগ্রহ, সুতরাং আশরফিগুলি পিসীমাকে পেটারা হইতে আর বাহির করিতে হইল না। মাণিকলালের লাভের মধ্যে তিনি যথাশাস্ত্র নির্ম্মলকুমারীর স্বামী হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মাণিকলাল রাণার সৈনিকদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চ পদ লাভ করিলেন, এবং নিজগুণে সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নির আয়োজন

প্রথম পরিচ্ছেদ : শাহজাদী অপেক্ষা দুঃখী ভাল

বলিয়াছি, মবারক রণভূমিতে পর্ব্বতের সানুদেশে সহসা অদৃশ্য হইলেন। অদৃশ্য হইবার কারণ, তিনি যে পথে অশ্বারোহণে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে একটা কূপ ছিল। কেহ পর্ব্বতোপরি বাস করিবার অভিপ্রায়ে জলের জন্য এই কূপটি খনন করিয়াছিল। এক্ষণে চারি পাশের জঙ্গল কূপের মুখে পড়িয়া কূপটি আচ্ছাদন করিয়াছিল। মবারক তাহা না দেখিতে পাইয়া উপর দিয়া ঘোড়া চালাইলেন। ঘোড়া সমেত তাহার ভিতর পড়িয়া গিয়া অদৃশ্য হইলেন। তাহার ভিতর জল ছিল না। কিন্তু পতনের আঘাতেই ঘোড়াটি মরিয়া গেল। মবারক পতনকালে সতর্ক হইয়াছিলেন, তিনি বড় বেশী আঘাত পাইলেন না। কিন্তু কূপ হইতে উঠিবার কোন উপায় দেখিলেন না। যদি কেহ শব্দ শুনিয়া তাঁহার উদ্ধার করে, এজন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধের কোলাহলে তিনি কোন উত্তর শুনিতে পাইলেন না। কেবল একবার যেন, দূর হইতে কে বলিল, "স্থির হইয়া থাক—তুলিব।" সেটাও সন্দেহ মাত্র।

যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, রণক্ষেত্র নিঃশব্দ হইলে, কেহ যেন কূপের উপর হইতে বলিল, "বাঁচিয়া আছ?"

মবারক উত্তর করিল, "আছি। তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যে হই, বড় জখম হইয়াছ কি?"

"সামান্য।"

"আমি একটা কাঠে, দুই চারিখানা কাপড় বাঁধিয়া লম্বা দড়ির মত করিয়াছি। পাকাইয়া মজবুত করিয়াছি। তাহা কূয়ার ভিতর ফেলিয়া দিতেছি। দুই হাতে কাঠের দুই দিক্ ধর—আমি টানিয়া তুলিতেছি।"

মবারক বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ যে স্ত্রীলোকের স্বর! কে তুমি?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এ গলা কি চেন না?"

মবা। চিনিতেছি। দরিয়া এখানে কোথা হইতে?

দরিয়া বলিল, "তোমারই জন্য। এখন তুলিতেছি—উঠ।"

এই বলিয়া দরিয়া কাপড়ের কাছিতে বাঁধা কাঠখানা কূপের ভিতর ফেলিয়া দিল। তরবারি দিয়া কূপের মুখের জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া দিল। মবারক কাঠের দুই দিক্ ধরিল। দরিয়া তখন টানিয়া তুলিতে লাগিল। জোরে কুলায় না। কান্না আসিতে লাগিল। তখন দরিয়া একটা বৃক্ষের বিনত শাখার উপর বস্ত্ররজ্জু স্থাপন করিয়া, শুইয়া পড়িয়া টানিতে লাগিল। মবারক উঠিল। দরিয়াকে দেখিয়া মবারক বিস্মিত হইল। বলিল, "এ কি? এ বেশ কেন?"

দরিয়া বলিল, "আমি বাদশাহী সওয়ার।"

মবা। কেন?

দরি। তোমারই জন্য।

মবা। কেন?

দরি। নহিলে তোমাকে আজ বাঁচাইত কে?

মবা। সেই জন্য কি দিল্লী হইতে এখানে আসিয়াছ? সেই জন্য কি সওয়ার সাজিয়াছ? এ যে রক্ত দেখিতেছি! তুমি যে জখম হইয়াছ! কেন এ করিলে?

দরি। তোমার জন্য করিয়াছি। না করিলে, তুমি বাঁচিতে কি? শাহজাদী কেমন ভালবাসে?

মবারক ম্লানমুখে, ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "শাহজাদীরা ভালবাসে না।"

দরিয়া বলিল, "আমরা দুঃখী—আমরা ভালবাসি। এখন বসো। আমি তোমার জন্য দোলা স্থির করিয়া রাখিয়াছি; লইয়া আসিতেছি। তোমার চোট লাগিয়াছে—ঘোড়ায় চড়া সৎপরামর্শ হইবে না।"

যে সকল দোলা মোগল সেনার সঙ্গে ছিল, যুদ্ধে ভীত হইয়া তাহার বাহকেরা কতকগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। দরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মবারককে কুপমগ্ন হইতে দেখিয়া, প্রথমেই দোলার সন্ধানে গিয়াছিল। পলাতক বাহকদিগকে সন্ধান করিয়া, দুইখানা দোলা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তার পর এখন, সেই দোলা ডাকিয়া আনিল। একখানায় আহত মবারককে তুলিল, একখানায় স্বয়ং উঠিল। তখন মবারককে লইয়া দরিয়া দিল্লীর পথে চলিল। দোলায় উঠিবার সময় মবারক দরিয়ার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, দরিয়া মবারকের শুশ্রূষা করিল। দরিয়ার চিকিৎসাতেই মবারক আরোগ্য লাভ করিল।

দিল্লীতে পেঁছিলে, মবারক দরিয়ার হাত ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া গেল। দিন কত ইহাতে উভয়ে বড় সুখী হইল। তার পর ইহার যে ফল উপস্থিত হইল, তাহা ভয়ানক। দরিয়ার পক্ষে ভয়ানক, মবারকের পক্ষে ভয়ানক, জেব্-উন্নিসার পক্ষে ভয়ানক, ঔরঙ্গজেবের পক্ষে ভয়ানক। সে অপূর্ব্ব রহস্য আমি পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু বলা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজসিংহের পরাভব

রাজসিংহ উদয়পুরে আসিলেন বলিয়াছি। চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ, এজন্য চঞ্চলকুমারীকেও উদয়পুরে লইয়া আসিয়া রাজাবরোধে সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে উদয়পুরে রাখিবেন, কি রূপনগরে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, ইহার মীমাংসা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। তিনি যত দিন ইহার সুমীমাংসা করিতে না পারিলেন, ততদিন চঞ্চল-কুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

এ দিকে চঞ্চলকুমারী রাজার ভাবগতিক দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, "রাজা যে আমাকে বিবাহ করিয়া গ্রহণ করিবেন, এমন ত ভাবগতিক কিছুই দেখিতেছি না; যদি না করেন, তবে কেন আমি উঁহার অন্তঃপুরে বাস করিব? যাবই বা কোথায়?"

রাজসিংহ কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, কতিপয় দিন পরে, চঞ্চলকুমারীর মনের ভাব জানিবার জন্য তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময়ে, যে পত্রখানি চঞ্চলকুমারী অনন্ত মিশ্রের হাতে পাঠাইয়াছিলেন, যাহা রাজসিংহ মাণিকলালের নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া গেলেন।

রাণা আসন গ্রহণ করিলে, চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, সলজ্জ এবং বিনীতভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকমনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা একটু মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনই মোহ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারি! এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি। তোমার পিত্রালয়ে যাইবার অভিলাষ, না এইখানে থাকিতেই প্রবৃত্তি?"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না—নীরবে রহিলেন।

তখন রাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রখানি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীকে দেখাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তোমার পত্র বটে?"

চঞ্চল বলিল, "আজ্ঞা হাঁ।"

রাণা। কিন্তু সবটুকু এক হাতের লেখা নহে। দুই হাতের লেখা দেখিতেছি। তোমার নিজের হাতের কোন অংশ আছে কি?

চঞ্চল। প্রথম ভাগটা আমার হাতের লেখা।

রাণা। তবে শেষ ভাগটা অন্যের লেখা?

পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে, এই শেষ অংশেই বিবাহের প্রস্তাবটা ছিল। চঞ্চলকুমারী উত্তর করিলেন, "আমার হাতের নহে।"

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তোমার সম্মতিক্রমেই ইহা লিখিত হইয়াছিল?"

প্রশ্নটা অতি নির্দ্দয়। কিন্তু চঞ্চলকুমারী আপনার উন্নত স্বভাবের উপযুক্ত উত্তর করিলেন।

বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষত্রিয় রাজগণ বিবাহার্থেই কন্যাহরণ করিতে পারেন। অন্য কোন কারণে কন্যাহরণ মহাপাপ। মহাপাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব কি প্রকারে?"

রাণা। আমি তোমাকে হরণ করি নাই। তোমার জাতিকুল রক্ষার্থ তোমাকে মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে তোমার পিতার নিকট প্রতিপ্রেরণ করাই রাজধর্ম্ম।

চঞ্চলকুমারী কয়টা কথা কহিয়া যুবতীসুলভ লজ্জাকে বশে আনিয়াছিল। এক্ষণে মুখ তুলিয়া, রাজসিংহের প্রতি চাহিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার রাজধর্ম্ম আপনি জানেন। আমার ধর্ম্মও আমি জানি। আমি জানি যে, যখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমি ধর্ম্মতঃ আপনার মহিষী। আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, ধর্ম্মতঃ আমি আর কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না। যখন ধর্ম্মতঃ আপনি আমার স্বামী, তখন আপনার আজ্ঞা মাত্র শিরোধার্য্য। আপনি যদি আমাকে রূপনগরে ফিরিয়া যাইতে বলেন, তবে অবশ্য আমি যাইব। সেখানে গেলে পিতা আমাকে পুনর্ব্বার বাদশাহের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইবেন। কেন না, আমাকে রক্ষা করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। যদি তাহাই অভিপ্রেত, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে যখন আমি বলিয়াছিলাম যে, 'মহারাজ! আমি দিল্লী যাইব'—তখন কেন যাইতে দিলেন না?"

রাজসিংহ। সে আমার আপনার মানরক্ষার্থ।

চঞ্চল। তার পর এখন, যে আপনার শরণ লইয়াছে, তাহাকে আবার দিল্লী যাইতে দিবেন কি?

রাজ। তাও হইতে পারে না। তবে, তুমি এইখানেই থাক।

চঞ্চল। অতিথিস্বরূপ থাকিব? না দাসী হইয়া? রূপনগরের রাজকন্যা এখানে মহিষী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

রাজ। তোমার মত লোকমনোমোহিনী সুন্দরী যে রাজার মহিষী, সকলেই তাঁহাকে ভাগ্যবান্ বলিবে। তুমি এমন অদ্বিতীয়া রূপবতী বলিয়াই তোমাকে মহিষী করিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে, রূপবতী ভার্য্যা শত্রুস্বরূপ—

"ঋণকারী পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ॥"

চঞ্চলকুমারী একটু হাসিয়া বলিল, "বালিকার বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন—উদয়পুরের রাজমহিষীগণ সকলেই কি কুরূপা?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তোমার মত কেহই সুরূপা নহে।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমার বিনীত নিবেদন, কথাটা মহিষীদিগের কাছে বলিবেন না। মহারাণা রাজসিংহেরও ভয়ের স্থান থাকিতে পারে।"

রাজসিংহ উচ্চহাস্য করিলেন। চঞ্চলকুমারী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল—এখন চাপিয়া বসিল, মনে মনে বলিল, "আর ইনি আমার কাছে মহারাণা নহেন, ইনি এখন আমার বর।"

আসন গ্রহণ করিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, "মহারাজ! বিনা আজ্ঞায় আমি যে মহারাজের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলাম, সে অপরাধ আপনাকে মার্জ্জনা করিতে হইতেছে—কেন না, আমি আপনার নিকট জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায় বসিলাম—শিষ্যের আসনে অধিকার আছে। মহারাজ! রূপবতী ভার্য্যা শত্রু কি প্রকারে, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

রাজসিংহ। তাহা সহজে বুঝান যায়। ভার্য্যা রূপবতী হইলে, তাহার জন্য বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়। এই দেখ, তুমি এখনও আমার ভার্য্যা হও নাই, তথাপি তোমার জন্য ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আমার বিবাদ বাধিয়াছে। আমাদের বংশের মহারাণী পদ্মিনীর কথা শুনিয়াছ ত?

চঞ্চল। ঋষিবাক্যে আমার বড় শ্রদ্ধা হইল না। সুন্দরী মহিষী না থাকিলে রাজারা কি বিবাদ হইতে মুক্তি পান? আর এ পামরীর জন্য মহারাজ কেন এ কথা তুলেন? আমি সুরূপা হই, কুরূপা হই, আমার জন্য যে বিবাদ বাধিবার, তাহা ত বাধিয়াছে।

রাজসিংহ। আরও কথা আছে। রূপবতী ভার্য্যাতে পুরুষ অত্যন্ত আসক্ত হয়। ইহা রাজার পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেন না, তাহাতে রাজকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে।

চঞ্চল। রাজারা বহুশত মহিষী কর্তৃক পরিবৃত থাকিয়াও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হয়েন না। আমার ন্যায় বালিকার প্রণয়ে মহারাণা রাজসিংহের রাজকার্য্যে বিরাগ জন্মিবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধার কথা।

রাজসিংহ। কথা তত অশ্রদ্ধেয় নহে। শাস্ত্রে বলে, "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।"

চঞ্চল। মহারাজ কি বৃদ্ধ?

রাজ। যুবা নহি।

চঞ্চল। যাহার বাহুতে বল আছে, রাজপুতকন্যার কাছে সেই যুবা। দুর্ব্বল যুবাকে রাজপুতকন্যাগণ বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য করেন।

রাজ। আমি সুরূপ নহি।

চঞ্চল। কীর্ত্তিই রাজাদিগের রূপ।

রাজ। রূপবান্, বলবান্, যুবা রাজপুত্রের অভাব নাই।

চঞ্চল। আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। অন্যের পত্নী হইলে দ্বিচারিণী হইব। আমি অত্যন্ত নির্লজ্জের মত কথা বলিতেছি। কিন্তু মনে করিয়া দেখিবেন, দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, শকুন্তলা লজ্জা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমারও আজ প্রায় সেই দশা। আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি রাজসমন্দবে* ডুবিয়া মরিব।

রাজসিংহ বাক্‌যুদ্ধে এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "তুমিই আমার উপযুক্ত মহিষী। তবে তুমি কেবল বিপদে পড়িয়া আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে; এক্ষণে আমার হাত হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা রাখ কি না, আমার এই বয়সে তুমি আমাতে অনুরাগিণী হইতে পারিবে কি না, আমার মনে এই সকল সংশয় ছিল। সে সকল সংশয় আজিকার কথাবার্ত্তায় দূর হইয়াছে। তুমি আমার মহিষী হইবে। তবে একটা কথার অপেক্ষা করিতে চাই। তোমার পিতার মত হইবে কি? তাঁহার অমতে আমি বিবাহ করিতে চাহি না। তাহার কারণ, যদিও তোমার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য এবং তাঁহার সৈন্য অল্প, কিন্তু বিক্রম সোলাঙ্কি যে একজন বীরপুরুষ এবং উপযুক্ত সেনানায়ক, ইহা প্রসিদ্ধ। মোগলের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বাধিবেই বাধিবে। বাধিলে, তাঁহার সাহায্য আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে। তাঁহার অনুমতি লইয়া বিবাহ না করিলে তিনি কখনও আমার সহায় হইবেন না। বরং তাঁর অমতে বিবাহ করিলে তিনি মোগলের সহায় এবং আমার শত্রু হইতে পারেন। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব আমার ইচ্ছা, তাঁহাকে পত্র লিখিয়া, তাঁহার সম্মতি আনাইয়া তোমাকে বিবাহ করি। তিনি সম্মত হইবেন কি?"

চঞ্চল। না হইবার ত কোন কারণ দেখি না। আমার ইচ্ছা, পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ লইয়াই আপনার চরণসেবাব্রত গ্রহণ করি। লোক পাঠান আমারও ইচ্ছা।

তখন রাজসিংহ একখানি সবিনয় পত্র লিখিয়া, বিক্রম সোলাঙ্কির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। চঞ্চলকুমারীও মাতার আশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অগ্নি জ্বালিবার প্রয়োজন

রূপনগরের অধিপতির উত্তর উপযুক্ত সময়ে পেঁছিল। উত্তর বড় ভয়ানক। তাহার মর্ম্ম এই:—রাজসিংহকে তিনি লিখিতেছেন, "আপনি রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। রাজপুতানার মুকুটস্বরূপ। এক্ষণে আপনি রাজপুতের নামে কলঙ্ক দিতে প্রস্তুত। আপনি বলপূর্ব্বক আমার অপমান করিয়া, আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছেন। আমার কন্যা পৃথিবীশ্বরী হইত, আপনি তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। আপনারও শত্রুতা করা আমার কর্ত্তব্য। আমার সম্মতিক্রমে আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

"আপনি বলিতে পারেন, সেকালে ক্ষত্রিয়বীরেরা কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিতেন। ভীষ্ম, অর্জ্জুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কন্যাহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সে বলবীর্য্য কই? আপনার বাহুতে যদি বল আছে, তবে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহ কেন? শৃগাল হইয়া সিংহের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমিও রাজপুত, মুসলমানকে কন্যা দান করিলে আমার গৌরব

* রাজসিংহের নির্ম্মিত সরোবর।

বৃদ্ধি পাইবে না জানি। কিন্তু না দিলে মোগল রূপনগরের পাহাড়ের একখানি পাথরও রাখিবে না। যদি আমি আপনি আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে জানিতাম, তবে আমিও ইহাতে সম্মত হইতাম না। যখন জানিব যে, আপনার সে ক্ষমতা আছে, তখন না হয় আপনাকে কন্যাদান করিব।

"সত্য বটে, পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করিতেন, কিন্তু এমন চাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনা কেহই করিতেন না। আপনি আমার কাছে লোক পাঠাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া, আমার সেনা লইয়া গিয়া, আমারই কন্যা হরণ করিলেন;—নচেৎ আপনার সাধ্য হয় নাই। ইহাতে আমার কতটা অনিষ্ট সাধিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। মোগল বাদশাহ মনে করিবেন, যখন আমার সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছে, তখন আমারই কুচক্রে আমার কন্যা অপহৃত হইয়াছে। অতএব নিশ্চয়ই আগে রূপনগর ধ্বংস করিয়া, তবে আপনার দণ্ডবিধান করিবেন। আমিও যুদ্ধ করিতে জানি, কিন্তু মোগলের লক্ষ লক্ষ ফৌজের কাছে কার সাধ্য অগ্রসর হয়? এই জন্য প্রায় সকল রাজপুত তাঁহার পদানত হইয়া আছে—আমি কোন্ ছার?

"জানি না, এখন তাঁহার কাছে সত্য কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইব কি না। কিন্তু আপনি যদি আমার কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহাকে সে কন্যা দিবার আর যদি পথ না থাকে, তবে আমার বা আমার কন্যার নিষ্কৃতির আর কোন উপায় থাকিবে না।

"আপনি আমার কন্যা বিবাহ করিবেন না। করিলে আপনাদিগকে আমার শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। আমি শাপ দিতেছি যে, তাহা হইলে আমার কন্যা বিধবা, সহগমনে বঞ্চিতা, মৃতপ্রজা এবং চিরদুঃখিনী হইবে। এবং আপনার রাজধানী শৃগাল-কুকুরের বাসভূমি হইবে।"

বিক্রম সোলাঙ্কি এই ভীষণ অভিসম্পাতের পর নীচে এক ছত্র লিখিয়া দিলেন, "যদি আপনাকে কখনও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পাই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি আপনাকে কন্যা দান করিব।"

চঞ্চলকুমারীর মাতা পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার পিতার পত্র রাজসিংহ চঞ্চল-কুমারীকে পড়িয়া শুনাইলেন। চঞ্চলকুমারী চারি দিক্ অন্ধকার দেখিল।

চঞ্চলকুমারী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিলে, রাণা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি করিব? পরিণয় বিধেয় কি না?"

চঞ্চলকুমারী—চক্ষের এক বিন্দু, বিন্দুমাত্র জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "বাপের এ অভিসম্পাত মাথায় করিয়া কোন্ কন্যা বিবাহ করিতে সাহস করিবে?"

রাণা। তবে যদি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় কর, তবে পাঠাইতে পারি।

চঞ্চল। কাজেই তাই। কিন্তু পিতৃগৃহে যাওয়াও যা, দিল্লী যাওয়াও তাই। তাহার অপেক্ষা বিষপান কিসে মন্দ?

রাণা। আমার এক পরামর্শ শুন। তুমিই আমার যোগ্য মহিষী, আমি সহসা তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যতীতও তোমাকে বিবাহ করিব না। সে আশীর্ব্বাদের ভরসা আমি একেবারে ত্যাগ করিতেছি না। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। একলিঙ্গ* আমার সহায়। আমি সে যুদ্ধে হয় মরিব, নয় মোগলকে পরাজিত করিব।

চঞ্চল। আমার স্থির বিশ্বাস, মোগল আপনার নিকট পরাজিত হইবে।

রাণা। সে অতিশয় দুঃসাধ্য কাজ। যদি সফল হই, তবে নিশ্চিত তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাইব।

চঞ্চল। তত দিন?

রাণা। তত দিন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক। মহিষীদিগের ন্যায় তোমার পৃথক্ রেউলা† হইবে। মহিষীদিগের ন্যায় তোমারও দাস-দাসী পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিব। আমি প্রচার করিব যে, অল্পদিনের মধ্যে তুমি আমার মহিষী হইবে। এবং সেই বিবেচনায় সকলেই তোমাকে মহিষীদিগের ন্যায় মহারাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে। কেবল যত দিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, তত দিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কি বল?

* রাণাদিগের কুলদেবতা—মহাদেব।

† অবরোধ।

চঞ্চলকুমারী বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, "ইহার অপেক্ষা সুব্যবস্থা এক্ষণে আর কিছু হইতে পারে না।" কাজেই সম্মত হইলেন। রাজসিংহও যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অগ্নি জ্বালিবার আরও প্রয়োজন

মাণিকলালের কাছে নির্ম্মল শুনিল যে, চঞ্চলকুমারী রাজমহিষী হইলেন। কিন্তু কবে বিবাহ হইল, বিবাহ হইয়াছে কি না, তাহা মাণিকলাল কিছুই বলিতে পারিল না। নির্ম্মল তখন স্বয়ং চঞ্চলকুমারীকে দেখিতে আসিলেন।

অনেক দিনের পর নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চলকুমারী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। সে দিন নির্ম্মলকে যাইতে দিলেন না। রূপনগর পরিত্যাগ করার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পরস্পর পরস্পরের কাছে সবিস্তারে বলিলেন। নির্ম্মলের সুখ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আহ্লাদিতা হইলেন। সুখ—কেন না, মাণিকলাল রাণার কাছে অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন—অনেক টাকা হইয়াছে; তার পর, মাণিকলাল রাণার অনুগ্রহে সৈন্যমধ্যে অতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এবং রাজসম্মানে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; নির্ম্মলের উচ্চ অট্টালিকা, ধন-দৌলত, দাস-দাসী সব হইয়াছে, এবং মাণিকলাল তাঁহার কেনা গোলাম হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নির্ম্মল, চঞ্চলকুমারীর দুঃখ শুনিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইল। এবং চঞ্চলকুমারীর পিতা-মাতা, রাজসিংহ এবং চঞ্চলকুমারীর উপর অতিশয় বিরক্ত হইল। চঞ্চলকুমারীকে সে মহারাণী বলিয়া ডাকিতে অস্বীকৃত হইল—এবং মহারাণার সাক্ষাৎ পাইলে, তাঁহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিবে, প্রতিজ্ঞা করিল। চঞ্চলকুমারী বলিল, "সে সকল কথা এখন থাক্। আমার সঙ্গে আমার একটি চেনা লোক নাই। আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকিতে পারি না। যদি ভগবান্ তোমাকে মিলাইয়াছেন তবে আমি তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।"

শুনিয়া, প্রথমে নির্ম্মলের বোধ হইল, যেন বুকের উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সে সবে স্বামী পাইয়াছে—নূতন প্রণয়, নূতন সুখ, এ সব ছাড়িয়া কি চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া থাকা যায়? নির্ম্মলকুমারী হঠাৎ সম্মত হইতে পারিল না—কোন মিছা ওজর করিল না—কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিয়াও বলিতে পারিল না। বলিল, "ও বেলা বলিব।"

চঞ্চলকুমারীর চক্ষে একটু জল আসিল; মনে মনে বলিল, "নির্ম্মলও আমায় ত্যাগ করিল! হে ভগবান্! তুমি যেন আমায় ত্যাগ করিও না।" তার পর চঞ্চলকুমারী একটু হাসিল, বলিল, "নির্ম্মল, তুমি আমার জন্য একা পদব্রজে রূপনগর হইতে চলিয়া আসিয়া মরিতে বসিয়াছিলে! আর আজ! আজ তুমি স্বামী পাইয়াছ!"

নির্ম্মল অধোবদন হইল। আপনাকে শত ধিক্কার দিল; বলিল, "আমি ও বেলা আসিব, যাহাকে মালিক করিয়াছি, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আর একটা মেয়ে ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

চঞ্চল। মেয়ে না হয়, এখানে আনিলে?

নির্ম্মল। সে খ্যান্-খ্যান্ প্যান্-প্যান্ এখানে কাজ নাই। একটা পাতান রকম পিসী আছে—সেটাকে ডাকিয়া বাড়ীতে বসাইয়া আসিব।

এই সকল পরামর্শের পর নির্ম্মলকুমারী বিদায় লইল। গৃহে গিয়া মাণিকলালকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। মাণিকলালও নির্ম্মলকে বিদায় দিতে বড় কষ্ট বোধ করিল। কিন্তু সে নিতান্ত প্রভুভক্ত, আপত্তি করিল না। পিসীমা আসিয়া কন্যাটির ভার লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সে প্রয়োজন কি?

নির্ম্মল শিবিকারোহণে দাস-দাসী সঙ্গে লইয়া রাণার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিতেছেন। পথিমধ্যে বড় চক বা চৌক। তাহার একটা বাড়ীতে বড় লোকের ভিড়। নির্ম্মলের দোলা বহুমূল্য বস্ত্রে আবৃত ছিল। কিন্তু জনমর্দ্দের শব্দে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আবরণ

উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন। একজন পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ?" শুনিলেন, একজন বিখ্যাত "জ্যোতিষী" এই বাড়ীতে থাকে। সহস্র সহস্র লোক তাহার কাছে প্রত্যহ গণনা করাইতে আসে। যাহারা গণাইতে আসিয়াছে, তাহারাই ভিড় করিযাছে। নির্ম্মল আরও শুনিলেন, "এই জ্যোতিষী সকল প্রকার প্রশ্ন গণিতে পারে। এবং যাহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছে, তাহা ঠিক ফলিয়াছে।" নির্ম্মল তখন দাসীদিগকে বলিলেন, "সঙ্গের পাইকদিগকে বল, লোক সকল সরাইয়া দেয়। আমি ভিতরে গিয়া গণনা করাইব। কিন্তু আমার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।"

পাইকদিগের বল্লমের গুঁতায় লোক সকল সরিল—নির্ম্মলের শিবিকা জ্যোতিষীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যে গণাইতে বসিয়াছিল—সে উঠিয়া গেলে নির্ম্মল গিয়া প্রশ্নকর্ত্তার আসনে বসিল। জ্যোতিষীকে প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ দর্শনী অগ্রিম দিল। জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি গণাইবে?"

নির্ম্মল বলিল, "আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা গণিয়া বলিয়া দিন।"

জ্যোতিষী। প্রশ্ন। ভাল, বল।

নির্ম্মল বলিল, "আমার এক প্রিয়সখী আছেন।"

জ্যোতিষী একটু কি লিখিল। বলিল, "তার পর?"

নির্ম্মল বলিল, "তিনি অবিবাহিতা।"

জ্যোতিষী আবার লিখিল। বলিল, "তার পর?"

নির্ম্মল। তাঁর কবে বিবাহ হইবে?

জ্যোতিষী আবার লিখিল। পরে খড়ি পাতিতে লাগিল। লগ্নসারণী দেখিল। শঙ্কুপত্র দেখিল। নির্ম্মলকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অনেক অঙ্ক কষিল। অনেক পুঁথি খুলিয়া পড়িল। শেষে নির্ম্মলের দিকে চাহিযা ঘাড় নাড়িল।

নির্ম্মল বলিল, "বিবাহ হইবে না?"

জ্যোতিষী। প্রায় সেইরূপ উত্তর শাস্ত্রে লেখে।

নির্ম্মল। প্রায় কেন?

জ্যোতিষী। যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখন তোমার সখীর পরিচর্য্যা করে, তখন বিবাহ হইবে। নহিলে হইবে না। তাহা অসম্ভব বলিয়াই বলিতেছি, বিবাহ হইবে না।

"অসম্ভব বটে!" বলিয়া নির্ম্মল জ্যোতিষীকে আরও কিছু দিয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আগুন জ্বালিবার প্রস্তাব

চঞ্চলকুমারীর হরণে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিল, তাহাতে হয় মোগল সাম্রাজ্য, নয় রাজপুতানা ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কেবল মহারাণা রাজসিংহের দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য এতটা হইতে পারে নাই। সেই আশ্চর্য্য ঘটনাপরম্পরা বিবৃত করা, উপন্যাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তবে কিছু কিছু না বলিলেও এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট বুঝা যাইবে না।

রূপনগরের রাজকুমারীর হরণ-সংবাদ দিল্লীতে আসিয়া পেঁৗছিল। দিল্লীতে অত্যন্ত কোলাহল পড়িয়া গেল। বাদশাহ রাগে স্বসৈন্যের নেতৃগণের মধ্যে কাহাকে পদচ্যুত, কাহাকে আবদ্ধ, কাহাকে বা নিহত করিলেন। কিন্তু যাহারা প্রধান অপরাধী—চঞ্চলকুমারী এবং রাজসিংহ—তাঁহাদের তত শীঘ্র দণ্ডিত করা দুঃসাধ্য। কেন না, যদিও মেবার ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি বড় "কঠিন ঠাঁই।" চারি দিকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালার প্রাচীর, রাজপুতেরা সকলেই বীরপুরুষ, এবং রাজসিংহ হিন্দুবীরচূড়ামণি। এ অবস্থায় রাজপুতে কি করিতে পারে, তাহা প্রতাপসিংহ, আকব্বর শাহকেও শিখাইয়াছিল। দুনিয়ার বাদশাহকে কিল খাইয়া কিছু দিনের জন্য কিল চুরি করিতে হইল।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব কাহারও উপর রাগ সহ্য করিবার লোক নহেন। হিন্দুর অনিষ্ট করিতে তাঁহার জন্ম, হিন্দুর অপরাধ বিশেষ অসহ্য। একে হিন্দু মারহাট্টা পুনঃ পুনঃ অপমান

করিয়াছে আবার রাজপুত অপমান করিল। মারহাট্টার বড় কিছু করিতে পারেন নাই রাজপুতের হঠাৎ কিছু করিতে পারিতেছেন না। অথচ বিষ উদ্গীরণ করিতে হইবে। অতএব রাজসিংহের অপরাধে সমস্ত হিন্দুজাতির পীড়াই অভিপ্রেত করিলেন।

আমরা এখন ইন্‌কম্ টেক্‌শকে অসহ্য মনে করি, তাহার অধিক অসহ্য একটা "টেক্‌শ" মুসলমানি আমলে ছিল। তাহার অধিক অসহ্য—কেন না, এই "টেক্‌শ" মুসলমানকে দিতে হইত না; কেবল হিন্দুকেই দিতে হইত। ইহার নাম জেজেয়া। পরম রাজনীতিজ্ঞ আকব্বর বাদশাহ, ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া, ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি উহা বন্ধ ছিল। এক্ষণে হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব তাহা পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া হিন্দুর যন্ত্রণা বাড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বেই বাদশাহ, জেজেয়ার পুনরাবির্ভাবের আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। হিন্দুরা ভীত, অত্যাচারগ্রস্ত, মর্ম্মপীড়িত হইল। যুক্তকরে সহস্র সহস্র হিন্দু বাদশাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা ছিল না। শুক্রবারে যখন বাদশাহ মসজিদে ঈশ্বরকে ডাকিতে যান, তখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিল। দুনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত আজ্ঞা দিলেন, "হস্তীগুলা পদতলে ইহাদিগকে দলিত করুক।" সেই বিষম জনসম্মর্দ্দ হস্তি-পদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল।

ঔরঙ্গজেবের অধীন ভারতবর্ষ জেজেয়া দিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত হিন্দুর দেবপ্রতিমা চূর্ণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তাহার স্থানে মুসলমানের মসজিদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির গেল; মথুরায় কেশবের মন্দির গেল; বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যাহা কিছু স্থাপত্যকীর্ত্তি ছিল, চিরকালের জন্য তাহা অন্তর্হিত হইল।

ঔরঙ্গজেব এক্ষণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতানার রাজপুতেরাও জেজেয়া দিবে। রাজপুতানার প্রজা তাঁহার প্রজা নহে, তথাপি হিন্দু বলিয়া তাহাদের উপর এ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজপুতেরা প্রথমে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু উদয়পুর ভিন্ন আর সর্ব্বত্র রাজপুতানা কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় অচল। জয়পুরের জয়সিংহ—যাঁহার বাহুবল মোগল সাম্রাজ্যের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, তিনি এক্ষণে গতাসু;—বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহস্তে ঔরঙ্গজেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দিল্লীতে আবদ্ধ। সুতরাং জয়পুর জেজেয়া দিল।

যোধপুরের যশোবন্ত সিংহও লোকান্তরগত। তাঁহার রাণী এখন রাজপ্রতিনিধি। স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি বাদশাহের কর্ম্মচারীদিগকে হাঁকাইয়া দিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। স্ত্রীলোক যুদ্ধের ধমকে ভয় পাইলেন। রাণী জেজেয়া দিলেন না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন।

রাজসিংহ জেজেয়া দিলেন না। কিছুতেই দিবেন না; সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। জেজেয়া সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাজপুতানার ইতিহাসবেত্তা সেই পত্রসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "The Rana remonstrated by letter, in the name of the nation of which he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty yet temperate resolve, so much of soul-stirring rebuke mingled with a boundless and tolerating benevolence, such elevating excess of the Divinity with such pure philanthropy, that it may challenge competition with any epistolary production of any age, clime or condition." * পত্রখানি বাদশাহের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিল।

বাদশাহ রাজসিংহের উপর আজ্ঞা প্রচার করিলেন, জেজেয়া ত দিতে হইবেই, তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহত্যা করিতে দিতে হইবে, এবং দেবালয় সকল ভাঙ্গিতে হইবে। রাজসিংহ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

---

* Tod's Rajasthan—Vol I, page 381

ঔরঙ্গজেবও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এরূপ ভয়ানক যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন যে, তিনি কখন এমন আর করেন নাই। চীনের সম্রাট্, কি পারস্যের রাজা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে যে উদ্যোগ করিতেন না, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে সেই উদ্যোগ করিলেন। অর্দ্ধেক আসিয়ার অধিপতি সের (Xerxes) যেমন ক্ষুদ্র গ্রীসরাজ্য জয় করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর সের, ক্ষুদ্র রাজা রাণা রাজসিংহকে পরাজয় করিবার জন্য সেইরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা পরস্পর তুলনীয়. ইহার তৃতীয় তুলনা আর নাই। আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না। আধুনিক শিক্ষার সুফল!

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নির উৎপাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ অরণিকাষ্ঠ--উর্ব্বশী

রাজসিংহ যে তীব্রঘাতী পত্র ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলেন, তৎপ্রেরণ হইতে এই অগ্নুৎপাদন খণ্ড আরম্ভ করিতে হইবে। সেই পত্র ঔরঙ্গজেবের কাছে কে লইয়া যাইবে, তাহার মীমাংসা কঠিন হইল। কেন না, যদিও দূত অবধ্য, তথাপি পাপে কুণ্ঠাশূন্য ঔরঙ্গজেব অনেক দূত বধ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব প্রাণের শঙ্কা রাখে, অন্ততঃ এমন সুচতুর নয় যে, আপনার প্রাণ বাঁচাইতে পারে, এমন লোককে পাঠাইতে রাজসিংহ ইচ্ছুক হইলেন না। তখন মাণিকলাল আসিয়া প্রার্থনা করিল যে, আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক। রাজসিংহ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাহাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এ সংবাদ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারীকে ডাকিলেন। বলিলেন, "তুমিও কেন তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও না?"

নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথা যাব? দিল্লী? কেন?"

চঞ্চল। একবার বাদশাহের রঙ্‌মহালটা বেড়াইয়া আসিবে।

নির্ম্মল। শুনিয়াছি, সে না কি নরক।

চঞ্চল। নরকে কি কখন তোমায় যাইতে হইবে না? তুমি গরিব বেচারা মাণিকলালের উপর যে দৌরাত্ম্য কর, তাহাতে তোমার নরক হইতে নিস্তার নাই।

নির্ম্মল। কেন, সুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল কেন?

চঞ্চল। সে বুঝি তোমায় গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া থাকিতে সাধিয়াছিল?

নির্ম্মল। আমি ত আর তাকে ডাকি নাই। এখন সে ভূতের বোঝা বহিয়া দিল্লী গিয়া কি করিব বলিয়া দাও।

চঞ্চল। উদিপুরীকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়া আসিতে হইবে।

নির্ম্মল। কিসের?

চঞ্চল। তামাকু সাজার।

নির্ম্মল। বটে, কথাটা মনে ছিল না। পৃথিবীশ্বরী তোমার পরিচর্য্যা না করিলে, তোমারও ভূতের বোঝা মিলিবে না।

চঞ্চল। দূর হ পাপিষ্ঠা! আমিই এখন ভূতের বোঝা। হয়, বাদশাহের বেগম আমার দাসী হইবে—নাহিলে আমাকে বিষ খাইতে হইবে। গণকের ত এই গণনা।

নির্ম্মল। তা, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেই কি বেগম আসিবে?

চঞ্চল। না। আমার উদ্দেশ্য বিবাদ বাধান। আমার বিশ্বাস, বিবাদ বাধিলেই মহারাণার জয় হইবে। আর বেগম বাঁদী হইবে। আর উদ্দেশ্য, তুমি বেগমদিগকে চিনিয়া আসিবে!

নির্ম্মল। তা কি প্রকারে এ কাজ পারিব, বলিয়া দাও।

চঞ্চল। আমি বলিয়া দিতেছি। তুমি জান যে, যোধপুরী বেগমের পাঞ্জাটা আমার কাছে আছে। সেই পাঞ্জা তুমি লইয়া যাও। তাহার গুণে তুমি রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিতে পারিবে। এবং তাহার গুণে তুমি যোধপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিবে। আমি উদিপুরীর নামে যে পত্র দিতেছি, তাহা তাঁহাকে দেখাইবে। তিনি ঐ পত্র কোন প্রকারে, উদিপুরীর কাছে পাঠাইয়া দিবেন। যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলাইবে না, সেখানে স্বামীর বুদ্ধি হইতে কিছু ধার লইও।

নির্ম্মল। ইঃ! আমি যাই মেয়ে, তাই তার সংসার চলে।

হাসিতে হাসিতে নির্ম্মলও পত্র লইয়া চলিয়া গেল। এবং যথাকালে স্বামীর সঙ্গে, উপযুক্ত লোকজন সমভিব্যাহারে দিল্লীযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অরণিকাষ্ঠ—পুরূরবা

উদ্যোগ মাণিকলালেরই বেশী। তাহার একটা নমুনা সে একদিন নির্ম্মলকুমারীকে দেখাইল। নির্ম্মল সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার কাটা আঙ্গুলের স্থানে আবার নূতন আঙ্গুল হইয়াছে। সে মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি?"

মাণিকলাল বলিল, "গড়াইয়াছি।"

নির্ম্মল। কিসে?

মাণিক। হাতীর দাঁতে। কল-কব্জা বেমালুম লাগাইয়াছি, তাহার উপর ছাগলের পাতলা চামড়া মুড়িয়া আমার গায়ের মত রঙ করাইয়াছি। ইচ্ছানুসারে খোলা যায়, পরা যায়।

নির্ম্মল। এর দরকার?

মাণিক। দিল্লীতে জানিতে পারিবে। দিল্লীতে ছদ্মবেশের দরকার হইতে পারে। আঙ্গুলকাটার ছদ্মবেশ চলে না। কিন্তু দুই রকম হইলে খুব চলে।

নির্ম্মল হাসিল। তার পর মাণিকলাল একটি পিঞ্জরমধ্যে একটা পোষা পায়রা লইল। এই পারাবতটি অতিশয় সুশিক্ষিত। দৌত্যকার্য্যে সুনিপুণ। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধে 'Carrier-pigeon' গুলির গুণ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই জাতীয় শিক্ষিত পারাবতের ব্যবহার চলিত ছিল। পারাবতের গুণ মাণিকলাল সবিশেষ নির্ম্মলকুমারীকে বুঝাইয়া দিলেন।

রীতি ছিল যে, দিল্লীর বাদশাহের নিকট দূত পাঠাইতে হইলে, কিছু উপঢৌকন সঙ্গে পাঠাইতে হয়। ইংলন্ড, পর্ত্তুগাল প্রভৃতির রাজারাও তাহা পাঠাইতেন। রাজসিংহও কিছু দ্রব্যসামগ্রী মাণিকলালের সঙ্গে পাঠাইলেন। তবে, অপ্রণয়ের দৌত্য, বেশী সামগ্রী পাঠাইলেন না।

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত, মণিরত্নখচিত কারুকার্য্যযুক্ত কতকগুলি সামগ্রী পাঠাইলেন। মাণিকলাল তাহা পৃথক্ বাহনে বোঝাই করিয়া লইবেন।

অবধারিত দিবসে রাণার আজ্ঞালিপি ও পত্র লইয়া, নির্ম্মলকুমারী সর্ব্বভিব্যাহারে, দাস-দাসী, লোকজন, হাতী-ঘোড়া, উট-বলদ, শকট, এক্কা, দোলা, রেশালা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বড় ঘটার সহিত মাণিকলাল যাত্রা করিলেন। যাইতে অনেক দিন লাগিল। দিল্লীর কয় ক্রোশ মাত্র বাকি থাকিতে, মাণিকলাল তাম্বু ফেলিয়া নির্ম্মলকুমারীকে ও অন্যান্য লোকজনকে তথায় রাখিয়া, একজন মাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দিল্লী চলিল। আর সেই পাথরের সামগ্রীগুলিও সঙ্গে লইল। গড়া আঙ্গুল খুলিয়া নির্ম্মলকুমারীর কাছে রাখিয়া গেল। বলিল, "কাল আসিব।"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

মাণিকলাল একখানা পাথরের জিনিস নির্ম্মলকে দেখাইয়া, তাহাতে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখাইল। বলিল, "সকলগুলিতেই এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি।"

নির্ম্মল। কেন?

মাণিক। দিল্লীতে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হইবে। তার পর যদি মোগলের প্রতিবন্ধকতায়, পরস্পরের সন্ধান না পাই, তাহা হইলে, তুমি পাথরের জিনিস কিনিতে বাজারে পাঠাইও। যে দোকানের জিনিসে তুমি এই চিহ্ন দেখিবে, সেই দোকানে আমার সন্ধান করিও।

এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া মাণিকলাল বিশ্বাসী লোকটি ও প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি লইয়া দিল্লী গেল। সেখানে গিয়া, একখানা ঘর ভাড়া লইয়া, পাথরের দোকান সাজাইয়া, ঐ সর্ব্বভিব্যাহারী লোকটিকে দোকানদার সাজাইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিল।

পরে সমস্ত ফৌজ ও রেশালা এবং নির্ম্মলকুমারীকে লইয়া পুনর্ব্বার দিল্লী গেল। এবং সেখানে যথারীতি শিবির সংস্থাপন করিয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অগ্নিচয়ন

অপরাহ্ণে ঔরঙ্গজেব দরবারে আসীন হইলে, মাণিকলাল সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। দিল্লীর বাদশাহের আমখাস অনেক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আমার

অভিপ্রেত নহে। মাণিকলাল প্রথম সোপানাবলী আরোহণ করিয়া একবার কুর্ণিশ করিলেন। তার পর উঠিতে হইল। একপদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ—আবার একপদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ। এইরূপে তিনবার উঠিয়া তক্তে তাউস্ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া রাজসিংহপ্রেরিত সামান্য উপহার বাদশাহের সম্মুখে অর্পিত করিলেন। নজরের অনর্ঘ্যতা দেখিয়া ঔরঙ্গজেব রুষ্ট হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে দুইখানি তরবারি ছিল, একখানি কোষে আবৃত, আর একখানি নিষ্কোষ। ঔরঙ্গজেব নিষ্কোষ অসি গ্রহণ করিয়া আর সব উপহার পরিত্যাগ করিলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের পত্র দিলেন। পত্রার্থ অবগত হইয়া ঔরঙ্গজেব ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সচরাচর বাহিরে কোপ প্রকাশ করিতেন না। তখন মাণিকলালকে বিশেষ সমাদরের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তাহাকে উত্তম বাসস্থান দিবার জন্য বখ্‌শীকে আদেশ করিলেন। এবং আগামী কল্য মহারাণার পত্রের উত্তর দিবেন বলিয়া মাণিকলালকে বিদায় করিলেন।

তখনই দরবার বরখাস্ত হইল। দরবার হইতে উঠিয়া আসিয়াই ঔরঙ্গজেব মাণিকলালের বধের আজ্ঞা করিলেন। বধের আজ্ঞা হইল, কিন্তু যাহারা মাণিকলালকে বধ করিবে, তাহারা মাণিকলালকে খুঁজিয়া পাইল না। যাহাদিগের প্রতি মাণিকলালের সমাদরের আদেশ হইয়াছিল, তাহারাও খুঁজিয়া পাইল না। দিল্লীর সর্ব্বত্র খুঁজিল, কোথাও মাণিকলালকে পাওয়া গেল না। তাহার বধের আজ্ঞা প্রচার হইবার আগেই মাণিকলাল সরিয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, যখন মাণিকলালের জন্য এত খোঁজ তল্লাস হইতেছিল, তখন সে আপনার পাথরের দোকানে ছদ্মবেশে সওদাগরি করিতেছিল। আহদীরা মাণিকলালকে না পাইয়া, তাঁহার শিবিরে যাহাকে যাহাকে পাইল, তাহাকে তাহাকে ধরিয়া কোতোয়ালের নিকট লইয়া গেল। তাহার মধ্যে নির্ম্মলকুমারীকেও ধরিয়া লইয়া গেল।

কোতোয়াল, অপর লোকদিগের কাছে কিছু সন্ধান পাইলেন না। ভয়প্রদর্শন ও মারপিটেও কিছুই হইল না। তাহারা কোন সন্ধান জানে না, কি প্রকারে বলিবে?

কোতোয়াল শেষ নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন—পরদানশীন বলিয়া তাঁহাকে এতক্ষণ তফাৎ রাখা হইয়াছিল। কোতোয়াল এখন নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল, "রাণার এল্‌চিকে আমি চিনি না।"

কোতোয়াল। তাহার নাম মাণিকলাল সিংহ।

নির্ম্মল। মাণিকলাল সিংহকে আমি চিনি না।

কো। তুমি রাণার এল্‌চির সঙ্গে উদয়পুর হইতে আস নাই?

নি। উদয়পুর আমি কখন দেখিও নাই।

কো। তবে তুমি কে?

নি। আমি জনাব যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদী।

কো। জনাব যোধপুরী বেগমের বাঁদীরা মহালের বাহিরে আসে না।

নি। আমিও কখন আসি নাই। এইবার হিন্দু এল্‌চি আসিয়াছে শুনিয়া বেগম সাহেবা আমাকে তাহার তাম্বুতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কো। সে কি? কেন?

নি। কিষণজীর চরণামৃতের জন্য; তাহা সকল রাজপুত রাখিয়া থাকে।

কো। তোমাকে ত একা দেখিতেছি। তুমি মহালের বাহিরেই বা আসিলে কি প্রকারে?

নি। ইহার বলে।

এই বলিয়া নির্ম্মলকুমারী যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল। দেখিয়া কোতোয়াল তিন সেলাম করিল। নির্ম্মলকে বলিল, "তুমি যাও। তোমাকে কেহ আর কিছু বলিবে না।"

নির্ম্মল তখন বলিল, "কোতোয়াল সাহেব! আর একটু মেহেরবানি করিতে হইবে আমি কখন মহালের বাহির হই নাই। আজ বড় ধর-পাকড় দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছে। আপনি যদি দয়া করিয়া একটা আহদী, কি পাইক সঙ্গে দেন, যে আমাকে মহাল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।"

কোতোয়াল তখনই একজন অস্ত্রধারী রাজপুরুষকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া নির্ম্মলকে বাদশাহের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। বাদশাহের প্রধানা মহিষীর পাঞ্জা দেখিয়া খোজারা কেহ কিছু আপত্তি করিল না। নির্ম্মলকুমারী একটু চাতুরীর সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে যোধপুরী বেগমের সন্ধান পাইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই পাঞ্জা দেখাইল। দেখিবামাত্র সংকর্ণ হইয়া রাজমহিষী তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন, তুমি এ পাঞ্জা কোথায় পাইলে?

নির্ম্মলকুমারী বলিল, আমি সমস্ত কথা সবিস্তার বলিতেছি।

নির্ম্মলকুমারী প্রথমে আপনার পরিচয় দিল। তার পর দেবীর রূপনগরে যাওয়ার কথা, সে যাহা বলিয়াছিল সে কথা, পাঞ্জা দেওয়ার কথা, তার পর চঞ্চল ও নির্ম্মলের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিল। মাণিকলালের পরিচয় দিল। মাণিকলালের সঙ্গে যে নির্ম্মল আসিয়াছিল, চঞ্চলকুমারীর পত্র লইয়া আসিয়াছিল তাহা বলিল। পরে দিল্লীতে আসিয়া যে প্রকার বিপদে পড়িয়াছিল তাহা বলিল, যে প্রকারে উদ্ধার পাইয়া যে কৌশলে মহাল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা বলিল। পরে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা দিল। শেষ বলিল, এই পত্র কি প্রকারে উদিপুরী বেগমের কাছে পৌঁছাইতে পারিব সেই উপদেশ পাইবার জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।

রাজমহিষী বলিলেন, তাহার কৌশল আছে। জেব উন্নিসা বেগমের হুকুমের সাপেক্ষ। তাহা এখন চাহিতে গেলে গোলযোগ হইবে, রাত্রে যখন এই পাপিষ্ঠারা শরাব খাইয়া বিহ্বল হইবে তখন সে উপায় হইবে। এখন তুমি আমার হিন্দু বাঁদীদিগের মধ্যে থাক। হিন্দুর অন্নজল খাইতে পাইবে।'

নির্ম্মলকুমারী সম্মত হইলেন। বেগম সেইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সমিধসংগ্রহ—উদিপুরী

রাত্রি একটু বেশী হইলে যোধপুরী বেগম নির্ম্মলকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া, একজন তুর্কী (তাতারী) প্রহরিণী সঙ্গে দিয়া জেব-উন্নিসার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। নির্ম্মল জেব-উন্নিসার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আতর-গোলাপের পুষ্পরাশির এবং তামাকুর সদ্‌গন্ধে বিমুগ্ধ হইল। নানাবিধ রত্নরাজিখচিত হর্ম্ম্যতল, শয্যাভবণ এবং গৃহাভরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা জেব-উন্নিসার বিচিত্র, রত্নপুষ্পমিশ্রিত অলঙ্কারপ্রভায় চন্দ্রসূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যপ্রভায় চমকিত হইল। এই সকলে সজ্জিতা পাপিষ্ঠা জেব-উন্নিসাকে দেবলোকবাসিনী অপ্সর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু অপ্সরার তখন চক্ষু ঢুলু ঢুলু, মুখ রক্তবর্ণ, চিত্ত বিভ্রান্ত, দ্রাক্ষাসুধার তখন পূর্ণাধিকার। নির্ম্মলকুমারী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে তিনি জড়িত রসনায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুই?'

নির্ম্মলকুমারী বলিল, 'আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী।'

জেব। মোগল বাদশাহের তক্তে তাউস লইয়া যাইতে আসিয়াছিস?

নির্ম্মল। না। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।

জেব। চিঠি কি হইবে? পুড়াইয়া রোশনাই করিবি?

নির্ম্মল। না। উদিপুরী বেগম সাহেবাকে দিব।

জেব। সে বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গিয়াছে?

নির্ম্মল। বোধ হয় বাঁচিয়া আছেন।

জেব। না। সে মরিয়া গিয়াছে। এ দাসীটাকে কেহ তাহার কাছে লইয়া যা।

জেব উন্নিসার উন্মত্ত প্রলাপবাক্যের উদ্দেশ্য যে ইহাকে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। কিন্তু তাতারী প্রহরিণী তাহা বুঝিল না। সাদা অর্থ বুঝিয়া নির্ম্মলকুমারীকে উদিপুরী বেগমের কাছে লইয়া গেল।

সেখানে নির্ম্মল দেখিল, উদিপুরীর চক্ষু উজ্জ্বল, হাস্য উচ্চ মেজাজ বড় প্রফুল্ল। নির্ম্মল খুব একটা বড় সেলাম করিল। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি?"

নির্ম্মল উত্তর করিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।"

উদিপুরী বলিল, "না। না। তুমি ফার্সী মুলুকের বাদশাহ। মোগল বাদশাহের হাত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ।"

নির্ম্মলকুমারী, হাসি সামলাইয়া চঞ্চলের পত্রখানি উদিপুরীর হাতে দিল। উদিপুরী তাহা পড়িবার ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি লিখিতেছে? লিখিতেছে, 'অয় নাজনী! পিয়ারী মেরে! তোমার সুরৎ ও দৌলত শুনিয়া আমি একেবারেই বেহোস্ ও দেওয়ানা হইয়াছি। তুমি শীঘ্র আসিয়া আমার কলিজা ঠাণ্ডা করিবে।' আচ্ছা, তা করিব। হুজুরের সঙ্গে আলবৎ যাইব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন---আমি একটু শরাব খাইয়া লই। আপনি একটু শরাব মোলাহেজা করিবেন? আচ্ছা শরাব! ফেরেঙ্গের এলচি ইহা নজর দিয়াছে। এমন শরাব আপনার মুলুকেও পয়দা হয় না।"

উদিপুরী পিয়ালা মুখে তুলিলেন, সেই অবসরে নির্ম্মলকুমারী বহির্গত হইয়া যোধপুরী বেগমের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং যোধপুরীর জিজ্ঞাসামত যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিয়া যোধপুরী বেগম হাসিয়া বলিল, "কাল পত্রখানা ঠিক হইয়া পড়িবে। তুমি এই বেলা পলায়ন কর। নচেৎ কাল একটা গণ্ডগোল হইতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে একজন বিশ্বাসী খোজা দিতেছি। সে তোমাকে মহালের বাহির করিয়া তোমার স্বামীর শিবিরে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখানে যদি তোমার আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও পাও, তার সঙ্গে আজই দিল্লীর বাহিরে চলিয়া যাইও। যদি শিবিরে কাহাকেও না পাও, তবে ইহার সঙ্গে দিল্লীর বাহিরে যাইও। তোমার স্বামী বোধ হয়, দিল্লী ছাড়াইয়া কোথাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পথে তাঁহার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে এই খোজাই তোমাকে উদয়পুরে পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবে। খরচ-পত্র তোমার কাছে না থাকে, তবে তাহাও আমি দিতেছি। কিন্তু সাবধান! আমি ধরা না পড়ি।"

নির্ম্মল বলিল, "হজরৎ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি রাজপুতের মেয়ে।"

তখন যোধপুরী বনাসী নামে তাঁহার বিশ্বাসী খোজাকে ডাকাইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই যাইতে পারিবে ত?"

বনাসী বলিল, "তা পারিব। কিন্তু বেগম সাহেবার দস্তখতি একখানা পরওয়ানা না পাইলে এত করিতে সাহস হইতেছে না।"

যোধপুরী তখন বলিলেন, "যেরূপ পরওয়ানা চাহি, লিখাইয়া আন, আমি বেগম সাহেবার দস্তখত করাইতেছি।"

খোজা পরওয়ানা লিখাইয়া আনিল। তাহা সেই তাতারী প্রহরিণীর হাতে দিয়া রাজমহিষী বলিলেন, "ইহাতে বেগম সাহেবার দস্তখত করাইয়া আন।"

প্রহরিণী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি জিজ্ঞাসা করে, কিসের পরওয়ানা?"

যোধপুরী বলিলেন, "বলিও, 'আমার কোতলের পরওয়ানা।' কিন্তু কালি কলম লইয়া যাইও। আর পাঞ্জা ছেপ্‌তে করিতে ভুলিও না।"

প্রহরিণী কালি কলম সহিত পরওয়ানা লইয়া গিয়া জেব-উন্নিসার কাছে ধরিল। জেব-উন্নিসা পূর্ব্বভাবাপন্ন, জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের পরওয়ানা?"

প্রহরিণী বলিল, "আমার কোতলের পরওয়ানা।"

জেব। কি চুরি করেছিস্?

প্রহরিণী। হজরৎ উদিপুরী বেগমের পেশ্‌ওয়াজ।

জেব। আচ্ছা করেছিস্—কোতলের পর পরিস্।

এই বলিয়া বেগম সাহেবা পরওয়ানা দস্তখত করিয়া দিলেন। প্রহরিণী মোহর ছেপ্‌ত করিয়া লইয়া, যোধপুরী বেগমকে আনিয়া দিল। বনাসী সেই পরওয়ানা এবং নির্ম্মলকে লইয়া যোধপুরী মহাল হইতে যাত্রা করিল। নির্ম্মলকুমারী অতি প্রফুল্লমনে খোজার সঙ্গে চলিলেন।

কিন্তু সহসা সে প্রফুল্লতা দূর হইল—রঙ্‌মহালের ফটকের নিকট আসিয়া খোজা ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কি বিপদ্! পালাও! পালাও!" এই বলিয়া খোজা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সমিধসংগ্রহ—স্বয়ং যম

নির্ম্মল বুঝিল না যে, কেন পলাইতে হইবে। এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিল—পলাইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, ফটকের নিকট, পরিণতবয়স্ক, শুভ্রবেশ একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিল, এটা কি ভূত-প্রেত যে, তাই ভয় পাইয়া খোজা পলাইল? নির্ম্মল নিজে ভূতের ভয়ে তেমন কাতর নহে। এ জন্য সে না পলাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল—ইতিমধ্যে সেই শুভ্রবেশ পুরুষ আসিয়া, নির্ম্মলের নিকট দাঁড়াইল। নির্ম্মলকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

নির্ম্মল বলিল, "আমি যে হই না কেন?"

শুভ্রবেশী পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইতেছিলে?"

নির্ম্মল। বাহিরে।

পুরুষ। কেন?

নি। আমার দরকার আছে।

পু। দরকার ভিন্ন কেহ কিছু করে না, তাহা আমার জানা আছে। কি দরকার?

নি। আমি বলিব না।

পু। তোমার সঙ্গে কে আসিতেছিল?

নি। আমি বলিব না।

পু। তুমি হিন্দুর মেয়ে দেখিতেছি। কি জাতি?

নি। রাজপুত।

পু। তুমি কি যোধপুরী বেগমের কাছে থাক?

নির্ম্মল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, যোধপুরী বেগমের নাম কাহারও সাক্ষাতে করিবে না—কি জানি, যদি তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে। অতএব বলিল "আমি এখানে থাকি না। আজ আসিয়াছি।"

সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হইতে আসিয়াছ?"

নির্ম্মল মনে ভাবিল, মিথ্যা কথা কেন বলিব? এ ব্যক্তি আমার কি করিবে? কার ভয়ে রাজপুতের মেয়ে মিথ্যা বলিবে? অতএব উত্তর করিল, "আমি উদয়পুর হইতে আসিয়াছি।"

তখন সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আসিযাছ?"

নির্ম্মল ভাবিল, ইহাকে বা এত পরিচয় কেন দিব? বলিল, "আপনাকে অত পরিচয় দিয়া কি হইবে? এত জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া আপনি যদি আমাকে ফটক পার করিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

পুরুষ উত্তর করিল, "তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উত্তরে যদি সন্তুষ্ট হই, তবে তোমাকে ফটক পার করিয়া দিতে পারি।"

নির্ম্মল। আপনি কে, তাহা না জানিলে আমি সকল কথা আপনাকে বলিব না।

পুরুষ উত্তর করিল "আমি আলমগীর বাদশাহ।"

তখন সেই তসবির, যাহা চঞ্চলকুমারী পদাঘাতে ভাঙ্গিয়াছিল নির্ম্মলকুমারীর মনে উদয় হইল। নির্ম্মল একটু জিব কাটিয়া মনে মনে বলিল, "হাঁ, সেই ত বটে।"

তখন নির্ম্মলকুমারী ভূমি স্পর্শ করিয়া বাদশাহকে রীতিমত সেলাম করিল। যুক্তকরে বলিল, "হুকুম ফরমাউন্।"

বাদশাহ বলিলেন, "এখানে কাহার কাছে আসিয়াছিলে?"

নির্ম্মল। হজরৎ বাদশাহ বেগম উদিপুরী সাহেবার কাছে।

বাদশাহ। কি বলিলে? উদয়পুর হইতে উদিপুরীর কাছে? কেন?

নি। পত্র ছিল।

বাদ। কাহার পত্র?

নি। মহারাণার রাজমহিষীর।

বাদ। কৈ সে পত্র?

নি। হজরৎ বেগম সাহেবাকে তাহা দিয়াছি।

বাদশাহ বড় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "আমার সঙ্গে এসো।"

নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহ উদিপুরীর মন্দিরে গমন করিলেন। দ্বারে নির্ম্মলকে দাঁড় করাইয়া, তাতারী প্রহরিণীদিগকে বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িও না।" নিজে উদিপুরীর শয্যাগৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উদিপুরী ঘোর নিদ্রাভিভূত। তাহার বিছানায় পত্রখানা পড়িয়া আছে। ঔরঙ্গজেব তাহা লইয়া পাঠ করিলেন। পত্রখানা, তখনকার রীতিমত ফার্সীতে লেখা।

পত্র পাঠ করিয়া, নিদাঘসন্ধ্যাকাদম্বিনী তুল্য ভীষণ কান্তি লইয়া ঔরঙ্গজেব বাহিরে আসিলেন। নির্ম্মলকে বলিলেন, "তুই কি প্রকারে এই মহাল মধ্যে প্রবেশ করিলি?"

নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, "বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা হউক্—আমি এ কথার উত্তর দিব না।"

ঔরঙ্গজেব বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "কি এত হেমাকৎ? আমি দুনিয়ার বাদশাহ—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুই উত্তর দিবি না?"

নির্ম্মল করজোড়ে বলিল, "দুনিয়া হুজুরের। কিন্তু রসনা আমার। আমি যাহা না বলিব, দুনিয়ার বাদশাহ তাহা কিছুতেই বলাইতে পারিবেন না।"

ঔরঙ্গ। তা না পারি, যে রসনার বড়াই করিতেছ, তা এখনই তাতারী প্রহরিণীর হাতে কাটিয়া ফেলিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নির্ম্মল। দিল্লীশ্বরের মর্‌জি! কিন্তু তাহা হইলে, যে সংবাদ আপনি খুঁজিতেছেন, তা প্রকাশের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হইবে।

ঔরঙ্গ। সেই জন্য তোমার জিভ রাখিলাম। তোমার প্রতি এই হুকুম দিতেছি যে, আগুনে জ্বালিয়া তোমাকে কাপড়ে মুড়িয়া, একটু একটু করিয়া তাতারীরা পোড়াইতে থাকুক। আমার কথায় যাহা বলিবে না, আগুনের জ্বালায় তাহা বলিবে।

নির্ম্মলকুমারী হাসিল। বলিল, "হিন্দুর মেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরিতে ভয় করে না। হিন্দুস্থানের বাদশাহ কি কখনও শুনেন নাই যে, হিন্দুর মেয়ে, হাসিতে হাসিতে স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় চড়িয়া পুড়িয়া মরে? আপনি যে মরণের ভয় দেখাইতেছেন, আমার মা মাতামহী প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সেই আগুনেই মরিয়াছেন। আমিও কামনা করি, যেন ঈশ্বরের কৃপায় আমিও স্বামীর পাশে স্থান পাইয়া আগুনেই জীবন্ত পুড়িয়া মরি।"

বাদশাহ মনে মনে বলিলেন, "বাহবা! বাহবা!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে কথার মীমাংসা পরে করিব। আপাততঃ তুমি এই মহালের একটা কামরার ভিতর চাবিবন্ধ থাক। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইলে কিছু খাইতে পাইবে না। তবে যখন নিতান্ত প্রাণ যায় বিবেচনা করিবে, তখন কবাটে ঘা মারিও, প্রহরীরা দ্বার খুলিয়া দিয়া আমার কাছে লইয়া যাইবে। তখন আমার নিকট সকল উত্তর দিলে, পান-আহার করিতে পাইবে।"

নির্ম্মল। শাহান্-শাহ! আপনি কখনও কি শুনেন নাই যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ব্রত-নিয়ম করে? ব্রত-নিয়ম জন্য এক দিন, দুই দিন, তিন দিন নিরম্বু উপবাস করে? শুনেন নাই, শরণা ধরণার জন্য অনিয়মিতকাল উপবাস করে? শুনেন নাই, তারা কখন কখন উপবাস করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে? জাঁহাপনা, এ দাসীও তা পারে। ইচ্ছা হয়, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, এ মেয়েকে ভয় দেখাইয়া কিছু হইবে না। মারিয়া ফেলিলেও কিছু হইবে না। পীড়ন করিলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে একবার প্রলোভনের শক্তিটা পরীক্ষা করা ভাল। অতএব বলিলেন, "ভাল, নাই তোমাকে পীড়ন করিলাম। তোমাকে ধন-দৌলত দিয়া বিদায় করিব। তুমি এ সকল কথা আমার নিকট যথার্থ প্রকাশ কর।"

নি। রাজপুতকন্যা যেমন মৃত্যুকে ঘৃণা করে, ধন-দৌলতকেও তেমনই। সামান্যা স্ত্রীলোক আমি—নিজগুণে আমাকে বিদায় দিন।

ঔরঙ্গ। দিল্লীর বাদশাহের অদেয় কিছু নাই। তাঁহার কাছে প্রার্থনীয় তোমার কি কিছুই নাই?

নি। আছে। নির্ব্বিঘ্নে বিদায়।

ঔরঙ্গ। কেবল সেইটি এখন পাইতেছ না। তা ছাড়া আর জগতে তোমার প্রার্থনা করিবার, কি ভয় করিবার কিছু নাই?

নি। প্রার্থনার আছে বৈ কি? কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের রত্নাগারে সে রত্ন নাই।

ঔরঙ্গ। এমন কি সামগ্রী?

নি। আমরা হিন্দু, আমরা জগতে কেবল ধর্ম্মকেই ভয় করি, ধর্ম্মই কামনা করি। দিল্লীর বাদশাহ ম্লেচ্ছ, আর দিল্লীর বাদশাহ ঐশ্বর্য্যশালী। দিল্লীর বাদশাহের সাধ্য কি যে, আমার কাম্য বস্তু দিতে পারেন, কি লইতে পারেন?

দিল্লীশ্বর নির্ম্মলকুমারীর সাহস ও চতুরতা দেখিয়া, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই কটূক্তিতে পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বটে! বটে! ঐ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" তখন তিনি একজন তাতারীকে আদেশ করিলেন, "যা! বাবর্চ্চি মহল হইতে কিছু গোমাংস আনিয়া, দুই তিন জনে ধরিয়া ইহার মুখে গুঁজিয়া দে।"

নির্ম্মল তাহাতেও টলিল না। বলিল, "জানি, আপনাদিগের সে বিদ্যা আছে। সে বিদ্যার জোরেই এই সোণার হিন্দুস্থান কাড়িয়া লইয়াছেন। জানি, গোরুর পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়া মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে—নহিলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বাহুবল, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। কিন্তু আবার একটা কথা আপনাকে মনে করিয়া দিতে হইল। শুনেন নাই কি যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ না লইয়া এক পা চলে না? আমার নিকটে এমন তীব্র বিষ আছে যে, আপনার ভৃত্যগণ গোমাংস লইয়া এ ঘরে পা দেওয়ার পরেও যদি তাহা আমি মুখে দিই, তবে জীবন্তে আর আমার মুখে কেহ গোমাংস দিতে পারিবে না। জাঁহাপনা! আপনার বড় ভাই দারা শেকোকে বধ করিয়া তাহার দুইটা কবিলা কাড়িয়া আনিতে গিয়াছিলেন —পারিয়াছিলেন কি?—অধম খ্রিষ্টিয়ানীটা আসিয়াছিল জানি, রাজপুতানী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি? আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।"

বাদশাহ বাক্যশূন্য। যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত, পৃথিবীময় যাঁহার গৌরব ঘোষিত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের গ্রাস, তিনি আজ এই অনাথা, নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত— পরাস্ত। ঔরঙ্গজেব পরাজয় স্বীকার করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ অমূল্য রত্ন, ইহাকে নষ্ট করা হইবে না। আমি ইহাকে বশীভূত করিব।" প্রকাশ্যে অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "তোমার নাম কি, পিয়ারী?"

নির্ম্মলকুমারী হাসিয়া বলিল, "ও কি জাঁহাপনা! আরও রাজপুত-মহিষীতে সাধ আছে না কি? তা সে সাধও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আমি বিবাহিতা, আমার হিন্দু স্বামী জীবিত আছেন।"

ঔ। সে কথা এখন থাক্। এখন তুমি কিছু দিন আমার এই রঙ্মহাল মধ্যে বাস কর। এ হুকুম বোধ করি তুমি অমান্য করিবে না?

নি। কেন আমাকে আটক করিতেছেন?

ঔ। তুমি এখন দেশে গেলে, আমার বিস্তর নিন্দা করিবে। যাহাতে তুমি আমার প্রশংসা করিতে পার, এক্ষণে তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিব। পরে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।

নি। যদি আপনি না ছাড়েন, তবে আমার যাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু আপনি কয়েকটি কথা প্রতিশ্রুত হইলেই আমি দিন কতক থাকিতে পারি।

ঔ। কি কি কথা?

নি। হিন্দুর অন্নজল ভিন্ন আমি স্পর্শ করিব না।

ঔ। তাহা স্বীকার করিলাম।

নি। কোন মুসলমান আমাকে স্পর্শ করিবে না।

ঔ। তাহাও স্বীকার করিলাম।

নি। আমি কোন রাজপুত বেগমের নিকটে থাকিব।

ঔ। তাহাও হইবে। আমি তোমাকে যোধপুরী বেগমের নিকট রাখিয়া দিব।

নির্ম্মলকুমারীর জন্য বাদশাহ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পুনশ্চ সন্ধিসংগ্রহের জন্য

পরদিন ঔরঙ্গজেব, জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্‌মহাল মধ্যে তদারক করিলেন, কে ইহাকে অন্তঃপুর-মধ্যে আসিতে দিয়াছে। অন্তঃপুরবাসী সমস্ত খোজা, তাতারী, বাঁদীদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহারা নির্ম্মলকে আসিতে দিয়াছিল, তাহারা তাহাকে চিনিল, কিন্তু একটা গর্হিত কাজ হইয়াছে বুঝিয়া কেহই অপরাধ স্বীকার করিল না। ঔরঙ্গজেব বা জেব-উন্নিসা কোন সন্ধানই পাইলেন না।

তখন ঔরঙ্গজেব ও জেব-উন্নিসা অপর পৌরবর্গকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, "ইহাকে আসিতে দেওয়ায় তত ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু ইহাকে কেহ আমাদের হুকুম ব্যতীত বাহির হইতে দিও না। তবে ইহাকে কেহ কোন প্রকার পীড়ন বা অপমান করিও না। বেগমদিগের মত ইহাকে মান্য করিবে। এ যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদীদিগের পাক ও জল খাইবে, মুসলমান ইহাকে ছুঁইবে না।"

তখন নির্ম্মলকুমারীকে সকলে সেলাম করিল। জেব-উন্নিসা তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া আপন মন্দিরে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। নির্ম্মলের কাছে ভিতরের কথা কিছু পাইলেন না।

সেই দিন অপরাহ্নে একজন তাতারী প্রহরিণী আসিয়া যোধপুরী বেগমকে সংবাদ দিল যে, একজন সওদাগর পাথরের জিনিস লইয়া দুর্গমধ্যে বেচিতে আসিয়াছে। কতকগুলো সে মহাল মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছে। জিনিসগুলো ভাল নহে—কোন বেগমই তাহা পসন্দ করিলেন না। আপনি কিছু লইবেন কি?

মাণিকলাল বাছিয়া বাছিয়া মন্দ জিনিস আনিয়াছিল—যে-সে বেগম যেন পসন্দ করিয়া কিনিয়া না রাখে। যখন প্রহরিণী এই কথা বলিল, তখন নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর নিকটে ছিল। সে যোধপুরীকে একটু চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আমি নিব।"

পূর্ব্বরাত্রিতে নির্ম্মলকুমারীর সঙ্গে যেরূপে বাদশাহের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছিল, নির্ম্মল সকলই তাহা যোধপুরী বেগমের কাছে বলিয়াছিল। যোধপুরী শুনিয়া নির্ম্মলের অনেক প্রশংসা এবং নির্ম্মলকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু যত্ন করিতেছিলেন। এক্ষণে নির্ম্মলের অভিপ্রায় বুঝিয়া পাথরের দ্রব্য আনাইতে হুকুম দিলেন।

প্রহরিণী বাহিরে গেলে নির্ম্মল সংক্ষেপে যোধপুরীকে মাণিকলালের সঙ্কেতকৌশল বুঝাইয়া দিল। যোধপুরী তখন বলিলেন, "তবে তুমি ততক্ষণ তোমার স্বামীকে একখানা পত্র লেখ। আমি পাথরের জিনিস পসন্দ করি। এই সুযোগে তাঁহাকে তোমার সংবাদ দিতে হইবে।" উপযুক্ত সময়ে সেই প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

নির্ম্মল দেখিল যে, সকল দ্রব্যেই মাণিকলালের চিহ্ন আছে। দেখিয়া নির্ম্মল পত্র লিখিতে বসিল। যতক্ষণ না নির্ম্মলের পত্র লেখা হইল ততক্ষণ যোধপুরী পসন্দ করিতে লাগিলেন। দ্রব্যজাতের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত মূল্যবান্ রত্নরাজির কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটা কৌটা ছিল। তাহাতে জড়াইয়া চাবি-তালা বন্ধ করিবার জন্য একটা সুবর্ণনির্ম্মিত শৃঙ্খল ছিল। নির্ম্মলের পত্র লেখা হইলে যোধপুরী অন্যের অলক্ষ্যে সেই পত্র ঐ কৌটার মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

যোধপুরী সকল দ্রব্য পসন্দ করিয়া রাখিলেন, কেবল সেই কৌটাটি না পসন্দ করিয়া ফেরৎ দিলেন। ফেরৎ দিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাবিটা ফেরৎ দিতে ভুলিয়া গেলেন।

ছদ্মবেশী সওদাগর মাণিকলাল, কেবল কৌটা ফেরৎ আসিল, তাহার চাবি আসিল না, দেখিয়া প্রত্যাশাপন্ন হইল। সে টাকা-কড়ি সব বুঝিয়া লইয়া, কৌটা লইয়া দোকানে গেল। সেখানে নির্জ্জনে কৌটার ভিতরে নির্ম্মলকুমারীর পত্র পাইল।

পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে জানিবার, পাঠকের প্রয়োজন নাই। স্থূল কথা যাহা, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। আনুষঙ্গিক কথা পরে বুঝিতে পারিবেন। পত্র পাইয়া, নির্ম্মল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মাণিকলাল স্বদেশযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দিনেই দোকান-পাট উঠাইলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এজন্য দিনকতক বিলম্ব করা স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : সমিধসংগ্রহ—জেব-উন্নিসা

এখন একবার নির্ম্মলকুমারীকে ছাড়িয়া মোগলবীর মবারকের সংবাদ লইতে হইবে। বলিয়াছি, যাহারা রূপনগর হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, ঔরঙ্গজেব তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে বা পদচ্যুত, কাহাকে বা দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মবারক সে শ্রেণীভুক্ত হয়েন নাই। ঔরঙ্গজেব সকলের নিকট তাঁহার বীরত্বের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বহাল রাখিয়াছিলেন।

জেব-উন্নিসাও সে সুখ্যাতি শুনিলেন। মনে করিলেন যে, মবারক নিজে উপযাচক হইয়া তাঁহার নিকট হাজির হইয়া সকল পরিচয় দিবে। কিন্তু মবারক আসিল না।

মবারক দরিয়াকে নিজালয়ে লইয়া আসিয়াছিল। তাহার খোজা বাঁদী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে এল্‌বাস পোষাক দিয়া সাজাইয়াছিল। যথাসাধ্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল। মবারক পবিত্র পরিণীতা পত্নী লইয়া ঘরকরনা সাজাইতেছিল।

মবারক স্বেচ্ছাক্রমে আসিল না দেখিয়া জেব-উন্নিসা বিশ্বাসী খোজা আসীরুদ্দীনের দ্বারা তাহাকে ডাকাইলেন। তথাপি মবারক আসিল না। জেব-উন্নিসার বড় রাগ হইল। বড় হেমাকৎ —বাদশাহজাদী মেহেরবানি ফরমাইয়া ইয়াদ্ করিতেছেন—তবু নফর হাজির হয় না—বড় গোস্তাকী।

দিন কতক জেব-উন্নিসা রাগের উপর রহিলেন—মনে মনে বলিলেন, "আমার ত সকলই সমান।" কিন্তু জেব-উন্নিসা তখনও জানিতেন না যে, বাদশাহজাদীরও ভুল হয় যে, খোদা বাদশাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে এক ছাঁচেই ঢালিয়াছেন;—ধন দৌলত, তক্তে তাউস্, সকলই কর্ম্মভোগ মাত্র, আর কোন প্রভেদ নাই।

সব সমান হয় না, জেব-উন্নিসারও সব সমান নয়। কিছু দিন রাগের উপর থাকিয়া, জেব-উন্নিসা মবারকের জন্য একটু কাতর হইলেন। মান খোওয়াইয়া—শাহজাদীর মান, নায়িকার মান, দুই খোওয়াইয়া, আবার সেই মবারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মবারক বলিল, "আমার বহুৎ বহুৎ তস্‌লিমাৎ, শাহজাদীর অপেক্ষা আমার নিকট বেশ্‌কিম্মৎ আর দুনিয়ায় কিছুই নাই। কেবল এক আছে। খোদা আছেন, "দীন্" আছে। গুনাহ্‌গারী আর আমা হইতে হইবে না। আমি আর মহালের ভিতর যাইব না—আমি দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছি।"

উত্তর শুনিয়া জেব-উন্নিসা রাগে ফুলিয়া আটখানা হইল এবং মবারকের ও দরিয়ার নিপাতসাধন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। ইহা বাদশাহী দস্তুর।

মহালমধ্যে নির্ম্মলকুমারীর অবস্থানে, জেব-উন্নিসার এ অভিপ্রায় সাধনের কিছু সুবিধা ঘটিল। নির্ম্মলকুমারী, ঔরঙ্গজেবের নিকট ক্রমশঃ আদরের বস্তু হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে কন্দর্প ঠাকুরের কোন কারসাজি ছিল না; কাজটা শয়তানের। ঔরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসর মত, সুখের ও আয়েশের সময়ে, "রূপনগরী নাজ্‌নীকে" ডাকিয়া কথোপকথন করিতেন। কথোপকথনের প্রধান উদ্দেশ্য, রাজসিংহের রাজকীয় অবস্থাঘটিত সংবাদ লওয়া। তবে চতুরচূড়ামণি ঔরঙ্গজেব এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন যে, হঠাৎ কেহ বুঝিতে না পারে যে, তিনি যুদ্ধকালে ব্যবহার্য্য সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু নির্ম্মলও চতুরতায় ফেলা যায় না, সে সকল কথারই অভিপ্রায় বুঝিত এবং সকল প্রয়োজনীয় কথার মিথ্যা উত্তর দিত।

অতএব ঔরঙ্গজেব তাহার কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি মনে মনে এইরূপ বিচার করিলেন,—"যেবার আমি সৈন্যের সাগরে ডুবাইয়া দিব, তাহাতে সন্দেহই করি না—রাজসিংহের রাজ্য থাকিবে না। কিন্তু তাহাতেই আমার মান বজায় হইবে না। তাহার রূপনগরী রাণীকে না কাড়িয়া আনিতে পারিলে আমার মান বজায় হইবে না। কিন্তু রাজ্য পাইলেই যে আমি রাজমহিষীকে পাইব, এমন ভরসা করা যায় না। কেন না, রাজপুতের মেয়ে, কথায় কথায় চিতায় উঠিয়া পুড়িয়া মরে, কথায় কথায় বিষ খায়। আমার হাতে পড়িবার আগে যে শয়তানী প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু এই বাঁদীটাকে যদি হস্তগত করিতে পারি—বশীভূত করিতে পারি—তবে ইহা দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া আনিতে পারিব না? এ বাঁদীটা কি বশীভূত হইবে না? আমি দিল্লীর বাদশাহ, আমি একটা বাঁদীকে বশীভূত করিতে পারিব না? না পারি, তবে আমার বাদশাহী নামোনাসেফ্।"

তার পর বাদশাহের ইঙ্গিতে জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকুমারীকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিলেন। তাঁর বেশভূষা, এল্‌বাস পোষাক, বেগমদিগের সঙ্গে সমান হইল। নির্ম্মল যাহা বলিতেন, তাহা হইত; যাহা চাহিতেন, তাহা পাইতেন। কেবল বাহির হইতে পাইতেন না।

এ সব কথা লইয়া যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলের আন্দোলন হইত। একদা হাসিয়া নির্ম্মল, যোধপুরীকে বলিল,—

সোনে কি পিঁজিরা, সোনে কি চিড়িয়া,
সোনে কি জিঞ্জির পয়ের মে,
সোনে কি চানা, সোনে কি দানা,
মট্টি কেঁও সেরেফ্ খয়ের মে।

যোধপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুই নিস্ কেন?"

নির্ম্মল বলিল, "উদয়পুরে গিয়া দেখাইব যে, মোগল বাদশাহকে ঠকাইয়া আনিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের দাহিন হাত। ঔরঙ্গজেবের আদেশ পাইয়া, জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকে লইয়া পড়িলেন। আসল কাজটা শাহজাদীর হাতে রহিল—বাদশাহ নিজে মধুর আলাপের ভারটুকু আপন হাতে রাখিলেন। নির্ম্মলের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করিতেন, কিন্তু তাহাও একটু বাদশাহী রকমের মাজাঘষা থাকিত—নির্ম্মল রাগ করিতে পারিত না, কেবল উত্তর করিত, তাও মেয়েলী রকম মাজাঘষা, তবে রূপনগরের পাহাড়ের কর্কশতাশূন্য নহে। এখনকার ইংরেজী রুচির সঙ্গে ঠিক মিলিবে না বলিয়া সেই বাদশাহী রুচির উদাহরণ দিতে পারিলাম না।

জেব-উন্নিসার কাছে নির্ম্মলের যাহা বলিবার আপত্তি নাই, তাহা সে অকপটে বলিয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে রূপনগরের যুদ্ধটা কি প্রকারে হইয়াছিল, সে কথাও পাড়িয়াছিল। নির্ম্মল যুদ্ধের প্রথম ভাগে কিছুই দেখে নাই, কিন্তু চঞ্চলকুমারীর কাছে সে সকল কথা শুনিয়াছিল। যেমন শুনিয়াছিল, জেব-উন্নিসাকে তেমনই শুনাইল। মবারক যে মোগল সৈন্যকে ডাকিয়া, চঞ্চলকুমারীব কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া, রণজয় ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তাহা বলিল; চঞ্চলকুমারী যে রাজপুতগণের রক্ষার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক দিল্লীতে আসিতে চাহিয়াছিল, তাহাও বলিল; বিষ খাইবার ভরসার কথাও বলিল, মবারক যে চঞ্চলকুমারীকে লইয়া আসিল না, তাহাও বলিল।

শুনিয়া জেব-উন্নিসা মনে মনে বলিলেন, "মবারক সাহেব! এই অস্ত্রে তোমার কাঁধ হইতে মাথা নামাইব।" উপযুক্ত অবসর পাইলে, জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবকে যুদ্ধের সেই ইতিহাস শুনাইলেন।

ঔরঙ্গজেব শুনিয়া বলিলেন, "যদি সে নফর এমন বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে আজি সে জাহান্নামে যাইবে।" ঔরঙ্গজেব কাণ্ডটা না বুঝিলেন, তাহা নহে। জেব-উন্নিসার কুচরিত্রের কথা তিনি সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতেন। কতকগুলি লোক আছে, এদেশের লোকে তাহাদের বর্ণনার সময় বলে, "ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না।" মোগল বাদশাহেরা সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারা কন্যা বা ভগিনীর দুশ্চরিত্র জানিতে পারিলে কন্যা কি ভগিনীকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগিনীর অনুগৃহীত, তাহার ঠিকানা পাইলেই কোন ছলে কৌশলে তাহার নিপাত সাধন করিতেন। ঔরঙ্গজেব অনেক দিন হইতে মবারককে জেব-উন্নিসার প্রীতিভাজন বলিয়া সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এখন কন্যার কথায় ঠিক বুঝিলেন, বুঝি কলহ ঘটিয়াছে, তাই বাদশাহজাদী, যে পিপীলিকা তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাকে টিপিয়া মারিতে চাহিতেছেন। ঔরঙ্গজেব তাহাতে খুব সম্মত। কিন্তু একবার নির্ম্মলের নিজমুখে এ সকল কথা বাদশাহের শুনা কর্ত্তব্য বোধে, তিনি নির্ম্মলকে ডাকাইলেন। ভিতরের কথা নির্ম্মল কিছু জানে না বা বুঝিল না, সকল কথাই ঠিক বলিল।

যথাবিহিত সময়ে বখ্শীকে তলব করিয়া, বাদশাহ মবারকের সম্বন্ধে আজ্ঞাপ্রচার করিলেন। বখ্শীর আজ্ঞা পাইয়া আট জন আহদী গিয়া মবারককে ধরিয়া আনিয়া বখ্শীর নিকট হাজির করিল। মবারক হাসিতে হাসিতে বখ্শীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বখ্শীর সম্মুখে দুইটি লৌহপিঞ্জর। তন্মধ্যে এক একটি বিষধর সর্প গর্জ্জন করিতেছে।

এখনকার দিনে যে রাজদণ্ডে প্রাণ হারায়, তাহাকে ফাঁসি যাইতে হয়, অন্য প্রকার রাজকীয় বধোপায় প্রচলিত নাই। মোগলদিগের রাজ্যে এরূপ অনেক প্রকার বধোপায় প্রচলিত ছিল।

কাহারও মস্তকচ্ছেদ হইত; কেহ শূলে যাইত; কেহ হাস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইত; কেহ বা বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণত্যাগ করিত। যাহাকে গোপনে বধ করিতে হইবে, তাহার প্রতি বিষপ্রয়োগ হইত।

মবারক সহাস্যবদনে বখ্‌শীর কাছে উপস্থিত হইয়া এবং দুই পাশে দুইটি বিষধর সর্পের পিঞ্জর দেখিয়া পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "কি? আমায় যাইতে হইবে?"

বখ্‌শী বিষণ্ণভাবে বলিল, "বাদশাহের হুকুম!"

মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এ হুকুম হইল, কিছু প্রকাশ পাইয়াছে কি?"

বখ্‌শী। না—আপনি কিছু জানেন না?

মবারক। এক রকম—আন্দাজী আন্দাজী। বিলম্বে কাজ কি?

বখ্‌শী। কিছু না।

তখন মবারক জুতা খুলিয়া একটা পিঞ্জরের উপর পা দিলেন। সর্প গর্জ্জাইয়া আসিয়া পিঁজরার ছিদ্রমধ্য হইতে দংশন করিল।

দংশনজ্বালায় মবারক একটু মুখ বিকৃত করিলেন। বখ্‌শীকে বলিলেন, "সাহেব! যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, মবারক কেন মরিল, তখন মেহেরবানি করিয়া বলিবেন, শাহজাদী আলম্‌জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবার ইচ্ছা।"

বখ্‌শী সভয়ে, অতি কাতরভাবে বলিলেন, "চুপ! চুপ! এটাও।"

যদি একটা সাপের বিষ না থাকে, এজন্য দুইটা সর্পের দ্বারা হন্য ব্যক্তিকে দংশন করান রীতি ছিল। মবারক তাহা জানিতেন। তিনি দ্বিতীয় পিঞ্জরের উপর পা রাখিলেন, দ্বিতীয় মহাসর্পও তাঁহাকে দংশন করিয়া তীক্ষ্ন বিষ ঢালিয়া দিল।

মবারক তখন বিষের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত ও নীলকান্তি হইয়া, ভূমে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে ডাকিতে লাগিল, "আল্লা আক্‌বর! যদি কখনও তোমার দয়া পাইবার যোগ্য কার্য্য করিয়া থাকি, তবে এই সময়ে দয়া কর।"

এইরূপে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে, তীব্র সর্পবিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া, মোগলবীর মবারক আলি প্রাণত্যাগ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : সব সমান

রঙ্‌মহালে সকল সংবাদই আসে—সকল সংবাদই জেব-উন্নিসা নিয়া থাকেন—তিনি নাএবে বাদশাহ। মবারকের বধসংবাদও আসিয়া পৌঁছিল।

জেব-উন্নিসা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইবেন। সহসা দেখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ আসিবামাত্র সহসা তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—এ শুক্‌না মাটিতে কখনও জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল তাই নহে, গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় সে জল গড়াইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। জেব-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নখচিত পালঙ্কে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কৈ শাহজাদী? হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নদণ্ডভূষিত পালঙ্কে শুইলেও ত চক্ষুর জল থামে না! তুমি যদি বাহিরে গিয়া দিল্লীর সহরতলীর ভগ্ন কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, কত লোক ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া কত হাসিতেছে। তোমার মত কান্না কেহই কাঁদিতেছে না।

জেব-উন্নিসার প্রথমে কিছু বোধ হইল যে, তাঁহার আপনার সুখের হানি তিনি আপনিই করিয়াছেন। ক্রমশঃ বোধ হইল যে, সব সমান নহে—বাদশাহজাদীরাও ভালবাসে; জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, নারীদেহ ধারণ করিলেই ঐ পাপকে হৃদয়ে আশ্রয় দিতে হয়। জেব-উন্নিসা আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তাকে এত ভালবাসিতাম, সে কথা এত দিন জানিতে পারি নাই কেন?" কেহ তাহাকে বলিয়া দিল না যে, ঐশ্বর্য্যমদে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, রূপের গর্ব্বে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, ইন্দ্রিয়ের দাসী হইয়া তুমি ভালবাসাকে চিনিতে পার নাই। তোমার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে—কেহ যেন তোমাকে দয়া না করে।

কেহ বলিয়া না দিক—তার নিজের মনে এ সকল কথা কিছু কিছু আপনা আপনি উদয় হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে এমনও মনে হইল, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি আছে। যদি থাকে, তবে বড় অধর্ম্মের কাজ হইয়াছে। শেষ ভয় হইল, ধর্ম্মাধর্ম্মের পুরস্কার দণ্ড যদি থাকে? তাহার পাপের যদি দণ্ডদাতা কেহ থাকেন? তিনি বাদশাহজাদী বলিয়া জেব-উন্নিসাকে মার্জ্জনা করিবেন কি? সম্ভব নয়। জেব-উন্নিসার মনে ভয়ও হইল।

দুঃখে, শোকে, ভয়ে জেব-উন্নিসা দ্বার খুলিয়া তাহার বিশ্বাসী খোজা আসিরুদ্দীনকে ডাকাইল। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাপের বিষে মানুষ মরিলে তার কি চিকিৎসা আছে?"

আসিরুদ্দীন বলিল, "মরিলে আবার চিকিৎসা কি?"

জেব। কখনও শুন নাই?

আসি। হাতেম মাল এমনই একটা চিকিৎসা করিয়াছিল, কাণে শুনিয়াছি, চক্ষে দেখি নাই

জেব-উন্নিসা একটু হাঁপ ছাড়িল। বলিল, "হাতেম মালকে চেন?"

আসি। চিনি।

জেব। সে কোথায় থাকে?

আসি। দিল্লীতে থাকে।

জেব। বাড়ী চেন?

আসি। চিনি।

জেব। এখন সেখানে যাইতে পারিবে?

আসি। হুকুম দিলেই পারি।

জেব। আজ মবারক আলি (একটু গলা কাঁপিল) সর্পাঘাতে মরিয়াছে জান?

আসি। জানি।

জেব। কোথায় তাহাকে গোর দিয়াছে, জান?

আসি। দেখি নাই, কিন্তু যে গোরস্থানে গোর দিবে, তাহা আমি জানি। নূতন গোর, ঠিকানা করিয়া লইতে পারিব।

জেব। আমি তোমাকে দুই শত আশরফি দিতেছি। এক শ হাতেম মালকে দিবে, এক শ আপনি লইবে। মবারক আলির গোর খুঁড়িয়া মোরদা বাহির করিয়া, চিকিৎসা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে। যদি বাঁচে, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিবে। এখনই যাও।

আশরফি লইয়া খোজা আসিরুদ্দীন তখনই বিদায় হইল।

নবম পরিচ্ছেদ : সমিধ-সংগ্রহ—দরিয়া

আর একবার রঙ্মহালে পাথরের দ্রব্য বেচিয়া, মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর খবর লইল। এবারও সেই পাথরের কৌটা চাবি-বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চাবি খুলিয়া, নির্ম্মল পাইল—সেই দৌত্য পারাবত। নির্ম্মল সেটিকে রাখিল। পত্রের দ্বারা, পূর্ব্বমত সংবাদ পাঠাইল। লিখিল, "সব মঙ্গল। তুমি এখন যাও, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি বাদশাহের সঙ্গে যাইব।"

মাণিকলাল তখন দোকান-পাট উঠাইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল। রাত্রি প্রভাত হইবার তখন অল্প বিলম্ব আছে। দিল্লীর অনেক "দর্ওয়াজা"। পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এজন্য মাণিকলাল আজমীর দর্ওয়াজায় না গিয়া, অন্য দর্ওয়াজায় চলিল। পথিপার্শ্বে একটা সামান্য গোরস্থান আছে। একটা গোরের নিকট দুইটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। মাণিকলালকে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে দেখিয়া, সেই দুইটা মানুষ দৌড়াইয়া পলাইল। মাণিকলাল তখন ঘোড়া হইতে নামিয়া নিকটে গিয়া দেখিল। দেখিল যে, গোরের মাটি উঠাইয়া, উহারা মৃতদেহ বাহির করিয়াছে। মাণিকলাল, সেই মৃতদেহ খুব যত্নের সহিত, উদয়োন্মুখ ঊষার আলোকে পর্য্যবেক্ষণ করিল। তার পর কি বুঝিয়া ঐ দেহ আপনার অশ্বের উপর তুলিয়া বাঁধিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া আপনি পদব্রজে চলিল।

মাণিকলাল দিল্লীর দর্ওয়াজার বাহিরে গেল। কিছু পরে সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাণিকলাল ঐ মৃতদেহ ঘোড়া হইতে নামাইয়া, জঙ্গলের ছায়ায় লইয়া গিয়া রাখিল। এবং

আপনার পেঁটরা হইতে একটি ঔষধের বড়ি বাহির করিয়া, তাহা কোন অনুপান দিয়া মাড়িল। তার পর ছুরি দিয়া মৃতদেহটা স্থানে স্থানে একটু একটু চিরিয়া, ছিদ্রমধ্যে সেই ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিল। এবং জিবে ও চক্ষুতে কিছু কিছু মাখাইয়া দিল। দুই দণ্ড পরে আবার ঐরূপ করিল। এইরূপ তিন বার ঔষধ প্রযোগ করিলে মৃত ব্যক্তি নিশ্বাস ফেলিল। চারি বারে সে চক্ষু চাহিল ও তাহার চৈতন্য হইল। পাঁচ বারে সে উঠিয়া বসিয়া কথা কহিল।

মাণিকলাল একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করাইয়াছিল। তাহা মবারককে পান করাইল। মবারক ক্রমশঃ দুগ্ধ পান করিয়া সবল হইলে, সকল কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে বাঁচাইল? আপনি?"

মাণিকলাল বলিল, "হাঁ।"

মবারক বলিল, "কেন বাঁচাইলেন? আপনাকে আমি চিনিয়াছি। আপনার সঙ্গে রূপনগরের পাহাড়ে যুদ্ধ করিয়াছি। আপনি আমায় পরাভব করিয়াছিলেন।"

মাণিক। আমিও আপনাকে চিনিয়াছি। আপনিই মহারাণাকে পরাজয় করেন। আপনার এ অবস্থা কেন ঘটিল?

মবারক। এখন বলিবার কথা নহে। সময়ান্তরে বলিব। আপনি কোথায় যাইতেছেন—উদয়পুরে?

মাণিক। হাঁ।

মবা। আমাকে সঙ্গে লইবেন? দিল্লীতে আমার ফিরিবার যো নাই, তা বুঝিতেছেন বোধ হয়। আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত।

মাণিক। সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। কিন্তু আপনি এখন বড় দুর্ব্বল।

মবা। সন্ধ্যা লাগায়েৎ শক্তি পাইতে পারি। ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবেন কি?

মাণিক। করিব।

মবারককে আরও কিছু দুগ্ধাদি খাওয়াইল। গ্রাম হইতে মাণিকলাল একটা টাটু কিনিয়া আনিল। তাহার উপর মবারককে চড়াইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে ঘোড়া পাশাপাশি করিয়া, নির্জ্জনে মবারক জেব-উন্নিসার সকল কথা মাণিকলালকে বলিল। মাণিকলাল বুঝিল যে, জেব-উন্নিসার কোপানলে মবারক ভস্মীভূত হইয়াছে।

এদিকে আসিরুদ্দীন ফিরিয়া আসিয়া জেব-উন্নিসাকে জানাইল যে, কিছুতেই বাঁচান গেল না। জেব-উন্নিসা আতরমাখা রুমালখানি চক্ষুতে দিয়াছিল, এখন পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া, চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।

যে দুঃখ কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার নয়, তাহা সহ্য করা বড়ই কষ্ট। বাদশাহজাদীর সেই দুঃখ হইল। জেব-উন্নিসা ভাবিল, "যদি চাষার মেয়ে হইতাম!"

এই সময়ে কক্ষদ্বারে বড় গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কেহ কক্ষপ্রবেশ করিবার জন্য জিদ করিতেছে—প্রতিহারী তাহাকে আসিতে দিতেছে না। জেব-উন্নিসা যেন দরিয়ার গলা শুনিলেন। প্রতিহারী তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। দরিয়া প্রতিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তরবারি ছিল। সে জেব-উন্নিসাকে কাটিবার জন্য তরবারি উঠাইল। কিন্তু সহসা তরবারি ফেলিয়া দিয়া জেব উন্নিসার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল। বলিল, "বহুৎ আচ্ছা,—চোখে জল!" এই বলিয়া উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। জেব-উন্নিসা প্রতিহারীকে ডাকিয়া উহাকে ধৃত করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রতিহারী তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। প্রতিহারী তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহার বস্ত্র ধরিল। দরিয়া বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নগ্নাবস্থায় পলায়ন করিল। সে তখন ঘোর উন্মাদগ্রস্ত। মবারকের মৃত্যুসংবাদ সে শুনিয়াছিল।

সপ্তম খণ্ড

অগ্নি জ্বলিল

প্রথম পরিচ্ছেদ : দ্বিতীয় Xerxes—দ্বিতীয় Platæs

রাজসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ঔরঙ্গজেবের যাত্রা করিতে যে বিলম্ব হইল, তাহার কারণ, তাঁহার সেনোদ্যোগ অতি ভয়ঙ্কর। দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তিনি ব্রহ্মপুত্র-পার হইতে বাহ্লীক পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে কেরল ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত, যেখানে যত সেনা ছিল, সব এই মহাযুদ্ধে আহূত করিলেন। দক্ষিণাপথের মহাসৈন্য, গোলকুণ্ডা, বিজয়পুর, মহারাষ্ট্রের সমরের অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাতে, দ্বিতীয় বৃত্রাসুরের ন্যায় যাহার পৃষ্ঠ অশনিদুর্ভেদ্য হইয়াছিল—তাহা লইয়া বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম, দক্ষিণ হইতে উদয়পুর ভাসাইতে আসিলেন। অন্য পুত্র আজম শাহ,—বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি, পূর্ব্বভারতবর্ষের মহতী চমূ লইয়া মেবারের পর্ব্বতমালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পশ্চিমে মুলতান হইতে পঞ্জাব-কাবুল-কাশ্মীরের অজেয় যোদ্ধৃবর্গ লইয়া, অপর পুত্র আকব্বর শাহ আসিয়া, সেনাসাগরের অনন্ত স্রোতে আপনার সেনা-সাগর মিশাইলেন। উত্তরে স্বয়ং শাহান্ শাহ বাদশাহ দিল্লী হইতে অপরাজেয় বাদশাহী সেনা লইয়া উদয়পুরের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য মেবারে দর্শন দিলেন। সাগরমধ্যস্থ উন্নত পর্ব্বতশিখরসদৃশ সেই অনন্ত মোগল সেনাসাগরমধ্যে উদয়পুর শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তসর্পশ্রেণীপরিবেষ্টিত গরুড়, যতটুকু শত্রুভীত হওয়ার সম্ভাবনা, রাজসিংহ এই সাগরসদৃশ মোগলসেনা দেখিয়া ততটুকুই ভীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এরূপ সেনোদ্যোগ কুরুক্ষেত্রের পর হইয়াছিল কি না বলা যায় না। যে সেনা চীন, পারস্য বা রুষ জয়ের জন্যও আবশ্যক হয় না—ক্ষুদ্র উদয়পুর জয়ের জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহ, তাহা রাজপুতানায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একবার মাত্র পৃথিবীতে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। যখন পারস্য পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজ্য ছিল, তখন তদধিপতি সের (Xerxes) পঞ্চাশ লক্ষ লোক লইয়া গ্রীস নামা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন। থার্ম্মপলিতে Leonidas, সালামিসে Themistocles এবং প্লাতীয়ায় Pausanias তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, তাঁহাকে দূর করিয়া দিল- শৃগাল-কুক্কুরের মত সের পলাইয়া আসিলেন। সেইরূপ ঘটনা পৃথিবীতলে এই দ্বিতীয়বার মাত্র ঘটিয়াছিল। বহু লক্ষ সেনা লইয়া ভারতপতি- সেরের অপেক্ষাও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজা—রাজপুতানার একটু ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন—রাজসিংহ তাঁহাকে কি করিলেন, তাহা বলিতেছি।

যুদ্ধবিদ্যা, ইউরোপীয় বিদ্যা। আসিয়া খণ্ডে, ভারতবর্ষে ইহার বিকাশ কোন কালে নাই। যে পুরাণেতিহাসবর্ণিত আর্য্যবীরগণের এত খ্যাতি শুনি, তাহাদের কৌশল কেবল তীরন্দাজী ও লাঠিয়ালিতে। ইতিহাসলেখক ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যা কি, তাহা বুঝিতেন না বলিয়াই হৌক, আর যুদ্ধবিদ্যা বস্তুতঃ প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ছিল না বলিয়াই হৌক, রামচন্দ্র অর্জ্জুনাদির সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, শকাদিত্য, শিলাদিত্য—কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। যাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, মহম্মদ কাসিম, গজনবী মহম্মদ, শাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন, বাবর, তৈমুর, নাদের, শের—কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। বোধ হয়, মুসলমান লেখকেরাও ইহা বুঝিতেন না। আকব্বরের সময় হইতে এই সেনাপতিত্বের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। আকব্বর, শিবজী, আহাম্মদ আবদালী, হৈদর আলি, হরিসিং প্রভৃতিতে সেনাপতিত্বের লক্ষণ, রণপাণ্ডিত্যের লক্ষণ দেখা যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপণ্ডিতের কথা আছে, রাজসিংহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইউরোপেও এরূপ রণপণ্ডিত অতি অল্পই জন্মিয়াছিল। অল্প সেনার সাহায্যে এরূপ মহৎ কার্য্য ওলন্দাজ বীর মুকাখ্য উইলিয়মের পর পৃথিবীতে আর কেহ করে নাই।

সে অপূর্ব্ব সেনাপতিত্বের পরিচয় দিবার এ স্থল নহে। সংক্ষেপে বলিব।

চতুর্ভাগে বিভক্ত ঔরঙ্গজেবের মহতী সেনা সমাগতা হইলে, রণপাণ্ডিতের যাহা কর্ত্তব্য, রাজসিংহ প্রথমেই তাহা করিলেন। পর্ব্বতমালার বাহিরে, রাজ্যের যে অংশ সমতল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া, পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া সেনা সংস্থাপিত করিলেন। তিনি নিজ সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহের কর্তৃত্বাধীনে পর্ব্বতশিখরে সংস্থাপিত করিলেন। দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহের অধীনে পশ্চিমে সংস্থাপিত করিলেন; সে দিকের পথ খোলা থাকে, অন্যান্য রাজপুতগণ সেই পথে প্রবেশ করিয়া সাহায্য করেন, ইহাও অভিপ্রেত। নিজে তৃতীয় ভাগ লইয়া পূর্ব্বদিকে নয়ন নামে গিরিসঙ্কটমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

আজম শাহ সৈন্য লইয়া যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে ত পর্ব্বতমালায় তাঁহার গতিরোধ হইল। আরোহণ করিবার সাধ্য নাই; উপর হইতে গোলা ও শিলাবৃষ্টি হয়। ক্রিয়াবাড়ীর দ্বার বন্ধ হইলে, কুকুর যেমন রুদ্ধ দ্বার ঠেলাঠেলি করে, কিছু করিতে পারে না, তিনি সেইরূপ পার্ব্বত্য দ্বার ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন—ঢুকিতে পাইলেন না।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আজমীরে আকব্বরের মিলন হইল। পিতাপুত্র সৈন্য মিলাইয়া পর্ব্বত-মালার মধ্যে যেখানে তিনটি পথ খোলা, সে দিকে আসিলেন। এই তিনটি পথ, গিরিসঙ্কট। একটির নাম দোবারি; আর একটি দয়েলবারা, আর একটি পূর্ব্বকথিত নয়ন। দোবারিতে পৌঁছিলে পর, ঔরঙ্গজেব, আকব্বরকে ঐ পথে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া আগে আগে যাইতে অনুমতি করিয়া উদয়সাগর নামে বিখ্যাত সরোবরতীরে শিবির সংস্থানপূর্ব্বক স্বয়ং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করিলেন।

শাহজাদা আকব্বর, পার্ব্বত্য পথে উদয়পুরে প্রবেশ করিতে চলিলেন। জনপ্রাণী তাঁহার গতিরোধ করিল না। রাজপ্রাসাদমালা, উপবনশ্রেণী, সরোবর, তন্মধ্যস্থ উপদ্বীপ সকল দেখিলেন, কিন্তু মনুষ্য মাত্র দেখিতে পাইলেন না। সমস্ত নীরব। আকব্বর তখন শিবির সংস্থাপন করিলেন; মনে করিলেন যে, তাঁহার ফৌজের ভয়ে দেশের লোক পলাইয়াছে। মোগলশিবিরে আমোদ-প্রমোদ হইতে লাগিল। কেহ ভোজনে, কেহ খেলায়, কেহ নেমাজে রত। এমন সময়ে সুপ্ত পথিকের উপর যেমন বাঘ লাফাইয়া পড়ে, কুমার জয়সিংহ তেমনই শাহজাদা আকব্বরের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। বাঘ, প্রায় সমস্ত মোগলকে দংষ্ট্রামধ্যে পুরিল—প্রায় কেহ বাঁচিল না। পঞ্চাশ সহস্র মোগলের মধ্যে অল্পই ফিরিল। শাহাজাদা গুজরাট অভিমুখে পলাইলেন।

মাজুম শাহ, যাঁহার নামান্তর শাহ আলম, তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্যরাশি লইয়া, আহম্মদাবাদ ঘুরিয়া, পর্ব্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পথ, গণরাও নামক পার্ব্বত্য পথ। তিনি সেই পথ উত্তীর্ণ হইয়া কাঁকরলির সমীপবর্ত্তী সরোবর ও রাজ-প্রাসাদমালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আর পথ নাই। পথ কবিয়া অগ্রসর হইতেও পারেন না। তাহা হইলে রাজপুতেরা তাঁহার পশ্চাতেব পথ বন্ধ করিবে—রসদ আনিবার আর উপায় থাকিবে না—না খাইয়া মরিবেন। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি, তাঁহারা জানেন যে, হাতে মারিলে যুদ্ধ হয় না—পেটে মারিতে হয়। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি, তাঁহারা জানেন যে, পেট চলিবার উপায় বজায় রাখিয়া—হাত চালান চাই। শিখেরা আজিও রোদন করিয়া বলে, শিখ সেনাপতিরা শিখসেনার রসদ বন্ধ করিল বলিয়া শিখ পরাজিত হইল। সার বার্টল্ ফ্রিয়র একদা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে জানে না বলিয়া ঘৃণা করিও না—বাঙ্গালী একদিনে সমস্ত খাদ্য লুকাইতে পারে। শাহ আলম যুদ্ধ বুঝিতেন, সুতরাং আর অগ্রসর হইলেন না।

রাজসিংহের সেনাসংস্থাপনের গুণে (এইটিই সেনাপতির প্রধান কার্য্য) বাঙ্গালার সেনা ও দাক্ষিণাত্যের সেনা, বৃষ্টিকালে কপিদলের মত—কেবল জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। মুলতানের সেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া ঝড়ের মুখে ধূলার মত কোথায় উড়িয়া গেল। বাকি খোদ বাদশাহ—দুনিয়াবাজ বাদশাহ আলমগীর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নয়নবহ্নিও বুঝি জ্বলিয়াছিল

শাহজাদা আকব্বর শাহকে আগে পাঠাইয়া, খোদ বাদশাহ উদয়সাগরতীরে শিবির ফেলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পরিব্রাজক, মোগলদিগের দিল্লী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, দিল্লী একটি

বৃহৎ শিবির মাত্র। পক্ষান্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মোগল বাদশাহদিগের শিবির একটি দিল্লী নগরী। নগরের যেমন চক, তেমনই বড় বড় চক সাজাইয়া তাম্বু পাতা হইত। এমন অসংখ্য চত্বরশ্রেণীতে একটি বস্ত্রনির্ম্মিতা মহানগরীর সৃষ্টি হইত। সকলের মধ্যে বাদশাহের তাম্বুর চক। দিল্লীতে যেমন মহার্ঘ হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে বাদশাহ বাস করিতেন, তেমনই মহার্ঘ হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে এখানেও বাস করিতেন; তেমনই দরবার, আমখাস, গোসলখানা,* রঙ্মহাল। এই সকল বাদশাহী তাম্বু কেবল বস্ত্রনির্ম্মিত নহে। ইহার লৌহ পিত্তলের সজ্জা ছিল—এবং ইহাতে দ্বিতল ত্রিতল কক্ষও থাকিত। সম্মুখে দিল্লীর দুর্গের ফটকের ন্যায় বড় ফটক। বাদশাহী তাম্বু সকলের বস্ত্রনির্ম্মিত প্রাচীর বা পট পাদক্রোশ দীর্ঘ, সমস্তই চারু কারুকার্য্যখচিত পট্ট-বস্ত্রনির্ম্মিত। যেমন দুর্গপ্রাচীরে বুরুজ গম্বুজ প্রভৃতি থাকিত, ইহাতে তাহা ছিল। পিত্তলের স্তম্ভের দ্বারা এই প্রাচীর রক্ষিত হইত। কক্ষসকলের বাহিরে উজ্জ্বল রক্তিম পটের শোভা, ভিতরে সমস্ত দেয়াল "ছবি"মোড়া। ছবি, আমরা এখন যাহাকে বলি তাই, অর্থাৎ কাচের পরকলার ভিতর চিত্র। দরবার-তাম্বুতে শিরোপরে সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপ—নিম্নে বিচিত্র গালিচা, মধ্যে রত্নমণ্ডিত রাজসিংহাসন। চারি দিকে অস্ত্রধারিণী তাতারসুন্দরীগণের প্রহরা।

রাজপ্রাসাদাবলীর পরে আমীর ওমরাহদিগের পটমণ্ডপরাজির শোভা। এমন শোভা অনেক ক্রোশ ব্যাপিয়া। কোন পটনির্ম্মিত অট্টালিকা রক্তবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি শ্বেত, কোনটি হরিৎকপিশ, কোনটি নীল; সকলের সুবর্ণকলস চন্দ্রসূর্য্যের কিরণে ঝলসিতে থাকে। তীরে, এই সকলের চারিদিকে, দিল্লীর চকের ন্যায় বিচিত্র পণ্যবীথিকা—বাজারের পর বাজার। সহসা বাদশাহের শুভাগমনে উদয়সাগরতীরে এই রমণীয় মহানগরীর সৃষ্টি হইল। দেখিয়া লোক বিস্ময়াপন্ন হইল।

বাদশাহ যখন শিবিরে আসিতেন, তখন অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই সঙ্গে আসিত। বেগমেরা সকলেই আসিত। এবারও আসিয়াছিল। যোধপুরী, উদিপুরী, জেব-উন্নিসা সকলেই আসিয়াছিল। যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলকুমারীও আসিয়াছিল। দিল্লীর রঙ্মহালে যেমন তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মন্দির ছিল, শিবিরের রঙ্মহালেও তেমনই তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মন্দির ছিল।

এই সুখের শিবিরে, ঔরঙ্গজেব রাত্রিকালে যোধপুরীর মহালে আসিয়া সুখে কথোপকথন করিতেছেন। নির্ম্মলকুমারীও সেখানে উপস্থিত।

"ইম্‌লি বেগম!" বলিয়া বাদশাহ নির্ম্মলকে ডাকিলেন। নির্ম্মলকে তিনি ইতিপূর্ব্বে "নিম্‌লি বেগম" বলিতেন, কিন্তু বাক্যের যন্ত্রণা ভুগিয়া এক্ষণে "ইম্‌লি বেগম" বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ নির্ম্মলকে বলিলেন, "ইম্‌লি বেগম! তুমি আমার, না রাজপুতের?" নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, "দুনিয়ার বাদশাহ দুনিয়ার বিচার করিতেছেন, এ কথারও তিনি বিচার করুন।"

ঔরঙ্গ। আমার বিচারে এই হইতেছে যে, তুমি রাজপুতের কন্যা, রাজপুত তোমার স্বামী, তুমি রাজপুতমহিষীর সখী—তুমি রাজপুতেরই।

নির্ম্মল। জাঁহাপনা! বিচার কি ঠিক হইল? আমি রাজপুতের কন্যা বটে, কিন্তু হজরৎ যোধপুরীও তাই। আপনার পিতামহী ও প্রপিতামহীও তাই—তাঁহারা মোগল বাদশাহের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না কি?

ঔরঙ্গ। ইহারা মোগল বাদশাহের বেগম, তুমি রাজপুতের স্ত্রী।

নির্ম্মল। (হাসিয়া) আমি শাহান্‌শাহ আলম্‌গীর বাদশাহের ইম্‌লি বেগম।

ঔরঙ্গ। তুমি রূপনগরীর সখী।

নির্ম্মল। যোধপুরীরও তাই।

ঔরঙ্গ। তবে তুমি আমার?

নির্ম্মল। আপনি যেমন বিবেচনা করেন।

ঔ। আমি তোমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাই। তাহাতে আমার উপকার আছে,

* যাহাকে মোগল বাদশাহেরা গোসলখানা বলিতেন, তাহাতে আধুনিক বৈঠকখানার মত কার্য্য হইত। সেইটি আয়েশের স্থান।

রাজসিংহের অনিষ্ট আছে। এমন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা করিবে?

নি। কি কার্য্য, তাহা না জানিলে আমি বলিতে পারি না। আমি কোন দেবতা ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে পারিব না।

ঔ। আমি তোমাকে সে সব কিছু করিতে বলিব না। আমি উদয়পুর নগর দখল করিব—রাজসিংহের রাজপুরী দখল করিব, সে সকল বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুরী দখল হইলে পর রূপনগরীকে হস্তগত করিতে পারিব কি না সন্দেহ। তুমি সেই বিষয়ে সহায়তা করিবে।

নি। আমি আপনার নিকট গঙ্গাজী যমুনাজীর শপথ করিতেছি যে, আপনি যদি উদয়পুরের রাজপুরী দখল করেন, তবে আমি চঞ্চলকুমারীকে আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিব।

ঔ। সে কথা বিশ্বাস করি; কেন না, তুমি নিশ্চয় জান যে যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে, তাহাকে টুকরা টুকরা কাটিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নি। পারেন কি না, সে বিষয়ের বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করিব না। তবে আপনি পুরী অধিকার করার পর তাহাকে আমি জীবিত পাইব কি না সন্দেহ। রাজপুতমহিষীদিগের রীতি এই যে, শত্রুর হাতে পড়িবার আগে চিতায় পুড়িয়া পুড়িয়া মরে। তাহাকে জীবিত পাইব না বলিয়াই এ কথা স্বীকার করিতেছি। নহিলে আমা হইতে চঞ্চলকুমারীর কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

ঔ। ইহাতে অনিষ্ট কি? সে ত বাদশাহের বেগম হইবে।

নির্ম্মল উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে খোজা আসিয়া নিবেদন করিল, "পেশকার দরবারে হাজির, জরুরি আরজি পেশ করিবে। হজরৎ শাহজাদা আকব্বর শাহের সংবাদ আসিয়াছে।"

ঔরঙ্গজেব অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দরবারে গেলেন। পেশকার আরজি পেশ করিল। ঔরঙ্গজেব শুনিলেন, আকব্বরের পঞ্চাশ হাজার মোগল সেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রায় নিঃশেষে নিহত হইয়াছে। হতাবশিষ্ট কোথায় পলায়ন করিয়াছে, কেহ জানে না।

ঔরঙ্গজেব তখনই শিবির ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

আকব্বরের সংবাদ রঙমহালেও পৌঁছিল। শুনিয়া নির্ম্মলকুমারী পেশোয়াজ পরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোধপুরী বেগমের নিকট রূপনগরী নাচের মহলা দিল।

বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলকুমারী ভাল মানুষ হইয়া বসিলে বাদশাহ তাহাকে তলব করিলেন। নির্ম্মল হাজির হইলে বাদশাহ বলিলেন, "আমরা তাম্বু ভাঙ্গিতেছি—লড়াইয়ে যাইব—তুমি কি এখন উদয়পুর যাইতে চাও?"

নি। না, এক্ষণে আমি ফৌজের সঙ্গে যাইব। যাইতে যাইতে যেখানে সুবিধা বুঝিব, সেইখান হইতে চলিয়া যাইব।

ঔরঙ্গজেব একটু দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কেন যাইবে?"

নির্ম্মল বলিল, "শাহান্‌শাহের হুকুম।"

ঔরঙ্গজেব প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "আমি যদি যাইতে না দিই, তুমি কি চিরদিন আমার রঙমহালে থাকিতে সম্মত হইবে?"

নির্ম্মলকুমারী যুক্তকরে বলিল, "আমার স্বামী আছেন।"

ঔরঙ্গজেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর—যদি সে স্বামী ত্যাগ কর—তবে উদিপুরী অপেক্ষা তোমাকে গৌরবে রাখিব।"

নির্ম্মল একটু হাসিয়া, অথচ সসম্ভ্রমে বলিল, "তাহা হইবে না, জাঁহাপনা!"

ঔ। কেন হইবে না? কত রাজপুতরাজকন্যা ত মোগলের ঘরে আসিয়াছে।

নি। তাহারা কেহ স্বামী ত্যাগ করিয়া আসে নাই।

ঔ। যদি তোমার স্বামী না থাকিত, তাহা হইলে আসিতে?

নি। এ কথা কেন?

ঔ। কেন, তাহা বলিতে আমার লজ্জা করে, আমি তেমন কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখন কাহাকেও ভালবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই

ভালবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়—পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়—একটু স্নিগ্ধ হয়।

নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবের কথায় বিশ্বাস করিল—কেন না, ঔরঙ্গজেবের কন্ঠের স্বর বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া বোধ হইল। নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবের জন্য কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল, "জাঁহাপনা, এ বাঁদী এমন কি কাজ করিয়াছে যে, সে আপনার ভালবাসার যোগ্য হয়?"

ঔ। তাহা বলিতে পারি না। তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার আর নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নও। বোধ করি, আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখন পাই নাই, সেই জন্য। বোধ করি, তোমার বুদ্ধি, চতুরতা, আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। যাই হোক, আলমগীর বাদশাহ তোমার ভিন্ন আর কাহারও কখন বশীভূত হয় নাই। আর কাহারও চক্ষুর কটাক্ষে মোহিত হয় নাই।

নি। শাহানশাহ! আমাকে একদা রূপনগরের রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তুমি কাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর?" আমি বলিয়াছিলাম, আলমগীর বাদশাহকে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, আমি বাল্যকালে বাঘ পুষিয়াছিলাম, বাঘকে বশ করাতেই আমার আনন্দ ছিল। বাদশাহকে বশ করিতে পারিলে আমার সেই আনন্দ হইবে। আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে দীন-দরিদ্রকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাতেই আমি সুখী। এক্ষণে আমায় বিদায় দিন।

ঔরঙ্গজেব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না—কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালবাসিয়াছি—কিন্তু তোমাকে পাইলাম না। তোমায় ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না—ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিব না। তুমি যাও। আমাকে স্মরণ রাখিও। যদি কখনও আমা হইতে তোমার কোন উপকার হয়, আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।"

নির্ম্মল কুর্ণিশ করিল। বলিল, "আমার একটি মাত্র ভিক্ষা রহিল। যখন উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি করিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করিব, তখন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন।"

ঔরঙ্গজেব বলিল, "সে কথার বিচার সেই সময়ে হইবে।"

তখন নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবকে তাহার কপোত দেখাইল। বলিল, "এই শিক্ষিত পায়রা আপনি রাখিবেন। যখন এ দাসীকে আপনি স্মরণ করিবেন, এই পায়রাটি আপনি ছাড়িয়া দিবেন। ইহা দ্বারা আমার নিবেদন আপনাকে জানাইব। আমি এক্ষণে সৈন্যের সঙ্গে রহিলাম। যখন আমার বিদায় লইবার সময় হইবে, বেগম সাহেবা যেন আমাকে বিদায় দেন, এই অনুমতি তাঁর প্রতি থাক।"

তখন ঔরঙ্গজেব সৈন্য চালনার ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। নির্ম্মলের মত কথোপকথনে সাহস, বাক্-চাতুর্য্য এবং স্পষ্টবক্তৃত্ব মোগল বাদশাহ আর কোথাও দেখেন নাই। যদি কোন রাজা,—শিবজী বা রাজসিংহ, যদি কোন সেনাপতি—দিলীর কি তয়বার, যদি কোন শাহজাদা—আজিম কি আকব্বর, এরূপ সাহসে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিত, ঔরঙ্গজেব তাহা সহ্য করিতেন না। কিন্তু রূপবতী যুবতী, সহায়হীনা নির্ম্মলের কাছে তাহা মিষ্ট লাগিত। বুড়ার উপর যতটুকু কন্দর্পের অত্যাচার হইতে পারে, বোধ হয় তাহা হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব প্রেমান্ধের মত বিচ্ছেদে শোকে শোকাকুল না হইয়া একটু বিষণ্ণ হইলেন মাত্র। ঔরঙ্গজেব মার্ক্ আন্তনি বা অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাদশাহ বহ্নিচক্রে

প্রভাতে বাদশাহী সেনা কুচ করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বাগ্রে পথপরিষ্কারক সৈন্য পথ পরিষ্কারের জন্য সশস্ত্রে ধাবিত। তাহাদের অস্ত্র কোদালি, কুড়ালি, দা ও কাটারি। তাহারা

সম্মুখের গাছ সকল কাটিয়া, সরাইয়া, খানা-পয়গার বুজাইয়া, মাটি চাঁচিয়া, বাদশাহী সেনার জন্য প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। সেই প্রশস্ত পথে কামানের শ্রেণী, শকটের উপর আরূঢ় হইয়া ঘড়্-ঘড়্ হড়-হড়্ করিয়া চলিল,—সঙ্গে গোলন্দাজ সেনা। অসংখ্য গোলন্দাজি গাড়ির ঘড়্-ঘড়্ শব্দে কর্ণ বধির,—তাহার চক্রসহস্র হইতে বিঘূর্ণিত উদ্ধোত্থিত ধূলিজালে নয়ন অন্ধ; কালান্তক যমের ন্যায় ব্যাদিতাস্য কামানসকলের আকার দেখিয়া হৃদয় কম্পিত। এই গোলন্দাজ সেনার পশ্চাৎ রাজকোষাগার। বাদশাহী কোষাগার সঙ্গে সঙ্গে চলিত দিল্লীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ঔরঙ্গজেব ধনরাশি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না; ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র সর্ব্বজনে অবিশ্বাস। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এইবার দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া ঔরঙ্গজেব আর কখন দিল্লী ফিরিলেন না। শতাব্দীর একপাদ শিবিরে শিবিরে ফিরিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্ত ধনরত্নরাজিপরিপূর্ণ গজাদিবাহিত রাজকোষের পর, বাদশাহী দফ্তরখানা চলিল। থাকে থাকে থাকে, গাড়ি, হাতী, উটের উপর সাজান খাতাপত্র বহিজাত; সারির পর সারি, শ্রেণীর পর শ্রেণী; অসংখ্য, অনন্ত. চলিতে লাগিল। তার পর গঙ্গাজলবাহী উটের শ্রেণী। গঙ্গাজলের মত সুপেয় কোন নদীর জল নহে; তাই বাদশাহদিগের সঙ্গে অর্দ্ধেক গঙ্গার জল চলিত। জলের পর আহার্য্য—আটা, ঘৃত, চাউল, মশলা, শর্করা, নানাবিধ পক্ষী, চতুষ্পদ—প্রস্তুত অপ্রস্তুত, পক্ক, অপক্ক, ভক্ষ্য চলিত। তার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বাবর্চি। তৎপশ্চাৎ তোষাখানা—এল্‌বাস পোষাকের, জেওরাতের হুড়াহুড়ি ছড়াছড়ি; তার পর অগণনীয় অশ্বারোহী মোগল সেনা।

এই গেল সৈন্যের প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বাদশাহ খোদ। আগে আগে অসংখ্য উষ্ট্র-শ্রেণীর উপর জ্বলন্ত বহ্নিবাহী বৃহৎ কটাহসকলে, ধূনা, গুগ্‌গুল, চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। সুগন্ধে ক্রোশ ব্যাপিয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আমোদিত। তৎপশ্চাৎ বাদশাহী খাস আহদী সেনা, দোষশূন্য রমণীয় অশ্বরাজির উপর আরূঢ়, দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মধ্যে বাদশাহ নিজে মণিবর্ত্নকিঙ্কিণীজালাদি শোভায় উজ্জ্বল উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্বের উপর আরূঢ়—শিরোপরি বিখ্যাত শ্বেতছত্র। তার পর সৈন্যের সার, দিল্লীর সার, বাদশাহীর সার, ঔরঙ্গজেবের অবরোধবাসিনী সুন্দরীসম্প্রদায়। কেহ বা ঐরাবততুল্য গজপৃষ্ঠে, সুবর্ণনির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মখমলে মোড়া, মুক্তাঝালরভূষিত, অতি সূক্ষ্ম লূতাতন্তুতুল্য রেশমী বস্ত্রে আবৃত, হাওদার ভিতরে, অতি ক্ষীণমেঘাবৃত উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রতুল্য জ্বলিতেছে—রত্নমালাজড়িত কালভুজঙ্গীতুল্য বেণী পৃষ্ঠে দুলিতেছে—কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষুর মধ্যে কালাগ্নিতুল্য কটাক্ষ খেলিতেছে: উপরে কালো ভ্রূযুগ, নীচে সুরমার রেখা, তাহার মধ্যে সেই বিদ্যুদ্দামবিস্ফুরণে, সমস্ত সৈন্য বিশৃংখল হইয়া উঠিতেছে; মধুর তাম্বূলরক্ত অধরে মাধুর্য্যময়ী সুন্দরীকুল মধুর মধুর হাসিতেছে। এমন এক জন নয়, দুই জন নয়,—হাতীর গায়ে হাতী, হাতীর পিছু হাতী, তার পিছু হাতী। সকলের উপরেই তেমনই হাওদা, সকল হাওদার ভিতর তেমনই সুন্দরী, সকল সুন্দরীর নয়নেই মেঘযুগলমধ্যস্থ বিদ্যুদ্দামের ক্রীড়া! কালো পৃথিবী আলো হইয়া গেল। কেহ বা কদাচিৎ দোলায় চলিল—দোলার বাহিরে কিংখাপ, ভিতরে জরদোজী কামদার মখমল, উপরে মুক্তার ঝালর, রূপার দাণ্ডা, সোণার হাঙ্গর—তাহার ভিতর রত্নমণ্ডিতা সুন্দরী। যোধপুরী ও নির্ম্মলকুমারী, উদিপুরী ও জেব-উন্নিসা, ইহারা গজপৃষ্ঠে। উদিপুরী হাস্যময়ী। যোধপুরী অপ্রসন্না। নির্ম্মলকুমারী রহস্যময়ী। জেব-উন্নিসা, গ্রীষ্মকালে উন্মূলিতা লতার মত ছিন্নবিচ্ছিন্ন, পরিশুষ্ক, শীর্ণ, মৃতকল্প। জেব-উন্নিসা ভাবিতেছে, "এ হাতিয়ার লহরীমাঝে আমার ডুবিয়া মরিবার কি উপায় নাই?"

এই মনোমোহিনী বাহিনীর পশ্চাৎ কুটুম্বিনী ও দাসীবৃন্দ। সকলেই অশ্বারূঢ়া, লম্বিতবেণী, রক্তাধরা, বিদ্যুৎকটাক্ষা; অলঙ্কারশিঞ্জিতে ঘোড়া সকল নাচিয়া উঠিতেছে। এই অশ্বারোহিণী বাহিনীও অতিশয় লোকমনোমোহিনী। ইহাদের পশ্চাতে আবার গোলন্দাজ সেনা --কিন্তু ইহাদের কামান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। বাদশাহ বুঝি স্থির করিয়াছিলেন, কামিনীর কমনীয় কটাক্ষের পর আর বড় কামানের প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় ভাগে পদাতি সৈন্য। তৎপশ্চাৎ দাস-দাসী, মুটে-মজুর, নর্ত্তকী প্রভৃতি বাজে লোক, খালি ঘোড়া, তাম্বুর রাশি এবং মোট-ঘাট।

যেমন ঘোরনাদে গ্রাম প্রদেশ ভাসাইয়া—তিমি-মকর-আবর্ত্তাদিতে ভয়ঙ্করী, বর্ষাবিপ্লাবি

স্রোতস্বতী, ক্ষুদ্র সৈকত ডুবাইতে যায়, তেমনই মহাকোলাহলে, মহাবেগে এই পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া, বিস্ময়করী মোগলবাহিনী রাজসিংহের রাজ্য ডুবাইতে চলিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। যে পথে আকব্বর সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন, ওরঙ্গজেবও সেই পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, আকব্বর শাহের সৈন্যের সঙ্গে নিজ সৈন্য মিলিত করিবেন। মধ্যে যদি কুমার জয়সিংহের সৈন্য পান, তবে তাঁহাকে মাঝে ফেলিয়া টিপিয়া মারিবেন, পরে দুই জনে উদয়পুর প্রবেশ করিয়া রাজ্য ধ্বংস করিবেন। কিন্তু পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, রাজসিংহ ঊর্দ্ধে পর্ব্বতের উপত্যকায় তাঁহার পথের পার্শ্বে সৈন্য লইয়া বসিয়া আছেন। রাজসিংহ নয়ননামা গিরিসঙ্কটে পার্ব্বত্য পথ রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি দ্রুতগামী দূতমুখে আকব্বরের সংবাদ শুনিয়া, রণপাণ্ডিত্যের অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ করিয়া আমিষলোলুপ শ্যেনপক্ষীর মত দ্রুতবেগে সেনা সহিত পূর্ব্বপরিচিত পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া এই গিরিসানুদেশে সসৈন্যে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

মোগল দেখিল, রাজসিংহের এই অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কেন না, মোগলেরা যে পথে যাইতেছিল, সে পথে আর চলিলে রাজসিংহকে পার্শ্বে রাখিয়া যাইতে হয়। শত্রুসৈন্যকে পার্শ্বে রাখিয়া যাওয়ার অপেক্ষা বিপদ্ অল্পই আছে। পার্শ্ব হইতে যে আক্রমণ করে, তাহাকে রণে বিমুখ করা যায় না, সেই জয়ী হইয়া বিপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। সালামাঙ্কা ও ঔস্তরলিজে ইহাই ঘটিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবও এ স্বতঃসিদ্ধ রণতত্ত্ব জানিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, পার্শ্বস্থিত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় বটে, কিন্তু তাহা করিতে গেলে নিজ সৈন্যকে ফিরাইয়া শত্রুর সম্মুখবর্ত্তী করিতে হয়। এই পার্ব্বত্য পথে তাদৃশ মহতী সেনা ফিরাইবার ঘুরাইবার স্থান নাই, এবং সময়ও পাওয়া যাইবে না। কেন না সেনার মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে রাজসিংহ পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার সেনা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, এক এক খণ্ড পৃথক্ করিয়া বিনষ্ট করিতে পারেন। এরূপ যুদ্ধে সাহস করা অকর্ত্তব্য। তার পর এমন হইতে পারে, রাজসিংহ যুদ্ধ না করিতেও পারেন। নির্ব্বিঘ্নে ঔরঙ্গজেবকে যাইতে দিতেও পারেন। তাহা হইলে আরও বিপদ্। তাহা হইলে ঔরঙ্গজেব চলিয়া গেলে রাজসিংহ পর্ব্বতাবতরণ করিয়া ঔরঙ্গজেবের পশ্চাদ্গামী হইবেন। হইলে, তিনি যে মোগলের পশ্চাদ্বর্ত্তী মাল, আসবাব লুঠপাট ও সেনাধ্বংস করিবেন, সেও ক্ষুদ্র কথা। আসল কথা, রসদের পথ বন্ধ হইবে। সম্মুখে কুমার জয়সিংহের সেনা। রাজসিংহের সেনা ও জয়সিংহের সেনা উভয়ের মধ্যে পড়িয়া, ফাঁদের ভিতর প্রবিষ্ট মূষিকের মত, দিল্লীর বাদশাহ সসৈন্যে নিহত হইবেন।

ফলে দিল্লীশ্বরের অবস্থা জালনিবদ্ধ রোহিতের মত,—কোন মতেই নিস্তার নাই। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে রাজসিংহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন। তিনি উদয়পুরের রাজ্য অতল জলে ডুবাইতে আসিয়াছিলেন—সে কথা দূরে থাকুক, এখন উদয়পুরের রাজা তাঁহার পশ্চাৎ করতালি দিতে দিতে ছুটিবে—পৃথিবী হাসিবে। মোগল বাদশাহের অপরিমিত গৌরবের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অবনতি আর কি হইতে পারে? ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন—সিংহ হইয়া মূষিকের ভয়ে পলাইব? কিছুতেই পলায়নের কথাকে মনে স্থান দিলেন না।

তখন আর কি হইতে পারে? এক মাত্র ভরসা—উদয়পুরে যাইবার যদি অন্য পথ থাকে। ঔরঙ্গজেবের আদেশে চারি দিকে অশ্বারোহী পদাতি অন্য পথের সন্ধানে ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নির্ম্মলকুমারীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি পরদানশীন স্ত্রীলোক—পথের কথা আমি কি জানি?" কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সংবাদ আসিল যে, উদয়পুরে যাইবার আর একটা পথ আছে। একজন মোগল সওদাগরের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, সে পথ দেখাইয়া দিবে। একজন মনসবদার সে পথ দেখিয়া আসিয়াছে। সে একটি পার্ব্বত্য রন্ধ্রপথ· অতিশয় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু পথটা সোজা পথ, শীঘ্র বাহির হওয়া যাইবে। সে দিকে কোন রাজপুত দেখা যাইতেছে না। যে মোগল সংবাদ দিয়াছে, সে বলিতেছে যে, সে দিকে কোন রাজপুত সেনা নাই।

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন। বলিলেন, "নাই, কিন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারে।"

যে মন্‌সবদার পথ দেখিয়া আসিয়াছিল—বখ্‌ত খাঁ—সে বলিল যে, "যে মোগল আমাকে প্রথমেই এই পথের সন্ধান দেয়, তাহাকে আমি পর্ব্বতের উপরে পাঠাইয়া দিয়াছি। সে যদি রাজপুত সেনা দেখিতে পায়, তবে আমাকে সঙ্কেত করিবে।"

ঔরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আমার সিপাহী?"

বখ্‌ত খাঁ। না, সে একজন সওদাগর। উদয়পুরে শাল বেচিতে গিয়াছিল। এখন শিবিরে বেচিতে আসিয়াছিল।

ঔরঙ্গ। ভাল, সেই পথেই তবে ফৌজ লইয়া যাও।

তখন বাদশাহী হুকুমে, ফৌজ ফিরিল। ফিরিল—কেন না, কিছু পথ ফিরিয়া আসিয়া তবে রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাতেও বিশেষ বিপদ্—তবে জালনিবদ্ধ বৃহৎ রোহিত আর কোন্ দিকে যায়? যেরূপ পারম্পর্য্যের সহিত মোগলসেনা আসিয়াছিল—তাহা আর রক্ষিত হইতে পারিল না। যে ভাগ আগে ছিল, তাহা পিছে পড়িল; যাহা পিছনে ছিল, তাহা আগে চলিল। সেনার তৃতীয় ভাগ আগে আগে চলিল। বাদশাহ হুকুম দিলেন যে, তাম্বু ও মোট-ঘাট ও বাজে লোক সকল এক্ষণে উদয়সাগরের পথে যাক্—পরে সেনার পশ্চাতে তাহারা আসিবে। তাহাই হইল। ঔরঙ্গজেব নিজে, পদাতি ও ছোট কামান ও গোলন্দাজ সেনা লইয়া রন্ধ্রপথে চলিলেন। আগে আগে বখ্‌ত খাঁ।

দেখিয়া রাজসিংহ, সিংহের মত লাফ দিয়া, পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া মোগল সেনার মধ্যে পড়িলেন। অমনই মোগল সেনা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল—ছুরিকাঘাতে যেন ফুলের মালা কাটিয়া গেল। এক ভাগ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রন্ধ্রমধ্যে প্রবিষ্ট; আর এক ভাগ, এখন পূর্ব্বপথে, কিন্তু রাজসিংহের সম্মুখে।

মোগলের বিপদের উপর বিপদ্ এই যে, যেখানে হাতী, ঘোড়া, দোলার উপর বাদশাহের পৌরাঙ্গনাগণ, ঠিক সেইখানে, পৌরাঙ্গনাদিগের সম্মুখে, রাজসিংহ সসৈন্যে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিয়া, যেমন চিল পড়িলে চড়াইয়ের দল কিল-কিল করিয়া উঠে, এই সসৈন্য গরুড়কে দেখিয়া রাজাবরোধের কালভুজঙ্গীর দল তেমনই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এখানে যুদ্ধের নামমাত্র হইল না। যে সকল আহদীয়ান্ তাঁহাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা কেহই অস্ত্রসঞ্চালন করিতে পারিল না—পাছে বেগমেরা আহত হয়েন। রাজপুতেরা বিনা যুদ্ধে আহদীদিগকে বন্দী করিল। সমস্ত মহিষীগণ এবং তাঁহাদিগের অসংখ্য অশ্বারোহিণী অনুচরীবর্গ, বিনা যুদ্ধে রাজসিংহের বন্দিনী হইলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের নিকটে নিকটে থাকেন—তিনি রাজসিংহের অতিশয় প্রিয়। মাণিকলাল আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজাধিরাজ! এখন এই মার্জ্জারী সম্প্রদায় লইয়া কি করা যায়? আজ্ঞা হয় ত উদর পুরিয়া দধিদুগ্ধ ভোজনের জন্য ইহাদের উদয়পুরে পাঠাইয়া দিই।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "এত দই-দুধ উদয়পুরে নাই। শুনিয়াছি, দিল্লীর মার্জ্জারীদের পেট মোটা। কেবল উদিপুরীকে মহিষী চঞ্চলকুমারীর কাছে পাঠাইয়া দাও। তিনি ইহার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আর সব ঔরঙ্গজেবের ধন ঔরঙ্গজেবকে ফিরাইয়া দাও।"

মাণিকলাল জোড়হাতে বলিল, "লুঠের সামগ্রী সৈনিকেরা কিছু কিছু পাইয়া থাকে।"

রাজসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার কাহাকেও প্রয়োজন থাকে, গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু মুসলমানী, হিন্দুর অস্পর্শীয়া।"

মাণিক। উহারা নাচিতে গায়িতে জানে।

রাজ। নাচ-গানে মন দিলে, রাজপুত কি আর তোমাদিগের মত বীরপনা দেখাইতে পারিবে? সব ছাড়িয়া দাও। উদিপুরীকে কেবল উদয়পুরে পাঠাইয়া দাও।

মাণিক। এ সমুদ্রমধ্যে সে রত্ন কোথায় খুঁজিয়া পাইব? আমার ত চেনা নাই। যদি আজ্ঞা হয়, তবে হনুমানের মত, এ গন্ধমাদন লইয়া গিয়া মহিষীর কাছে উপস্থিত করি। তিনি বাছিয়া লইবেন। যাহাকে রাখিতে হয়, রাখিবেন, বাকিগুলা ছাড়িয়া দিবেন। তাহারা উদয়পুরের বাজারে সুরমা মিশি বেচিয়া দিনপাত করিবে।

এমন সময়ে মহাগজপৃষ্ঠ হইতে নির্ম্মলকুমারী রাজসিংহ ও মাণিকলাল উভয়কে দেখিতে পাইল। করযুগল উত্তোলন করিয়া সে উভয়কে প্রণাম করিল। দেখিয়া রাজসিংহ মাণিকলালকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও আবার কোন্ বেগম ? হিন্দু বোধ হইতেছে—সেলাম না করিয়া, আমাদের প্রণাম করিল।"

মাণিকলাল দেখিয়া উচ্চহাস্য করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ও একটা বাঁদী—ওটা বেগম হইল কি প্রকারে? উহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল, হুকুম দিয়া, নির্ম্মলকুমারীকে হাতীর উপর হইতে নামাইয়া আপনার নিকট আনাইল। নির্ম্মল কথা না কহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি? তুমি বেগম হইলে কবে?"

নির্ম্মল, মুখ-চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "মেয়্নে-হজরৎ ইম্‌লি বেগম। তস্‌লিম দে।"

মাণিকলাল। তা না হয় দিতেছি—বেগম ত তুমি নও জানি; তোমার বাপ-দাদাও কখনও বেগম হয় নাই—কিন্তু এ বেশ কেন?

নির্ম্মল। পহেলা মেরা হুকুম তামিল কর্—বাজে বাত্ আব্‌হি রাখ্।

মাণিকলাল। সীতারাম! বেগম সাহেবার ধমক দেখ!

নির্ম্মল। হামারি হুকুম যেহি হৈ কি হজরৎ উদিপুরী বেগম সাহেবা সামনেকা পঞ্জকলস্-দার হাওদাওয়ালে হাতিপর তশরিফ রাখ্‌তী হে'ই। উন্‌কো হামারা হুজুর মে হাজির কর্।

বলিতে বিলম্ব সহিল না—মাণিকলাল তখনই উদিপুরীকে হাতী হইতে নামাইতে বলিল। উদিপুরী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নামিল। মাণিকলাল একখানা দোলা খালি করিয়া, সে দোলা উদিপুরীর হাতীর কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দোলায় চড়াইয়া উদিপুরীকে লইয়া আসিল। তার পর মাণিকলাল, নির্ম্মলকুমারীকে কাণে কাণে বলিল, "জী হাম্‌লী বেগম সাহেবা! আর একটা কথা—"

নির্ম্মল। চুপ্ রহ, বেতমিজ! মেরে নাম হজ্‌রৎ ইম্‌লি বেগম।

মাণিক। আচ্ছা, যে বেগমই হও না কেন, জেব-উন্নিসা বেগমকে চেন?

নির্ম্মল। জান্‌তে নেহিন্? বহ হামারি বেটী লাগ্‌তী হৈ। দেখ, আগাড়ী সোনেকা তিন কলস যো হাওদে পর জলুষ দেতা হ্যায়, বস্‌পর জেব-উন্নিসা বৈঠী হৈ।

মাণিকলাল তাঁহাকেও হাতী হইতে নামাইয়া দোলায় তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

সেই সময়ে আবার কোন মহিষী হাওদার জরির পরদা টানিয়া মুখ বাহির করিয়া, নির্ম্মল-কুমারীকে ডাকিল। মাণিকলাল নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার তোমাকে কে ডাকিতেছে না?"

নির্ম্মল দেখিয়া বলিল, "হাঁ। যোধপুরী বেগম। কিন্তু উঁহাকে এখানে আনা হইবে না। আমাকে হাতীর উপর চড়াইয়া উঁহার কাছে লইয়া চল। শুনিয়া আসি।"

মাণিকলাল তাহাই করিল। নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর হাতীর উপর উঠিয়া তাঁহার ইন্দ্রাসনতুল্য হাওদার ভিতর প্রবেশ করিল। যোধপুরী বলিলেন, "আমাকে তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল।"

নির্ম্মল। কেন মা?

যোধপুরী। কেন, তা ত কতবার বলিয়াছি। আমি এ ম্লেচ্ছপুরীতে, এ মহাপাপের ভিতর আর থাকিতে পারি না।

নির্ম্মল। তাহা হইবে না। তোমার যাওয়া হইবে না। আজ যদি মোগল সাম্রাজ্য টিকে, তবে তোমার ছেলে দিল্লীর বাদশাহ হইবে। আমরা সেই চেষ্টা করিব। তাঁর রাজ্যে আমরা সুখে থাকিব।

যোধপুরী। অমন কথা মুখে আনিও না, বাছা! বাদশাহ শুনিলে, আমার ছেলে এক দিনও বাঁচিবে না। বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণ যাইবে।

নির্ম্মল। এখনকার কথা বলিতেছি না। যাহা শাহজাদার হক্, কালে তিনি পাইবেন। আপনি আমাকে আর কোন আজ্ঞা করিবেন না। আপনি যদি আমার সঙ্গে এখন যান, আপনার পুত্রের অনিষ্ট হইতে পারে।

যোধপুরী ভাবিয়া বলিল, "সে কথা সত্য। তোমার কথাই শুনিলাম। আমি যাইব না। তুমি যাও।"

নির্ম্মলকুমারী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসা উপযুক্ত সৈন্যে বেষ্টিতা হইয়া নির্ম্মলকুমারীর সহিত উদয়পুরে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অগ্নিচক্র বড় ভীষণ হইল

তখন রাজসিংহ আর সকল পৌরাঙ্গনাগণকে—গজারূঢ়া, শিবিকারূঢ়া, এবং অশ্বারূঢ়া—সকলকেই, ঔরঙ্গজেবকে যে রন্ধ্রপথে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিতে দিলেন। তাহারা প্রবেশ করিলে পর, উভয় সেনা নিস্তব্ধ হইল। ঔরঙ্গজেবের অবশিষ্ট সেনা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না—কেন না, রাজসিংহ পথ বন্ধ করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সাগরতুল্য অশ্বারোহী সেনা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। তাহারা ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া রাজপুতের সম্মুখীন হইল। তখন রাজসিংহ একটু হঠিয়া গিয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন—তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন না। তাহারা "দীন্ দীন্" শব্দ করিতে করিতে বাদশাহের আজ্ঞানুসারে, বাদশাহ যে সংকীর্ণ রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিল। রাজসিংহ আবার আগু হইলেন।

তার পর বাদশাহী তোষাখানা আসিয়া উপস্থিত হইল। রক্ষক নাই বলিলেই হয়, রাজপুতেরা তাহা লুঠিয়া লইল। তার পর খাদ্যদ্রব্য। যাহা হিন্দুর ব্যবহার্য্য, তাহা রাজসিংহের রসদের সামিল হইল। যাহা হিন্দুর অব্যবহার্য্য, তাহা ডোম দোসাদে লইয়া গিয়া কতক খাইল, কতক পর্ব্বতে ছড়াইল—শৃগাল-কুক্কুর এবং বন্য পশুতে খাইল। রাজপুতেরা দফ্তরখানা হাতীর উপর হইতে নামাইল—কতক বা পুড়াইয়া দিল, কতক বা ছাড়িয়া দিল। তার পর মালখানা; তাহাতে যে ধনরত্নরাশি আছে, পৃথিবীতে এমন আর কোথাও নাই,—জানিয়া রাজপুত সেনাপতিগণ লোভে উন্মত্ত হইল। তাহার পশ্চাতে বড় গোলন্দাজ সেনা। রাজসিংহ আপন সেনা সংযত করিলেন। বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। ও সব তোমাদেরই। আজ ছাড়িয়া দাও। আজ এখন যুদ্ধের সময় নহে।" রাজসিংহ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

তার পর মাণিকলালকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি সেই মোগলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এতটা সুবিধা হইবে, আমি মনে করি নাই। আমি যাহা অভিপ্রেত করিয়াছিলাম, তাহাতে যুদ্ধ করিয়া মোগলকে বিনষ্ট করিতে হইত। এক্ষণে বিনা যুদ্ধেই মোগলকে বিনষ্ট করিতে পারিব। মবারককে আমার নিকট লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে সমাদর করিব।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মবারক মাণিকলালের হাতে জীবন পাইয়া তাহার সঙ্গে উদয়পুর আসিয়াছিলেন। রাজসিংহ তাহার বীরত্ব অবগত ছিলেন, অতএব তাহাকে নিজসেনা মধ্যে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। তাহাতে মবারক কিছু দুঃখিত ছিল। আজ সেই দুঃখে গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছিল। সে গুরুতর কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, মবারকই ছদ্মবেশী মোগল সওদাগর।

মাণিকলাল আজ্ঞা পাইয়া মবারককে লইয়া আসিলেন। রাজসিংহ মবারকের অনেক প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "তুমি এই সাহস ও চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া, মোগল সওদাগর সাজিয়া, মোগল সেনা রন্ধ্রপথে না লইয়া গেলে অনেক প্রাণিহত্যা হইত। তোমাকে কেহ চিনিতে পারিলে তোমারও মহাবিপদ্ উপস্থিত হইত।"

মবারক বলিল, "মহারাজ! যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে মরিয়াছে, যাহাকে সকলের সমক্ষে গোর দিয়াছে, তাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেও চেনে না—মনে করে, ভ্রম হইতেছে। আমি এই সাহসেই গিয়াছিলাম।"

রাজসিংহ বলিলেন, "এক্ষণে যদি আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে সে আমার দোষ। তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই তোমাকে দিব।"

মবারক কহিল, "মহারাজ! বে-আদবী মাফ হৌক! আমি মোগল হইয়া মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কার্য্য করিয়াছি।

আমি সত্যবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছি। আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমি মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাইতেছি। আমার আর কোন পুরস্কারে সাধ নাই। আমি কেবল এক পুরস্কার আপনার নিকট ভিক্ষা করি। আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

রাজসিংহ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "যদি এ কাজে তোমার এতই কষ্ট, তবে এমন কাজ কেন করিলে? আমাকে জানাইলে না কেন? আমি অন্য লোক নিযুক্ত করিতাম। আমি কাহাকেও এত দূর মনঃপীড়া দিতে চাহি না।"

মবারক, মাণিকলালকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই মহাত্মা আমার জীবন দান করিয়াছিলেন। ইঁহার নিতান্ত অনুরোধ যে, আমি এই কার্য্য সিদ্ধ করি। আমি নহিলেও এ কাজ সিদ্ধ হইত না; কেন না, মোগল ভিন্ন হিন্দুকে মোগলেরা বিশ্বাস করিত না। আমি ইহা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা পাপে পড়িতাম। তাই এ কাজ করিয়াছি। এক্ষণে এ প্রাণ আর রক্ষা করিব না স্থির করিয়াছি। আমাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে আদেশ করুন। অথবা আমাকে বাঁধিয়া বাদশাহের নিকটে পাঠাইয়া দিন, অথবা অনুমতি দিন যে, আমি যে প্রকারে পারি, মোগল সেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

রাজসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "কাল তোমাকে আমি মোগল সেনায় প্রবেশের অনুমতি দিব। আর একদিন মাত্র থাক। আমার কেবল এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। ঔরঙ্গজেব তোমাকে বধ করিয়াছিলেন কেন?"

মবারক। তাহা মহারাজের সাক্ষাৎ বক্তব্য নহে।

রাজসিংহ। মাণিকলালের সাক্ষাৎ?

মবারক। বলিয়াছি।

রাজসিংহ। আর একদিন অপেক্ষা কর।

এই বলিয়া রাজসিংহ মবারককে বিদায় দিলেন।

তার পর, মাণিকলাল মবারককে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব! যদি আপনার মরিবার ইচ্ছা, তবে শাহজাদীকে ধরিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কেন?"

মবারক বলিল, "ভুল! সিংহজী ভুল! আমি আর শাহজাদী লইয়া কি করিব? মনে করিয়াছিলাম বটে যে, যে শয়তানী আমার ভালবাসার বিনিময়ে আমাকে কালসাপের বিষদন্তে সমর্পণ করিয়া মারিয়াছিল, তাহাকে তাহার কর্ম্মের প্রতিফল দিব। কিন্তু মানুষ যাহা আজ চাহে, কাল তাহার ইচ্ছা থাকে না। আমি এখন মরিব নিশ্চয় করিয়াছি—এখন আর শাহজাদী প্রতিফল পাইল না পাইল, তাহাতে আমার কি? আমি আর কিছুই দেখিতে আসিব না।"

মাণিকলাল। জেব-উন্নিসাকে রাখিতে যদি আপনি অনুমতি না করেন, তবে আমি বাদশাহের নিকট কিছু ঘুষ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই।

মবারক। আর একবার তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা আছে। একবার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে যে, জগতে ধর্ম্মাধর্ম্মে তাহার কিছু বিশ্বাস আছে কি না? একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে যে, সে আমায় দেখিয়া কি বলে? একবার জানিবার ইচ্ছা আছে যে, আমাকে দেখিয়া সে কি করে?

মাণিকলাল। তবে আপনি এখনও তাহার প্রতি অনুরক্ত?

মবারক। কিছুমাত্র না। একবার দেখিব মাত্র। আপনার কাছে এই পর্য্যন্ত ভিক্ষা।

অষ্টম খণ্ড

আগুনে কে কে পুড়িল?

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাদশাহের দাহনারম্ভ

এদিকে বাদশাহ বড় গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিবার অল্প পরেই দিবাবসান হইল। কিন্তু রন্ধ্রের অপর মুখে কেহই পৌঁছিল না। অপর মুখের কোন সংবাদ নাই। সন্ধ্যার পরেই সেই সংকীর্ণ বন্ধ্রপথে অতিশয় গাঢ় অন্ধকার হইল। সমস্ত সেনার পথ আলোকযুক্ত হয়, এমন রোশনাইয়ের সরঞ্জাম সঙ্গে কিছুই নাই। বাদশাহের ও বেগমদিগের নিকট রোশনাই হইল—কিন্তু আর সমস্ত সেনাই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। তাহাতে আবার বন্ধুর পার্ব্বত্য তলভূমি, বিকীর্ণ উপলখণ্ডে ভীষণ হইয়া আছে। ঘোড়া সকল টক্কর খাইতে লাগিল। কত ঘোড়া আরোহীসমেত পড়িয়া গেল; অপর অশ্বের পাদদলনে পিষ্ট হইয়া অশ্ব ও আরোহী উভয়ে আহত বা নিহত হইল। কত হাতীর পায়ে বড় বড় শিলাখণ্ড ফুটিতে লাগিল—হস্তিগণ দুর্দ্দমনীয় হইয়া ইতস্ততঃ ফিরিতে লাগিল। অশ্বারোহিণী স্ত্রীগণ, ভূপাতিতা হইয়া অশ্বপদে, হস্তিপদে দলিত হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। দোলার বাহকদিগের চরণ সকল ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরে পরিপ্লুত হইতে লাগিল। পদাতিক সেনা আর চলিতে পারে না—পদস্খলনে এবং উপলাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইল। তখন ঔরঙ্গজেব রাত্রিতে সেনার গতি বন্ধ করিয়া শিবির সংস্থাপন করিতে অনুমতি করিলেন।

কিন্তু তাম্বু ফেলিবার স্থান নাই। অতি কষ্টে বাদশাহ ও বেগমদিগের তাম্বুর স্থান হইল। আর কাহারও হইল না। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে রহিল। অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে—গজারোহী গজপৃষ্ঠে—পদাতিক চরণে ভর করিয়া রহিল। কেহ বা কষ্টে পর্ব্বতসানুদেশে একটু স্থান করিয়া, তাহাতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু সানুদেশ দুরারোহণীয়,—এমন খাড়া যে, উঠা যায় না। অধিকাংশ লোকেই এরূপ বিশ্রামের স্থান পাইল না।

তার পর বিপদের উপর বিপদ—খাদ্যের অত্যন্ত অভাব। সঙ্গে যাহা ছিল, তাহা ত রাজপুতেরা লুঠিয়া লইয়াছে। যে রন্ধ্রপথে সেনা উপস্থিত—সেখানে অন্য খাদ্যের কথা দূরে থাক ঘোড়ার ঘাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কেহ কিছু খাইতে পাইল না, বাদশাহ কি বেগমেরাও নয়। ক্ষুধায়, নিদ্রার অভাবে সকলে মৃতপ্রায় হইল। মোগল সেনা বড় গোলযোগে পড়িল।

এ দিকে বাদশাহ উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার হরণ-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে অগ্নিতুলা জ্বলিয়া উঠিলেন। একা সমস্ত সৈনিকদিগকে নিহত করা যায় না, নহিলে ঔরঙ্গজেব তাহা করিতেন। বিবরে নিরুদ্ধ সিংহ সিংহীকে পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিলে যেরূপ গর্জ্জন করে, ঔরঙ্গজেব সেইরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে সেনার কোলাহল কিছু নিবৃত্ত হইলে, অনেকে শুনিল, অতি দূরে অনেক পাহাড়ের উপর যেন বহুসংখ্যক বৃক্ষ উন্মূলিত হইতেছে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া অথবা ভৌতিক শব্দ মনে করিয়া সকলে চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দাহনে বাদশাহের বড় জ্বালা

রাত্রি প্রভাতে ঔরঙ্গজেব সৈনাচালনার আদেশ করিলেন। সেই বৃহতী সেনা,—তোপ লইয়া তরঙ্গিণী—অতি দ্রুতপদে রন্ধ্রমুখের উদ্দেশে চলিল। ক্ষুৎপিপাসায় সকলেই অত্যন্ত ক্লিষ্ট—বাহির হইলে তবে পানাহারের ভরসা—সকলে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নিজে উদিপুরী ও জেব-উন্নিসাকে মুক্ত করিয়া উদয়পুর নিঃশেষে ভস্ম করিবার জন্য আপনার ক্রোধাগ্নিতে আপনি দগ্ধ হইতেছিলেন—তিনি আর কিছুমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। বড় ছুটাছুটি করিয়া মোগল সেনা রন্ধ্রমুখে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া দেখিল,

মোগলের সর্ব্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া আছে। রন্ধ্রমুখ বন্ধ। রাত্রিতে রাজপুতেরা সংখ্যাতীত মহামহীরূহ সকল ছেদন করিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে রন্ধ্রমুখে ফেলিয়া দিয়াছে—পর্ব্বতাকার সপল্লব ছিন্ন বৃক্ষরাশি রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ করিয়াছে; হস্তী অশ্ব পদাতিক দূরে থাক, শৃগাল-কুক্কুরেরও যাতায়াতের পথ নাই।

মোগল সেনামধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ উঠিল—স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শুনিয়া, ঔরঙ্গজেবের পাষাণনির্ম্মিত হৃদয়ও কম্পিত হইল।

সৈন্যের পথপরিষ্কারক সম্প্রদায় অগ্রে থাকে, কিন্তু এই সৈন্যকে বিপরীত গতিতে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে হইযাছিল বলিয়া তাহারা পশ্চাতে ছিল। ঔরঙ্গজেব প্রথমতঃ তাহাদিগকে সম্মুখে আনিবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিন্তু তাহাদের আসা কালবিলম্বের কথা। তাহাদের অপেক্ষা করিতে গেলে, হয় ত সে দিনও উপবাসে কাটিবে। অতএব ঔরঙ্গজেব হুকুম দিলেন যে, পদাতিক সৈন্য, এবং অন্য যে পারে, বহু লোক একত্র হইয়া, গাছের প্রাচীরের উপর চড়িয়া, গাছ সকল ঠেলিয়া পাশে ফেলিয়া দেয়, এবং এই পরিশ্রমের সাহায্য জন্য হস্তীসকলকে নিযুক্ত করিলেন। অতএব সহস্র সহস্র পদাতিক এবং শত শত হস্তী বৃক্ষপ্রাকার ভগ্ন করিতে ছুটিল। কিন্তু যখন এ সকল বৃক্ষপ্রাকারমূলে সমবেত হইল, তখন অমনই গিরিশিখর হইতে, যেমন ফাল্গুনের বাত্যায় শিলাবৃষ্টি হয়, তেমনই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতে লাগিল। পদাতিক সকলের মধ্যে কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও মস্তক, কাহারও কক্ষ, কাহারও বক্ষ চূর্ণীকৃত হইল—কাহারও বা সমস্ত শরীর কর্দ্দমপিণ্ডবৎ হইয়া গেল। হস্তীসকলের মধ্যে কাহারও কুম্ভ, কাহারও দন্ত, কাহারও মেরুদণ্ড, কাহারও পঞ্জর ভগ্ন হইয়া গেল; হস্তী সকল বিকট চীৎকার করিতে করিতে, পদাতিক সৈন্য পদতলে বিদলিত করিতে করিতে পলায়ন করিল, তদ্দ্বারা ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা বিত্রস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। সকলে ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টি করিয়া সভয়ে দেখিল, পর্ব্বতের শিরোদেশে সহস্র সহস্র রাজপুত পদাতিক পিপীলিকার মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে আহত বা নিহত না হইল, রাজপুতগণের বন্দুকের গুলিতে তাহারা মরিল। ঔরঙ্গজেবের সৈনিকেরা বৃক্ষপ্রাকারমূলে ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিল না।

শুনিয়া ঔরঙ্গজেব সৈন্যাধ্যক্ষগণকে তিরস্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষপ্রাচীরভঙ্গের উদ্যম রিতে আদেশ করিলেন। তখন "দীন্ দীন্" শব্দ করিয়া মোগল সেনা আবার ছুটিল—াবার রাজপুতসেনাকৃত গুলির বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টিতে বাত্যা সমীপে ইক্ষুক্ষেত্রের ইক্ষুর মত মিশায়ী হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ উদ্যম করিয়া মোগল সেনা দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিতে পারিল না।

তখন ঔরঙ্গজেব হতাশ হইয়া, সেই বৃহতী সেনাকে রন্ধ্রপথে ফিরিতে আদেশ করিলেন। রন্ধ্রের যে মুখে সেনা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুখে বাহির হইতে হইবে। সমস্ত সেনা ক্ষুৎপিপাসায় ও পরিশ্রমে অবসন্ন, ঔরঙ্গজেবও তাঁহার জন্মে এই প্রথম ক্ষুৎপিপাসায় অধীর; বেগমরাও তাই। কিন্তু আর উপায়ান্তর নাই—পর্ব্বতের সানুদেশ আরোহণ করা যায় না; কেন না, পাহাড় সোজা উঠিয়াছে। কাজেই ফিরিতে হইল।

ফিরিয়া আসিযা অপরাহ্ণে, যে মুখে ঔরঙ্গজেব সসৈন্য রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পুনশ্চ রন্ধ্রের সেই মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেখানেও প্রত্যক্ষমূর্ত্তি মৃত্যু, তাঁহাকে সসৈন্যে গ্রাস করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। রন্ধ্রের সে মুখও, সেইরূপ অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতপ্রমাণ বৃক্ষপ্রাকারে বন্ধ; নির্গমের উপায় নাই। পর্ব্বতোপরি রাজপুতসেনা পূর্ব্ববৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু নির্গত না হইলে ত নিশ্চিত সসৈন্য মৃত্যু। অতএব সমস্ত মোগল সেনাপতিকে ডাকিয়া ঔরঙ্গজেব স্তুতি মিনতি, উৎসাহবাক্য এবং ভয়প্রদর্শনের দ্বারা পথ মুক্ত করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পতন করিতে স্বীকৃত করাইলেন। সেনাপতিগণ সেনা লইয়া পুনশ্চ বৃক্ষপ্রাকার আক্রমণ করিলেন। এবার একটু সুবিধাও ছিল—পথপরিষ্কারক সেনাও উপস্থিত ছিল। মোগলেরা মরণ তৃণজ্ঞান করিয়া বৃক্ষরাজি ছিন্ন ও আকৃষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র। পর্ব্বতশিখর হইতে যে লৌহ ও পাষাণবৃষ্টি হইতেছিল—ভাদ্রের বর্ষায় যেমন ধান্যক্ষেত্র ডুবিয়া যায়, মোগল সেনা তাহাতে তেমনই ডুবিয়া গেল।

তার পর বিপদের উপর বিপদ্, সম্মুখস্থ পর্ব্বতসানুদেশে রাজসিংহের শিবির। তিনি দূর হইতে মোগল সেনার প্রত্যাবর্ত্তন জানিতে পারিয়া, তোপ সাজাইয়া সম্মুখে প্রেরণ করিলেন।

রাজসিংহের কামান ডাকিল। বৃক্ষপ্রাকার লঙ্ঘিত করিয়া রাজসিংহের গোলা ছুটিল—হস্তী, অশ্ব, পত্তি, সেনাপতি সব চূর্ণ হইয়া গেল। মোগল সেনা রন্ধ্রমধ্যে হটিয়া গিয়া, ক্রূর সর্প যেমন অগ্নিভয়ে কুণ্ডলী করিয়া বিবরে লুকায়, মোগল সেনা রন্ধ্রবিবরে সেইরূপ লুকাইল। শাহান্‌শাহ বাদশাহ, হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ মস্তক হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জানু পাতিয়া, পর্ব্বতের কাঁকর তুলিয়া আপনার মাথায় দিলেন। দিল্লীর বাদশাহ রাজপুত ভুঁইঞার নিকট সসৈন্যে পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিক। একটা মূষিকের আহার পাইলেও আপাততঃ তাঁর প্রাণরক্ষা হইতে পারে।

তখন ভারতপতি ক্ষুদ্রা রাজপুতকুলবালাকে উদ্ধারকারিণী মনে করিয়া তাহার পারাবত উড়াইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উদিপুরীর দাহনারম্ভ

নির্ম্মলকুমারী, উদিপুরী বেগম ও জেব-উন্নিসা বেগমকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া, মহারাণী চঞ্চলকুমারীর নিকট গিয়া প্রণাম করিলেন। এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। সকল কথা সবিশেষ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আগে উদিপুরীকে ডাকাইলেন। উদিপুরী আসিলে তাঁহাকে পৃথক্ আসনে বসিতে দিলেন; এবং তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য আপনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উদিপুরী অত্যন্ত বিষণ্ণ ও বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর সৌজন্য দেখিয়া মনে করিলেন, ক্ষুদ্রপ্রাণ হিন্দু ভয়েই এত সৌজন্য করিতেছে। তখন ম্লেচ্ছকন্যা বলিল, "তোমরা মোগলের নিকট মৃত্যু বাসনা করিতেছ কেন?"

চঞ্চলকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমরা তাঁহার নিকট মৃত্যু কামনা করি নাই। তিনি যদি সে সামগ্রী আমাদিগকে দিতে পারেন, সেই আশায় আসিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা হিন্দু; যবনের দান গ্রহণ করি না।"

উদিপুরী ঘৃণার সহিত বলিল, "উদয়পুরের ভুঁইঞারা পুরুষানুক্রমে মুসলমানের কাছে এ দান স্বীকার করিয়াছেন। সুলতান আলাউদ্দীনের কথা ছাড়িয়া দিই; মোগল বাদশাহ আকব্বর শাহ, এবং তাঁহার পৌত্রের নিকটও রাণা রাজসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা এ দান স্বীকার করিয়াছেন।"

চঞ্চল। বেগম সাহেব! আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে আমরা দান বলিয়া স্বীকার করি নাই; ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আকব্বর বাদশাহের ঋণ, প্রতাপসিংহ নিজে পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। আপনার শ্বশুরের ঋণ এক্ষণে আমরা পরিশোধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহার প্রথম কিস্তি লইবার জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি। আমার তামাকু নিবিয়া গিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তামাকুটা সাজিয়া দিন।

চঞ্চলকুমারী প্রথমে বেগমের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বেগম যদি তাহার উপযোগী ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, তাঁহাকে এ অপমানে পড়িতে হইত না। কিন্তু তিনি পরুষবাক্যে তেজস্বিনী চঞ্চলকুমারীর গর্ব্ব উদ্রিক্ত করিয়াছেন—কাজেই এখন ফল-ভোগ করিতে হইল। তামাকু সাজার কথায়, সেই তামাকু সাজার নিমন্ত্রণপত্রখানা মনে পড়িল। উদিপুরীর সর্ব্বশরীরে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল। তথাপি অভ্যস্ত গর্ব্বকে হৃদয়ে পুনঃ স্থাপন করিয়া কহিলেন, "বাদশাহের বেগমে তামাকু সাজে না।"

চঞ্চলকুমারী। যখন তুমি বাদশাহের বেগম ছিলে, তখন তামাকু সাজিতে না। এখন তুমি আমার বাঁদী। তামাকু সাজিবে। আমার হুকুম।

উদিপুরী কাঁদিয়া ফেলিল—দুঃখে নহে: রাগে। বলিল, "তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আলমগীর বাদশাহের বেগমকে তামাকু সাজিতে বল?"

চঞ্চল। আমার ভরসা আছে, কাল আলমগীর বাদশাহ স্বয়ং এখানে আসিয়া মহারাণার

তামাকু সাজিবেন। তাঁহার যদি সে বিদ্যা না থাকে, তবে তুমি তাঁহাকে কাল শিখাইয়া দিবে। আজ আপনি শিখিয়া রাখ।

চঞ্চলকুমারী তখন পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিলেন, "ইহা দ্বারা তামাকু সাজাইয়া লও।"

উদিপুরী উঠে না।

তখন পরিচারিকা বলিল, "ছিলিম উঠাও।"

উদিপুরী তথাপি উঠিল না। তখন পরিচারিকা তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে আসিল। অপমানভয়ে, কম্পিতহৃদয়ে শাহান্‌শাহের প্রেয়সী মহিষী ছিলিম তুলিতে গেলেন। তখন ছিলিম পর্য্যন্ত পেঁাছিলেন না। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, এক পা বাড়াইতে না বাড়াইতে থর থর করিয়া কাঁপিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া গেলেন। পরিচারিকা ধরিয়া ফেলিল—আঘাত লাগিল না। উদিপুরী হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

তখন চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত, যে মহার্ঘ পালঙ্কে তাঁহার জন্য মহার্ঘ শয্যা রচিত হইয়াছিল, তথায় তিনি পরিচারিকাগণের দ্বারা বাহিত ও নীত হইলেন। সেখানে পৌরাঙ্গনাগণ তাঁহার যথাবিহিত শুশ্রূষা করিল। অল্প সময়েই তাঁহার চৈতন্য লাভ হইল। চঞ্চলকুমারী আজ্ঞা দিলেন যে, আর কেহ কোন প্রকারে বেগমের অসম্মান না করে। আহারাদি শয়ন ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে চঞ্চলকুমারীর নিজের যেরূপ বন্দোবস্ত, বেগম সম্বন্ধে ততোধিক যাহাতে হয় তাহা করিতে চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলকুমারীকে আদেশ করিলেন।

নির্ম্মল বলিল, "তাহা সবই হইবে। কিন্তু তাহাতে ইঁহার পরিতৃপ্তি হইবে না।"

চঞ্চল। কেন, আব কি চাই?

নির্ম্মল। তাহা বাজপুবীতে অপ্রাপ্য।

চঞ্চল। শবাব? যখন তাহা চাহিবে, তখন একটু গোময় দিও।

উদিপুরী পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু রাত্রিকালে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, উদিপুরী নির্ম্মলকুমারীকে ডাকাইয়া মিনতি করিযা বলিলেন, "ইম্‌লি বেগম—থোড়া শরাব হুকুম কি জিযে।"

নির্ম্মল "দির্তেছি" বলিয়া রাজবৈদ্যকে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজবৈদ্য এক বিন্দু ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন, এবং উপদেশ দিলেন যে, শরবৎ প্রস্তুত করিযা এই ঔষধবিন্দু তাহাতে মিশাইযা শবাব বলিয়া পান করিতে দিবে। নির্ম্মল তাহাই করাইলেন। উদিপুরী তাহা পান কবিযা, অতিশয় প্রীত হইলেন। বলিলেন, "অতি উৎকৃষ্ট মদ্য।" এবং অল্পকাল মধ্যেই নেশায অভিভূত হইয়া গভীর নিদ্রায মগ্ন হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জেব-উন্নিসার দাহনারম্ভ

জেব-উন্নিসা একা বসিয়া আছেন। দুই একজন পবিচারিকা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছে। নির্ম্মলকুমারীও দুই একবার তাঁহাব খবর লইতেছেন। ক্রমশঃ জেব-উন্নিসা উদিপুরীর বিভ্রাটবার্ত্তা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি নিজের জন্য চিন্তিত হইলেন।

পরিশেষে তাঁহাকেও নির্ম্মলকুমারী চঞ্চলকুমারীর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি না বিনীত, না গর্ব্বিত ভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, আমি যে আলম্‌গীর বাদশাহের কন্যা, তাহা কিছুতেই ভুলিব না।

চঞ্চলকুমারী অতিশয় সমাদরের সহিত তাঁহাকে উপযুক্ত পৃথক্‌ আসনে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। জেব-উন্নিসাও সৌজন্যের সহিত কথার উত্তর করিলেন। পরস্পরে বিদ্বেষ ভাব জন্মে, এমন কথা কেহই কিছুই বলিলেন না। পরিশেষে চঞ্চলকুমারী তাঁহার উপযুক্ত পরিচর্য্যার আদেশ দিলেন। এবং জেব-উন্নিসাকে আতর ও পান দিলেন।

কিন্তু জেব-উন্নিসা, না উঠিয়া বলিলেন, "মহারাণি! আমাকে কেন এখানে আনা হইয়াছে, আমি কিছু শুনিতে পাই কি?"

চঞ্চল। সে কথা আপনাকে বলা হয় নাই। না বলিলেও চলে। কোন দৈবজ্ঞের আদেশমত আপনাকে আনা হইয়াছে। আপনি অদ্য একা শয়ন করিবেন। দ্বার খুলিয়া রাখিবেন। প্রহরিণীগণ অলক্ষ্যে প্রহরা দিবে, আপনার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন, আপনি

আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিবেন। যদি স্বপ্ন দেখেন, তবে আমাকে কাল তাহা বলিবেন, ইহা আপনার নিকট প্রার্থনা।

শুনিয়া চিন্তিতভাবে জেব-উন্নিসা চঞ্চলকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। নির্ম্মল-কুমারীর যত্নে তাঁহার আহার ও শয্যার পারিপাট্য যেমন দিল্লীর রঙ্‌মহালে ঘটিত, তেমনই ঘটিল। তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা যাইলেন না। চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত দ্বার খুলিয়া রাখিয়া একাই শয়ন করিলেন; কেন না, অবাধ্য হইলে যদি চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর দশার মত তাঁহারও কোন দুর্দ্দশা ঘটান, সে ভয়ও ছিল। কিন্তু একা সমস্ত রাত্রি দ্বার খুলিয়া রাখাতেও অত্যন্ত শঙ্কা উপস্থিত হইল। মনে ভাবিলেন যে, ইহাই সম্ভব যে, গোপনে আমার উপর কোন অত্যাচার হইবে, এই জন্য এমন বন্দোবস্ত হইয়াছে। অতএব স্থির করিলেন, নিদ্রা যাইবেন না, সতর্ক থাকিবেন।

কিন্তু দিবসে অনেক কষ্ট গিয়াছিল, এজন্য নিদ্রা যাইব না, জেব-উন্নিসা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেও, তন্দ্রা আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অধিকার করিতে লাগিল। যে নিদ্রা যাইব না প্রতিজ্ঞা করে, তন্দ্রা আসিলেও মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হয়; তন্দ্রাভিভূত হইলেও একটু বোধ থাকে যে, আমার ঘুমান হইবে না। জেব-উন্নিসা মধ্যে মধ্যে এইরূপ তন্দ্রাভিভূত হইতেছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চমকে চমকে ঘুম ভাঙ্গিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিলেই আপনার অবস্থা মনে পড়িতেছিল। কোথায় দিল্লীর বাদশাহজাদী, কোথায় উদয়পুরের বন্দিনী! কোথায় মোগল বাদশাহীর রঙ্গভূমির প্রধানা অভিনেত্রী, মোগল বাদশাহীর আকাশের পূর্ণচন্দ্র, তক্তে তাউসের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন, কাবুল হইতে বিজয়পুর গোলকুণ্ডা যাঁহার বাহুবলে শাসিত, তাঁহার দক্ষিণ বাহু,—আর কোথায় আজ গিরিগুহানিহিত উদয়পুরের কোটরে মূষিকবৎ পিঞ্জরাবদ্ধা, রূপ-নগরের ভুঁইঞার মেয়ের বন্দিনী, হিন্দুর ঘরে অস্পর্শীয়া শূকরী, হিন্দুপরিচারিকামণ্ডলীর চরণকলঙ্ককারী কীট! মরণ কি ইহার অপেক্ষা ভাল নহে? ভাল বৈ কি! যে মরণ তিনি প্রাণাধিক প্রিয় মবারককে দিয়াছেন, সে ভাল না ত কি? যা মবারককে দিয়াছেন, তাহা অমূল্য—নিজে কি তিনি সেই মরণের যোগ্য? হায় মবারক! মবারক! মবারক! তোমার অমোঘ বীরত্ব কি সামান্য ভুজঙ্গগরলকে জয় করিতে পারিল না? সে অনিন্দনীয় মনোহর মূর্ত্তিও কি সাপের বিষে নীল হইয়া গেল! এখন উদয়পুরে কি এমন সাপ পাওয়া যায় না যে, এই কালভুজঙ্গীকে দংশন করে? মানুষী কালভুজঙ্গী কি ফণিনী কালভুজঙ্গীর দংশনে মরিবে না! হায় মবারক! মবারক! মবারক! তুমি একবার সশরীর দেখা দিয়া, কালভুজঙ্গী দিয়া আমায় একবার দংশন করাও; আমি মরি কি না দেখ।

ঠিক এই কথা ভাবিয়া যেন মবারককে সশরীর দর্শন করিবার মানসেই জেব-উন্নিসা নয়ন উন্মীলিত করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে সশরীর মবারক! জেব-উন্নিসা চীৎকার করিয়া, চক্ষু পুনর্নিমীলিত করিয়া অজ্ঞান হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অগ্নিতে ইন্ধনক্ষেপ—জ্বালা বাড়িল

পরদিন যখন জেব-উন্নিসা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, তখন আর তাঁহাকে চেনা যায় না। একে ত পূর্ব্বেই মূর্ত্তি শীর্ণা বিবর্ণা, কাদম্বিনীচ্ছায়াপ্রচ্ছন্নাবৎ হইয়াছিল—আজ আরও যেন কি হইয়াছে, বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত দিনরাত্র আগুনের তাপের নিকট বসিয়া থাকিলে মানুষ যেমন হয়, চিতারোহণ করিয়া, না পুড়িয়া কেবল ধূম ও তাপে অর্দ্ধদগ্ধা হইয়া চিতা হইতে নামিলে যেমন হয়, জেব-উন্নিসাকে আজ তেমনই দেখাইতেছিল। জেব-উন্নিসা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুড়িতেছিল।

বেশভূষা না করিলে নয়; জেব-উন্নিসা অত্যন্ত অনিচ্ছায় বেশভূষা করিয়া, নিয়ম ও অনুরোধ রক্ষার্থ জলযোগ করিল। তার পর প্রথমে উদিপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। দেখিল, উদিপুরী একা বসিয়া আছে—সম্মুখে কুমারী মেরীর প্রতিমূর্ত্তি এবং একটি যিশুর ক্রস্‌। অনেক দিন উদিপুরী যিশুকে এবং তাঁহার মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুর্দ্দিনে তাঁহাদের মনে পড়িয়াছিল। খৃষ্টিয়ানির চিহ্নস্বরূপ এই দুইটি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত; বৃষ্টির দিনে দুঃখীর পুরাণ ছাতির মত আজ তাহা বাহির হইয়াছিল। জেব-উন্নিসা দেখিলেন,

উদিপুরীর চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিতেছে; বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু, বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু, নিঃশব্দে দুগ্ধালক্তকনিন্দী গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে। জেব-উন্নিসা উদিপুরীকে এত সুন্দর কখনও দেখেন নাই। সে স্বভাবতঃ পরম সুন্দরী—কিন্তু গর্ব্বে, ভোগবিলাসে, ঈর্ষ্যাদির জ্বালায়, সর্ব্বদাই সে অতুল সৌন্দর্য্য একটু বিকৃত হইয়া থাকিত। আজ অশ্রুস্রোতে সে বিকৃতি ধুইয়া গিয়াছিল—অপূর্ব্ব রূপরাশির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

উদিপুরী জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আপনার দুঃখের কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন, "আমি বাঁদী ছিলাম—বাঁদীর দরে বিক্রীত হইয়াছিলাম—কেন বাঁদীই রহিলাম না! কেন আমার কপালে ঐশ্বর্য্য ঘটিয়াছিল!—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া উদিপুরী, জেব-উন্নিসার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার অবস্থা এমন কেন? কাল তোমার কি হইয়াছিল? কাফের তোমার উপরও কি অত্যাচার করিয়াছে?"

জেব উন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কাফেরের সাধ্য কি? আল্লা য়াছেন!"

উদিপুরী। সকলই তিনি করেন, কিন্তু কি ঘটিয়াছে, শুনিতে পাই না?

জেব। এখন সে কথা মুখে আনিতে পারিব না। মৃত্যুকালে বলিয়া যাইব।

উদি। যাই হৌক, ঈশ্বর যেন রাজপুতের এ স্পর্দ্ধার দণ্ড করেন।

জেব। রাজপুতের ইহাতে কোন দোষ নাই।

এই কথা বলিয়া জেব-উন্নিসা নীরব হইয়া রহিল। উদিপুরীও কিছু বলিল না। পরিশেষে চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য জেব-উন্নিসা উদিপুরীর নিকট বিদায় চাহিল।

উদিপুরী বলিল, "কেন, তোমাকে কি ডাকিয়াছে?"

জেব। না।

উদি। তবে উপযাচক হইয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি বাদশাহের কন্যা।

জেব। আমার নিজের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

উদি। সাক্ষাৎ কর ত জিজ্ঞাসা করিও যে, কত আশরফি পাইলে এই গাঁওয়ারেরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে?

"করিব।" বলিয়া জেব উন্নিসা বিদায় লইলেন। পরে চঞ্চলকুমারীর অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের মত সম্মান করিলেন, এবং রীতিমত স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, উত্তম নিদ্রা হইয়াছিল ত?"

জেব। না। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে গিয়া ভয়ে ঘুমাই নাই।

চঞ্চল। তবে কিছু স্বপ্নে দেখেন নাই?

জেব। স্বপ্ন দেখি নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ কিছু দেখিয়াছি।

চঞ্চল। ভাল, না মন্দ?

জেব। ভাল, না মন্দ, তাহা বলিতে পারি না—ভাল ত নহেই। কিন্তু সে বিষয়ে আপনার কাছে আমার ভিক্ষা আছে।

চঞ্চল। বলুন।

জেব। আর তাহা দেখিতে পাই কি?

চঞ্চল। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা না করিলে বলিতে পারি না। আমি পাঁচ সাত দিন পরে, দৈবজ্ঞের কাছে লোক পাঠাইব।

জেব। আজ পাঠান যায় না?

চঞ্চল। এত কি ত্বরা বাদশাহজাদী?

জেব। এত ত্বরা, যদি আপনি এই মুহূর্ত্তে তাহা দেখাইতে পারেন, তবে আমি আপনার বাঁদী হইয়া থাকিতেই চাহিব।

চঞ্চল। বিস্ময়কর কথা শাহজাদী! এমন কি সামগ্রী?

জেব-উন্নিসা উত্তর করিল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেখিয়া চঞ্চলকুমারী দয়া করিল না। বলিল, "আপনি পাঁচ সাত দিন অপেক্ষা করুন, বিবেচনা করিব।"

তখন জেব-উন্নিসা, হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ ভুলিয়া গেল। যেখানে তাহার যাইতে নাই

সেখানে গেল। যে শয্যার উপর চঞ্চলকুমারী বসিয়া, তাহার উপর গিয়া দাঁড়াইল। তার পর ছিন্ন লতার মত সহসা চঞ্চলকুমারীর চরণে পড়িয়া গিয়া, চঞ্চলকুমারীর পায়ের উপর মুখ রাখিয়া, পদ্মের উপর পদ্মখানি উল্টাইয়া দিয়া, অশ্রুশিশিরে তাহা নিষিক্ত করিল। বলিল, "আমার প্রাণ রক্ষা কর! নহিলে আজ মরিব।"

চঞ্চলকুমারী তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন—তিনিও হিন্দু মুসলমান মনে রাখিলেন না। তিনি বলিলেন, "শাহজাদী! আপনি যেমন কাল রাত্রিতে দ্বার খুলিয়া শুইয়াছিলেন, আজিও তাই করিবেন। নিশ্চিত আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।"

এই বলিয়া তিনি জেব-উন্নিসাকে বিদায় দিলেন।

এ দিকে উদিপুরী জেব-উন্নিসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু জেব-উন্নিসা তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না। নিরাশ হইয়া উদিপুরী স্বয়ং চঞ্চলকুমারীর কাছে যাইবার অনুমতি চাহিলেন।

সাক্ষাৎ হইলে উদিপুরী চঞ্চলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কত আশরফি পাইলে চঞ্চলকুমারী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন। চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "যদি বাদশাহ ভারতবর্ষের সকল মসজিদ—মায় দিল্লীর জুম্মা মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন, আর ময়ূরতক্ত এখানে বহিয়া দিয়া যাইতে পারেন, আর বৎসর বৎসর আমাদিগকে রাজকর দিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে তোমাদের ছাড়িয়া দিতে পারি।"

উদিপুরী ক্রোধে অধীর হইল। বলিল, "গাঁওয়ার ভুঁঞার ঘরে এত স্পর্দ্ধা আশ্চর্য্য বটে!"

এই বলিয়া উদিপুরী উঠিয়া চলিয়া যায়। চঞ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, "বিনা হুকুমে যাও কোথায়? তুমি গাঁওয়ার ভুঁইয়ারাণীর বাঁদী, তাহা মনে নাই?" পরে একজন পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, "আমার এই নূতন বাঁদীকে আর আর মহিষীদিগের নিকট লইয়া গিয়া দেখাইয়া আসিও। পরিচয় দিও, ইনি দারাসেকোর খরিদা বাঁদী।"

উদিপুরী কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিকার সঙ্গে চলিল। পরিচারিকা রাজসিংহের আর আর মহিষীদিগের নিকট, ঔরঙ্গজেবের প্রেয়সী মহিষীকে দেখাইয়া আনিল।

নির্ম্মল আসিয়া চঞ্চলকে বলিল, "মহারাণি! আসল কথাটা ভুলিতেছ? কি জন্য উদিপুরীকে ধরিয়া আনিয়াছি? জ্যোতিষীর গণনা মনে নাই?"

চঞ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, "সে কথা ভুলি নাই। তবে সে দিন বেগম বড় কাতর হইয়া পড়িল বলিয়া আর পীড়ন করিতে পারিলাম না। কিন্তু বেগম আপনা হইতেই আমার দয়াটুকু শুকাইয়া তুলিতেছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ শাহজাদী ভস্ম হইল

অর্দ্ধ রাত্র অতীত; সকলে নিঃশব্দে নিদ্রিত। জেব-উন্নিসা বাদশাহ-দুহিতা সুখশয্যায় অশ্রুমোচনে বিবশা, কদাচিৎ দাবাগ্নিপরিবেষ্টিত বাঘিনীর মত কোপতীব্রা। কিন্তু তখনই যেন বা শরবিদ্ধা হরিণীর মত কাতরা। রাত্রিটা ভাল নহে; মধ্যে মধ্যে গভীর হুংকারের সহিত প্রবল বায়ু বহিতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাতায়নপথলক্ষ্য গিরিশিখরমালায় প্রগাঢ় অন্ধকার—কেবল যথায় রাজপুতের শিবির, তথায় বসন্তকাননে কুসুমরাজি তুল্য সমুদ্রে ফেননিচয় তুল্য, এবং কামিনীকমনীয় দেহে রত্নরাশি তুল্য, এক স্থানে বহুসংখ্যক দীপ জ্বলিতেছে—আর সর্ব্বত্র নিঃশব্দ, প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কদাচিৎ সিপাহীর হস্তমুক্ত বন্দুকের প্রতিধ্বনিতে ভীষণ। কখনও বা মেঘের "অদ্রিগ্রহণগুরুগর্জ্জিত,"—কখন বা একমাত্র কামানের, শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত তুমুল কোলাহল। রাজপুরীর অশ্বশালায় ভীত অশ্বের হ্রেষা, রাজপুরীর উদ্যানে ভীত হরিণীর কাতরোক্তি। সেই ভয়ংকরী নিশীথিনীর সকল শব্দ শুনিতে শুনিতে বিষণ্ণমনে জেব-উন্নিসা ভাবিতেছিল, "ঐ যে কামান ডাকিল, বোধ হয় মোগলের কামান—নহিলে কামান অমন ডাকিতে জানে না। আমার পিতার তোপ ডাকিল—এমন শত শত তোপ আমার বাপের আছে- একটাও কি আমার হৃদয়ের জন্য নহে? কি করিলে এই তোপের মুখে বুক পাতিয়া দিয়া, তোপের আগুনে সকল জ্বালা জুড়াই? কাল সৈন্যমধ্যে গজপৃষ্ঠে চড়িয়া লক্ষ সৈন্যের

শ্রেণী দেখিয়াছিলাম, লক্ষ অস্ত্রের ঝঞ্জনা শুনিয়াছিলাম—তার একখানিতে আমার সব জ্বালা ফুরাইতে পারে; কৈ, সে চেষ্টা ত করি নাই? হাতীর উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, হাতীর পায়ের তলে পিষিয়া মরিতে পারিতাম,—কৈ? সে চেষ্টাও ত করি নাই। কেন করি নাই? মরিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মরিবার উদ্যোগ করি নাই কেন? এখনও ত অঙ্গে অনেক হীরা আছে, গুঁড়াইয়া খাইয়া মরি না কেন? আমার মনের আর সে শক্তি নাই যে, উদ্যোগ করিয়া মরি।"

এমন সময়ে বেগবান্ বায়ু, মুক্তদ্বার কক্ষমধ্যে, অতি বেগে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বাতি নিবাইয়া দিল। অন্ধকারে জেব-উন্নিসার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। জেব-উন্নিসা ভাবিতে লাগিল, "ভয় কেন? এই ত মরণ কামনা করিতেছিলাম! যে মরিতে চাহে, তার আবার কিসের ভয়? ভয়? কাল মরা মানুষ দেখিয়াছি, আজও বাঁচিয়া আছি। বুঝি যেখানে মরা মানুষ থাকে, সেইখানে যাইব, ইহা নিশ্চিত; তবে ভয় কিসের? তবে বেহেস্ত আমার কপালে নাই—বুঝি জাহান্নায় যাইতে হইবে, তাই এত ভয়! তা, এত দিন এ সকল কথা কিছুই বিশ্বাস করি নাই। জাহান্নাও মানি নাই, বেহেস্তও মানি নাই; খোদাও জানিতাম না, দীন্‌ও জানিতাম না। কেবল ভোগবিলাসই জানিতাম। আল্লা রহিম! তুমি কেন ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলে? ঐশ্বর্য্যেই আমার জীবন বিষময় হইল। তোমায় আমি তাই চিনিলাম না। ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই, তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তুমি ত জান! জানিয়া শুনিয়া নির্দ্দয় হইয়া কেন এ দুঃখ দিলে? আমার মত ঐশ্বর্য্য কাহার কপালে ঘটিয়াছে? আমার মত দুঃখী কে?"

শয্যায় পিপীলিকা, কি অন্য একটা কীট ছিল—রত্নশয্যাতেও কীটের সমাগমের নিষেধ নাই—কীট জেব-উন্নিসাকে দংশন করিল। যে কোমলাঙ্গে পুষ্পধন্বাও শরাঘাতের সময়ে মৃদুহস্তে বাণক্ষেপ করেন, তাহাতে কীট অবলীলাক্রমে দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিল। জেব-উন্নিসা জ্বালায় একটু কাতর হইল। তখন জেব-উন্নিসা মনে মনে একটু হাসিল। ভাবিল, "পিপীলিকার দংশনে আমি কাতর! এই অনন্ত দুঃখের সময়েও কাতর! আপনি পিপীলিকা-দংশন সহ্য করিতে পারিতেছি না আর অবলীলাক্রমে আমি, যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহাকে ভুজঙ্গমদংশনে প্রেরণ করিলাম! এমন কেহ নাই কি যে, আমাকে তেমনই বিষধর সাপ আনিয়া দেয়! হয় সাপ, নয় মবারক!"

প্রায় সকলেরই ইহা ঘটে যে, অধিক মানসিক যন্ত্রণার সময়, অধিক ক্ষণ ধরিয়া একা, মর্ম্মভেদী চিন্তায় নিমগ্ন হইলে মনের কোন কোন কথা মুখে ব্যক্ত হয়। জেব-উন্নিসার শেষ কথা কয়টি সেইরূপ মুখে ব্যক্ত হইল। তিনি সেই অন্ধকার নিশীথে, গাঢ়ান্ধকার কক্ষমধ্যে হইতে, সেই বায়ুর হুঙ্কার ভেদ করিয়া যেন কাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হয় সাপ! নয় মবারক!" কেহ সেই অন্ধকারে উত্তর করিল, "মবারককে পাইলে তুমি কি মরিবে না?"

"এ কি এ?" বলিয়া জেব-উন্নিসা উপাধান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। যেমন গীতধ্বনি শুনিয়া হরিণী উন্নমিতাননে উঠিয়া বসে, তেমনই করিয়া জেব-উন্নিসা উঠিয়া বসিল। বলিল, "এ কি এ? এ কি শুনিলাম! কার এ আওয়াজ?"

উত্তর হইল, "কার?"

জেব-উন্নিসা বলিল, "কার! যে বেহেস্তে গিয়াছে, তারও কি কণ্ঠস্বর আছে! সে কি ছায়া মাত্র নহে? তুমি কি প্রকারে বেহেস্ত হইতে আসিতেছ, যাইতেছ, মবারক? তুমি কাল দেখা দিয়াছিলে, আজ তোমার কথা শুনিলাম—তুমি মৃত, না জীবিত? আসিরুদ্দীন কি আমার কাছে মিছা কথা বলিয়াছিল? তুমি জীবিত হও, মৃত হও, তুমি আমার কাছে—আমার এই পালঙ্কে মুহূর্ত্তে জন্য বসিতে পার না? তুমি যদি ছায়া মাত্রই হও, তবু আমার ভয় নাই। একবার বসো।"

উত্তর, "কেন?"

জেব-উন্নিসা সকাতরে বলিল, "আমি কিছু বলিব। আমি যাহা কখন বলি নাই, তাহা বলিব।"

মবারক—(বলিতে হইবে না যে, মবারক সশরীর উপস্থিত) তখন অন্ধকারে, জেব-উন্নিসার পার্শ্বে পালঙ্কের উপর বসিল। জেব-উন্নিসার বাহুতে তাহার বাহু স্পর্শ হইল,—জেব-উন্নিসার শরীর হর্ষকণ্টকিত, আহ্লাদে পরিপ্লুত হইল;—অন্ধকারে মুক্তার সারি গণ্ড দিয়া বহিল। জেব-উন্নিসা আদরে মবারকের হাত আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইল। বলিল, "ছায়া

নও প্রাণনাথ! আমায় তুমি যা বলিয়া ভুলাও, আমি ভুলিব না। আমি তোমার; আবার তোমায় ছাড়িব না।" তখন জেব-উন্নিসা সহসা পালঙ্ক হইতে নামিয়া, মবারকের পায়ের উপর পড়িল; বলিল, "আমায় ক্ষমা কর! আমি ঐশ্বর্য্যের গৌরবে পাগল হইয়াছিলাম। আমি আজ শপথ করিয়া ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিলাম—তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আমি আর দিল্লী ফিরিয়া যাইব না। বল তুমি জীবিত?"

মবারক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি জীবিত। একজন রাজপুত আমাকে কবর হইতে তুলিয়া চিকিৎসা করিয়া প্রাণদান দিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে আমি এখানে আসিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা পা ছাড়িল না। তাহার চক্ষুর জলে মবারকের পা ভিজিয়া গেল। মবারক তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। কিন্তু জেব-উন্নিসা উঠিল না; বলিল, "আমায় দয়া কর, আমায় ক্ষমা কর।"

মবারক বলিল, "তোমায় ক্ষমা করিয়াছি। না করিলে, তোমার কাছে আসিতাম না।"

জেব-উন্নিসা বলিল, "যদি আসিয়াছ, যদি ক্ষমা করিয়াছ, তবে আমায় গ্রহণ কর। গ্রহণ করিয়া, ইচ্ছা হয় আমাকে সাপের মুখে সমর্পণ কর, না ইচ্ছা হয়, যাহা বল, তাহাই করিব। আমায় আর ত্যাগ করিও না। আমি তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, আর দিল্লী যাইতে চাহিব না; আলমগীর বাদশাহের রঙমহালে আর প্রবেশ করিব না। আমি শাহজাদা বিবাহ করিতে চাহি না। তোমার সঙ্গে যাইব।"

মবারক সব ভুলিয়া গেল সর্পদংশনজ্বালা ভুলিয়া গেল -আপনার মরিবার ইচ্ছা ভুলিয়া গেল—দরিয়াকে ভুলিয়া গেল। জেব-উন্নিসার প্রীতিশূন্য অসহ্য বাক্য ভুলিয়া গেল। কেবল জেব-উন্নিসার অতুল রূপরাশি তাহার নয়নে লাগিয়া রহিল; জেব-উন্নিসার প্রেমপরিপূর্ণ কাতরোক্তি তাহার কর্ণমধ্যে ভ্রমিতে লাগিল; শাহজাদীর দর্প চূর্ণিত দেখিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। তখন মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখন এই গরিবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত?"

জেব-উন্নিসা যুক্তকরে, সজলনয়নে বলিল, "এত ভাগ্য কি আমার হইবে?"

বাদশাহজাদী আর বাদশাহজাদী নহে, মানুষী মাত্র। মবারক বলিল, "তবে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আইস।"

আলো জ্বালিবার সামগ্রী তাঁহার সঙ্গে ছিল। মবারক আলো জ্বালিয়া ফানুসের ভিতর রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কথামত জেব-উন্নিসা বেশভূষা করিলেন। তাহা সমাপন হইলে, মবারক তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া কক্ষের বাহিরে গেলেন। তথা প্রহরিণীগণ নিযুক্ত ছিল। তাহারা মবারকের ইঙ্গিতে দুই জনে মবারক ও জেব-উন্নিসার সঙ্গে চলিল। মবারক যাইতে যাইতে জেব-উন্নিসাকে বুঝাইলেন যে, রাজাবরোধ মধ্যে পুরুষের আসিবার উপায় নাই। বিশেষ মুসলমানের ত কথাই নাই। এই জন্য তিনি বাহিরে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাও মহারাণীর বিশেষ অনুগ্রহেই পারিয়াছেন, এবং তাই এই প্রহরিণীদিগের সাহায্য পাইয়াছেন। সিংহদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাঁটিয়া যাইতে হইবে। বাহিরে মবারকের ঘোড়া এবং জেব-উন্নিসার জন্য দোলা প্রস্তুত আছে।

প্রহরিণীদিগের সাহায্যে সিংহদ্বারের বাহির হইয়া, তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব যানে আরোহণ করিলেন। উদয়পুরেও দুই চারি জন মুসলমান সওদাগরী ইত্যাদি উপলক্ষে বাস করিত। তাহারা রাণার অনুমতি লইয়া নগরপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মবারক জেব-উন্নিসাকে সেই মসজিদে লইয়া গেলেন। সেখানে একজন মোল্লা ও উকীল ও গোওয়া উপস্থিত ছিল। তাহাদের সাহায্যে মবারক ও জেব-উন্নিসার সরা মত পরিণয় সম্পাদিত হইল।

তখন মবারক বলিলেন, "এখন তোমাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছি, সেইখানে রাখিয়া আসিতে হইবে। কেন না, এখনও তুমি মহারাণার বন্দী। কিন্তু ভরসা করি তুমি শীঘ্র মুক্তি পাইবে।"

এই বলিয়া মবারক জেব-উন্নিসাকে পুনর্ব্বার তাঁহার শয্যাগৃহে রাখিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : দগ্ধ বাদশাহের জলাভিক্ষা

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণকালে চঞ্চলকুমারীর নিকট জেব-উন্নিসা বসিয়া প্রফুল্লবদনে কথোপকথনে প্রবৃত্ত। দুই দিনের রাত্রিজাগরণে শরীর ম্লান—দুশ্চিন্তার দীর্ঘকাল ভোগে বিশীর্ণ। যে জেব-উন্নিসা রত্নরাশি, পুষ্পরাশিতে মণ্ডিত হইয়া সীস্ মহলের দর্পণে দর্পণে আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া হাসিত, এ সে জেব-উন্নিসা নহে। যে জানিত যে, বাদশাহজাদীর জন্ম কেবল ভোগবিলাসের জন্য, এ সে বাদশাহজাদী নহে। জেব-উন্নিসা বুঝিয়াছে যে, বাদশাহজাদীও নারী, বাদশাহজাদীর হৃদয়ও নারীর হৃদয়; স্নেহশূন্য নারীহৃদয়, জলশূন্য নদী মাত্র—কেবল বালুকাময় অথবা জলশূন্য তড়াগের মত—কেবল পঙ্কময়।

জেব-উন্নিসা এক্ষণে অকপটে গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট গত রাত্রির ঘটনা সকল বিবৃত করিতেছিলেন। চঞ্চলকুমারী সকলই জানিতেন। সকল বলিয়া, জেব-উন্নিসা যুক্তকরে চঞ্চলকুমারীকে বলিলেন, "মহারাণি! আমায় আর বন্দী রাখিয়া আপনার কি ফল? আমি যে আলমগীর বাদশাহের কন্যা, তাহা আমি ভুলিয়াছি। আপনি তাঁহার কাছে পাঠাইলেও আমার আর যাইতে ইচ্ছা নাই। গেলেও বোধ করি, আমার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার স্বদেশ তুর্কস্থানে চলিয়া যাই।"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "এ সকল কথার উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই। কর্ত্তা মহারাণা স্বয়ং। তিনি আপনাকে আমার কাছে রাখিতে পাঠাইয়াছেন, আমি আপনাকে রাখিতেছি। তবে এই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহার জন্য মহারাণার সেনাপতি মাণিকলাল সিংহ দায়ী। আমি মাণিকলালের নিকট বিশেষ বাধিত, তাই তাঁহার কথায় এতটা করিয়াছি। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার কোন উপদেশ পাই নাই। অতএব সে বিষয়ে কোন অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না।"

জেব-উন্নিসা বিষণ্ণভাবে বলিল, "মহারাণাকে আমার এ ভিক্ষা আপনি কি জানাইতে পারেন না? তাঁহার শিবির এমন অধিক দূরে ত নহে! কাল রাত্রে পর্ব্বতের উপর তাঁহার শিবিরের আলো দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "পাহাড় যত নিকট দেখায়, তত নিকট নয়। আমরা পাহাড়ে দেশে বাস করি, তাই জানি। আপনিও কাশ্মীর গিয়াছিলেন, এ কথা আপনার স্মরণ হইতে পারে। তা যাই হোক, লোক পাঠান কষ্টসাধ্য নহে। তবে, রাণা যে এ কথায় সম্মত হইবেন, এমন ভরসা করি না। যদি এমন সম্ভব হইত যে, উদয়পুরের ক্ষুদ্র সেনা মোগল রাজ্য এই এক যুদ্ধে একেবারে ধ্বংস করিতে পারিত, যদি বাদশাহের সঙ্গে আমাদের আর সন্ধিস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকিত, তবে অবশ্য তিনি আপনাকে স্বামীর সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন সন্ধি অবশ্য এক দিন না এক দিন করিতে হইবে, তখন আপনাদিগকেও বাদশাহের নিকট অবশ্য ফেরৎ দিতে হইবে।"

জেব। তাহা হইলে, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাঠাইবেন। এ বিবাহের কথা জানিতে পারিলে, বাদশাহ আমাকে বিষভোজন করাইবেন। আর আমার স্বামীর ত কথাই নাই। তিনি আর কখনও দিল্লী যাইতে পাইবেন না। গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। এ বিবাহে কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, মহারাণি?

চঞ্চল। যাহাতে কোন উৎপাত না ঘটে, এমন উপায় করা যাইতে পারে, বোধ হয়।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে নির্ম্মলকুমারী সেখানে কিছু ব্যস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মল, চঞ্চলকে প্রণাম করার পর, জেব-উন্নিসাকে অভিবাদন করিলেন। জেব-উন্নিসাও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। তার পর চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিলেন, "নির্ম্মল, এত ব্যস্তভাবে কেন?"

নির্ম্মল। বিশেষ সংবাদ আছে।

তখন জেব-উন্নিসা উঠিয়া গেলেন। চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের সংবাদ না কি?"

নির্ম্মল। আজ্ঞা হাঁ।

চঞ্চল। তা ত লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি। ইন্দুর গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মহারাণা গর্ত্তের মুখ বুজাইয়া দিয়াছেন। শুনিয়াছি, ইন্দুর না কি গর্ত্তের ভিতর মরিয়া পচিয়া থাকিবার মত হইয়াছে।

নি। তার পর, আর একটা কথা আছে। ইন্দুর বড় ক্ষুধার্ত্ত। আমার সেই পায়রাটি আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। বাদশাহ ছাড়িয়া দিয়াছেন—তাহার পায়ে একখানি রোক্কা বাঁধিয়া দিয়াছেন।

চ। রোক্কা দেখিয়াছ?

নি। দেখিয়াছি।

চ। কাহার বরাবর?

নি। ইমলি বেগম।

চ। কি লিখিয়াছে?

নির্ম্মল পত্রখানি বাহির করিয়া কিয়দংশ এইরূপ পড়িয়া শুনাইলেন,—

"আমি তোমায় যেরূপ স্নেহ করিতাম, কোন মনুষ্যকে কখনও এমন স্নেহ করি নাই। তুমিও আমার অনুগত হইয়াছিলে। আজ পৃথিবীশ্বর দুর্দ্দশাপন্ন—লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে। অনাহারে মরিতেছি। দিল্লীর বাদশাহ আজ এক টুকরা রুটির ভিখারী। কোন উপকার করিতে পার না কি? সাধ্য থাকে, করিও। এখনকার উপকার কখনও ভুলিব না।"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপকার করিবে?"

নির্ম্মল বলিলেন, "তাহা বলিতে পারি না। আর কিছু না পারি, বাদশাহের জন্য আর যোধপুরী বেগমের জন্য কিছু খাদ্য পাঠাইয়া দিব।"

চ। কি রকমে? সেখানে ত মনুষ্য সমাগমের পথ নাই।

নি। তাহা এখন বলিতে পারি না। আমায় একবার শিবিরে যাইতে অনুমতি দিন। কি করিতে পারি, দেখিয়া আসি।

চঞ্চলকুমারী অনুমতি দিলেন। নির্ম্মলকুমারী গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, রক্ষিবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া, শিবিরে স্বামিসন্দর্শনে গেলেন। যাইবামাত্র মাণিকলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের অভিপ্রায়ে না কি?"

নি। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? তুমি কি আমার যুদ্ধের যোগ্য?

মাণিক। তা ত নই। কিন্তু আলমগীর বাদশাহ?

নি। আমি তাঁর ইমলি বেগম—তাঁর সঙ্গে কি যুদ্ধের সম্বন্ধ? আমি তাঁর উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি। আমি যাহা আজ্ঞা করি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

তার পর মাণিকলালে ও নির্ম্মলকুমারীতে কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। অনেক কথা হইল, ইহাই জানি।

মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীকে উদয়পুরে প্রতিপ্রেরণ করিয়া, রাজসিংহের সাক্ষাৎকারলাভের অভিপ্রায়ে রাণার তাম্বুতে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : অগ্নিনির্ব্বাণের পরামর্শ

মহারাণার সাক্ষাৎ পাইয়া, প্রণাম করিয়া মাণিকলাল যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "যদি এ দাসকে অন্য কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান মহারাজের অভিপ্রায় হয়, তবে বড় অনুগৃহীত হইব।"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এখানে কি হইয়াছে?"

মাণিকলাল উত্তর করিল, "এখানে ত কোন কাজ নাই। কাজের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত মোগলদিগের শুষ্ক মুখ দেখা ও আর্ত্তনাদ শুনা। তাহা কখনও কখনও পর্ব্বতের উপর গাছে চড়িয়া দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে কাজ, যে সে পারিবে। আমি ভাবিতেছি কি যে, এতগুলা মানুষ, হাতী, ঘোড়া, উট, এই রন্ধ্রে পচিয়া মরিয়া থাকিবে,—দুর্গন্ধে উদয়পুরেও কেহ বাঁচিবে না—বড় মড়ক উপস্থিত হইবে।"

রাণা বলিলেন, "অতএব তোমার বিবেচনা এই, মোগল সেনাকে অনাহারে মারিয়া ফেলা অকর্ত্তব্য?"

মাণিক। বোধ হয়। যুদ্ধে লক্ষ জনকে মারিলেও দেখিয়া দুঃখ হয় না। বসিয়া বসিয়া অনাহারে একজন লোকও মারিলে দুঃখ হয়।

রাণা। তবে উহাদিগের সম্বন্ধে কি করা যায়?

মাণিক। মহারাজ! আমার এত বুদ্ধি নাই যে, আমি এমন বিষয়ে পরামর্শ দিই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্ধিস্থাপনের এই উত্তম সময়। জঠরাগ্নির দাহের সময়ে মোগল যেমন নরম হইবে, ভরা পেটে তেমন হইবে না। আমার বোধ হয়, রাজমন্ত্রিগণ ও সেনাপতিগণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে মীমাংসা করা ভাল।

রাজসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মত ও স্বীকৃত হইলেন। উপবাসে এত মানুষ মারাও তাঁহার ইচ্ছা নহে। হিন্দু, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন যোগান পরমধর্ম্ম বলিয়া জানে। অতএব হিন্দু, শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।

সন্ধ্যার পর শিবিরে রাজসভা সমবেত হইল। তথা প্রধান সেনাপতিগণ, প্রধান রাজমন্ত্রিগণ উপস্থিত হইলেন। রাজমন্ত্রিগণের মধ্যে প্রধান দয়াল সাহা। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। মাণিকলালও ছিল।

রাজসিংহ বিচার্য্য বিষয়টা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, সভাসদ্‌গণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকেই বলিলেন, "মোগল ঐখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিয়া পচিয়া থাকুক--ঔরঙ্গজেবের বেটাকে ধরিয়া আনিয়া উহাদের গোর দেওয়াইব। না হয়, দোসাদের দল আনিয়া মাটি চাপা দেওয়াইব। মোগল হইতে বার বার রাজপুতের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে, কাহারও ইচ্ছা হইবে না যে, মোগলকে হাতে পাইয়া ছাড়া যায়।"

ইহার উত্তরে মহারাণা বলিলেন, "না হয় স্বীকার করিলাম যে, এই মোগলদিগকে এইখানে শুকাইয়া মারিয়া মাটি চাপা দেওয়া গেল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব আর ঔরঙ্গজেবের উপস্থিত সৈন্যগণ মরিলেই মোগল নিঃশেষ হইল না। ঔরঙ্গজেব মরিলে শাহ আলম বাদশাহ হইবে। শাহ আলমের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী মহাসৈন্য পর্ব্বতের অপর পারে সশস্ত্রে উপস্থিত আছে। আর দুইটা মোগলসেনা আর দুই দিকে বসিয়া আছে। আমরা কি এই সকলগুলিকে নিঃশেষ ধ্বংস করিতে পারিব? যদি না পারি, তবে অবশ্য একদিন সন্ধিস্থাপন করিতে হইবে। যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে এমন সুসময় আর কবে হইবে? এখন ঔরঙ্গজেবের প্রাণ কণ্ঠাগত—এখন তাহার কাছে যাহা চাহিব, তাহাই পাইব। সময়ান্তরে কি তেমন পাইব?"

দয়াল সাহা বলিলেন, "নাই পাইলাম। তবু এই মহাপাপিষ্ঠ পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ ঔরঙ্গজেবকে বধ করিলে পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করা হইবে। এমন পুণ্য আর কোন কার্য্যে নাই, মহারাজ মতান্তর করিবেন না।"

রাজসিংহ বলিলেন, "সকল মোগল বাদশাহই দেখিলাম—পৃথিবীর কণ্টক। ঔরঙ্গজেব শাহজাঁহার অপেক্ষাও কি নরাধম? খস্রু হইতে আমাদের যত অমঙ্গল ঘটিয়াছে, ঔরঙ্গজেব হইতে কি তত হইয়াছে? শাহ আলম যে পিতৃপিতামহ হইতেও দুরাচার না হইবে, তাহার স্থিরতা কি? আর তোমরা যদি এমন ভরসাই কর—সে ভরসা আমিও না করি তা নয়—যে এই চারিটি মোগল সেনাই আমরা পরাজিত করিতে পারিব, তবে ভাবিয়া দেখ, কত অসংখ্য মনুষ্যহত্যার পর সে আশা ফলে পরিণত হইবে। কত অসংখ্য রাজপুত বিনষ্ট হইবে। অবশিষ্ট থাকিবে কয় জন? আমরা অল্পসংখ্যক; মুসলমান বহুসংখ্যক। আমরা সংখ্যায় কমিয়া গেলে, আবার যদি মোগল আসে, তবে কার বাহুবলে তাদের আবার তাড়াইব?"

দয়াল সাহা বলিল, "মহারাজ! সমস্ত রাজপুতনা একত্রিত হইলে মোগলকে সিন্ধু পার করিয়া রাখিয়া আসিতে কতক্ষণ লাগে?"

রাজসিংহ বলিলেন, "সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা কখন হইয়াছে কি? এখনও ত সে চেষ্টা করিতেছি—ঘটিতেছে কি? তবে সে ভরসা কি প্রকারে করিব?"

দয়াল সাহা বলিলেন, "সন্ধি হইলেও ঔরঙ্গজেব সন্ধি রক্ষা করিবে, এমন ভরসা করি না। অমন মিথ্যাবাদী, ভণ্ড কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। মুক্তি পাইলেই, সে সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, যা করিতেছিল, তাহাই করিবে।"

রাজসিংহ বলিলেন "তাহা ভাবিলে কখনই সন্ধি করা হয় না। তাই কি মত?"

এইরূপ অনেক বিচার হইল। পরিশেষে সকলেই রাণার কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিলেন। সন্ধিস্থাপনের কথাই স্থির হইল।

তখন কেহ আপত্তি করিল, "ঔরঙ্গজেব ত কই, সন্ধির চেষ্টায় দূত পাঠান নাই। তাঁর গরজ, না আমাদের গরজ?"

তাহাতে রাজসিংহ উত্তর করিলেন, "দূত আসিবে কি প্রকারে? সে রন্ধ্রপথের ভিতর হইতে একটি পিঁপড়া উপরে আসিবার পথ রাখি নাই।"

দয়াল সাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমাদেরই বা দূত যাইবে কি প্রকারে? সেবার ঔরঙ্গজেব আমাদিগের দূতকে বধ কবিবার আজ্ঞা দিয়াছিল, এবার যে সে আজ্ঞা দিবে না, তার ঠিকানা কি?"

রাজসিংহ বলিলেন, "এবার যে বধ করিবে না, তাহা স্থির। কেন না, এখন কপট সন্ধিতেও তাহার মঙ্গল। তবে দূত সেখানে যাইবে কি প্রকারে, তাহার গোলযোগ আছে বটে।"

তখন মাণিকলাল নিবেদন করিল, "সে ভার আমার উপর অর্পিত হউক। আমি মহারাণার পত্র ঔরঙ্গজেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিব, এবং উত্তর আনিয়া দিব।"

সকলেই সে কথায় বিশ্বাস করিল; কেন না, সকলেই জানিত, কৌশলে ও সাহসে মাণিকলাল অদ্বিতীয়। অতএব পত্র লিখিবার হুকুম হইল। দয়াল সাহা পত্র প্রস্তুত করাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে—বাদশাহ, সমস্ত সৈন্য মেবার হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবেন। মেবারে গোহত্যা ও দেবালয়ভঙ্গ নিবারণ করিবেন, এবং জেজেয়ার কোন দাবি করিবেন না। তাহা হইলে রাজসিংহ পথ মুক্ত করিয়া দিবেন, নিরুদ্বেগে বাদশাহকে যাইতে দিবেন।

পত্র সভাসদ্ সকলকে শুনান হইল। শুনিয়া মাণিকলাল বলিল, "বাদশাহের স্ত্রী-কন্যা আমাদিগের নিকট বন্দী আছে। তাহারা থাকিবে?"

বলিবামাত্র সভামধ্যে একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। সকলে একবাক্যে বলিল, "ছাড়া হইবে না।" কেহ বলিল, "থাক্। উহারা মহারাণার আঙ্গিনা ঝাঁটাইবে।" কেহ বলিল, "উহাদের ঢাকায় পাঠাইয়া দাও। হিন্দু হইয়া, বৈষ্ণবী সাজিয়া, হরিনাম করিবে।" কেহ বলিল, "উহাদের মূল্যস্বরূপ এক এক ক্রোর টাকা বাদশাহ দিবেন।" ইত্যাদি নানা প্রকার প্রস্তাব হইল। মহারাণা বলিলেন, "দুইটা মুসলমান বাঁদীর জন্য সন্ধি ত্যাগ করা হইবে না। সে দুইটাকে ফিরাইয়া দিব, লিখিয়া দাও।"

সেইরূপ লেখা হইল। পত্রখানি মাণিকলালের জিম্মা হইল। তখন সভাভঙ্গ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ : অগ্নিতে জলসেক

সভাভঙ্গ হইল, তবু মাণিকলাল গেল না। সকলেই চলিয়া গেল, মাণিকলাল গোপনে মহারাণাকে জানাইল, "মবারকের বখ্শিশের কথাটা এই সময়ে মহারাজকে স্মরণ করিয়া দিতে হয়।"

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি চায়?"

মাণিক। বাদশাহের যে কন্যা আমাদিগের কাছে বন্দী আছে, তাহাকেই চায়।

রাজসিংহ। তাহাকে যদি বাদশাহের নিকট ফেরৎ না পাঠাই, তবে বোধ করি, সন্ধি হইবে না। আর স্ত্রীলোকের উপর কি প্রকারে আমি পীড়ন করিব?

মাণিক। পীড়ন করিতে হইবে না। শাহজাদীর সঙ্গে মবারকের গত রাত্রে সাদী হইয়াছে।

রাজসিংহ। সেই কথা শাহজাদী বাদশাহকে বলিলেই বোধ হয়, সব গোল মিটিবে।

মাণিক। এক রকম—কেন না, দুই জনেরই মাথা কাটা যাইবে।

রাজসিংহ। কেন?

মাণিক। শাহজাদীদের শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ নাই। এই শাহজাদী একজন ক্ষুদ্র সৈনিককে বিবাহ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের কুলের কলঙ্ক করিয়াছে। বিশেষ বাদশাহকে না জানাইয়া এ বিবাহ করিয়াছে, এজন্য তাহাকে দিল্লীর রঙ্মহালের প্রথানুসারে বিষ খাইতে হইবে। আর মবারক সাপের বিষে যখন মরেন নাই, তখন তাঁহাকে হাতীর পায়ে, কি শূলে যাইতে হইবে। যদি সে অপরাধও মার্জ্জনা হয়, তবে তিনি মহারাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য

বাদশাহের কাছে শূলে যাইবার যোগ্য। জানিতে পারিলে বাদশাহ তাহাকে শূলে দিবে। তাহা ছাড়া তিনি বিনানুমতিতে শাহজাদী বিবাহ করিয়াছেন, সে জন্যও শূলে যাইতে বাধ্য।

রাজসিংহ। আমি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি কি?

মাণিক। ঔরঙ্গজেব, কন্যা-জামাতাকে মার্জ্জনা না করিলে আপনি সন্ধি করিবেন না, এই নিয়ম করিতে পারেন।

রাজসিংহ বলিলেন, "তাহা আমি করিতে স্বীকৃত হইতেছি। উহাদের জন্য আমি একখানি পৃথক্ পত্র বাদশাহকে লিখিতেছি। তাহাও তুমি ঐ সঙ্গে লইয়া যাও। ঔরঙ্গজেব কন্যাকে মার্জ্জনা করিতে পারেন। কিন্তু মবারককে মার্জ্জনা করিতে তিনি আপাততঃ স্বীকৃত হইলেও, তাহাকে যে তিনি নিষ্কৃতি দিবেন, এমন আমার ভরসা হয় না। যাই হউক, মবারক যদি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়, তবে আমি ইহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই বলিয়া রাজসিংহ একখানি পৃথক্ পত্র স্বহস্তে লিখিয়া মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল পত্র দুইখানি লইয়া সেই রাত্রিতে উদয়পুর চলিল।

উদয়পুরে গিয়া মাণিকলাল প্রথম নির্ম্মলকুমারীকে এই সকল সংবাদ দিলেন। নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইল। সেও একখানি পত্র বাদশাহকে এই মর্ম্মে লিখিল—

"শাহান্‌শাহ!

বাঁদীর অসংখ্য কুর্ণিশ। হুজুর যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, বাঁদী তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। এক্ষণে হুজুরের সম্মতি পাইলেই হয়। আমার শেষ ভিক্ষাটা স্মরণ রাখিবেন। সন্ধি করিবেন।"

সে পত্রও নির্ম্মল মাণিকলালকে দিল। তার পর নির্ম্মল জেব-উন্নিসাকে সকল কথা জানাইল, তিনিও তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। এ দিকে মাণিকলাল মবারককে সকল কথা জানাইলেন। মবারক কিছু বলিল না। মাণিকলাল তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিল, "সাহেব' বাদশাহের নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি যে আপনাকে যথার্থ মার্জ্জনা করিবেন, এমন ভরসা আমি করি না।"

মবারক বলিল, "নাই করুন।"

পরদিন প্রাতে মাণিকলাল, নির্ম্মলকুমারীর পায়রা চাহিয়া লইয়া গিয়া, পত্রগুলি কাটিয়া ছোট করিয়া তাহার পায়ে বাঁধিয়া দিল। পায়রা ছাড়িয়া দিবামাত্র সে আকাশে উঠিল। পায়ের ভরে বড় পীড়িত। তথাপি কোন মতে উড়িয়া যেখানে ঔরঙ্গজেব উর্দ্ধমুখে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেইখানে বাদশাহের কাছে পত্র পৌঁছাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ : অগ্নিনির্ব্বাণকালে উদিপুরী ভস্ম

কপোত শীঘ্রই ঔরঙ্গজেবের উত্তর লইয়া আসিল। রাজসিংহ যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সকলেতেই সম্মত হইলেন। কেবল একটা গোলযোগ করিলেন, লিখিলেন, "চঞ্চলকুমারীকে দিতে হইবে।" রাজসিংহ বলিলেন, "তদপেক্ষা আপনাকে ঐখানে সসৈন্যে কবর দেওয়া আমার মনোমত।" কাজেই ঔরঙ্গজেবকে সে বাসনা ছাড়িতে হইল। তিনি সন্ধিতে সম্মত হইয়া মুন্‌শীর দ্বারা সেই মর্ম্মে সন্ধিপত্র লেখাইয়া আপনার পাঞ্জা অঙ্কিত করিয়া, স্বহস্তে তাহাতে "মঞ্জুর" লিখিয়া দিলেন। জেব-উন্নিসা ও মবারক সম্বন্ধে একখানি পৃথক্ পত্রে তাঁহাদিগকে মার্জ্জনা করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু একটি সর্ত্ত এই করিলেন যে, এ বিবাহের কথা কাহারও সাক্ষাতে কখন প্রকাশ করিবে না। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিলেন যে, কন্যা যাহাতে স্বামিসন্দর্শনে বঞ্চিত না হয়েন, সে উপায়ও বাদশাহ করিবেন।

রাজসিংহ সন্ধিপত্র পাইয়া, মোগল সেনা মুক্তি দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজপুতেরা হাতী লাগাইয়া গাছ সকল টানিয়া বাহির করিল। মোগলেরা হঠাৎ আহার্য্য কোথায় পাইবে, এই জন্য রাজসিংহ দয়া করিয়া বহুতর হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়া, অনেক আহার্য্য বস্তু উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। এবং শেষে উদিপুরী, জেব-উন্নিসা ও মবারককে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য উদয়পুরে আদেশ পাঠাইলেন। তখন নির্ম্মল, চঞ্চলকে ইঙ্গিত করিয়া কাণে কাণে বলিল, "বেগম তোমার দাসীপনা করিল কৈ?" এই বলিয়া নির্ম্মল উদিপুরীকে বলিল, "আমি যে নিমন্ত্রণ করিতে দিল্লী গিয়াছিলাম, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না?"

উদিপুরী বলিল, "তোমার জিব আমি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিব। তোমাদের সাধ্য কি যে, আমাকে দিয়া তামাকু সাজাও? তোমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য কি যে, বাদশাহের বেগম আটক রাখ? কেমন, এখন ছাড়িতে হইল ত? কিন্তু যে অপমান করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিব। উদয়পুরের চিহ্ন মাত্র রাখিব না।"

তখন চঞ্চলকুমারী স্থিরভাবে বলিলেন, "শুনিয়াছি, মহারাণা বাদশাহকে দয়া করিয়া তোমাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন। আপনি তাঁহার জন্য একটা মিষ্টি কথাও বলিতে জানেন না। অতএব আপনাকে ছাড়া হইবে না। আপনি বাঁদী মহলে গিয়া আমার জন্য তামাকু প্রস্তুত করিয়া আনুন।"

জেব-উন্নিসা বলিল, "সে কি মহারাণি! আপনি এত নির্দ্দয়?"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আপনি যাইতে পারেন—কেহ বিঘ্ন করিবে না। ইহাকে আমি এক্ষণে যাইতে দিতেছি না।"

জেব-উন্নিসা অনেক অনুনয় করিল, শেষ উদিপুরীও কিছু বিনীত ভাব অবলম্বন করিল। কিন্তু চঞ্চলকুমারী বড় শক্ত। দয়া করিয়া কেবল এইটুকু বলিলেন, "আমার জন্য একবার তামাকু প্রস্তুত করুক, তবে যাইতে পারিবে।"

তখন উদিপুরী বলিল, "তামাকু প্রস্তুত করিতে আমি জানি না।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "বাঁদীরা দেখাইয়া দিবে।"

অগত্যা উদিপুরী স্বীকৃত হইল। বাঁদীরা দেখাইয়া দিল। উদিপুরী চঞ্চলকুমারীর জন্য তামাকু সাজিল।

তখন চঞ্চলকুমারী সেলাম করিয়া তাহাদের বিদায় করিলেন। বলিলেন, "এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই আপনি বাদশাহকে জানাইবেন, এবং তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিবেন যে, আমিই তসবিরে নাথি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম। আরও বলিবেন, পুনশ্চ যদি তিনি কোন হিন্দুবালার অপমানের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি কেবল তসবিরে পদাঘাত করিয়া সন্তুষ্ট হইব না।"

তখন উদিপুরী নিদাঘের মেঘের মত সজলকান্তি হইয়া বিদায় লইল।

মহিষী, কন্যা ও খাদ্য পাইয়া ঔরঙ্গজেব বেত্রাহত কুক্কুরের মত বদনে লাঙ্গুল নিহিত করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : অগ্নিকাণ্ডে তৃষিতা চাতকী

বেগমদিগকে বিদায় দিয়া চঞ্চলকুমারী আবার অন্ধকার দেখিল। মোগল ত পরাভূত হইল, বাদশাহের বেগম তাহার পরিচর্য্যা করিল, কিন্তু কৈ, রাণা ত কিছু বলেন না। চঞ্চলকুমারী কাঁদিতেছে দেখিয়া নির্ম্মল আসিয়া কাছে বসিল। মনের কথা বুঝিল। নির্ম্মল বলিল, "মহারাণাকে কেন কথাটা স্মরণ করিয়া দাও না?"

চঞ্চল বলিল, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? স্ত্রীলোক হইয়া বার বার এই কথা কি বলা যায়?"

নির্ম্মল। তবে রূপনগরে, তোমার পিতাকে কেন আসিতে লেখ না?

চঞ্চল। কেন? সেই পত্রের উত্তরের পর আবার পত্র লিখিব?

নির্ম্মল। বাপের উপর রাগ অভিমান কি?

চঞ্চল। রাগ অভিমান নয়। কিন্তু একবার লিখিয়া—সে আমারি লেখা—যে অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা মনে হইলে এখনও বুক কাঁপে, আর কি লিখিতে সাহস হয়?

নির্ম্মল। সে ত বিবাহের জন্য লিখিয়াছিলে?

চঞ্চল। এবার কিসের জন্য লিখিব?

নির্ম্মল। যদি মহারাণা কোন কথা না পাড়িলেন—তবে বোধ করি, পিত্রালয়ে গিয়া বাস করাই ভাল,—ঔরঙ্গজেব এ দিকে আর ঘেঁষিবে না। সেই জন্য পত্র লিখিতে বলিতেছিলাম। পিত্রালয় ভিন্ন আর উপায় কি?

চঞ্চল কি উত্তর করিতে যাইতেছিল। উত্তর মুখ দিয়া বাহির হইল না—চঞ্চল কাঁদিয়া ফেলিল। নির্ম্মলও কথাটা বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়াছিল।

চঞ্চল, চক্ষুর জল মুছিয়া, লজ্জায় একটু হাসিল। নির্ম্মলও হাসিল। তখন নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "আমি দিল্লীর বাদশাহের কাছে কখন অপ্রতিভ হই নাই--তোমার কাছে অপ্রতিভ হইলাম—ইহা দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে বড় লজ্জার কথা। ইমলি বেগমেরও কিছু লজ্জার কথা। তা, তুমি একবার ইমলি বেগমের মুন্‌শীআনা দেখ। দোয়াত-কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ কর—আমি বলিয়া যাইতেছি।"

চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে লিখিব—মাকে, না বাপকে?

নির্ম্মল বলিল, "বাপকে।"

চঞ্চল পাঠ লিখিলে, নির্ম্মল বলিয়া যাইতে লাগিল, "এখন মোগল বাদশাহ মহারাণার হস্তে"—

"বাদশাহ" পর্য্যন্ত লিখিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, "মহারাণার হস্তে" লিখিব না—"রাজপুতের হস্তে" লিখিব। নির্ম্মলকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা লেখ।" তার পর নির্ম্মলের কথন মতে চঞ্চল লিখিতে লাগিল—

"হস্তে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া রাজপুতানা হইতে তাড়িত হইয়াছেন। এক্ষণে আর তাঁহার আমাদিগের উপর বলপ্রকাশ করিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনার সন্তানের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা? আমি আপনারই অধীন—"

পরে নির্ম্মল বলিল, "মহারাণার অধীন নই।"

চঞ্চল বলিল, "দূর হ পাপিষ্ঠা।" সে কথা লিখিল না। নির্ম্মল বলিল, "তবে লেখ, 'আর কাহারও অধীন নই'।" অগত্যা চঞ্চল তাহাই লিখিল।

এইরূপ পত্র লিখিত হইলে, নির্ম্মল বলিল, "এখন রূপনগর পাঠাইয়া দাও।" পত্র রূপনগরে প্রেরিত হইল। উত্তরে রূপনগরের রাও লিখিলেন, "আমি দুই হাজার ফৌজ লইয়া উদয়পুর যাইতেছি। ঘাট খুলিয়া রাখিতে রাণাকে বলিবে।"

এই আশ্চর্য্য উত্তরের অর্থ কি, তাহা চঞ্চল ও নির্ম্মল কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা বিচারে স্থির করিল যে, যখন ফৌজের কথা আছে, তখন রাণাকে অবগত করা আবশ্যক। নির্ম্মলকুমারী মাণিকলালের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

রাণাও সেইরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। চঞ্চলকুমারীকে ভুলেন নাই। তিনি বিক্রম সোলাঙ্কিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম্ম, চঞ্চলকুমারীর বিবাহের কথা। বিক্রম সিংহ কন্যাকে শাপ দিয়াছিলেন, রাণা তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। আর তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন রাজসিংহকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবেন, তখন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তাহাও স্মরণ করাইলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনার কিরূপ অভিপ্রায়?"

এই উত্তরে বিক্রম সিংহ লিখিলেন, "আমি দুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া আপনার নিকট যাইতেছি। ঘাট ছাড়িয়া দিবেন।"

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারীর মত সমস্যা বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, "দুই হাজার মাত্র অশ্বারোহী লইয়া বিক্রম আমার কি করিবে? আমি সতর্ক আছি।" অতএব তিনি বিক্রমকে ঘাট ছাড়িয়া দিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অগ্নি পুনর্জ্জ্বলিত

উদয়সাগরের তীরে ফিরিয়া আসিয়া, ঔরঙ্গজেব তথায় শিবির স্থাপন ও রাত্রি যাপন করিলেন। সৈনিক ও বাহনগণ খাইয়া বাঁচিল। তখন সিপাহী মহালে গান, গল্প এবং নানাবিধ রসিকতা আরম্ভ হইল। একজন মোগল বলিল, "হিন্দুর রাজ্যে আসিয়াছি বলিয়া আমরা একাদশীর উপবাস করিয়াছিলাম।" শুনিয়া একজন মোগলানী বলিল, "বাঁচিয়া আছ, তবু ভাল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, তোমরা নাই—তাই আমরাও একাদশী করিয়াছিলাম।" একজন গায়িকা কতকগুলি সৌখীন মোগলদিগের সম্মুখে গীত করিতেছিল; গায়িতে গায়িতে তাহার তাল কাটিয়া গেল। একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিল, "বিবিজান! এ কি হইল? তাল কাটিল যে?" গায়িকা বলিল, "আপনাদের যে বীরপনা দেখিলাম, তাহাতে আর হিন্দুস্থানে

থাকিতে সাহস হয় না। উড়িষ্যায় যাইব মনে করিয়াছি—তাই তাল কাটিতে শিখিতেছি।" কেহ বা উদিপুরীর হরণবৃত্তান্ত লইয়া দুঃখ করিতে লাগিল—কোন খয়েরখাঁ হিন্দুসৈনিক রাবণকৃত সীতাহরণের সহিত তাহার তুলনা করিল—কেহ তাহার উত্তরে বলিল, "বাদশাহ এত বানর সঙ্গে আনিয়াছিল, তবু এ সীতার উদ্ধার হইল না কেন?" কেহ বলিল, "আমরা সিপাহী—কাঠুরিয়া নহি, গাছ-কাটা বিদ্যা আমাদের নাই, তাই হারিলাম।" কেহ উত্তরে বলিল, "তোমাদের ধান-কাটা পর্য্যন্ত বিদ্যা, তা গাছ কাটিবে কি?" এইরূপ রঙ্গ রহস্য চলিতে লাগিল।

এ দিকে বাদশাহ শিবিরের রঙ্মহালে প্রবেশ করিলে জেব-উন্নিসা তাঁহার নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইল। বাদশাহ জেব-উন্নিসাকে বলিলেন, "তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর নাই, বুঝিতে পারিতেছি। এজন্য তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম। কিন্তু সাবধান! বিবাহের কথা প্রকাশ না পায়।"

তারপর উদিপুরী বেগমের সঙ্গে বাদশাহ সাক্ষাৎ করিলেন। উদিপুরী তাঁহার অপমানের কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। দশটা বাড়াইয়া বলিল, ইহা বলা বাহুল্য। ঔরঙ্গজেব শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হইলেন।

পরদিন দরবারে বসিয়া, আমদরবার খুলিবার আগে, নিভৃতে মবারককে ডাকিয়া বাদশাহ বলিলেন, "এক্ষণে তোমার সকল অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিলাম। কেন না, তুমি আমার জামাতা। আমার জামাতাকে নীচ পদে নিযুক্ত রাখিতে পারি না। অতএব তোমাকে দুই হাজারের মন্‌সবদার করিলাম। পরওয়ানা আজি বাহির হইবে। কিন্তু এক্ষণে তোমার এখানে থাকা হইতে পারিতেছে না। কারণ, শাহজাদা আকব্বর, পর্ব্বত মধ্যে আমার ন্যায় জালে পড়িয়াছেন। তাঁহার উদ্ধারের জন্য দিলীর খাঁ সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। সেখানে তোমার ন্যায় যোদ্ধার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। তুমি অদ্যই যাত্রা কর।"

মবারক এ সকল কথায় আহ্লাদিত হইলেন না; কেন না, জানিতেন, ঔরঙ্গজেবের আদর শুভকর নহে। কিন্তু মনে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দুঃখিতও হইলেন না। অতি বিনীত ভাবে বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া দিলীর খাঁর শিবিরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তার পর ঔরঙ্গজেব একজন বিশ্বাসী দূতের দ্বারা দিলীর খাঁর নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, মবারক খাঁকে দুইহাজারি মন্‌সবদার করিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছি। সে যেন একদিনও জীবিত না থাকে। যুদ্ধে মরে ভালই,—নহিলে অন্য প্রকারে যেন মরে। দিলীর মবারককে চিনিতেন না। বাদশাহের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয় বলিয়া স্থির করিলেন।

তার পর ঔরঙ্গজেব আমদরবারে বসিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, "আমরা কাঠুরিয়ার ফাঁদে পড়িয়াই সন্ধিস্থাপন করিয়াছি। সে সন্ধি রক্ষণীয় নহে। ক্ষুদ্র একজন ভুঁইঞা রাজার সঙ্গে বাদশাহের আবার সন্ধি কি? আমি সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বিশেষ, সে রূপনগরের কুমারীকে ফেরৎ পাঠায় নাই। রূপনগরীকে তাহার পিতা আমাকে দিয়াছে। অতএব রাজসিংহের তাহাতে অধিকার নাই। তাহাকে ফিরাইয়া না দিলে, আমি রাজসিংহকে ক্ষমা করিতে পারি না। অতএব যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিবে। রাণার রাজ্যমধ্যে গোরু দেখিলে, মুসলমান তাহা মারিয়া ফেলিবে। দেবালয় দেখিলেই তাহা ভগ্ন করিবে। জেজেয়া সর্ব্বত্রই আদায় হইবে।"

এই সকল হুকুম জারি হইল। এদিকে দিলীর খাঁ দাইসুরীর পথ দিয়া মাড়বার হইতে উদয়পুরে প্রবেশের চেষ্টায় আসিতেছেন শুনিয়া রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেবের কাছে লোক পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সন্ধির পর আবার যুদ্ধ কেন? ঔরঙ্গজেব বলিলেন, "ভুঁইঞার সঙ্গে বাদশাহের সন্ধি? বাদশাহের রূপনগরী বেগম ফেরৎ না পাঠাইলে বাদশাহ তোমাকে ক্ষমা করিবেন না।" শুনিয়া, রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "আমি এখনও জীবিত আছি।" রূপনগরের রাজকুমারীর অপহরণটা ঔরঙ্গজেবের শেল সমান বিঁধিতেছিল। তিনি রাজসিংহের নিকট অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া, রূপনগরের "রাও সাহেবকে" এক পরওয়ানা দিলেন, তাহাতে লিখিলেন, "তোমার কন্যা এখনও আমার নিকট উপস্থিত হয় নাই। শীঘ্র তাহাকে উপস্থিত করিবে—নহিলে রূপনগরের গড়ের চিহ্ন রাখিব না।" ঔরঙ্গজেবের

ভরসা যে, পিতা জিদ্ করিলে চঞ্চলকুমারী তাঁহার নিকটে আসিতে সম্মত হইতে পারে। পর্‌ওয়ানা পাইয়া বিক্রমসিংহ উত্তর লিখিল, "আমি শীঘ্র দুই হাজার অশ্বারোহী সেনা লইয়া আপনার হুজুরে হাজির হইব।"

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন, "সেনা কেন?" মনকে এইরূপ বুঝাইলেন যে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিক্রমসিংহ সেনা লইয়া আসিতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মবারকের দাহনারম্ভ

সৌন্দর্য্যের কি মহিমা! মবারক জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আবার সব ভুলিয়া গেল। গর্ব্বিতা, স্নেহাভাবদর্পে প্রফুল্লা জেব-উন্নিসাকে দেখিলে আর তেমন হইত কি না, বলা যায় না, কিন্তু সেই জেব-উন্নিসা এখন বিনীতা, দর্পশূন্যা, স্নেহশালিনী, অশ্রুময়ী। মবারকের পূর্ব্বানুরাগ সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। দরিয়া, দরিয়ায় ভাসিয়া গেল। মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। তাহার মত বিশ্বাসঘাতক, পাপিষ্ঠ আর নাই।

সহস্র দীপের রশ্মি-প্রতিবিম্ব-সমন্বিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুঃপার্শ্বে পর্ব্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমণ্ডপের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভুবন তুল্য কক্ষে বসিয়া মবারক জেব-উন্নিসার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল। মবারক বড় দুঃখের সহিত বলিল, "তোমাকে আবার পাইয়াছি, কিন্তু দুঃখ এই যে, এই সুখ দশ দিন ভোগ করিতে পারিলাম না।"

জেব-উন্নিসা। কেন? কে বাধা দিবে? বাদশাহ?

মবারক। সে সন্দেহও আছে। কিন্তু বাদশাহের কথা এখন বলিতেছি না। আমি কাল যুদ্ধে যাইব। যুদ্ধে মরণ জীবন দুই আছে। কিন্তু আমার পক্ষে মরণ নিশ্চয়। আমি রাজপুতদিগের যুদ্ধের যে সুবন্দোবস্ত দেখিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চিত জানি যে, পার্ব্বত্য যুদ্ধে আমরা তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারিব না! আমি একবার হারিয়া আসিয়াছি, আর একবার হারিয়া আসিতে পারিব না। আমাকে যুদ্ধে মরিতে হইবে।

জেব-উন্নিসা সজল নয়নে বলিল, "ঈশ্বর অবশ্য করিবেন যে, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিবে। তুমি আমার কাছে না আসিলে আমি মরিব।"

উভয়ে চক্ষুর জল ফেলিল। তখন মবারক ভাবিল, "মরিব, না মরিব না?" অনেক ভাবিল। সম্মুখে সেই নক্ষত্রখচিতগগনস্পর্শী পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয়সাগরের জল—তাহাতে দীপমালাপ্রভাসিত পট-নির্ম্মিতা মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া—দূরে পর্ব্বতের চূড়ার উপর চূড়া—তার উপর চূড়া—বড় অন্ধকার। দুই জনে বড় অন্ধকারই দেখিল।

সহসা জেব-উন্নিসা বলিল, "এই অন্ধকারে, শিবিরের প্রাচীরের তলায়, কে লুকাইল? তোমার জন্য আমার মন সর্ব্বদা সশঙ্কিত।"

"দেখিয়া আসি," বলিয়া মবারক ছুটিয়া দুর্গপ্রাকারতলে গেলেন। দেখিলেন, একজন যথার্থই লুকাইয়া শুইয়া আছে বটে। মবারক তাহাকে ধৃত করিলেন। হাত ধরিয়া তুলিলেন। যে লুকাইয়াছিল, সে দাঁড়াইয়া উঠিল। অন্ধকারে মবারক কিছু ঠাওর পাইলেন না। তাহাকে টানিয়া দুর্গমধ্যে দীপালোকের নিকট আনিলেন। দেখিলেন যে, একটা স্ত্রীলোক। সে মুখে কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিল—মুখ খুলিল না। মবারক তাহাকে একজন প্রতিহারীর জিম্মায় রাখিয়া, স্বয়ং জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া সবিস্তার নিবেদন করিলেন। জেব-উন্নিসা কৌতূহল-বশতঃ তাহাকে কক্ষমধ্যে আনিতে অনুমতি দিলেন। মবারক তাহাকে কক্ষমধ্যে লইয়া আসিলেন।

জেব-উন্নিসা বলিল, "তুমি কে? কেন লুকাইয়াছিলে? মুখের কাপড় খোল।"

সে স্ত্রীলোক তখন মুখের কাপড় খুলিল। দুই জনে সবিস্ময়ে দেখিল—দরিয়া বিবি!

বড় সুখের সময়ে, সহসা বিনা মেঘে সম্মুখে বজ্রপতন দেখিলে যেমন বিহ্বল হইতে হয়, জেব-উন্নিসা ও মবারক সেইরূপ হইল। তিন জনের কেহ কোন কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মবারক বলিল, "ইয়া আল্লা! আমাকে মরিতেই হইবে।"

জেব-উন্নিসা তখন অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "তবে আমাকেও।"

দরিয়া বলিল, "তোমরা কে?"
মবারক তাহাকে বলিল, "আমার সঙ্গে আইস।"
তখন মবারক অতি দীনভাবে জেব-উন্নিসার নিকট বিদায় লইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : অগ্নির নূতন স্ফুলিঙ্গ

রাজসিংহ রাজনীতিতে ও যুদ্ধনীতিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। মোগল যতক্ষণ না সমস্ত সৈন্য লইয়া রাণার রাজ্য ছাড়িয়া অধিক দূর যায়, ততক্ষণ শিবির ভঙ্গ করেন নাই বা স্বীয় সেনার কোন অংশ স্থানবিচ্যুত করেন নাই। তিনি শিবিরেই রহিয়াছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, বিক্রমসিংহ রূপনগর হইতে দুই সহস্র সেনা লইয়া আসিতেছেন। রাজসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একজন অশ্বারোহী অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া দূতস্বরূপ, রাজসিংহের দর্শন পাইবার কামনা জানাইল। রাজসিংহের অনুমতি পাইয়া প্রতিহারী তাহাকে লইয়া আসিল। সে রাজসিংহকে প্রণাম করিয়া জানাইল যে, রূপনগরাধিপতি বিক্রম সোলাঙ্কি মহারাণার দর্শন মানসে সসৈন্যে আসিয়াছেন।

রাজসিংহ বলিলেন, "যদি শিবিরের ভিতরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে একা আসিতে বলিবে। যদি সসৈন্যে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে শিবিরের বাহিরে থাকিতে বলিবে। আমি সসৈন্যে যাইতেছি।"

বিক্রম সোলাঙ্কি একা শিবিরমধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। তিনি আসিলে রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আসন প্রদান করিলেন। বিক্রমসিংহ, রাণাকে কিছু নজর দিলেন। উদয়পুরের রাণা রাজপুতকুলের প্রধান,—এ জন্য এ নজর প্রাপ্য। কিন্তু রাজসিংহ ঐ নজর না গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে এ নজর, মোগল বাদশাহেরই প্রাপ্য।"

বিক্রমসিংহ বলিলেন, "মহারাণা রাজসিংহ জীবিত থাকিতে, ভরসা করি, আর কোন রাজপুত মোগল বাদশাহকে নজর দিবে না। মহারাজ! আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি না জানিয়াই তেমন পত্রখানা লিখিয়াছিলাম। আপনি মোগলকে যেরূপ শাসিত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, সমস্ত রাজপুত মিলিত হইয়া আপনার অধীনে কার্য্য করিলে মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইবে! আমার পত্রের শেষ ভাগ স্মরণ করিবেন। আমি আপনাকে কেবল নজর দিতে আসি নাই। আমি আরও দুইটি সামগ্রী আপনাকে দিতে আসিয়াছি। এক আমার এই দুই সহস্র অশ্বারোহী; দ্বিতীয় আমার নিজের এই তরবারি;—আজিও এ বাহুতে কিছু বল আছে; আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, শরীর পতন করিয়াও সে কার্য্য সম্পন্ন করিব।"

রাজসিংহ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন। আপনার আন্তরিক আনন্দ বিক্রমসিংহকে জানাইলেন। বলিলেন, "আজ আপনি সোলাঙ্কির মত কথা বলিয়াছেন। দুষ্ট মোগল, আমার হাতে নিপাত যাইতেছিল, সন্ধি করিয়া উদ্ধার পাইল। উদ্ধার পাইয়া বলে, সন্ধি করি নাই। আবার যুদ্ধ করিতেছে। দিলীর খাঁ সৈন্য লইয়া শাহজাদা আকব্বরের উদ্ধারের জন্য যাইতেছে। আপনি অতি সুসময়ে আসিয়াছেন। দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে নিকাশ করিতে হইবে—সে গিয়া আকব্বরের সঙ্গে যুক্ত হইলে কুমার জয়সিংহের বিপদ্ ঘটিবে। তজ্জন্য আমি গোপীনাথ রাঠোরকে পাঠাইতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার সেনা অতি অল্প। আমার নিজ সেনা হইতে কিছু তাঁহার সঙ্গে দিব—মাণিকলাল সিংহ নামে আমার একজন সুদক্ষ সেনাপতি আছে—সে তাহা লইয়া যাইবে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব নিকটে, আমি নিজে এ স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না, অথবা অধিক সৈন্য মাণিকলালের সঙ্গে দিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা, আপনিও আপনার অশ্বারোহী সেনা লইয়া সেই যুদ্ধে যান। আপনারা তিন জনে মিলিত হইয়া দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে সসৈন্যে সংহার করুন।"

বিক্রমসিংহ আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগার্থ বিদায় হইলেন। চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : মবারক ও দরিয়া ভস্মীভূত

গোপীনাথ রাঠোর, বিক্রম সোলাঙ্কি, এবং মাণিকলাল দিলীর খাঁর ধ্বংসাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। যে পথে দিলীর খাঁ আসিতেছেন, সেই পথে তিন স্থানে তিন জন লুক্কায়িত রহিলেন। কিন্তু পরস্পরের অনতিদূরেই রহিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই তিনি উচ্চ সানুদেশে থাকিতে পারিলেন না। তিনি পর্ব্বতবাসী হইলেও তাঁহাকে অশ্ব রাখিতে হইত; তাহার কারণ, তদ্ব্যতীত নিম্নভূমিনিবাসী শত্রু ও দস্যুর পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারিতেন না। আর এমন সকল ক্ষুদ্র রাজগণ, রাত্রিকালে সুযোগ পাইলে, নিজে নিজেও এক আধটা ডাকাতি—অর্থাৎ এক রাত্রিতে দশ পাঁচখানা গ্রাম লুণ্ঠন না করিতেন, এমন নহে। পর্ব্বতের উপর তাঁহার সৈনিকেরা অশ্ব ছাড়িয়া পদাতিকের কাজ করিত। এক্ষণে মোগলের পশ্চাদনুসরণ করিতে হইবে বলিয়া, বিক্রমসিংহ অশ্ব লইয়া আসিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য যুদ্ধে তাহাতে অসুবিধা হইল। অতএব তিনি পর্ব্বতে না উঠিয়া অপেক্ষাকৃত সমতলভূমির অন্বেষণ করিলেন। মনোমত সেরূপ কিছু ভূমি পাইলেন। তাহার সম্মুখে কিছু বন-জঙ্গল আছে। জঙ্গলের পশ্চাৎ তাঁহার অশ্বারোহিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। তৎপরে মাণিকলাল রাজসিংহের পদাতিকগণ লইয়া লুক্কায়িত হইল। সর্ব্বশেষে গোপীনাথ রাঠোর রহিলেন।

দিলীর খাঁ আকব্বরের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া একটু সতর্কভাবে আসিতেছিলেন—অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহী পাঠাইয়া সন্ধান লইতেছিলেন যে, রাজপুত কোথাও লুকাইয়া আছে কি না। অতএব বিক্রম সোলাঙ্কির অশ্বারোহিগণের সন্ধান, তাঁহাকে সহজে মিলিল। তিনি তখন কতকগুলি সৈন্য অশ্বারোহীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি অন্যান্য বিষয়ে বড় স্থূলবুদ্ধি, কিন্তু যুদ্ধকালে অতিশয় ধূর্ত্ত এবং রণপাণ্ডিত—অনেক সময়ে ধূর্ত্ততাই রণপাণ্ডিত্য—তিনি মোগল সেনার সঙ্গে অতি সামান্য যুদ্ধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন—দিলীর খাঁর মুণ্ডপাত করিবার জন্য।

দিলীর মাণিকলালকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন, মাণিকলাল যে পার্শ্বে লুক্কায়িত আছে, তাহা তিনিও জানিতে পারিলেন না—মাণিকলালও কোন সাড়াশব্দ করিল না। সোলাঙ্কিকে তাড়াইয়া দিলীর বিবেচনা করিয়াছিলেন, সব রাজপুতই হঠিয়াছে—অতএব আর পূর্ব্ববৎ অবধানের সহিত চলিতেছিলেন না। মাণিকলাল বুঝিল, এ উপযুক্ত সময় নহে—সেও স্থির রহিল।

পরে, যথায় গোপীনাথ রাঠোর লুক্কায়িত, তাহারই নিকট দিলীর উপস্থিত। সেখানে পর্ব্বতমধ্যস্থ পথ অতি সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সেইখানে সেনার মুখ উপস্থিত হইলে, গোপীনাথ রাঠোর লাফ দিয়া তাহার উপর পড়িয়া, বাঘ যেমন পথিকের সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসে, সেইরূপ সসৈন্যে বসিলেন।

দিলীর, মবারককে আজ্ঞা করিলেন, "সম্মুখবর্ত্তী সেনা লইয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দাও।" মবারক অগ্রসর হইলেন। কিন্তু গোপীনাথ রাঠোরকে তাড়াইবার তার সাধ্য কি? সংকীর্ণ পথে অল্প মোগলই দাঁড়াইতে পারিল। যেমন গর্ত্ত হইতে পিপীলিকা বাহির হইবার সময়ে, বালকে একটি একটি করিয়া টিপিয়া মারে, তেমনই রাজপুতেরা মোগলদিগকে সংকীর্ণ পথে টিপিয়া মারিতে লাগিল। এ দিকে দিলীর, সম্মুখে পথ না পাইয়া, সেনা লইয়া নিশ্চল হইয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাণিকলাল বুঝিল, এই উপযুক্ত সময়। সে সসৈন্য পর্ব্বতাবতরণ করিয়া বজ্রের ন্যায় দিলীরের উপর পড়িল। দিলীর খাঁর সেনা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে বিক্রম সোলাঙ্কি সেই দুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া হঠাৎ দিলীরের সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন। তখন তিন দিকে আক্রান্ত হইয়া মোগল সেনা আর এক দণ্ড তিষ্ঠিল না। যে পারিল, সে পলাইয়া বাঁচিল। অধিকাংশই পলাইবার পথ পাইল না—কৃষকের অস্ত্রের নিকট ধান্যের ন্যায় ছিন্ন হইয়া রণক্ষেত্রে নিপাতিত হইল।

কেবল গোপীনাথ রাঠোরের সম্মুখে, কয়জন মোগল যোদ্ধা কিছুতেই হঠিল না—মৃত্যুকে

তৃণজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। তাহারা মোগলসেনার সার—বাছা বাছা লোক। মবারক তাহাদের নেতা। কিন্তু তাহারাও আর টিকে না। পলকে পলকে এক একজন বহুসংখ্যক রাজপুতের আক্রমণে নিপাত যাইতেছিল। শেষ দুই চারি জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া মাণিকলাল সেখানে শীঘ্র উপস্থিত হইলেন। রাজপুত-দিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "ইহাদিগকে মারিও না। ইহারা বীরপুরুষ। ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজপুতেরা মুহূর্ত্ত জন্য নিরস্ত হইল। তখন মাণিকলাল বলিল, "তোমরা চলিয়া যাও। তোমাদের ছাড়িয়া দিলাম। আমার অনুরোধে তোমাদের কেহ কিছু বলিবে না।"

একজন মোগল বলিল, "আমরা যুদ্ধে কখন পিছন ফিরি নাই। আজও ফিরিব না।" সেই কয়জন মোগল আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন মাণিকলাল মবারককে ডাকিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব! আর যুদ্ধ করিয়া কি করিবে?"

মবারক বলিল, "মরিব।"

মাণিক। কেন মরিবে?

মবা। আপনি কি জানেন না যে, মৃত্যু ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই?

মাণিক। তবে বিবাহ করিলেন কেন?

মবা। মরিবার জন্য।

এই সময়ে একটা বন্দুকের শব্দ পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে না করিতে মবারক মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। মাণিকলাল দেখিলেন, মবারক জীবনশূন্য। মাথায় গুলি বিঁধিয়াছে। মাণিকলাল চাহিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের সানুদেশে একজন স্ত্রীলোক বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বন্দুকের মুখনিঃসৃত ধূম দেখা গেল। বলা বাহুল্য, সে উন্মাদিনী দরিয়া!

মাণিকলাল স্ত্রীলোককে ধরিতে আজ্ঞা দিলেন। সে হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গেল। সেই অবধি দরিয়া বিবিকে পৃথিবীতে আর কেহ কখন দেখে নাই।

যুদ্ধের পর জেব-উন্নিসা শুনিল, মবারক যুদ্ধে মরিয়াছে। তখন সে বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিল, উদয়সাগরের প্রস্তরকঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিল—

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : পূর্ণাহুতি—ইষ্টলাভ

যুদ্ধান্তে জয়শ্রী বহন করিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি রাজসিংহের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি বলিলেন, "একটা কথা বাকি আছে। আমার সেই কন্যাটা। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। গ্রহণ করিবেন কি?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তবে উদয়পুরে চলুন।"

বিক্রম সোলাঙ্কি সেই দুই সহস্র ফৌজ লইয়া উদয়পুরে গেলেন।

বলা বাহুল্য, সেই রাত্রেই রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তার পর যা ঘটিল, তাহাতে ইতিহাসবেত্তার অধিকার, উপন্যাসলেখকের সে সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আবার স্বয়ং ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আজিম আসিয়া ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। ঔরঙ্গজেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া, বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিলেন। রাজপুতেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইল। ঔরঙ্গজেবের বিস্তর সেনা মরিল।

ঔরঙ্গজেব ও আজিম ভয়ে পলাইয়া রাণাদিগের পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। সুবলদাস নামা একজন রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে

গিয়া চিতোর ও আজমীরের মধ্যে সেনা স্থাপন করিলেন। আবার আহার বন্ধের ভয়। অতএব খাঁ রহিলাকে বার হাজার ফৌজের সহিত সুবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিয়া ঔরঙ্গজেব স্বয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন। আর কখনও উদয়পুরমুখো হইলেন না। সে সাধ তাঁহার জন্মের মত ফুরাইল।

এ দিকে সুবলদাস, খাঁ রহিলাকে উত্তম মধ্যম দিয়া দূরীকৃত করিলেন। পরাভূত হইয়া খাঁ রহিলাও আজমীরে প্রস্থান করিলেন। দিগন্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের অধিকারে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর, গ্রাম, এমন কি, মোগল সুবাদারের রাজধানীও লুঠপাট করিলেন। অনেক স্থান অধিকার করিয়া সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত রাজসিংহের অধিকার স্থাপন করিতেছিলেন, কিন্তু পীড়িত প্রজারা আসিয়া রাজসিংহকে জানাইল। করুণ-হৃদয় রাজসিংহ তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন। দয়ার অনুরোধে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না।

কিন্তু রাজমন্ত্রী দয়াল সাহ সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মালবে মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম্মের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। প্রতিশোধের স্বরূপে ইনি কাজিদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কুয়ায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।

দয়াল সাহ, কুমার জয়সিংহের সৈন্যের সঙ্গে আপনার সৈন্য মিলাইলে, তাঁহারা শাহজাদা আজিমকে পাকড়া করিয়া চিতোরের নিকট যুদ্ধ করিলেন। আজিমও হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল। পদে পদে মোগলেরা পরাজিত হইল। শেষ ঔরঙ্গজেব সত্য সত্যই সন্ধি করিলেন। রাণা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল। মোগল এমন শিক্ষা আর কখনও পায় নাই।

উপসংহার

গ্রন্থকারের নিবেদন

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ; অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীর তুলনায়, মাণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়। এই জন্য এ সকল কল্পনা।

ঔরঙ্গজেবের উত্তম ঐতিহাসিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ। উভয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি; উভয়েই ঐশ্বর্য্যে, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী, এবং প্রজাপীড়ক। এজন্য উভয়েই আপন

আপন সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। উভয়েই ক্ষুদ্র শত্রু দ্বারা পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন:—ফিলিপ ইংরেজ (তখন ক্ষুদ্রজাতি) ও ওলন্দাজের দ্বারা, ঔরঙ্গজেব মারহাট্টা ও রাজপুতের দ্বারা। মারহাট্টা শিবজী ও ইংলণ্ডের তৎকালিক নেত্রী এলিজাবেথ পরস্পর তুলনীয়। কিন্তু তদপেক্ষা ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্ত্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।

দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

বিংশতিতম হেমন্ত আমার দেহ শীতবাত দ্বারা আঘাত কবিলে আমি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া খ্রীষ্টের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিলাম। তৎকালে আশা ছিল, যে কত বিবি আমার নয়নভঙ্গির চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া প্রাণনাথ করিতে ব্যস্ত হইবে, কত ইংরাজ আপনপ্রার্থিত প্রিয়তমার অলাভে হতাশ হইয়া অশ্রুপাত ও আমায় শাপদান করিবে, এই সকল অদম্য মনোরথ সমাকৃষ্ট হইয়াই আমার খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয়। যদি শ্রদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা কর, শ্রদ্ধা আমার অন্য ধর্ম্মে যেমন, খ্রীষ্টধর্ম্মেও সেইরূপ অর্থাৎ কিছুই নহে। আমি মাতার চরিত্র উচ্চারণ করিয়া শপথ কবিতে পারি, যদি পৃথিবীর কোন ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস থাকে। আমি ধর্ম্মকে ঐহিক মহাবাসনাপূরণেব উপায় চিরকাল মনে করিতাম, কিন্তু আমার অদ্যাপি স্থির নিশ্চয় আছে, যে খ্রীষ্টধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত আব সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা অল্প অনুপকারী। এই ধর্মের অবলম্বী জাতিরা এক্ষণে শারীবিক ও মানসিক [২] উৎকর্ষবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাদিগেরই অধিষ্ঠান এখন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রিয়নিকেতন হইয়াছে। কিন্তু যাহারা ইহাকেই খ্রীষ্টধর্ম্মের ঐশ্বরিকতার যুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে, আমি তাহাদিগকে মনেব সহিত ঘৃণা করি।

আমি খ্রীষ্টান হইয়া যে সকল আশা সিদ্ধ করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহাব একটিও সফল হইল না। কোন বিবিই প্রণয়িভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বাঙ্গালি বলিয়া ইংবাজেরা ঘৃণা, এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া স্বজাতীয়েবা পরিহার করিতে লাগিলেন। তথাপি আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ হইল না। প্রমোদরত মানস ও স্ফুর্ত্তিযুক্ত শবীরের সাহায্যে আমার প্রফুল্লতাব কোন হানি হয় নাই। মিশনরিবা যে অত্যল্পমাত্র বৃত্তি দিতেন, তাহাতে আবশ্যক ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হইত না। অতএব বাঙ্গালাভাষায একজন লেখক হইয়া বসিলাম। উৎকৃষ্ট হউক, আর অপকৃষ্টই হউক আমাব বচনাদ্বারা আপনাব অনেক আনুকূল্য হইল, লোকের উপকাব হইয়াছে কি না তাহা লোকেই বলিতে পারে আমার সে বিষয়ে অবধান ছিল না, পয়সার দবকার বড়, যাহাতে হউক পয়সা পাইলেই হইত। এইরূপে কিছুকাল কাটাইলাম। কিন্তু যৌবনের উত্তপ্ত রক্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। সচ্চরিত্র ও সন্তুষ্টস্বভাব হইয়া বিস্তীর্ণ অর্ণবাম্বরার এক কোণে অজ্ঞাতরূপে বিলীন হইতে হইবে এই ভাবনা আমার বিষের ন্যায় মনে হইল। মন কিছুতেই সুস্থির থাকিল না। বাঙ্গালাভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাতি লাভ কবিতে অভিলাষ ছিল না, অতএব চেষ্টাও হইল না। আমি বাঙ্গালাব অধিবাসী, ভাষা, এমন কি সকলই (৩) অতিশয় ঘৃণা করিতাম। অতি পাপাচাব ক্ষুদ্রদেহ কতকগুলি কৃষাণেব স্বজাতীয় হইয়াছি এই ভাবিয়াই আমাব কত ক্ষোভ হইত, আবার তাহাদের দেশে তাহাদের ভাযায কিছু আনুকূল্য করিয়া তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিব এবং মলিনগাত্র বীভৎসাচাব নগ্নাঙ্গ পিশাচদিগের সহবাস তাহা অপেক্ষা প্রার্থনীয়, আমাব তখন মনের গতি এইরূপ ছিল। এইরূপ বিদ্বেষী হইয়া এদেশে থাকিতে মন সরিল না। লেখনীদ্বারা যাহা উপার্জ্জন

করিয়াছিলাম, তাহাদ্বারা বোম্বাই নগরাভিমুখি এক ফরাশি জাহাজে এক গৃহ ভাড়া করিলাম এবং স্থিব করিলাম যে, ইংরেজরা ঘৃণা করিয়াছে, বাঙ্গালিদিগের সমাজও পরিত্যাগ কবিলাম, অতএব এক্ষণে হাইদরের অধিরাজ্যে আপনার সৌভাগ্য উপার্জ্জন কবিব। এইরূপ অধ্যবসাযে আরূঢ় হইয়া ফ্লোরেন্সনামক জাহাজে অধিরোহণ করিলাম। গঙ্গার শুভ্র জলে ভাসিয়া জাহাজ দুই দিনেই সমুদ্রে উপস্থিত হইল। সাগর-দ্বীপ নযনগোচর হইল। হিন্দুদিগেব কুসংস্কার ও তীর্থযাত্রার এই স্থান সাগরের তরঙ্গে সঞ্চিত সিকতোচ্চয়দ্বারা মরুস্থল হইয়া আছে। শীতাতপ অতি অস্বাস্থ্যকর। সকলেই আপনার মাতা, বা ভগিনী বা অন্য কোন পরিবার গঙ্গাসাগর হইতে যেরূপ বিবর্ণকপোল ও ক্ষমাঙ্গ হইয়া প্রত্যাগত হযেন তাহা দেখিয়া সাগরদ্বীপেব শীতাতপের অপকর্ষ অনুমান করিতে পাবেন।

আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশবর্ষবয়স্কা এক ফরাশি-যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া। তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ঃক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল [৪] না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীব প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপা। তাহার অলকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়নযুগল উজ্জ্বল বিশাল ও ভ্রমরেব ন্যায নীল। কপোলতল এরূপ স্বচ্ছ, যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুবজন-সুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই। জুলিয়াব স্বামী আমাব নবীন বয়স ও নির্ভয ব্যবহাব দেখিয়া অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার আশঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি অতি অপবিচিতভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার পত্নীর সহিত আমাব সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা এদেশের মত যুবতী স্ত্রীর পবপুরুষের সহিত আলাপ কবিতে নিষেধ করে না, অতএব আমি জুলিযাব প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন কবিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগেব পথ অতীত হইতে লাগিল। কোন দিন একটি হাঙ্গর, কোন দিন জগন্নাথের মন্দিবেব চূড়া, কোন দিন মছলীবন্দবে মাস্তুলেব বন, কোন দিন সফেন ঊর্মিমালায় আহত উপকূলে অধিষ্ঠিত মান্দ্রাজনগবের প্রাসাদাগ্র এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগবেব নীল জল ভেদ কবিয়া যাইতে লাগিলাম।

একদিন অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হইল, চন্দ্রের স্ময়মান রশ্মিজাল সমুদ্রের উরঃস্থলে চিক্ চিক্ করিতেছিল, বরুণদেব যেন শয়ান ছিলেন, অত্যল্প বাতাঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী সঞ্চালিত হইতেছিল, জগৎ স্তব্ধীভূত বোধ হইল, জলের [৫] মধুর কলকল ধ্বনি কর্ণে সূক্ষ্মরূপে আঘাত করিতেছিল, এই সমযে আমি জাহাজেব ছাদে আসিয়া প্রকৃতিব অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতেছিলাম। জুলিয়া হংসীসদৃশ পদবিক্ষেপে গ্রীষ্মাপনয়নার্থ সেই স্থানে আসিয়া বসিল। জাহাজেব আব সকল নিদ্রাগত বা কার্য্যব্যাসক্ত ছিল। সেই কালে জুলিয়াব মনোহারী বদনশোভা দর্শন কবিলে কেই বা অপহৃত মানস না হইত। মনে করিযা দেখ, আমি কিরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। আবাব জুলিয়া বলিল, "সমুদ্রোপরি জ্যোৎস্না কি মধুর।" "মধুব" এই শব্দটি এরূপ মধুবভাবে

উচ্চারিত হইল যে, আমি কি বলিব। আমি কহিলাম, ''তাহার সন্দেহ কি। আবার এক অনির্ব্বচনীয় শান্তভাব সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে এই কাল অতি মধুর হইয়াছে।'' আমরা এইরূপে বিশ্রদ্ধভাবে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম, এই কালে তনু মেঘাববণদ্বাবা শশী অপাবৃত হইলেন। আমি পূবোবর্ত্তী প্রলোভনের প্রতিবোধ কবিতে পাবিলাম না। জুলিয়ার করকমল ধাবণ কবিলাম। ইহাব মধ্যে সমীবণ প্রবল হইয়া উঠিল, উত্তবে কপিলবর্ণ বিদ্যুৎ উন্মিলিত হইতে লাগিল, তরঙ্গের উৎসের কিছু কিছু বাড়িতে লাগিল, জলের শব্দ কোলাহল হইয়া উঠিল, একত্রবাশীকৃত পালগুলি ফর্‌ফব্‌ ইত্যাকার নিনাদযুক্ত হইল, অন্তরীক্ষ পরিবর্ত্তমান কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তারকাপ্রদীপ লুক্কায়িত করিল, চন্দ্র যে স্থানে অন্তর্হিত হইযাছিলেন, সেই ভাগ তাঁহাব প্রভা-নিচযদ্বাবা চিহ্নিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা দর্শনপথ হইতে বিনষ্ট হইল। এখন সম্পূর্ণ [৬] অন্ধকাব হইল। ঝঞ্ঝা প্রচণ্ডবেগে মাস্তুলে আঘাত কবিতে লাগিল, সমুদ্র প্রকোপিত হইযা মহোর্ম্মিরূপ কশাদ্বারা জাহাজকে তাড়ন করিযা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কবিতে লাগিল। গর্জ্জনকাবী তবঙ্গেবা একবাব গুহার ন্যায নিম্ন হইয়া পুনর্ব্বাব শিখবের ন্যায় উচ্চ হইল এবং বাতাবেগে উড্ডীন ফেনরাশিদ্বাবা আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। বিদ্যুত নয়ন প্রতিঘাত কবিবাব ক্ষণকাল পবেই বংশস্ফোটসম বজ্র মাথার উপর দিয়া গড়াইয়া কর্ণ বধির করিল। জুলিয়াব ভযপ্রযুক্ত আর্ত্তববে জাহাজের সকলে উপরে উঠিয়া আসিল। জাহাজ ভয়ানকরূপে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। এক একবাব এক পার্শ্বে নত হইয়া যেন আমাদিগকে সর্পেব ন্যায ক্রুদ্ধ ঊর্ম্মির গ্রাসে ফেলিয়া দেয়, আবার অপর দিক্‌ হইতে তরঙ্গবেগ এমনি সবেগে আঘাত কবে, যে তৎক্ষণাৎ প্রতিকূল দিকে অবনত হয়। একবার এরূপ ত্বিবত ও শীঘ্র প্রক্ষিপ্ত হইল, যে জুলিয়া ঝুপ কবিয়া সাগরগর্ভে পতিত হইল। ক্ষণকাল পরেই আবর্ত্তযুক্ত পয়োরাশি তাহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক রসাতলে লইয়া গেল। আমাব সেই সময়ের আন্তবিক কষ্ট যুধ্যমান মহাভূতদিগের প্রচণ্ডতাকে অতিক্রম করিয়াছিল. ভাবিলাম এখনি প্রিযাব অনুবর্ত্তী হই, কিন্তু গূঢ় জীবনতৃষ্ণা সে ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিল। জাহাজের লোকেবা বা তাহাব স্বামীও তখন জানিতে পাবে নাই, যে অত্যুজ্জ্বল ভূষণটি বরুণদেবেব বলি হইয়াছে, আমিও প্রকাশ করিলাম না। বায়ু উত্তবোত্তর বাড়িতেই লাগিল। অমি মাস্তুল না ধবিযা স্থিব থাকিতে পারিলাম না। এই সময়ে আমার বিপদ্‌গ্রস্ত জাহাজের দুর্দ্দশা মনে পড়িল। আমি যেন স্বচক্ষে [৭] দেখিলাম, যে যাত্রীরা ক্ষুধায কাতর হইয়া পরস্পবকে গ্রাস কবিতে আরম্ভ করিয়াছে, যেন আমার ক্ষুৎক্ষাম দেহ হইতে মাংস কর্ত্তনপূর্বক কটাহে সিদ্ধ করিতে দিয়াছে। উঃ কি ভয়ানক! আমি কাল্পনিক ভয়ে চীৎকার কবিযা উঠিলাম। ভাবিলাম, যদি জাহাজ বক্ষা পায়, তবে সেই দশা হইবে, যদি রক্ষা না পায় তবে অবশ্য মৃত্যু। এই চিন্তিয়া জাহাজের ছাদে যে বোট থাকে, তাহা সমুদ্রে সত্ত্বরে ভাসাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাহাব উপরে লাফিযা পড়িলাম। তরঙ্গের বেগে বোট্‌ বিপর্য্যস্ত হইবাব উপক্রম হইল। আমি তাহাকে বায়ুর গতিতে সমর্পণপূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিলাম। মনে করিতে পার যে, আমাব তখন ভয়ের সীমা ছিল না, কিন্তু আমার যাহা কিছু

ভয় ছিল, সে সকলই মানুষ হইতে। আমি মহাভূতের প্রকোপে আত্মসমর্পণ করিতে কিছুমাত্র ত্রস্ত হই নাই। এরূপ শান্ত ও গম্ভীরভাবে অবস্থিত রহিলাম, যে একজন অমায়িক খ্রীষ্টানকে দেখিয়া ঈর্ষ্যা হইত। প্রকৃত খ্রীষ্টানেব পবকালে শান্তিভোগেব আশাদ্বারা চিত্ত সুস্থির থাকিতে পাবে। সে সুখদ্বীপে পরিক্রম করিবে, স্বচ্ছ গিরিনদীব তটজাত সুদৃশ্য পুষ্পের আমোদে পরিতৃপ্ত হইবে, জগৎপিতার গরীযান্ প্রভাময় মূর্ত্তিব সৌম্য কান্তি দ্বারা নয়ন সার্থক করিবে। এবম্বিধ মহামনোবথ অবশ্যই মানুষেব লঘু চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে পারে। কিন্তু আমার সে সকল আশা ছিল না, আমি জানিতাম, যে রুধির অপরিশুদ্ধ ও মস্তিষ্ক বিকল হইলেই দৈহিক ও মানসিক জ্ঞান নিবৃত্ত হইবে, শরীর জলে পচিয়া স্ফীত হইবে, তাহার কিয়দংশ জলচবেরা কতক বা খেচবেবা ভক্ষণ করিবে [৮] ইত্যাদি। অতএব আমি দেহের অসারতা, আত্মার অত্যন্তাভাব ও পরলোকের অঘটনীয়তা জানিয়া কি নিমিত্ত খেদ করিব? যদি কিছু ইচ্ছা হইত, তবে জুলিয়ার দেহস্পর্শ, তাহার মুখদর্শন ও তাহার সহিত প্রণয়ালাপদ্বাবা বিপদের লঘুকরণ। কিন্তু হায় সে অতীত...জলসাৎ হইয়াছে। এই ভাবিয়া আমার তখন গুটিকতক অশ্রুবিন্দু নির্গত হইয়া কপোল আর্দ্র করিল। বায়ু পূর্ব্বদিক্ হইতে বহিতেছিল। এই নিমিত্ত মনে কবিয়াছিলাম, যে আমার বোট্ ভাসিতে ভাসিতে ভারতবর্ষেব পূর্ব্ব উপকূলে উপস্থিত হইবে। কিন্তু সারারাত্র বোট্খানি একবাব অত্যুচ্ছ জলস্তম্ভোপবি উঠিল আবাব মহাবেগে গ্রাসোদ্যত তরঙ্গের গহ্বরে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আমার অনেকবার বমি হইল, তদ্বারা ক্রমে নিসসহ হইয়া পড়িলাম। এখন শয়ন না করিলে চলিল না। দৌর্ব্বল্যে চক্ষু মেলিতে পারিলাম না। এক একবার চাহিলে কেবল বিদ্যুতের প্রভা লোচনকে পরিপূর্ণ করিত। ক্রমে আন্তরিক স্ফুর্তি অবসান হইয়া আসিল, শিরোদেশের অভ্যন্তর যেন কেহ বরফের পাতে মুড়িয়া দিল, এই শীতানুভব ভ্রূপর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে চক্ষু ব্যথিত হইয়া জলাবিষ্কার করিল। বোট্ স্থির আছে, কি চলিয়া যাইতেছে কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। ঝঞ্ঝার গর্জ্জন ও জলের কোলাহল অতি সূক্ষ্মরূপে শ্রবণগোচর হইতে লাগিল, গাত্র কাষ্ঠের কঠিন স্পর্শেও ত্বগিন্দ্রিয়শূন্য হইল। আমি সেই অবধি কি হইল তাহা জানি না। তখনই অচেতন হইলাম।

আমার পুনশ্চেতনাগমে দেখিলাম, যে দুই নীলবর্ণ উজ্জ্বল নয়ন আমার উপব চাহিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে [৯] জানিলাম, যে মুখ অতিকোমল-কপোল-যুক্ত, ললাট সুবর্ণের সপ্রভ ও বক্ষঃস্থল কাঁচলি দ্বারা আবৃত। পার্শ্বে এক বৃদ্ধা আমাকে অঞ্চলে ব্যজন করিতেছে। আমার প্রথমে এই দর্শন স্বপ্ন বোধ হইল, কিন্তু দেখিলাম অতি সূক্ষ্ম পদার্থগুলিও পারমার্থিক অবস্থায় যেরূপ থাকে, সেইরূপেই আছে। আমি অতিশয় বিস্ময়ের সহিত পুরোবর্ত্তিনী যুবতীর মুখে দৃষ্টিপাত করিলাম। সে মধুরস্বরে বৃদ্ধাকে কিছু বলিল, আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না। পরে আমাকে উঠাইবার নিমিত্ত হস্ত ধারণ করিল। আস্তে আস্তে উঠিয়া দেখিলাম যে আমি সমুদোপবে আপনার বোটেই বহিয়াছি। সমুদয় শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সাগরের শান্ত জলে উপকূলেব

তরুবর্গের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তথাকাব উপকূল শিলাময় এবং স্থানে স্থানে দুই তালা অপেক্ষাও অধিক উচ্চ, ইহার প্রায় কুত্রাপি উঠিবাব উপায নাই। আমাব বোট্ যেখানে লাগিয়াছিল, তথায় এক কৃত্রিম ঘূর্ণিত সোপানশ্রেণী ছিল। এই সকল সোপান আস্ত পাথর কাটিয়া বচিত হইয়াছে। জলে থাকিলে একেবারে দুটি তিনটিব অতিবিক্ত সোপান দেখা যায না। ফলতঃ ঠিক্ কলিকাতাব মনুমেন্টেব সিঁড়িব মত। সমুদ্রেব পাড়েব উপব নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা গেল। বোট্ যেখানি লাগিযাছিল, তথায ভূমিব কিয়দংশ জলের মধ্যে প্রবেশ কবিযা অন্তরীপেব আকাব ধাবণ কবিযাছে। এই অন্তরীপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ উদ্ভূত হইয়া স্থলভাগ হবিদ্বর্ণ কবিযাছে। মধ্যে মধ্যে আকন্দব কাল-রেখা-কবলিত-শ্বেত কুসুম বিকসিত হইযাছে। আমি যুবতীর ভুজে ভরাপর্ণপূর্ব্বক [১০] দুর্ব্বলভাবে স্থলে উত্তীর্ণ হইযা মৃদুগতিতে সোপানে উঠিতে আবম্ভ কবিলাম। এই স্থানেব পাড় অপেক্ষাকৃত নিম্ন ছিল, শীঘ্র উঠিতে পাবা গেল। দেখিলাম স্থান অতি রমণীয়, স্থলের দিকে ববাবব চন্দন, তাল, এলালতালিঙ্গিত চ্যূত ও তাম্বুলবল্লীপবিণদ্ধ সুপাবি, এই সকল বৃক্ষের অতি বিস্তৃত অবণ্য হইযাছিল। চক্ষু যত দূর গেল, কেবল নানা বর্ণে বিচিত্রিত পত্রকুঞ্জই লক্ষিত হইল। সমুদ্রেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিযা অবলোকন কবিলাম, যে আমাদিগেব নিম্নে জলবাশি অভেদ্য ও অচল শিলা-বপ্রেব উপব শনৈঃ শনৈঃ আঘাত কবিযা বাবম্বাব অপসৃত হইতেছে। পাড ঠিক্ খাড়াভাবে সমুদ্রের গভীব অভ্যন্তরে প্রবেশ কবিযাছে। আমি অতিশয় দুর্ব্বল ছিলাম, যুবতীব অবলম্বন পাইযা সহকাব বৃক্ষেব ছাযাযুক্ত একটি ক্ষুদ্র পথ অবলম্বন কবিলাম। তখন দিনমণি প্রখবতাধাবণে উন্মুখ হইতেছিলেন। এমন কালে এই শীতল পথ পাইযা আমার অনেক নিবৃত্তি হইল। আম্রবনের ঘন পল্লবে পথ অন্ধকাবময ছিল। বাযু অতি মৃদুভাবে পত্রকুঞ্জে প্রবেশিযা এক প্রকার কর্ণসুখদ শব্দ আবিষ্কৃত কবিতেছিল। আমার বমনজনিত শাবীরিক সমুদয উত্তাপ এই শীতল স্থানে প্রবেশ কবিবামাত্র অপগত হইল। দুই রশি পথ এই ভাবে অতিক্রম করিযা সম্মুখে অতি প্রাচীন ও শক্ত এক অট্টালিকা দেখিলাম। ইহাব সর্ব্বাংশ ধূসব পাষাণে নির্ম্মিত তন্নির্ম্মিত্ত কখন চুণকাম বা বর্ণলেপ প্রযোজন কবে না। পাষাণনির্ম্মিত কড়িকাটের অগ্রভাগ ভিত্তি হইতে বহির্গত আছে। অত্যুচ্চ তোরণে দুই লৌহকীলকদস্তুর কপাট সংলগ্ন আছে। কোন প্রকার [১১] শস্ত্রই তাহা ভেদ করিতে সমর্থ নহে, এমন কি আমাব বোধ হইল কামানেব গোলাও শীঘ্র কিছু কবিতে পাবে না। অট্টালিকা তাদৃশ আয়ত নহে, কিন্তু অত্যন্ত উচ্চ। প্রবেশের একটি ব্যতীত দ্বাব নাই। আর চাবি দিকে কোন স্থানেই জানালা নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ আছে। আমি দুই অবলার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি অর্দ্ধবযস্ক সবলকায ভৃত্য তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। তাহারা আমাকে উপরিতলে লইয়া গিযা এক কোমলশয্যাযুক্ত পর্য্যঙ্কে শয়ন কবিতে ইঙ্গিত করিল। আমি হস্তসংজ্ঞাদ্বারা জানাইলাম, যে আমার শযন করিতে অভিলাষ নাই, অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। তাহারা বুঝিতে পাবিযা কতগুলি ভর্জিত জনাব ও চিনিমিশ্রিত ছাগদুগ্ধেব সর বৌপ্য পাত্রে আনিয়া দিল। আমাব বাস্তবিক ক্ষুধা হইয়াছিল,

উৎকর্ষ অপকর্ষ বিবেচনা না করিয়া খাইতে লাগিলাম। আহার শেষ হইলে অত্যন্ত নিদ্রা উপস্থিত হইল, অতএব সেই পর্য্যঙ্কেই শয়ন কবিলাম।

প্রায় সন্ধ্যার সময় আমার জাগরণ হইল। তখনও দেখিলাম পার্শ্বে যুবতী উপবিষ্ট আছে। তাহার আকার দর্শনে নিতান্ত অচতুর ও পূর্ব্বরাগের চিহ্ন দেখিতে অসমর্থ হইত না। তাহার নয়ন বারম্বার আমার প্রতি প্রেবিত হইয়া সংগতিসময়েই নিবর্ত্তিত হইত, এবং তৎক্ষণাৎ কপোলতল হ্রীচিহ্নস্বরূপ পল্লবাভায় ঈষৎ রঞ্জিত হইত। কিন্তু কথা কহিবাব পথ ছিল না। মানুষের সর্ব্বস্বস্বরূপ জিহ্বা থাকিয়াও আমাদিগের পক্ষে তাহার অসদ্ভাব হইল। বাস্তবিক সে অতি মধুবদর্শনা। আমার [১২] ভাবতবর্ষের কোন্ স্থানে উত্তরণ হইয়াছে তাহাব কিছুই নির্ণয ছিল না অতএব সে কোন্ দেশীয কামিনী তাহা প্রথমে জানিতে পারি নাই। তথাপি তাহাব সুকোমল অঙ্গ, চিক্কণ কপোলযুগল, কৃষ্ণসারসদৃশ নয়নদ্বয়, এবং সংস্কৃতকবিদ্দিগের সতত বর্ণিত সুবর্ণতুল্য দেহপ্রভা, এই সকল দেখিয়া এক জন ভারতবর্ষীযের মন অনায়াসেই অপহৃত হইতে পাবে। যে আমি গতরাত্রে জুলিয়ার স্বর্গযাত্রার অনুগামী হইতে চাহিয়াছিলাম, এখন সেই সমযেব পর চব্বিশ ঘণ্টা অতীত হইতেই সেই আমি আর এক যুবতীর প্রণয়বশম্বদ হইতে পরাঙ্মুখ হইলাম না। ইহারই নাম মানুষের অচঞ্চলতা, ইহারই নাম মানুষের জিতেন্দ্রিয়তা, আর ইহাবই নাম মানুষের একপত্নীব্রততা। হে মূঢ়জনকর্ত্তৃক পবাৰ্দ্ধ্য বাব জগতে উদ্ঘোষিত প্রণয়সর্ব্বস্ব, যদি তোমার অর্থ এই হয়, যদি উদ্দাম বিপুব চবিতার্থতা কবাই প্রণযপদবাচ্য হয, যদি কবিবা যে সকল লোভনীয মনোবম প্রণয়বার্তার বর্ণন কবেন, সে সমুদযই অযথার্থ ও কল্পনাসমর্থিত হয়, তবে যেন উত্তরকালে সুখাশায কেহ তোমাব অনুবৃত্তি কবে না। আমি তখন ধর্ম্মবোধকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলাম, যে এখন যে আমাব মনোহবণ করিতেছে, সে আমাকে সাগবেব গ্রাস হইতে উদ্ধাব কবিযাছে, অতি বিপদেব সময আশ্রয দিয়াছে, আমাকে অপ্রার্থনায গৃহেব অতিথি করিয়াছে এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইযা আপনার যৌবন ও সুখ আমার আয়ত্ব করিবার অভিলায দেখাইতেছে। ঈদৃশ মহোপকারী জনেব প্রত্যুপকার না [১৩] কবিলে মনুষ্য নামের অবাচ্য হইতে হয। আবার প্রত্যুপকারই কেমন মধুর, তাহার সহিত অখণ্ডনীয় সূত্রে বদ্ধ হইয়া চিরকাল সুখ সম্ভোগ। আমি এই সকল ভাবিয়া তৎকালে ধর্ম্মকে ফাঁকি দিলাম।

যুবতীব প্রযত্নে ও বৃদ্ধার পরিচর্য্যায দিন চাবি পাঁচে আমাব স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধৃত হইল। আমি তাহাদিগের ভাষাব দুটি একটি কথা বুঝিতে সমর্থ হইলাম, কিন্তু যুবতী কোন্ জাতীয় বমণী, সে কিরূপে যৌবনে একপ স্বতন্ত্র হইয়াছে, তাহার অট্টালিকা কোন নগরের সমীপবর্ত্তি কিনা, আমি ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে আছি, এই স্থান জনপদ কি অরণ্যমধ্য এই সমুদয মৃত্যুর উত্তবকালীন অবস্থায় ন্যায়, জন্মের পূর্ব্বতর দশাব ন্যায়, ঈশ্ববের ন্যায়, চন্দ্রলোকেব অভ্যন্তববৃত্তান্তেব ন্যায়, আমার নিকট অপাবজ্ঞাত ও অস্ফুষ্ট বহিল। প্রতিদিনই পূর্ব্বনির্দিষ্ট গৃহের পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া ভিত্তিস্থিত নানা শস্ত্রাবলী দেখিতে লাগিলাম, জনার ভাজা ও ছাগদুগ্ধের সব খাইতে লাগিলাম, এবং বৃদ্ধা ও

যুবতীর পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আপনার ভাষাজ্ঞানের কিছু কিছু আধিক্য করিতে লাগিলাম।

পোনের দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল। যুবতী আমার প্রতি সেইরূপ প্রেমভাবে দৃষ্টিপাত করে, আমিও তাহার প্রতিদান কবি। কিন্তু এই পর্য্যন্তই শেষ। আমি এখন ক্রমে তাহার ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে [১৪] শিখিলাম। তাহাদিগেব মুখে জানিতে পারিলাম, যে সেই অট্টালিকা এক জন পল্লিগারের ছিল। পল্লিগার বহুকাল ত্রিবাঙ্কোড় রাজের অধীন থাকিয়া ঐ স্থানে আপনার গিরিদুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাস কবিত। যুবতী তাহারই দুহিতা, নাম কমলাদী। ঐ অট্টালিকা হইতে ত্রিবাঙ্কোড় নগর অধিক দূরবর্ত্তী হইবে না, অধিকতঃ দেড় দিনের পথ। এতও হইত না যদি তথায় যাইবাব কোন সুপথ থাকিত। চারি দিকে অনেক ক্ষুদ্র শৈল থাকাতে প্রপাত, অন্তর্দ্দেশ, গিরিনদী ইত্যাদি দুর্গম স্থান পার হইয়া ঐ স্থান হইতে ত্রিবাঙ্কোড়ে যাওয়া যায়। সমীপে লোকালয় নাই, কেবল পল্লীগার একাকী বাস করিত, সে এবং তাহাব ভার্য্যা লোকান্তরিত হইযাছিল, তদনুসারে কমলাদী গৃহস্বামিনী হইয়াছে। তাহাদিগেব ক্ষেত্র ছিল, তথায উদ্ভিজ আহার উৎপন্ন হইত, ছাগযূথ ছিল, তাহার দুগ্ধ পবিপোষক ভোজন হইত। পূৰ্ব্বোক্ত ভৃত্য এই সমুদয়ের তত্ত্বাবধারণ করিত। কখন নগবে যাইবাব প্রয়োজন হইলে সেই যাইত। নির্ঝবের স্ফটিকজল তাহারা পান করিত। সমুদ্রের স্বাস্থ্যকব শীতল বায়ুতে পবিসেবিত বেলাভাগে তাহারা বিহাব করিত। বসন্তকালে সিংহলের দারুচিনির গন্ধযুক্ত ধীব সমীব দ্বারা তাহাদের চতুঃপার্শ্বস্থ রমণীয় বন আমোদিত হইত। অট্টালিকার সন্নিকটে প্রবাহমানা ক্ষুদ্র গিরিনদীতে স্নান কবিয়া তাহাবা দেহেব তাপশান্তি কবিত। এবম্বিধ মনোহারী বিবিক্ত স্থানে কমলাদী সুরলোকের বিদ্যা-ধবীব [১৫] ন্যায় বাস কবিত। তাহাব যৌবন অদ্যাপি অক্ষত ছিল। তাহার রূপে কালিদাসের "অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলুনং কবরুহৈঃ" এই বাক্য সম্যক্ সংগত হইত। সে, পুরুষ যে চঞ্চল, নিষ্ঠুর ও কৃতঘ্নতাব প্রধান নিদর্শন তাহা অদ্যাপি শিক্ষা করে নাই, তাহাব সরল চিত্ত দ্রব নিকট বক্রভাবেব উপদেশ পায় নাই। অনায়াসেই আমাতে সমর্পিত ও পাযাণের ন্যায় নিশ্চল হইল। তাহারই বাস্তবিক; পবিত্র প্রণয় হইয়াছিল, সেই শরৎকালের নিৰ্ম্মল সুধাকর ও মহোজ্জ্বল দিনকরবিম্বের বিস্ময়নীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনের মালিন্য দূর কবিয়াছিল। তাহাব হৃদয় যেন সায়ংকালে সাগরগর্ভে নিমজ্জনোদ্যত আবক্ত তরণিমণ্ডলের নিকট অনুরাগ শিক্ষা করিয়াছিল। এত দিন মনোমত পাত্র না পাইয়া সেই অনুরাগ প্রতিফলিত হয় নাই। আমাকে সে, রূপবান্ বলিয়াই হউক, প্রণয়ের অনিবন্ধনতাপ্রযুক্তই হউক, অন্তবেব সহিত ভাল বাসিতে লাগিল। যে অবধি অতি অল্প মাত্রার কথা কহিতে শিখিয়াছিলাম, সেই পর্য্যন্তই মুগ্ধভাবে আপনার মনের সমুদায় কথা বলিত, কিছুমাত্র লজ্জা বোধ না করিয় গাত্র অনাবৃত রাখিত। তাহার সারল্য এমন চমৎকারী ছিল! আমি সংসাবে কেবল বাহ্য প্রেম দেখিয়াছি, ধরণীতে এমন সরস বস্তু আছে, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। আমার বাঞ্ছা হইল, সমুদয় হৃদয দ্রবীভূত কবিয়া এমন সুজনকে ঢালিয়া দি।

আমি স্থিব কবিলাম, যে অবনিমণ্ডলে যদি কিছু সুখ থাকে, যদি দুর্জনেব অসূয়া, জিগীষুদিগের দুর্দান্ত সংহারক সমব ও উৎপীড়কদিগের-[১৬] লৌহসদৃশ কঠিন দণ্ড পৃথিবীকে একেবারে বাসের অযোগ্য না করিয়া থাকে, তবে বোধ হয় এমন সুখ আব কোথাও পাওয়া যাইবে না, আমি এই স্থানে চিরতৃপ্তিতে জীবন ভোগ করিয়া মাতার সদৃশ্য অবনীতে দেহার্পণ কবিব। তখন কবিরা আপনাদের মধুর সংগীতে যাহার বর্ণন কবেন, আমার সেই অবস্থা লাভ হইযাছে বোধ হইল।

কমলাদীর ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যুৎপন্ন হইতে আমাব দুই মাস লাগিল। এই দুই মাস কাল আমি গৃহ হইতে বর্হিগত হই নাই। অট্টালিকাব নানা গৃহেব নানাবিধ সজ্জা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই সকল গৃহেব মধ্যে কমলাদীব বাসাগাব অতি রমণীয়। ইহা হইতে সাগরের নীল জল অসংখ্য ক্ষুদ্র দ্বীপে অবাকীর্ণ লক্ষিত হইত। কল্লোলধ্বনি প্রভাতে কমলাদীব নিদ্রা ভঙ্গ করিত। সুমন্দ বাযুর প্রবাহে তাহার শয্যাস্তবণ চঞ্চলিত হইত। অস্তোমুখ দিনকরকিরণ গবাক্ষমার্গদ্বারা প্রবিষ্ট হইযা ইহাব ভিত্তি রঞ্জিত কবিত। ইহাব এক পার্শ্বে টবে বোপিত দুটি গোলাপ্ গাছ ছিল। তাহাব নযনহারী পাটলবর্ণ কুসুমের আমোদে গৃহ সর্ব্বদা আমোদিত থাকিত। ভিত্তিতে হনুমান রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি রামাযণের নায়কবর্গেব প্রতিমা চিত্রিত ছিল।পর্য্যঙ্ক ধূমলবর্ণ এক গদি ও তদুপরি কুসুমী বর্ণে রঞ্জিত এক আস্তবণ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। কমলাদী এই শয়নে আপনার পবিপেলব অঙ্গ নিমগ্ন কবিয়া নয়নে নিদ্রাকে অবকাশ দান কবিত। আমাব ইচ্ছা হইত যে যদি আমিই শয়নীয় হইতাম। অট্টালিকাব নিম্ন তলে একটি সংকীর্ণ [১৭] বিববাকাব গৃহ ছিল। কমলাদী বৃদ্ধাব সহিত পবিক্রমে বহির্গত, আমি একদিন সেই গৃহে প্রবেশ কবিলাম। তথায় মৃত পল্লিগারেব যুদ্ধে বিনিযোজিত নানা অস্ত্র সজ্জিত ছিল। প্রায় তিন হাত ব্যাসের একখানি ঢাল এবং বাক্ষসেব সন্নহনযোগ্য লৌহবর্ম্ম দেখিযা আমি সমধিক বিস্মিত হইলাম। যে কেহ পল্লিগারদিগের ছবি দেখিযাছে সেই জানে, যে এই সকল প্রকাণ্ড বীরেরা কেমন বেশ ধারণ কবিযা যুদ্ধে গমন কবে। কিন্তু ইউরোপীয় সৈনিকদিগের সাহসেব নিকট ঈদৃশ মূর্ত্তি ভীষণ হয় না এবং তাহাদের গুলিক্ষেপেব নিকট এমন দুর্ভেদ্য বর্ম্মও দেহ রক্ষা করিতে পারে না।

দুই মাস অতীত হইলে কমলাদী বিবাহের প্রস্তাব করিল। তুমি মনে করিয়াছিলে যে ইহার পূর্ব্বেই আমরা পরস্পরের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। কমলাদী নিতান্ত সবল হইলেও ধর্ম্মানুযায়ী বিবাহ-বিধির নির্বাহ অতি আবশ্যক বোধ করিত। তাহার এমন মধুর প্রস্তাবে কে না সম্মত হয়। এ স্থলেব বিবাহ, মাল্যবিনিময় প্রভৃতি সামান্য আচারে সম্পন্ন হয়, আমরা সেই বিধিতে পরস্পর সূত্রিত হইলাম। আমাদিগের পূর্ব্বরাগ কখন কোন অন্তবায় দ্বারা বিহত হয় নাই, এক্ষণেও আমরা নিবিঘ্নে বাস করিতে লাগিলাম। এক্ষণে আমরা বাহুদামে পরস্পরকে সংযত কবিয়া নানা স্থানে বিহার করিতে লাগিলাম, বকুল বৃক্ষের তলে উপবেশন কবিতাম, গিরিনদীতে বিহারমান হংসযূথে কৌতুকযুক্ত হইতাম, আম্রকুঞ্জে অবিবলিতকপোলে কথা কহিয়া রাত্রির

অতিপাত কবিতাম, নগ্নসর্ব্বাঙ্গ হইয়া নির্ঝরের ক্ষবণশীল জলে ধৌত হইতাম, [১৮] সমুদ্রতটে কত খেলা খেলিতাম, বর্ষাকালে জলবিন্দুসিক্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া ময়ূব ময়ূরীর কেকা সহিত নৃত্য ও পক্ষবিস্তাব দর্শন করিতাম, শবৎ কালেব নির্ম্মল জ্যোৎস্নাব সহিত কমলাদীব কপোলপ্রভাব উপমা দিতাম, গ্রীষ্মের যূথিকা লইয়া তাহাব ভ্রমবনীল অলকে বসাইয়া দিতাম, হেমন্তের বান্ধুব অপাণ্ডু গণ্ডস্থলে পবাইয়া দিতাম, মধু মাসেব মধু বায়ু সেবন কবিতে কবিতে তাহাব বদনসুধা পান কবিয়া মাস নামেব সার্থকতা কবিতাম। আর কত বলিব, সংস্কৃত কবিরা যে স্থানে যেরূপ বর্ণন কবিয়াছেন, আমবা সে সকলেব স্বাদগ্রহণ কবিতে অবশিষ্ট বাখি নাই। যদি আমাব চিবকাল ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন কবিবাব অভিলাষ থাকিত, যদি দুবাশা কর্ণে জাপতা না কবিত, তবে আমি কমলাদীর সহিত অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ করিতাম। প্রিযবাদিনী প্রিয়দর্শিনী ভার্য্যা, মানুষেব বিযচক্ষু হইতে দূববর্ত্তিতা, প্রকৃতিব অতি মনোহর অবস্থা নিবীক্ষণ এবং স্বতন্ত্রতা, ইহা অপেক্ষা সংসাবে আর সুখ কি আছে। আমার সেই সকলই ছিল। নিবিড় অবণ্যমুকুটিত শৈলমালা প্রতিদিন লোচনগোচর হইয়া অপরিসীম আনন্দ দান করিত, নির্ঝর হইতে ঝর্ঝব শব্দে স্রুতিশীল বারি বীণা অপেক্ষাও অধিক মধুধারা কর্ণে বমন কবিত, ঘন পত্রাচ্ছন্ন তরুমালায সূর্য্যতাপ হইতে ছাদিত নদীব তটভাগে হংসতূল অপেক্ষা সমধিক কোমল নব শষ্পশয়নীর বিস্তার কবিযা বাখিত, কলকণ্ঠ পতত্রিবা মধুব স্বব আবিষ্কৃত কবিয়া নাগরিকাদিগেব আমোদদাযী গাযকবর্গকে ধিক্কাব কবিত, কস্তুবী [১৯] মৃগাদিগেব অধ্যাসনে সুরভীকৃত শিলাতল শ্রমহাবী বিষ্টবস্বরূপ হইযা উপবেশনেব নিমিত্ত আহ্বান করিত। ইহা অপেক্ষা মধুবতব আবাস আব কি হইবে? আবাব এমন স্থানে যেরূপ সৌন্দর্য্য, যেরূপ প্রণয, সেরূপ শুচারিত্র ছিল তাহাতে কি এমন স্থান সেই সুবলোক অপেক্ষা বমণীয়তর নহে? তথায় কোন সংস্কৃত নাটকেব একজন পাত্র বলিয়াছে, যে যথায় আহাবও নাই, পানও নাই, কেবল মীনের মত অনিমিষে চাহিতে হয়।

কিন্তু আমার মন ইহা অপেক্ষা অনেক ভিন্ন মনোরথ দ্বারা বীজিত হইতেছিল। নবতানিবন্ধন রমণীয়তা অতীত হইলেই আমাব চিত্ত অন্য দিকে ধাবিত হইল। ভাবিলাম আমি কি এত অল্প বয়সেই সংসাব আরম্ভ কবিব? জগতের কেহ আমায় জানিবে না? কমলাদীর সংসর্গেই জীবনক্ষেপ করিব? আমাব আকাঙ্ক্ষা কি যশোমন্দিবে অপরিজ্ঞাত বিবিক্তবাসিনী এক কামিনীব প্রণযী হইযাই চরিতার্থ হইল? কিন্তু তখন কমলাদী হইতে মন তত ভ্রষ্ট হয় নাই, তখনও তাহাব পেলব পরীরস্তে মহাসুখ অনুভব করিতাম, অতএব তাদৃশ্য বিরক্তি জন্মিল না।

এক বৎসর এইরূপে অতীত হইল। তখন কমলাদীর বয়ঃক্রম ঊনবিংশতিতে অধিরোহণ করিল। আমি চতুর্বিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলাম। কমলাদী সর্ব্বদা গুরুজনেব ভয় বা লজ্জা না থাকাতে আমার বক্ষেরই ভূষণ স্বরূপ থাকতি। যৌবনের যাবতীয় সুখ আমার অনুভুত হইতে লাগিল। কিছু দিন পবে স্তনেব অগ্রভাগ মলিন হইল, কপোল পাণ্ডু, শবীব কৃশ ও দুর্বল, এবং আরোচক- [২০] ইত্যাদি গর্ভেব চিহ্ন নির্গত হইল।

আমার এই ঘটনায় অন্তরস্থ নির্বেদ একেবাবে জাগরূক হইয়া উঠিল, আমি মনে কবিলাম, যে আমাব এ স্থলে বাস শ্রেয়স্কব নহে। আব একটি স্নেহের পাত্র হইলে কি সমুদয বন্ধন ছেদ করিয়া পলাইতে পাবিব। কমলাদীকে পবিত্যাগই আমার কত জাগব, কত চিন্তা, কত উদ্বেগের হেতু হইবে। আবার অপত্য হইলে তাহার অস্ফুট বাক্য সমধুব স্মিত ও নিজ জননীর সদৃশ প্রিয়দর্শন মুখকমল দেখিলে কি তাহা ছাড়িতে পাবিব? এইরূপ ভাবিয়া আমি অবিজ্ঞাতরূপে পলায়নে স্থিরনিশ্চয় হইলাম। আমাব মন একূপ চঞ্চল! যদি ইহাতে অতি অল্পমাত্রায়ও সন্তোষেব সংযোগ থাকিত।

যে আমি প্রথমে কমলাদীর সহিত চিবকাল সুখে বাস কবিবার প্রতিজ্ঞা কবিযাছিলাম, সেই আমার এখন যত শীঘ্র সম্ভব, সেই সুখময় সারল্যধাম হইতে দূবীভূত হইবাব প্রবল অভিলাষ হইল। যৌবন কি ভয়ানক সময়! যশোবাসনা এই সময়ে মানুষকে অন্ধীভূত করিয়া সাক্ষাৎ সংহারেব অন্ধকাবময কুহবে নিক্ষেপ কবে। এই সময়েব প্রতপ্ত মানস যথার্থ সুখে সুখী না হইয়া লোকসমাজে বিখ্যাতি লাভকেই মানুষের অন্ত্য উদ্দেশ্য বোধ কবে। সন্তোষবত্ন তখন অপবিচিত থাকে, তখন মহোদ্যমযুক্ত কার্য্য না কবিলে যেন বিনোদনশূন্য হইতে হয়। আমাব অবিলম্বে অপসবণই নির্ধারিত হইল। পাথেয স্বরূপ কতকগুলি সুরম্য বস্ত্র ও কমলাদীব পিতাব অস্ত্র- [২১] গাব হইতে একখানি তীক্ষ্ণ তববাবি গ্রহণ কবিলাম।

পূর্ব্বদিক্ অরুণোদয়েব চিহ্ন ধাবণ করিলে আমি শনৈঃ শনৈঃ অট্টালিকা হইতে বহির্গত হইলাম। তখনও পক্ষীবা একপাদে অবস্থান পরিত্যাগ কবে নাই, তখনও দুটি একটি নক্তঞ্চর ক্ষুদ্র পশু আপনাব গর্ত্তে প্রবেশ কবে নাই। আমি এই অহোবাত্রেব সন্ধি সময়ে বহির্গত হইয়া অতি শীঘ্র উত্তবদিক্‌বর্ত্তী ক্ষুদ্রশৈলে অধিবোহণ কবিলাম। বন্ধুব আবোহণপথে হস্ত পদেব সাহায্য লইযা উঠিতে হইল। দক্ষিণে ও বামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকবৃক্ষ গাত্র ঘর্ষণ কবিতে লাগিল। উর্দ্ধে লম্বমান শিলাবিভঙ্গ যেন আমাকে প্রথিত কবিবাব ভয দেখাইতে লাগিল। চাবি দিক্ ঝোপ্ ও কণ্টকবনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আমি পথ জানিতাম না। তথাপি যেদিকে উঠিবার স্থান পাইলাম, তথায়ই যাইতে লাগিলাম। ক্রমে যত ঊর্দ্ধে উঠি, ততই ভাঙ্গা পাথর, ফাটা মৃত্তিকাস্তূপ ও দুরাবোহ পাহাড় আমাব পথে বিঘ্নস্বরূপ হইতে লাগিল। অতিশয় প্রয়াসেব সহিত এই সকল অতিক্রম কবিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। দুই প্রহব বৌদ্রে পাথব তপ্ত হইয়া উঠিল। আমাব পাদুকাবহিত চবণ তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল। তথাপি অসীম অধ্যাবসায়েব সহিত আপনাব ভ্রমণেই বত থাকিলাম। বনফল দ্বাবা ক্ষুধাব শান্তি কবিয়া আমি অনাচ্ছন্ন মস্তকে সূর্য্যেব প্রখব কিবণ সহ্য কবিতে করিতে হস্ত ও পদেব বিনিযোগ কবিযা সবীসৃপেব ন্যায যাইতে লাগিলাম। এই সময়ে একস্থলে পথ শেষ হইল। পর্ব্বতেব সানুদেশেব- [২২] ধাবে আমি আপনাকে দণ্ডাযমান দেখিলাম। প্রায পঞ্চাশ হাত নিম্নে এক জলপ্রবাহ ভয়ানক গর্জ্জন ও শুভ্রবর্ণ ফেণরাশি উদ্বমন কবিতে করিতে মহাবেগে নিম্নগামী হইতেছিল। স্রোতের অপব পাবে অনেক নিচে এক পাহাড় ছিল। এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ সেই

পাহাড় হইতে উদ্ভূত হইয়া আপনার বিশাল শাখা, আমি যে পারে ছিলাম, সেই পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিল। আমার সাহস তখন অতিশয় বাড়িয়াছিল। আমি স্রোতের ভীষণ নিনাদ ও তাহার হৃদয়কম্পী বেগ অবধান না করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থের শাখা ধরিলাম। সেই শক্ত শাখায় আরূঢ় হইয়া আমি মার্গরোধী জলপ্রপাতেব উপব ধিক্‌কাব দিয়া অপর পারে অবতীর্ণ হইলাম। এক্ষণে দেখিলাম, পাহাড় ফুরাইল। তরঙ্গসম ক্ষেত্রমণ্ডলে জনার, সিলেট প্রভৃতি শস্যচয় কম্পমান হইতেছিল। দূরবর্ত্তী তরুসমূহ লোকালযের নিকটবর্ত্তিতা সূচন করিল। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া চারি ধারে তালমালা দ্বাবা বেষ্টিত পুষ্করিণীর ঘাসযুক্ত গড়ানিয়া পাড়ে বসিয়া তাহার শীতবায়ু সেবন কবিতে লাগিলাম। তালপত্রের ঝর্ঝর ধ্বনি আমার শ্রবণে ক্লান্তিব সময় অতি মধুর হইল। ক্ষণকাল পবে এক গোযূথ একটী গোপাল বালকের অনুগত হইয়া পুষ্করিণীতে জল পান কবিতে লাগিল। কত দিন এদৃষ্টি দর্শন কবি নাই, এখন অতি মধুর বোধ হইল। তখন বৌদ্রেব তাপ শান্তিব উন্মুখ হইতেছিল। আমি গোপালদাবকেব উপদিশ্যমান পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গ্রামে উপস্থিত হইলাম। তথাকার আতিথেয় অধিবাসীবা [২৩] পবম সমাদবেব সহিত সেদিন বাস করিতে দিল। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিলাম। মাঠের শোভা, দেশীয় লোকের অবস্থা, নাবীগণের সুশ্রীকতা, এই সকল দেখিতে দেখিতে দুই প্রহরের সময় ত্রিবাঙ্কোড়ে উপস্থিত হইলাম। তথায় সঙ্গে আনীত বস্ত্রের বিক্রয় দ্বারা কতকগুলি মুদ্রা বিনিময়ে পাইলাম। ত্রিবাঙ্কোড় হইতে পাঁচ দিনেব মধ্যেই ত্রিবাঙ্কোড় দেশের পরিবেষ্টক মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাকার পার হইয়া হাইদবের বাজ্যে পদার্পণ করিলাম। আমার নিশ্চয় হইল যে, হাইদবের সেনাদলে ভুক্ত হইয়া আমাব অবমাননাকারী ইংরাজদিগের উপব বিলক্ষণ বৈবনির্যাতন করিব।

হাইদরের বাজ্যের প্রান্তভাগেই তাঁহার অপক্ষপাতিতা, ন্যায়াচার ও পুত্রেব ন্যায় প্রজা পালানের যশ শ্রবণ করিলাম। কত অনাথ অবলা তাঁহার প্রসাদে দুষ্ট লোকের ক্রূরতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতেছে, কত উপেক্ষিত গুণবান্ ব্যক্তিবা তাঁহার গুণগ্রাহিতায় উচ্চ পদে অধিরোপিত হইয়া প্রশংসা করিতেছে, এই সকল লক্ষ্য করিলাম। কি হিন্দু, কি মুশলমান, কাহাকেও তাঁহার আধিপত্যে অপরক্ত দেখিলাম না। তাঁহার সৌরাজ্যের চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাইলাম। কৃষাণেবা অতি প্রফুল্লভাবে মাঠের কার্য্য করিয়া অপর্য্যাপ্ত আহার উৎপন্ন করে, মহীসূর প্রদেশের সর্ব্বভাগেই, উদ্যান, ক্রয়বিক্রয়ের কলকলপূর্ণ নগর, স্ময়মান গ্রামাবলী ও লুব্ধকহীন রাস্তা। দুষ্টেরা তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বিষম শত্রুর মত দেখিত, সজ্জনেরা অতি দয়ালু জনকের মত বোধ কবিত। তাঁহার রাজস্ব অতি সুনিয়মে- [২৪] দত্ত ও গৃহীত হইত। কোন জমিদাব যে রাজদত্ত ক্ষমতাব সাহায্য পাইয়া দরিদ্রদিগেব উপর দৌরাত্ম্য কবিবেন, তাহাব কিছু পথ ছিল না।

আমার, এই সকল সদ্‌গুণ শ্রবণ করিয়া আপনাকে তাঁহার কার্য্যে ব্যাপৃত কবিতে অত্যন্ত আগ্রহ হইল। আমি তখন তিন দিনের মধ্যেই তাঁহার রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইলাম।

তথায় তাঁহার সেনানাথের নিকট উপস্থিত হইয়া এক জন সামান্য সৈনিক হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলাম। সেনানাথ অতি সুজন ছিলেন, তাঁহাব মুখে দাক্ষিণ্য স্পষ্টরূপে লিখিত ছিল। তিনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য কবিলেন না। কিন্তু আমার বৈদেশিক বেশ ও বাঙ্গালীর মত আকার দেখিয়া অতিশয আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যাহা হউক, আমি ইংরাজদিগের প্রতি সাতিশয় দ্বেষ প্রকাশ কবাতে তাঁহার সংশয় অপনীত হইল।

এইরূপে কিছু কাল সামান্য সৈনিক পদেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। অনন্তব দৈবযোগে আমার আশাসিদ্ধিব উপায হইল। যৎকালে আমি হাইদবেব সেনায নিবিষ্ট হইয়াছিলাম, সেই সময়ে তাঁহাব জাগরূক চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কযেক জন প্রসিদ্ধ দস্যু রাজ্যে অত্যাচার কবিত। প্রায প্রতি মাসেই কেহ না কেহ তাহাদিগের উপদ্রব সহ্য করিতেন ও রাজসমীপে আসিযা আক্ষেপ কবিতেন। হাইদর অতি কঠিন শাসন ব্যবস্থিত কবিয়াও তাহাদিগকে ধরিতে সমর্থ হইলেন না। দুবাচাবেবা সৈনিকদিগেব বন্দুককে অবগণনা করিত, চৌকিদারদিগের অবধানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত। পরিশেষে তাহাবা এমন [২৫] সাহসিক হইল, যে শ্রীরঙ্গপত্তনেব অভ্যন্তবে দৌরাত্ম্য আরম্ভ কবিল। নগবেব মধ্যে সন্ধ্যার পর কেহ ভয়ে বাহির হইতে পাবিত না। তাহাবা রাত্রিকালে দস্যুবৃত্তি কবিয়া দিবাভাগে যে কোথায় লুকাইত, তাহা কেহ অনুসন্ধান পাইত না। হাইদব ঘোষণা কবিয়া দিলেন, যে যদি কেহ দস্যুদিগকে ধৃত কবিযা দিতে পাবে, তবে তাহাকে দেশেব এক ওমবা করা যাইবে এবং যদি তৎকালে কোন উচ্চপদ খালি থাকে, তবে প্রার্থনা করিলে সে সেই পদে অধিরোপিত হইবে। এই সৌভাগ্য আমাব নিমিত্তই সঞ্চিত ছিল।

আমি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগব হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিম দিক যে একটী ক্ষুদ্র শৈল ছিল, তথায ভ্রমণ কবিতে গেলাম। এই শৈল অতি বমণীয। ইহাব উপবিস্থ নীলবর্ণ নানা তরুর পত্রকুঞ্জ পবিদৃষ্ট হইয়া মনে কত মহীয়ান্ ভাবেব আর্বিভাব করে। ইহার পার্শ্ব গড়ানিয়া। তথায় শ্বেত, বক্ত, কাল পুষ্পে শোভিত অনেক ঝোপ আছে; ইহার তলভাগ নিবিড় শরবনে আচ্ছাদিত। উপবেব ঝাউ বৃক্ষের হু হু শব্দ বিষণ্নভাবে কর্ণে আহত হয়। সায়ংকালের প্রাক্কালে এই সকল ঝোপ, বৃক্ষ ও জঙ্গল একপ এক প্রকার ভয়মিশ্রিত আনন্দের উৎপাদন কবে, যে তাহা অনির্ব্বচনীয। আমি এমন স্থান চিরকাল বড় ভাল বাসিতাম। শৈশবেই আমাব এমন স্থানেব পল্লব-জালে আবৃত হইযা শুইয়া থাকিতে, ঘুঘুব বিষাদজনক কলবব শ্রবণ করিতে এবং বায়ুব তীক্ষ্ম হিল্লোলে স্পৃষ্ট হইতে বড় [২৬] অভিলাষ হইত। আমাব এমন স্থান মনে করিযাই নয়ন জলার্দ্র হইত। আমি কথিত দিনে সেই স্থানে যাইয়া আপনাব শ্রমখিন্ন অঙ্গ পত্রোচ্চয়ে ঢালিযা দিলাম। আমার শরীব পুরোবর্ত্তী শববন দ্বাবা আচ্ছাদিত বহিল।

এই সময়ে আমার নিম্নে যেন মানুষের স্বব শ্রবণ কবিলাম। প্রথমে আমাব আশ্চর্য্যেব সীমা রহিল না। আমার শরীর আপাদ মস্তক কম্পমান ও উৎপুলক হইল, এবং অতিশয় ঘাম্ বহিতে লাগিল। আস্তে আস্তে কর্ণেব তলস্থিত পত্রবাশি অপনযন পূর্ব্বক স্পষ্টই আমাব দুই তিন জনেব কথোপকথন শ্রবণগোচব হইল। একজন কহিল, "ওহে,

আমাদের ধরিবার জন্য পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছে, তবে এখন ওর্ ঘরে না একবার যাইলে মজা নাই।'' আমি ইহাতেই বুঝিয়া লইলাম, যে কাহারা কথা কহিতেছে। আমার তখন আহ্লাদও হইল, ভয়ও হইল। দস্যুদিগের নির্জন স্থান পাইয়াছি বলিয়া আহ্লাদ হইল, যদি এখনি যাই, তবে রাত্রিকালে শরবনে পদশব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া বিনাশ করিবে, এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে একটি শৃগাল খশ্ খশ্ করিয়া শরবনের উপর দিয়া চলিয়া গেল এবং প্রান্তে যাইয়া চীৎকার করিল। আমার বিলক্ষণ সুবিধা হইল। আমি অকুতোভয়ে শরবনে চলিয়া গেলাম, দস্যুরা নিঃসন্দেহ পূর্ব্বোক্ত শৃগাল মনে করিয়া কিছু বলিল না।

আমি দ্রুতবেগে সেনানাথের নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলাম। তিনি স্বয়ং পঁচিশ জন গৃহীতশস্ত্র সৈনিক [২৭] সঙ্গে লইয়া আমার সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অবিলম্বে যে স্থানে কথা শুনিয়াছিলাম, সেই ভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ''এই বেলা বিনীতভাবে বশীভূত হও। নতুবা এখনি সকলের মস্তক চূর্ণ করিব।'' বাস্তবিকও দস্যুদিগের পলাইবার উপায় ছিল না। তাহারা পাহাড়ের গড়ানিয়া পার্শ্বে সুড়ঙ্গ করিয়া লুক্কায়িত থাকিত। সুড়ঙ্গের মুখ শরবনে আচ্ছন্ন এবং নিকটে লোকালয়ের অসদ্ভাব থাকাতে তাহারা এতদিন নির্বিঘ্নে ছিল। কিন্তু এখন প্রবেশপথ রুদ্ধ হইল। অতএব তাহারা একে একে বহির্ভূত হইয়া সৈনিকগণের অধীন হইল। কিন্তু এক্ষণে সেনানাথ ও আমি দুই জনে তাহাদের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দিব্য একটি সজ্জিত ক্ষুদ্র গৃহ, তাহার চারি ধারে আয়না দেয়ালগিরি ইত্যাদি সামগ্রী রহিয়াছে। একটি সিন্দুক ছিল, তাহা উদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল, অনেক বস্ত্র, কতকগুলি মুদ্রা এবং খানকতক শাণিত তরবারি।

সেই সমুদয় লইয়া আমরা নগরে প্রত্যাগমন করিলাম। হাইদর দস্যুদিগকে যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড বিধান করিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার সেনার অর্দ্ধভাগের নেতা করিলেন। সেনানাথ আমাকে আপনার সমকক্ষ দেখিয়া কিছুমাত্র মাৎসর্য্য প্রকাশ করিলেন না। ফলতঃ আমার উদ্যম, সাহস ও কলহবিরাগ দেখিয়া তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, এমন কি, সন্তানের মত দেখিতেন। আমার সৌভাগ্য সম্পূর্ণ-রূপে উজ্জ্বল [২৮] হইল, সকল আশা ফলবতী হইল। আমি হাইদরের রাজসভায় একজন ওমরা হইয়া বাস করিতে লাগিলাম।

হাইদর আমার প্রতি সবিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করিয়া আপন পুত্র টিপুকে অপকৃষ্ট বলিয়া তিরস্কার করিতেন। এই নিমিত্তই টিপুর আমার প্রতি আন্তরিক মহাদ্বেষ হইল। আমি টিপুর ঈর্ষ্যাপীড়িত মনে বিশ্বাস ও মিত্রতা জন্মাইবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। হাইদর চিতেল্‌দ্রুগ্ নামক প্রসিদ্ধ গিরিদুর্গ অধিকার করিবার সময় আমার সাহস ও কৌশল দেখিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং আপনার দুহিতার সহিত পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি টিপুরই অসূয়াধিক্য পরিহারের নিমিত্ত তাহাতে সম্মত হই নাই।

কিছু দিন পরেই হাইদর বহুকালজ্বলিত ইংবাজদিগেব প্রতি কোপ উদ্গাব কবিতে আরম্ভ করিলেন। যে কেহ ভাবতবর্ষেব ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দেব যুদ্ধেব বৃত্তান্ত সম্যক্ অবগত আছেন। ইহাব কিছু দিন পূর্ব্বে হাইদবেব চিরস্মবণীয় কথাও তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি ইংবাজদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ''যে এত দিন আমি কিছু কাল বলি নাই। তাতে কিছু এসে যাবে না।'' সকলেই জানেন, তাঁহার তুবগসেনা মান্দ্রাজের আড়াই ক্রোশ দূর পর্যন্ত আসিয়া ইংবাজদিগেব মনে কেমন ভয় জন্মিযাছিল, [২৯] মহীসুরে যাইবার সকল গিরিমার্গ কেমন অবরোধ কবিয়াছিল, কত দ্রুতবেগে কার্ণটিকের এক নগর হইতে অপব নগরে দুই অরিদলের মধ্যে দিযা যাইত, কত কৌশল, কত প্রযাণ, কত প্রতিপ্রয়াণ করিত। আমি এই সকল যুদ্ধেব অনেক ব্যাপাবে ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাবই অধীনস্থ সেনাদল কাপ্তেন বেলি সাহেবেব সেনা সম্পূর্ণরূপে পরাভব কবে, আমি পণ্ডীচেরিতে নির্ভযে উপস্থিত হইযা ফবাশি গবর্ণবেব নিকট হাইদবের দৌত্যকার্য্য নির্বাহ করি। এই যুদ্ধে হেষ্টিংস সাহেব একেবাবে সকল অন্ধকাব দেখিয়াছিলেন, তাঁহাবই আদেশে তখন মাবহাট্টাদিগেব সহিত সমব চলিতেছিল, আবার হাইদর এই সময়ে বিবোধিভাব ধাবণ কবিলেন, তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থিব করিতে পারিতেন না। কিন্তু ঘটনাক্রমে মেজর স্কুট্ সাহেব তৎকালে সৈনাপত্য ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক প্রযাস ও কৌশলে হাইদরেব বর্দ্ধমান প্রভাবেব লঘুতা করিয়া দিলেন। সংগ্রাম নিবৃত্ত না হইতেই হাইদর এক প্রাচীন বোগে আক্রান্ত হইয়া লেকান্তরিত হইলেন। তাঁহাব তনয় টিপু এক্ষণে উত্তবাধীকাবী হইযা পশ্চিম ও পূর্ব্ব দুই উপকূলেই যুদ্ধে সমান বক্ষা আপনাব অসাধ্য ভাবিলেন এবং অচিবে সন্ধি প্রার্থনা কবিলেন। ইংরেজরা বিলক্ষণ শিক্ষা পাইযাছিল, এক্ষণে আগ্রহ সহকারে তাঁহাব প্রার্থনা গ্রাহ্য কবিল। সন্ধিব সর্ব্ব প্রথম পণবদ্ধ আমাকে ইংবাজদিগেব হস্তে সমর্পণ। আমি তাহাদিগের প্রতি অতিমাত্র শত্রুতা কবিযাছিলাম, [৩০] তাহাদিগেব মর্ম্মে বহু আঘাত কবিযাছিলাম, এই নিমিত্তই ইংবাজদিগের আমাব প্রতি দ্বেষ হইল। কিন্তু আমি কিছু অন্যায় করি নাই, সেনাপতি হইলে যুদ্ধে চাব পাঁচ জন শত্রুব প্রতি যেমন ব্যবহাব করে, আমিও সেইরূপ কবিযাছিলাম। অতএব আমাকে কবতলস্থ কবিবাব অভিলাষ গুপ্তভাবে সিদ্ধ করিবাব নিমিত্ত প্রযাস পাইতে লাগিল। যদি প্রকাশিতভাবে তাহাবা একজন সেনাপতিকে আপনাদিগের হস্তগত হইবার নিমিত্ত পণবদ্ধ পত্রে প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে ইউরোপে মুখ দেখাইবার পথ থাকিত না। অতএব টিপুর সহিত দূতদ্বারা এই কথাবার্ত্তা স্থির হইল, যে টিপু আমাকে ধবিয়া ইংবাজদিগেব হস্তে সমর্পণ কবিবেন। টিপুর মহাদ্বেষ ছিল তিনি এই উপায়ে আমাকে অপসারণ করিতে বিমুখ হইলেন না।

আমি অতি শীঘ্র এই বৃত্তান্ত জানিতে পাবিলাম। আমাব তখন টিপুর বাজ্যে ক্ষমতা অল্প ছিল না। সৈনিকেরা আমাব নিতান্ত বশীভূত ছিল। সৈনাপত্যেব বেতন মিতব্যযিতা সহকারে ব্যয় কবাতে অনেক বৈভব সঞ্চয় কবিযাছিলাম। এই দুই সুবিধাব সুকৌশল-যুক্ত বিনিযোগ করিলে টিপুব বাজ্যে বিলক্ষণ গোলযোগ ঘটিত। কিন্তু আমি তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য

ছিলাম না। তাঁহার পিতার উপকার দ্বারা বলী হইয়া সেই বল তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে আমার একবারও অভিলাষ হইল না। আমি আপনার সমুদয় সামগ্রীর সহিত টিপুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মালোয়া অভিমুখে [৩১] যাত্রা করিলাম। যাইবার সময় টিপুকে এই পত্র লিখিয়াছিলাম।

"তুমি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছ, তদনুসারে তোমাকে আমার কোন নামে সম্বোধন করিবার অভিলাষ নাই। যদি তোমার বুদ্ধি অবিচলিত থাকে, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, যে আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছি এবং তোমার মাৎসর্য্য উদ্দাম না হইলে আরও কত করিতাম। তুমি আমাকে ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়া আপনার শক্তির অপমান করিয়াছ। তুমি হাইদরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আপন দেশের একজন প্রজাকে শত্রুর প্রসাদের সহিত বিনিময় করিতে লজ্জাবোধ করিলে না। যাহা হউক, আমার বশীভূত সৈনিকগণকে আমি তোমাকে সমর্পণ করিতে কিছুমাত্র মমতা প্রকাশ করি নাই। লোকে অবশ্যই আমার মহানুভবতা ও তোমার লঘু চিত্ততা চিরকাল উদ্‌ঘোষণা করিবে। তোমার ইংরাজদিগের নিকট এই কাপুরুষতার ফল শীঘ্রই দৃষ্ট হইবে। আমার মন যেন তোমাকে হাইদরের শূন্য হইতে পরিনির্ম্মিত রাজ্যের শেষ পুরুষ মনে করিতেছে। যদি কিছু ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকে, তবে যাহাতে আমার এই আশঙ্কা বিফল হয়, তাহাই যেন সেই ক্ষমতা দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, ইহা আমি মনের সহিত প্রার্থনা করি।"

আমার ভবিষ্যদ্বানী কিরূপে সত্য হইয়াছে, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। আমার মহীসূর পরিত্যাগ সময়ে ত্রিশ জন তুরগসাদী অনুচর ছিল। [৩২] ইংরাজেরা আমাকে ধরিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা করিয়াছিল, কত স্থানে থানা বসাইয়াছিল, কত কৌশল করিয়াছিল। আমি অরণ্য গিরিপথ প্রভৃতি দুর্গম বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই মালোয়ায় পহুঁছিলাম। সিন্ধিয়া সাতিশয় অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আপন সভার একজন সভাসদ করিলেন। আমি তাঁহার অনুগ্রহচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া শান্তিসুখে কাল অপনয়ন করিতে লাগিলাম। তৎকালে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি ছিল। এই নিমিত্ত ইংরাজেরা তাঁহাকে আমার সমর্পণ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তীব্রপ্রতাপ মারহাট্টা অতি গোপনভাবে উত্তর করিলেন যে, "ইংরাজদিগের কোন অধিকার নাই, যে একজন স্বতন্ত্র রাজার প্রতি এইরূপে প্রজানির্বাসনের আজ্ঞা করিয়া পাঠান। মালোয়ারাজ অতিশয় আশ্চর্য্য হইবেন, যদি কোম্পানির স্বদেশীয় রাজার নিকট লব্ধ চার্টার হিন্দুস্থানের অধিরাজদিগকে এইরূপে অপমান করিবার ক্ষমতা অর্পিত থাকে।"

ইংরাজদিগের আমার প্রতি এই দ্বেষচিহ্ন প্রকাশ করা অবধি আমি জ্বলিয়া উঠিলাম। আমার তাহাদিগের অপকার করাই জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। আমি সিন্ধিয়াকে বুঝাইয়া দিলাম, যে এক দল বণিক্ কত পরিশ্রম, কত ছল, কত দৌরাত্ম্য, কত অন্যায় করিয়া এক্ষণে এত প্রবল হইয়াছে। তাহারা উত্তরকালে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে হস্তগত করিতে উপেক্ষা করিবে না। আমি দেখাইয়া দিলাম, যে দেশীয় সেনা বর্ত্তমান

[৩৩] অবস্থায় কোন ক্রমেই ইংরাজদিগেব সমকক্ষ হইতে পাবিবে না; যে, তাহাদিগেব সুশিক্ষা ইউরোপীয় রীতিক্রমে নির্বাহিত হইলে অতি উৎকৃষ্ট সেনা হইতে পাবিবে; যে ইউরোপীয় রীতিক্রমে শিক্ষা দিলে ফবাশিদিগকে আহ্বান কবিতে হইবে, কাবণ ফবাশিরা ইংরাজদিগের স্বভাবশত্রু। তাহারা এত ধূর্ত্ততা খেলিতে পারে নাই বলিযা হিন্দুস্থানে প্রভূত উপার্জ্জন করিতে পারে নাই, নচেৎ তাহাদিগের সভ্যতা, যুদ্ধে পাবদর্শিতা, সাহস ও কৌশল ইংবাজদিগেব অপেক্ষা এক কেশও ন্যূন নহে, বরং অনেক স্থলে অধিক হইবে। আরও কহিলাম, যে যদি হিন্দুস্থানেব একজন প্রবল রাজা তাহাদিগকে আহ্বান করে, তবে ফরাশিরা প্রফুল্লচিত্তে তাহাব কার্য্যে আপনাদিগকে ব্যাপৃত কবিতে তৎপর হইবে।

আমার এই সকল প্রবোধনা সফল হইল। বরগোইন্ নামক একজন ফবাশি তাঁহার সেনাকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত ছিল। অত্যল্প কালেই এই বন্দোবস্তের শুভ ফল দৃষ্ট হইল। সিন্ধিয়ার সেনা দেশীয় সকল রাজাব অপেক্ষা সমধিক বলবান্ ও শিক্ষিত হইল। সিন্ধিয়ার মহারাষ্ট্র তন্ত্রে ক্ষমতার আতিশয্য হইল। দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার করতলস্থ হইলেন। ফলত দেশীয কোন নরপতিই তাহাব সদৃশ প্রভাবশালী হইতে পাবে নাই। তথাপি আমার অন্তরস্থ অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। আমাব বাঞ্ছা ছিল, যে একেবাবে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের ভিত্তিতে কামানের গোলা না লাগাইলে বৈর নির্যাতন হয না। কিন্তু সিন্ধিয়া অসমীক্ষ্যকারী ছিলেন [৩৪] না। ইংবাজদিগেব সহিত অন্তবে বিরক্ত থাকিলেও অকারণ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার অভিলাষ ছিল না। তিনি সন্ধির সুশান্ত পক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাব উপকার করণেই তৎপব ছিলেন। অতএব তাঁহা হইতে আমার দুরন্ত বৈরের নির্যাতন অসম্ভব হইযা উঠিল। আমি তখন ক্রোধে এরূপ অন্ধ ছিলাম, যে এমন এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, যাহাতে যশ, মান, প্রাণ এই সকল সংশয়িত হইয়া উঠিল।

মালোয়ার রাজকুমারী চিকের অন্তরাল হইতে আমার দর্শন পাইয়া প্রণয়জালে পতিত হইয়াছিলেন, আমি শ্রুতিপরম্পরায় এরূপ শ্রবণ কবিযাছিলাম। তিনি সেই অবধি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বিরহের সম্পূর্ণ দশা ভোগ করিতেছিলেন, তথাপি স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের বশম্বদ হইয়া পিতা বা মাতাকে বলিতে পাবেন নাই। তাঁহার পিতাও একজন বৈদেশিককে কন্যা সম্প্রদান পূর্ব্বক আপন কুলে কলঙ্ক দান করিতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু আমি ভাবিলাম, যে আমার অতিশয় সৌভাগ্যের কথা, বাজকুমাবী স্বজাতীয় কত সুপুরুষকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক একজন অর্থহীন বৈদেশিককে পাণি দানে উৎসুক হইয়াছে, স্বর্গে আমার নিমিত্ত অবশ্যই কিছু সঞ্চিত থাকিবে। এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, যদি আমি গোপনীয়ভাবে দেশীয় বিধি অনুসাবে বিবাহ করি, তবে সিন্ধিযা কি ক্রোধভবে আপনার প্রিয়তম দুহিতারও সর্ব্বনাশ কবিবেন? ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেও [৩৫] দুহিতার অনুরোধে অবশ্যই রক্ষা কবিবেন এবং তাঁহার মনোদুঃখ পরিহারার্থে অবশ্যই মহোচ্চ পদে অধিরোপিত করিবেন। এই ক্ষমতাব

অধিকারী হইয়া তাহার জীবন সময়ে দেশের ওমরাদিগকে অতিশয় প্রয়াস পাইযা সন্তুষ্ট ও স্বপক্ষ করিতে চেষ্টা করিব। পবে তাঁহাব পবলোক হইলে তাঁহার গৃহীত পোষ্য পুত্রকে ওমরাদিগের সাহায্যে রাজ্যভ্রষ্ট কবা তাদৃশ দুঃস্বাধ্য হইবে না। তখন দেখা যাইবে যে হিন্দুস্থানের অত্যুৎকৃষ্ট সৈন্য লইযা ইংরাজদিগেব প্রতিকুলে কি করা যায়।

আমার এই ষড়যন্ত্রের কথা আমার দুই জন পবমবন্ধু মারহট্টা সমুদয় জানিত। আমি তাহাদিগকে কহিলাম, ''যদি আমার এই কল্প সিদ্ধ হয, তবে তোমবা মালোযার মহামাতা হইবে। যদি ব্যর্থ হয়, তবে নিঃসংশয় থাকিও, যে কাটিয়া কাটিয়া লবণই দিউক, নখের ভিতর পেরেকই চালাক, তোমাদেব নামোচ্চারণ বিষয়ে আমাব অধব ষ্টীবাকষ দ্বারা আঁটা থাকিবে।'' এই কথা বলিয়া কিরূপে পুরোহিতের আনয়ন কবিবে, কোথায় বিবাহ হইবে, রাজকুমারী বিবাহের সময় কিরূপ ছদ্মবেশ অবলম্বন কবিবেন, ইত্যাদি উপদেশ দিয়া সন্ধ্যাগমে রাজকুমারীর অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলাম, পথে যাইবাব সময় আমার চরণদ্বয় যেন পশ্চাৎ স্মরণ কবিতে লাগিল। আমি কখনও কোন কর্ম্ম করিতে ভয় পাই নাই, কিন্তু এবার যেন কে আমাকে যাইতে নিষেধ করিতেছে এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। যে কেহ আমার পশ্চাতে আসে, সেই যেন ধরিতে আসিতেছে, এইরূপ মনে হইতে লাগিল। পেচক বালকদিগের ন্যায় [৩৬] চীৎকার কবিয়া আমায় কম্পবান্ করিল। একটু কিছু নড়িলেই চকিত হইতে লাগিলাম। আমার বস্ত্রের অভ্যন্তরে একখানি দড়ির মই ছিল। তাহার এক প্রান্তে দুইটা আংটা ছিল। পাছে কেহ দেখিতে পায এই ভয়ে আমার ঘাম হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরেই কৃষ্ণপক্ষের নিশাব ঘোব অন্ধকার জগত্কে আবরণ করিল। আমি কত প্রবোধ দিযা মনকে সাহসযুক্ত করিলাম, কিন্তু আকাশে যেন কে আমাকে কত তিরস্কার কবিতেছে এইরূপ বোধ হওযাতে সমুদয় উৎসাহ জল হইয়া গেল। এইরূপে আমি খিড়কীব উদ্যানেব পুরুষদ্বয পবিমাণ উচ্চ প্রাচীর কাঁপিতে কাঁপিতে উল্লঙ্ঘন করিলাম। উদ্যানে প্রবেশ করিবামাত্র এক বৃহৎ জ্যোতির্মণ্ডল আমার নয়ণকে আঘাত করিল। দেখিলাম রাজতনয়ার প্রাসাদ পরমোজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছে; অপাবৃত বাতায়ন দ্বারা প্রভা নির্গত হইয়া বৃক্ষদিগের পত্র পর্য্যন্ত রঞ্জিত করিয়াছিল। পেচকের পক্ষে সূর্যালোকের ন্যায় আমার এই আলোক বিষাদজনক হইল। সেই সময়েই মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। এক ঝোপের ভিতর শঙ্কাকম্পিত চিত্তে লুক্কায়িত থাকিলাম। উঃ তখন আমার এক মুহূর্ত্ত যুগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমি পাপ সম্পূর্ণরূপে না করিয়াই ফলভোগ করিলাম। সেই সময়ের কষ্ট কি আমি বাক্যে বর্ণন করিতে পারি? যত উদ্বেগ, যত শঙ্কা, যত বিষময় ভাবনা আমাব হৃদয়কে চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের ভয়ানক স্বরূপ কি শব্দ দ্বারা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা যায়। চারি দিকের মধুর সৌরভ আমাব অসহ্য হইল। [৩৭] আমি পরম রমনীয় শোভায় দৃষ্টিপাত করিতে কষ্টবোধ করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিলক্ষণ বোধ হইল যে মানুষের সুখ ও দুঃখ মনের অবস্থারই অনুসারী। তথাপি পাপের পথ এমনি পবিস্কার ও মসৃণ, যে একবার তাহাতে পদার্পণ করিলে প্রত্যাগমন করিতে পারে না। দুরাচার

পাপপিশাচ তোমাকে কত সাদরে আলিঙ্গন করিবে, কত প্রণয় দেখাইবে, তুমি তাহার বাহ্য মাধুর্য্যে মোহিত না হইয়া থাকিতে পার না। পরিশেষ যখন একেবারে বিনিপাতের গর্ত্তে ক্ষিপ্ত হও তখন তোমার অনুতাপ উপস্থিত হইয়া গাত্র জর্জ্জরীভূত করে, মন নীরস করে এবং তীক্ষ্ণরূপে কশাঘাত করিতে থাকে। আমি তখনও নিবৃত্ত হইলে কিছু মাত্র ক্ষতি হইত না। কিন্তু দুঃপ্রবৃত্তি সমধিক বলবতী, আমাকে যেন বাঁধিয়া রাখিল।

নিশীথ সময় উপস্থিত হইল। আমি গোপন স্থান হইতে বহির্ভূত হইয়া আকাশে দ্যোতমান তারাবলী দেখিলাম। তাহারা যেন আমার কার্য্য দেখিবার নিমিত্ত চিক্ চিক্ করিতেছিল। পর্ব্বতের শীতবাত হু হু শব্দ করিয়া আমার মুখে লাগিয়া যেন দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে লাগিল। আমি এই অচেতন পদার্থের বারণ না শুনিয়া রাজকুমারীর জানালায় উঠিলাম। সমুদয় নিস্তব্ধ ছিল, সকল আলোক নির্বাণ হইয়াছিল, কেবল একটিমাত্র প্রদীপ সুপ্ত নৃপতনয়ার মুখে আপনার প্রভাজাল ছড়াইয়া দিতেছিল।

আমি এক উচ্চ পর্য্যঙ্কে শয়ান রাজকুমারীর শরীর দর্শন করিয়া যেন জড়ীভূত হইয়া [৩৮] গেলাম। সেই ভক্তিযোগ্য রূপ দর্শন করিলে মনে কোন প্রকার অসৎ প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয় না। আমার সেই আকারকে যেন অলৌকিক জীব বোধ হইল। পবিত্রতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আমা হইতে ভক্তির আকর্ষণ করিতে লাগিল। একপ মহিমা, এরূপ কান্তিচয়, এমন অধর্ষনীয়তা কখন দেখি নাই। তাঁহার রূপ মধুর, তথাপি মনে এক প্রকার সম্ভ্রমের উৎপাদন করে। তোমার বোধ হইত না, যে এ পদার্থ অন্য লোকের উপাদানে নির্ম্মিত অথবা পার্থিব শোক, তাপ ও বিপুর বশম্বদ। আমি চকিত হইয়া ক্ষণকাল এই মনোহর বস্তু নিধ্যান করিতে লাগিলাম। আমার সমুদয় মালিন্য, সমুদয় অসাদাশয় দূরীভূত হইল। এই সময়ে রাজতনয়া জাগরিত হইয়া আমি যে জানালায় ছিলাম, অকস্মাৎ সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করিলেন, আমাকে দেখিতে পাইয়াই কোপপ্রস্ফুরিতাধরে কহিলেন, "দুরাত্মন্ আমি তোর অভিসন্ধি অনেক দিন জানিতে পারিয়াছি। তুই মনে করিয়াছিলি, যে একপ কৃতঘ্ন দুরাচারকে এক মারহট্টা অবলা পাণি দান করিবে। আমি তোকে ভাল বাসিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম, তুই আমার প্রীতির নিতান্ত অযোগ্য। তথাপি আমি মহানুভতা গুণে বলিতেছি, যে এই দণ্ডেই পলায়ন কর্, নচেৎ আগামী দিনের সূর্য্য তোকে এইখানে দেখিলে মালোয়া রাজ্য তোর কলঙ্কিত রুধিরে কলুষিত হইবে।" এই [৩৯] বলিয়া পাথেয়স্বরূপ হস্তের এক আভরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উদ্যান হইতে বহির্গত হইলাম।

আমার তখন প্রাণভয়ই প্রবল প্রবর্ত্তনা হইল। সেই রাত্রেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন আমার মনে বিস্ময়, ভয় ও দুঃখের পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল। আমি সর্ব্বসাধারণ পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদবর্ত্তী মহারণ্যে প্রবেশিলাম। আমার অরণ্য পশুর ভয় কিছুমাত্র ছিল না। যদি কোন হিংস্র জন্তু আমাকে মানসিক যাতনা হইতে মুক্ত করিতে আসিত, তাহা হইলে আমি অতিশয়

আহ্লাদের সহিত আমিষপিণ্ডের ন্যায় আপনাব শবীব তাহার নিকট উপনীত কবিতাম। যখন আমি অরণ্যে প্রবেশ করিলাম, তৎকালে বাত্রির অবশেষ ছিল। কাননের সূচীভেদ্য অন্ধকার আমার নিকট স্বাগতীকৃত হইল। আমি কিছুমাত্র গণনা না কবিয়া পত্রবনেব মধ্যে চলিয়া যাইতে লাগিলাম। কতদূব যাইয়া অতিশয শ্রান্তি বোধ হইল। রাশীকৃত শুষ্ক পর্ণের উপর শয়ন করিয়া সর্পের ন্যায দুশ্চিন্তা দ্বারা দহ্যমান হইতে লাগিলাম।

প্রভাতের সহিত পক্ষীরা কলরব করিয়া উঠিল। সেই গহন কাননে মধ্যাহ্নকাল ব্যতীত অন্য কোন সময়েই সূর্য্যকিরণ প্রবেশ কবে না। আমার সেই সময়ে আবাব জীবন তৃষ্ণা প্রবল হইল। গত রাত্রে কত আশা করিয়াছিলাম, বাজকুমারীব পাণিগ্রহণ কবিব; মালোয়া রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত লোক হইব, হয়ত এক সময় [৪০] সিংহাসনেও অধিরোহণ কবিব। হা পবমেশ্বব, প্রভাতে ক্ষুধাব শান্তির নিমিত্ত ইতস্তত বিচবণ কবিতে হইল। দেব, তুমি এইরূপেই মানুষের ভাগ্য লইয়া খেলা কব। আমি বনফল অন্বেষণার্থে চাবি দিকে নয়ন প্রযোগ করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে এক প্রকাব দুর্গন্ধ অনুভূত হইল। আমি কারণ জানিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতুকযুক্ত ও উদ্বিগ্ন হইলাম। কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আস্ত মানুষ গিলিতে সমর্থ এক ব্যাঘ্র ওত্ পাতিয়া বসিয়া আছে নয়নগোচর হইল। আমি ভয়ে লাফাইয়া উঠিলাম। ব্যাঘ্র চক্ষু লাল কবিয়া এক ভয়ানক গর্জন ছাড়িল, পদাগ্রে পৃথিবী বিদীর্ণ করিল, এবং লাঙ্গুলে চড়াৎ কবিয়া মৃত্তিকায় আঘাত পূর্ব্বক আমার অভিমুখে উল্লম্ফ প্রদান করিল: শশব্যস্তে হাতে আব কিছু না থাকাতে, বাজকুমারীর প্রদত্ত অলঙ্কাবখানি স্বভাবত ছুঁড়িয়া দিলাম। শার্দ্দুল মহাকোপে আমার দিকে আসিতেছিল, অকস্মাৎ অলঙ্কাবের চাক্‌চিক্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং নখদ্বারা ধারণপূর্ব্বক দন্তে বাখিযা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আমি এই অবকাশে পাঁচ হাত অন্তবস্থিত বটবৃক্ষে যাইয়া উঠিলাম; তাহাব জটাসমূহ স্তম্ভাকাবে মৃত্তিকাতে বদ্ধমূল হওয়াতে বৃক্ষ এক থিয়েটারেব সদৃশ হইয়াছে। আমি আপাতত হিংস্রেব দর্শন হইতে রক্ষা পাইলাম ভাবিয়া রাজকুমাবীর ঔদার্য্যগুণে ধন্যাবাদ করিতে লাগিলাম। শার্দ্দুল আপনাব উপহার লইয়া পলায়ন করিল দেখিয়া গলবক্ত্র হইতে এক প্রকার [৪১] গদগদ চীৎকার আবিষ্কৃত করিল। ''কতক্ষণ থাকিতে পাবিস্, থাক্'' এই বলিতেই যেন আমার প্রতি জ্বলিত দৃষ্টি প্রক্ষেপ করিল। আমি ক্ষুধায় জর্জর হইয়া সেই বটশাখায় বসিয়া রহিলাম। ব্যাঘ্রও বৃক্ষতল হইতে একটুও নড়িল না। ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য কবিয়া পলায়িত শীকারের শীর্ষ চর্ব্বণ কবিবাব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কবিয়া উপবিষ্ট থাকিল। এক একপ্রকার তাহার ক্রোধহুঙ্কার দিগ্‌দিগন্তে পূর্ণ কবিতে লাগিল।

আমি তাহার দৃঢ় নিশ্চয় দেখিয়া মনে করিলাম, যে বর্ব্বরের নখর হইতে রক্ষা পাইয়া ক্ষুধার মর্ম্মভেদক যন্ত্রণায় বুঝি প্রাণত্যাগ কবিতে হইল। সেই অহোবাত্র এইরূপ অতিবাহিত হইল। ব্যাঘ্র তথাপি স্থান ছাড়িয়া গেল না। এত বিলম্ব হইতেছে বলিয়া তাহার যেন কোপের আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি তাহার ভীষণ দৃষ্টিপাত ও নিষ্ঠুর দন্ত কড়মড়ি সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাকে পত্রজালেব ভিতব লুক্কায়িত

করিলাম। আমার তখন অনাহার জনিত সাতিশয় কষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। গাত্র স্রস্ত হইতে লাগিল, শরীর নিতান্ত দুর্বল হইল। ভাবিলাম, দৌর্বল্যে শাখার উপব থাকিতে অসমর্থ হইয়া ব্যাঘ্রেব মুখগহ্বরে পতিত হইব। এইরূপে মনে করিতেছিলাম, এই সময়ে অকস্মাৎ ''গোঁ গোঁ"ইত্যাকার শব্দ শ্রবণগোচব হইল। আমি বহির্ভূত হইয়' দেখিলাম, ব্যাঘ্রেব উদর হইতে ফিনকি দিয়া বক্ত ছুটিতেছে। সে অতি যাতনায় এপাশ্ ও ওপাশ্ করিতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার [৪২] শব্দ কবিতেছে। ক্ষণকাল পরে তাহাব শরীর ক্রমে চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হাঁ করা মুখ মাটিতে স্রস্ত হইয়া পড়িল। গলা হইতে একটু একটু হুঙ্কার নির্গত হইতেছিল। তাহাব লাঙ্গুল এক একবার ধরণীতে আছড়াইতেছিল। কিয়ৎকালানন্তর তাহাব সমুদয় জীবনচিহ্ন অন্তর্হিত হইল। অমনি তৎক্ষণাৎ এক কৃষ্ণকায় পুলিন্দ কর্ণকঠোর আক্রন্দেব সহিত লতাবন হইতে কৃপাণিকা করে লাফাইয়া পড়িল। তাহার শ্যাম গণ্ডস্থল নানাবিধ গিবিমৃত্তিকার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া শ্বেত, নীল ও বক্ত কমলে আচ্ছন্ন কালিন্দীজলের শোভা ধাবণ কবিযাছিল। তাহার শিরস্থিত রক্তোষ্ণীষে এক ময়ূরপুচ্ছ সন্নিবেশিত হইয়া কদলীপত্রেব ন্যায় হেলিযা পড়িয়াছিল। তাহার অপাঙ্গ সিন্দুরে লোহিত হইযা এক ভয়ানক জ্যোতি প্রক্ষেপ করিতেছিল। দুই পার্শ্ববর্ত্তী তূণীবদ্বয হইতে কঙ্কপত্র বহির্ভূত দেখা গেল। গুণযুক্ত ধনুকখানি স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত ছিল, পরিধান এক কৌপীন। তাহাব সর্ব্বাঙ্গ পাষাণেব ন্যায় দৃঢ় বোধ হইল। সে করস্থিত কৃপাণিকা দ্বারা ব্যাঘ্রের শীর্ষ দেহ হইতে বিছিন্ন করিল। তৎক্ষণাৎ পূর্ণ ভিস্তির ছিদ্র কবিয়া দিলে জল যেমন বেগে নির্গত হয় সেইরূপ এক রুধিরস্রোত বহির্গত হইয়া পুলিন্দের মসীসদৃশ হস্ত সিন্দুরময় করিল। পরে সে ব্যাঘ্রেব চর্ম্ম পৃথক কবিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে এক জীর্ণ পর্ণ বৃন্ত হইতে স্রস্ত হইয়া তাহাব মস্তকে পড়িল। সে চমকিয়া উপব দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আমাকে দেখিতে পাইল। অমনি ক্ষিপ্রহস্ততা [৪৩] প্রদর্শনপূর্ব্বক ধনুকে বাণ যোজনা করিল। আমার স্বব ক্ষুধায় অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিল, তথাপি যত পারিলাম তত উচ্চগলা করিয়া কহিলাম,''আমায মাবিও না, মাবিও না, আমি শরণাগত, আমি অতিথি।'' ইহা শুনিযাই বাণ সংহার পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইতে ইঙ্গিত করিল। আমি তাহার আহ্বানানুসারে নামিয়া তাহাব পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলাম এবং সাতিশয় ক্ষুধা প্রকাশ করিলাম। সে তুণের অভ্যন্তর হইতে তিন আঙ্গুল পুরু ঘুটেব অগ্নিতে দগ্ধ এক ময়দার পিণ্ড প্রদান করিল। আমার এক দিন আহার হয় নাই অতএব এই খাদ্য নিতান্ত ঘৃণিত হইল না। আমি প্রকৃত ঔদরিকের মত খাইতে লাগিলাম।

তাহাব ব্যাঘ্রচর্ম্ম পৃথক করণ শেষ হইলে আমাকে অনুগামী হইতে আদেশ করিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহার সঙ্গে কতক দূর গমনপূর্ব্বক কতকগুলি কুটীর দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক কুটীরই এক প্রকাণ্ড তরুব ছাযার অবস্থিত। চাবি দিক্ দেবদারুবনে বেষ্টিত। তাহাদিগের তমোময় আভা চিন্তাপ্রবণ মানসে অনেক ভাবনার উদয় কবিতে সমর্থ, এক এক আরণ্য লতা উগ্রগন্ধ বৃহদাকার পুষ্পমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া দেবদারুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। অধিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাঘ্র, অথবা বন্যবরাহের উপদ্রব নিবাবণার্থ অখণ্ড বংশদ্বাবা

রচিত প্রায় দশ বার হস্ত উচ্চ এক বৃতি আছে। এই বৃতিব স্থানে স্থানে এক এক সাধারণ প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পথ আছে। পুলিন্দ আমাকে লইয়া আপনাব পবিবাবেব নিকট [৪৪] অতিথি বলিয়া পবিচয দিলেন। অসভ্যাবস্থ লোকদিগেব আতিথেয়তা এক প্রধান ধর্ম্ম। এমন কি, অতিথিকে বাস দিবাব নিমিত্ত তাহাবা কখন কখন প্রতিবেশীব সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়। তাহাব পবিবাবেবা আমাব আগমনে অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। পুলিন্দের যুব-বযস্ক দুহিতাবা অবাধে আমাব সমীপে আসিযা কেহ আমার কেশকলাপে স্থূল কৃষ্ণ আঙ্গুলী দিয়া খেলা কবিতে লাগিল, কেহ আমাব গাত্রবস্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল, কেহ বা আমার হাত লইযা অঙ্গুলীস্থিত অঙ্গুবীয়কের হীবকপ্রভা দেখিতে লাগিল। তাহাদিগেবও প্রায় সর্ব্বাঙ্গ নগ্ন, কেশ অতি নীল, অধর সাতিশয স্থূল ও সিন্দুর দ্বারা বিম্বের মত লাল। পুলিন্দ আমাকে কহিল, ''তুমি অতিথি হইযাছ। আপনাব গৃহের ন্যায় আমাদিগের নিকট অবস্থান কব, তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই'' এই বলিয়া চলিয়া গেল। তাহাব পত্নী ও দুহিতাবা মৃগমাংস ও ভাত খাইতে দিল। আমি তাহা খাইয়া সেদিন তাহাদিগেব একটি কুটীবে বিচালিব শয্যায শয়নপূর্ব্বক বাত্রিপাত করিলাম।

পবদিন প্রাতে সেই অধিষ্ঠানের দলপতি আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে আমার ইংবাজদিগের নিকট হইতে ভয় বিজ্ঞাপন কবিলাম এবং বিশেষ কহিলাম, যে তাহাদিগেব রাজ্যে আমায় জানিতে পাবিলে কাবাকদ্ধ কবিবে। তিনি কহিলেন, ''তোমাব এই স্থান হইতে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি চিরকাল আমার আতিথেযতাব উপর নির্ভর করিতে পারিবে [৪৫]। কোম্পানীব সেনা কোন কালে এখানে প্রবেশ করে না।'' এই কথা বলিয়া আমাকে তাঁহাব গৃহে লইয়া চলিলেন, যাইবাব সময় পুলিন্দের দুহিতারা কতবার তাহাদিগের মসীময দেহ আমার শরীরের সহিত সংসৃষ্ট কবিল এবং দলপতির আজ্ঞা অণুল্লঙ্ঘনীয় ভাবিয়া বিযন্নমুখ হইল। দলপতিব গৃহে আসিযা দেখিলাম, যে তাঁহার দলপতিত্বেব চিহ্ন কেবল তাঁহাব পবিবাবেব গাত্রে কতগুলি গৌগাভরণ ও ময়ূরপুচ্ছ আধিক্য। ষোড়শবর্ষবয়স্কা তাঁহাব এক দুহিতা ছিল। তাহাব বেশভূষণ দর্শন করিয়া আমি অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিলাম। ময়ূবপুচ্ছ হইতে পালক তুলিযা অতিস্ফীত কপোলে বসাইয়া দিয়া বিচিত্রিত করিয়াছে। তিসীপুষ্প সদৃশ দুই উরুতে লোহিত বসন জড়ান আছে। সম্পূর্ণরূপে পরিবৃদ্ধ স্তনদ্বয় চূচূক ব্যতীত সর্ব্বাগ্রে সিন্দুবাক্ত হইযা ঠিক্ দুই বৃহৎ গুঞ্জাফলের মত দেখিতে হইয়াছে। শীর্ষস্থ কেশপাশ ঘাড়ে এক খোঁপা বাঁধা আছে। তাহাতে দুটি একটি পুষ্প প্রদত্ত হইয়াছে। বেগুনের মত সর্ব্বাঙ্গ চিক্কণ। তাহার এই রূপের দাস হইয়া কত কৃষ্ণকায় প্রণয়ী প্রতিদিন সাক্ষাৎকার লাভার্থ আসিয়া হতাশে ফিরিয়া যাইত। তাহার গর্ব্ব দেখিলে মনে হইত, বুঝি সে আপনাকে সকল স্ত্রী অপেক্ষা সুরূপা মনে করে। আমি তাহাদেব বাটীতে যাইবামাত্র সে দৌড়িয়া দেখিতে আসিল এবং আপনার প্রেম-কিঙ্করদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া পিতার সম্মুখেই আমাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিল এবং বারম্বাব [৪৬] আমাব কপালে অধব ঘর্ষণপূর্ব্বক একপ ঘৃণা জন্মাইয়া দিল যে আমার মনে হইল, পালাইতে পাবিলে বাঁচি।

দলপতি তাহাকে অপসৃত হইতে আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "এই আমার গৃহ। তুমি সন্তানের ন্যায় প্রতিপালিত হইবে। তুমি আমাদিগের ব্যবসায় ও কার্য্য শিক্ষা কর, তোমার কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই।" আমি, জন্তুর শুভাশুভ বিধানে ভবিতব্যতা দেবীরই প্রভুতা জানিযা, শিরকম্পন দ্বারা তাহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ কবিলাম এবং সেই অবধি পুলিন্দদলভুক্ত হইয়া বাণ শিক্ষা, লম্ফ প্রদান, বৃক্ষারোহণ, বৃত্তি নির্ম্মাণ, নতারজ্জু রচন প্রভৃতি আরণ্য জনের প্রযোজনোপযোগী শিল্প শিক্ষা করিতে লাগিলাম। পুলিন্দদিগের সহিত মৃগয়ায় যাইতাম, নিকটবর্ত্তী হ্রদে নৌকাবাহন দ্বারা মৎস্য ধবিতাম, কুম্ভীরের ন্যায় জলে সন্তবণ করিতাম, ববাহেব অনুসবণে ন্যগ্রোধ বৃক্ষেব কোটরে বিলীন হইতাম, তথাকার ভুজঙ্গমেব সবিষ মুখ হস্ত দ্বাবা নিপীড়ন পূর্ব্বক অতি দূরে নিক্ষেপ করিতাম, উড্ডীন ময়ূরের প্রতি শরক্ষেপ পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত কবিলাম, পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক জলপ্রপাতেব কল্লোলশব্দ শুনিতে শুনিতে মৃগয়ার যোগ্য পশু অন্বেষণ করিতাম, সবল নামক দেবদারুর ধুনাব দিগন্ত বিস্তৃত সৌরভে আমোদিত হইযা বনে বিচরণ কবিতাম, এবং নিহত পশুর ভার স্কন্ধে বহন পূর্ব্বক ক্ষুদ্র শৈলেব শাদ্বলময় পার্শ্বদেশ হইতে অবতীর্ণ হইতাম। অতি অল্পকালেব মধ্যেই আমার আচাব ও কচি পুলিন্দদিগেব-[৪৭] সদৃশ হইল। আমাব ক্রীড়াও সেই অসভ্য জাতিদিগেব অনুকপ হইয়া উঠিল। হ্রদেব চাবি ধারে বাঁশ, ঝাউ, দেবদাক প্রভৃতি তরুদ্বারা বেষ্টিত। তাহাদিগেব প্রতিবিম্ব হ্রদগর্ভে অধোমুখ ভাবে পতিত হইযা এক গবীয়ান দর্শনীয় পদার্থ হইত। আমি এক শাখার উচ্চ অগ্রে উপস্থিত হইযা ঝুপ্ কবিযা জলে ঝাঁপ দিতাম। কত গভীর জলে তলাইযা গিয়া পুনর্ব্বাব অনেক দূবে উত্থান পূর্ব্বক সকলকে বিস্মিত কবিতাম। কখন বা দেবদাকব সর্ব্বোচ্চ শাখায দোলা খাটাইযা এপাব ওপাব কবিয়া দোল খাইতাম। কখন কৌশল প্রদর্শনার্থ ভারাসহ ক্ষুদ্র ডালে দাঁড়াইতাম, এবং তাহা বিভগ্ন হইযা পড়িতে না পড়িতে উর্দ্ধস্থ আব এক শক্ত শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক ঝুলিয়া পড়িতাম। এইরূপে আমি একজন প্রকৃত পুলিন্দ হইয়াছিলাম। আমাব শবীব শীতাতপেব পবিবর্ত্ত সহ্য কবিয়া বিলক্ষণ কষ্টসহ ও সবল হইয়াছিল, বর্ণ অনেক মলিন হইয়াছিল, এবং খর্ব্বকায়দিগেব অপেক্ষা প্রাংশু দেহ থাকাতে আমাব তাহাদিগের নিকট অতিশয গৌবব ও শোভা হইত। প্রতি পুরুষ আমাকে দলপতিব প্রিযপাত্র জানিযা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইতে বাসনা কবিত, প্রতি অবলাই দীর্ঘকায ও শ্রীযুক্ত আকার দেখিয়া প্রণয প্রকাশ কবিতে ব্যগ্র হইত।

আমি এইরূপে ক্ষমতাসহকাবে বহুকাল পুলিন্দ সমাজে বাস করিতে পাবিতাম, এমন কি সংসারের আস্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাব চিত্তেব এক দিনের নিমিত্ত [৪৮] সভ্য সমাজে যাইতে ঔৎসুক্যমাত্র ছিল না এবং আমি মনে কবিয়াছিলাম, যে এই সকল সবলহৃদয় প্রাকৃতিক মনুষ্যেব নিকট সুখে জীবন ক্ষেপ করিব। কিন্তু দলপতিদুহিতাব রূপগন্ধ আমার তথায বাস করিবাব সকল আশা উচ্ছেদ করিল। সে মনে করিয়াছিল, যে আমি তাহাব রূপে অবশ্যই মোহিত হইব এবং তাহাব নিকট প্রণয যাচঞা করিব।

কিন্তু সে মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে স্বযং আমাকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন আসিয়া আমার কাছে বসিত, আমার গালে দুই হাত বুলাইয়া দিত, এক একবার বাহুদ্বারা বেষ্টন করিত এবং আবও কত কি অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ কবিয়া আমার চিত্তকে রুগ্ন করিত। আমি আপনাব সমুদয় ধৈর্য্যের আহ্বান পূর্ব্বক এই সকল উৎপাত সহ্য করিতাম। পরিশেষে নিতান্ত বাড়াবাড়ি হইল। সে আপনার জনক সন্নিধানে আমার সহিত বিবাহেব প্রস্তাব তুলিল এবং আমার ধৈর্য্যকে প্রণয়ের চিহ্ন মনে করিয়া দশগুণ করিয়া বলিল। তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তাঁহাব মনে এইরূপ ইচ্ছা বহুদিন অবধি ছিল, কিন্তু দুহিতার ইচ্ছা না জানিলে আপনি বিবাহের কথা তুলিতে অসম্মত ছিলেন। এখন তাহাবই সাতিশয় আগ্রহ দেখিয়া কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সম্মতিদান ও দুহিতার অভিরুচির প্রশংসা কবিলেন। বিবাহেব উদ্যোগ আবম্ভ হইল। অন্যান্য স্থান হইতে নিমন্ত্রিতেরা উপস্থিত হইতে আবম্ভ হইল। আমার এই বিপদের সময় কিছু উপায় স্থির কবিতে না পাবিয়া [৪৯] পলায়নমাত্র পরায়ণ দেখিলাম। কিন্তু অরণ্যে একাকী কিরূপে পলাইব, কোথায় যাইব, এমন কোন স্থানই আছে, যথায় ইংরাজেরা আমাকে হস্তগত করিবেক না। এই সকল চিন্তায় মহা ব্যাকুল হইলাম। দৈবক্রমে এই কালে অনাহূত হইয়া এক উপায় উপস্থিত হইল।

বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আব এক জন প্রবল দলপতির তরুণবয়স্ক তনয় আসিয়াছিল। সে প্রথমে আমার ভাবিনী বধূব পাণিগ্রহণে সাতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল এবং এমন আশাও পাইয়াছিল, যে সেই এক সময়ে তাহার বর হইবে। কিন্তু এক্ষণে একজন নবাগত বিজাতীয়কে স্বয়ংবৃত দেখিয়া স্বভাবতই অসন্তুষ্ট ও আমাব মহাবিদ্বেষী হইল। আমি নানা বাহ্য চিহ্নে তাহাব মনেব ভাব অবগত হইয়া তাহাকে কহিলাম, যে "নির্জনে তোমাব এক প্রিয় নিবেদন করিব।" পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক লতাকুঞ্জে দুই জনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে কহিলাম, "ভদ্র, তোমাব প্রিয়ার পাণিগ্রহণ কবিতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। নিরুপায় ভাবিয়া আমি সম্মতি প্রদর্শন কবিয়াছি। যদি তুমি কোন পলায়নের উপায় করিয়া দিতে পাব, তাহা হইলে তোমাকে চিবকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিত্র মনে করিব। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখ, যে ইংবাজ রাজ্যে জ্ঞাতভাবে বাস করিবার আমার পথ নাই।" আমি অতি ধীর ও অমায়িকভাবে এই বাক্য উচ্চারণ করিলাম। কিন্তু সে আমার তাদৃশ সুরূপার পরিত্যাগহেতু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত এবং [৫০] আমি বারম্বার তাহাকে কহিলে আহ্লাদিত হইল। পরে কহিল, "তোমাব এই স্থান হইতে অপসরণের বিলক্ষণ সুবিধা কবিয়া দিতে পাবি। এই পূর্ব্বপশ্চিমে আয়ত বিন্ধ্যাটবীব অনেক ভাগ আমাদিগের জাতীয় লোকের অধ্যুষিত আছে। এই সকল অধিষ্ঠানের পরস্পব বিরোধ থাকিলেও অতিথির কার্য্য সম্পাদন করিতে কেহ এক মুহূর্ত্তকাল পরাঙ্মুক হয় না। তথাপি তোমার আমাদিগের জাতির সহিত সহবাস জানিলে, তোমার ভাবী শ্বশুর এরূপ অপমানিত হইয়া কখন ক্ষমা করিবে না। আমি বোধ করি, উড়িষ্যাব সমীপে ছদ্মবেশে বাস করা পরামর্শসিদ্ধ। তথাকার জঙ্গলে অনেক আরণ্য জাতি বাস করে,

তুমি তাহাদিগের দলভুক্ত হইলে ইংরাজেরা কোন কালে তোমার অনুসন্ধান পাইবে না। তোমার তথায় যাইবার ভাবনা নাই, প্রত্যেক অধিষ্ঠানের এক জন পথপ্রদর্শক তোমাকে তাহার পূর্ব্বদিক্‌স্থিত অধিষ্ঠানে রাখিয়া আসিবে। এইরূপে কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি বিন্ধ্যাটবীর পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইবে এবং তথায় আপনার বাসস্থান মনোনীত করিয়া লইবে।'' আমি এই পরামর্শে সম্মত হইয়া ''পরদিন প্রাতঃকালে দুই জনে দুই দিক্ হইতে বহির্গত হইব এবং এই লতাকুঞ্জই সংগতিস্থল হইবে'' এই স্থিব করিয গৃহে প্রত্যাগমন কবিলাম। আমার উদ্বিগ্নচিত্তেব সে দিবস বিশ্রাম হইল না। সারা রাত্র আপনার নিয়তির ঈদৃশ বৈষম্য ভাবিতে ভাবিতে কালাপনয়ন কবিলাম।

পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ লোহিতবর্ণ হইলেই আমি গাত্রোত্থান [৫১] পূর্ব্বক পূর্ব্বনির্দিষ্ট লতাকুঞ্জে যাইয়া দেখিলাম, দলপতিতনয় আমাব নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ তরুগণের অন্ধকারে গুপ্ত থাকিয়া আমরা যাত্রা কবিলাম। তখন সম্যক্ আলোকোদয় হয় নাই। বনের স্তব্ধভাব অতি রমণীয় ছিল। দুটি একটি ঊষাগায়ক পক্ষী শাখায় এক পদে অবস্থিত হইয়া মাধুর্য্য বর্ষণ করিতেছিল। আমাদিগেব পথেব দুই ধাবে ঝাউ ও দেবদারু গাছ ছিল। প্রাভাতিক পরিশুদ্ধ বায়ু তাহাদিগেব ভিতব দিয়া ঝব্ ঝর্ কবিতে কবিতে শযনোত্তপ্ত দেহ শীতল ও উজ্জীবিত কবিতেছিল। হ্রদের বারি সুস্নিগ্ধ ও শান্তভাব অবলম্বন করিয়া যেন সাক্ষাৎ মহিমা মূর্ত্তিধব হইযা নিদ্রাকালীন স্থির ভাবেব নিদর্শন দেখাইতেছিল। দলপতিকুমাব এমন মনোবম স্থানে প্রায তিন ক্রোশ পথ আমাব সহিত আসিয়া আব এক অধিষ্ঠান হইতে আমাকে এক জন পথপ্রদর্শক কবিয়া দিলেন। তথায প্রাতরাশ নির্বাহিণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বাব চলিতে আবম্ভ কবিলাম। এইরূপে কত সুন্দব গিবি, নয়নতর্পণ কানন, মন্দপ্রবাহ তরঙ্গিণী, শৈবালময সবোবব, নবপুষ্পে হিবণ্ময শাদ্বল, বায়ুহিল্লোলে কম্পিতশীর্ষ শালিনিচয, মাঠোদ্ভূত পদ্মেব মূলভাগে অবনত কলম ধান্য, এই সকল দেখিতে দেখিতে অহোবাত্র অবিশ্রামে গমন পূর্ব্বক উড়িষ্যাব ক্ষেত্রমণ্ডল নয়নগোচর কবিলাম।

যে সময়ে ইংবাজ অধিকারে পদার্পণ করিলাম, তাহা সন্ধ্যার প্রাক্কাল ছিল: সেই স্থান হইতে জগন্নাথের [৫২] মন্দিবেব চূড়া লক্ষিত হইল। আমি তখন অতি শ্রান্ত হইয়া সমীপবর্ত্তী এক তরুতলে নিষণ্ণ হইলাম। তথাকাব নিকটে লোকালয ছিল না। আমার উত্তরে প্রায় আধ ক্রোশ অন্তবে একটি ক্ষুদ্র শৈল দেখিলাম। তৎকালে আকাশ অতিশয পবিষ্কার ছিল। বেলা অধিক না থাকাতে এবং আপনিও সবিশেষ শ্রান্ত হওযাতে মনে কবিয়াছিলাম, যে আজি এই তরুতলেই রাতিপাত কবিব।

আমি এই ভাবে নিষণ্ণ আছি, এই সময়ে এদেশে যাহাকে তুফান বলে, সেই ঝড় উপস্থিত হইল। সমুদ্র হইতে বাতাস বহিয়া নদীব পয়োবাশির স্রোত ফিবাইয়া দিল এবং ফেণ উদ্বমন করিতে করিতে সেই পযোবাশি মুখস্থিত দ্বীপে আঘাত করিতে লাগিল: বায়ু দ্বারা দ্বীপের উপকূল হইতে সিকতাস্তম্ভ এবং জঙ্গল হইতে ঘন পত্রোচ্চয় সম্মার্জ্জিত হইয়া গেল। সেই পত্রজাল বাত্যাবেগে নদী ও মাঠ পার হইয়া আকাশেব কত ঊর্দ্ধে

উন্নীত হইল। এক একবার বাঁশঝাড়ে বাত্যার বেগ বায় হইতে লাগিল। ইহাবা অতি প্রাংশু বৃক্ষের মত উচ্চ হইলেও ঘাসেব ন্যায আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমার আশ্রয়তরু এরূপ তেজে কম্পিত হইতে লাগিল, যে চাপা পডিবার আশঙ্কায আমি মাঠের দিকে ধাবমান হইলাম। পুবোবর্ত্তী স্রোতস্বিনীব জল উচ্চলিত হইয়া উঠিয়া তীবদেশ প্লাবিত করিল এবং আমাকে গ্রাস কবিবার নিমিত্ত মহাবেগে মাঠেব উপর দিয়া আসিতে লাগিল। আমি সেখানে উচ্চ ভূমি পাইলাম, [৫৩] সেই স্থানেই উঠিয়া পড়িতে লাগিলাম। রাত্রি বাড়িতে লাগিল, এবং আমি দুই ঘণ্টাকাল ঘোর অন্ধকারে, কোথায় যাইতেছি কিছুই নির্ণয় না কবিয়া চলিতে লাগিলাম। এই সমযে এক তড়িৎপ্রভা কাদম্বিনী ভেদ ও গগনমন্ডল উদ্দীপন করিয়া দক্ষিণে সংক্ষোভিত সাগর এবং বামভাগে দুই ক্ষুদ্র শৈলের মধ্যস্থলে নিহিত এক উপত্যকা দেখাইয়া দিল। আমি আশ্রয়ের নিমিত্ত দৌড়িয়া সেই উপত্যকার দিকে গমন করিলম এবং প্রবেশস্থানেই বজ্রের হৃদয়কম্পক গর্জন শ্রবণ করিলাম। ইহার দুই পার্শ্বে পাহাড় ও মধ্যভাগে প্রকাণ্ডাকার বৃক্ষমণ্ডলীদ্বারা আচ্ছন্ন। যদিও ঝড় ভীষণ গর্জন পূর্ব্বক তাহাদিগের শিবোভাগ নত করিতেছিল তথাপি তাহাদের স্কন্ধদেশ পার্শ্ববর্ত্তী পাষাণের মত অচল ছিল। এই প্রাচীন বনান্ত বিশ্রামস্থান বোধ হইল, কিন্তু তাহার ভিতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। ইহার সীমায় নানা লতা উদ্ভুত হইযা বৃক্ষস্কন্ধে জড়াইয়া এক প্রকার লতাদুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিল। আমি অতি কষ্টে তাহাদিগেব বন্ধন পৃথক্ করিয়া প্রবেশ করিলাম এবং ভাবিলাম ঝড হইতে রক্ষা হইল। কিন্তু এই সময় মহাবেগে বৃষ্টি পড়িয়া আমার চারিদিকে অসংখ্য স্রোত বহাইয়া দিল। আমি এই বিপদে একটি আলোক এবং উপত্যকাব অতি সংকীর্ণভাগে বৃক্ষতলে অধিষ্ঠাপিত এক কুটীর দর্শন করিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ধাবমান হইয়া দ্বাবে আঘাত করিবামাত্র এক সৌম্যাকার পলিতকেশ পুরুষ কপাট খুলিয়া দিল। আমি আপনাকে আশ্রয়ার্থী [৫৪] অতিথি বলিয়া বিজ্ঞাপন করাতে সে আমাকে কুটীরের মধ্যবর্ত্তী এক মাদুরে উপবেশন করাইয়া আমার সম্মুখে আম, যাম, আতা এবং নারিকেল জল ও চিনিতে পরিপক্ক এক শরাব ভাত আনিযা দিল। পরে আপনি এক যুবতী অবলার কাছে যাইয়া বসিল।

আমার এক্ষণে সমুদয় আশঙ্কা অপগত হইল। কুটীরখানি পাষাণের ন্যায অচল হইয়া ছিল। ইহা অতি সংকীর্ণভাবে এক বটবৃক্ষতলে নির্ম্মিত ছিল। ইহার পত্রোচ্চয় এরূপ ঘন, যে একবিন্দু বৃষ্টিও তাহা ভেদ করিতে পারে নাই। যদিও ঝড় ভয়ঙ্কর রূপ গর্জন করিতে লাগিল এবং বজ্র কর্ণকঠোর স্তনিতের সহিত আমার উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছিল, তথাপি কুটীর মধ্যের ধূম বা প্রদীপ কিঞ্চিন্মাত্র চঞ্চল হয় নাই। বৃদ্ধ অনির্ব্বচনীয় স্নেহের সহিত সেই যুবতীর প্রতি চাহিতেছিল। সে বসিয়া গলায় পরিবার নিমিত্ত পদ্মবীজের মালা গাঁথিতেছিল। একটি বৃদ্ধ কুকুর ও তাদৃশ একটি মার্জার জাজ্জ্বল্যমান বহ্নির নিকট শুইয়া ছিল। কুকুর এক একবার চক্ষু চাহিয়া তাহার প্রভুর প্রতি দৃষ্টিপাত ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল। আমার আহাব সমাপ্ত

হইলে বৃদ্ধ যুবতীর প্রতি সংকেত করিবামাত্র সে আমার সম্মুখে এক নারিকেলের খোল রাখিয়া তাহাতে লেবুর রস, ইক্ষুরস ও জলে নির্ম্মিত এক পানীয় ঢালিয়া দিল। আমি সানন্দ চিত্তে পান করিয়া শরীর শীতল করিলাম। পরে বৃদ্ধ আমার কাছে বসিয়া কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় যাইব, কি জানি, [৫৫] কি ব্যবসায় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিল। আমি সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সে বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে কহিল, "তোমার এত অল্প বয়সে ঈদৃশ লীলা হইয়াছে। আমার আখ্যান একরূপ আশ্চর্য্য নহে, বোধ করি শুনিতে অকৌতুক হইবে না।" আমি অতিশয় অনুরোধ পূর্ব্বক আগ্রহ প্রকাশ করিলে এইরূপে আপনার বৃত্তান্ত কহিল।

"তুমি বাঙ্গালি, অতএব মালবারের সামাজিক ব্যবস্থা সম্যক্ অবগত নহ। তথায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সাত জাতি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধম জাতির নাম পরিয়া। পরিয়ারা বিশুদ্ধ জাতির নয়নগোচর হইলে নিহত হয়। বিশুদ্ধ জাতিরা তাহার দর্শন পর্য্যন্ত একরূপ অপবিত্রতাজনক বোধ করে। আমি এই পরিয়া জাতির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলাম। আমার সমুদয় সংসারই শত্রু ছিল। আমি প্রথমে এইরূপ ভাবিতাম "যদি সকলেই তোমার শত্রু হয়, তবে আপনি আপনার বন্ধু হও। তোমার বিপদ্ এমন গুরুতর নহে, যে তোমার বল তাহা সহ্য করিতে পারে না। বৃষ্টি যত কেন মুষলধার হউক না, এক ক্ষুদ্র পক্ষীর গাত্রে একেবারে দুই এক বিন্দুর অধিক লাগে না।" আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আহারান্বেষণে বনে বনে ও নদীর ধারে ধারে ফিরিতাম, কিন্তু প্রায়ই আরণ্যফল ব্যতীত আর কিছু পাইতাম না এবং সর্ব্বদাই শ্বাপদের ভয়ে শঙ্কিত থাকিতাম। আমি ইহাতে নিশ্চয় করিলাম, যে প্রকৃতি একাকী মানুষের নিমিত্ত কিছু দেন নাই অতএব যে সমাজ আমাকে ঘৃণা করে, তাহারই ভিতর থাকিতে হইবে। [৫৬] এইরূপ স্থির করিয়া, ভারতবর্ষে যে সকল পরিত্যক্ত ক্ষেত্র আছে, যাহাদের প্রভুরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক যাহা কিছু পাইতাম ভক্ষণ করিতাম। এই ভাবে আমি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। যদি কখন কোন প্রয়োজনীয় বৃক্ষের বীজ পাইতাম, তবে এই ভাবিয়া রোপণ করিতাম যে আমার না হউক, অন্যের উপকার হইবে। আমার এই অবস্থায় অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইল। আমার নগর দেখিবার নিমিত্ত বড় অভিলাষ ছিল। আমি দূর হইতে নগরের প্রাকার, উচ্চ অট্টালিকা, নিম্নস্থ নদীতে অগণনীয় পোতশ্রেণী, রাজমার্গে সার্থ বণিক্‌দল এই সকল দেখিতাম। আমি দেখিতাম পৃথিবীর সর্ব্বভাগ হইতে পণ্য আনীত হইতেছে, বিভিন্ন রাজ্যের দূতেরা সাহায্য প্রার্থনার্থে আসিয়াছে, এবং সৈনিকেরা কার্য্যকালে অতিদূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে উপনীত হইতেছে। যত সাধ্য, আমি নগরের নিকটে যাইয়া বিস্ময় সহকারে পর্য্যটকবর্গের পদোদ্ধূত ধূলিস্তম্ভ দর্শন করিতাম এবং উপকূলে সাগরতরঙ্গের আঘাত সদৃশ গোলমাল শ্রবণ করিয়া তথায় যাইবার নিমিত্ত অতিশয় উৎসুক হইতাম। কিন্তু অপবিত্র জাতি বলিয়া প্রবেশের অনুমতি ছিল না। তখন আপনাআপনি কহিতাম, একরূপে বিভিন্নাবস্থ লোকে বা যে স্থানে আপনাদিগের শ্রম, ধন, ও আমোদ সংযুক্ত

করিয়াছে, নিঃসংশয় সে স্থান অতি বমণীয। দিবাভাগে যাইবার অনুমতি নাই বটে, কিন্তু রাত্রে আমাকে কে নিষেধ করবে? নিরুপায মূষিক যাহার কত শত্রু আছে, সে অন্ধকারের আবরণে যথাইচ্ছা গমন করে, সে ভিক্ষুব কুটীর [৫৭] হইতে রাজার প্রাসাদে গমন করে। যদি তাবালোকেই সুখে জীবনক্ষেপ হয়, তবে আমার সূর্য্যালোকের প্রয়োজন কি? দিল্লীব সন্নিধানে আমি এইরূপ ভাবিযাছিলাম। আমার বাত্রে নগর প্রবেশ করিবার সাহস হইল। আমি লাহোব গেট্ দ্বাবা প্রবেশ করিলাম। প্রথমে একনির্জন নগরমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, দুই ধারে বণিক্‌দিগের দোকান। স্থানে স্থানে দৃঢ়রূপে আবৃত সরাই এবং গভীব স্তব্ধীভাবেব আস্পদ বাজার বহিয়াছে। আমি নগরগর্ভে অগ্রসর হইয়া যমুনাকূলবর্ত্তী, প্রাসাদ ও উদ্যানে পবিপূর্ণ ওমবাদিগের পল্লী দর্শন কবিলাম। এই ভাগ নানা বাদ্যধ্বনি ও বাইদিগেব সংগীতে শব্দময় হইয়া ছিল। বাইবা মশালেব আলোকে নদীকূলে নৃত্য কবিতেছিল। আমি এই মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতে এক উদ্যানতোরণে দাঁড়াইবামাত্র দাসেরা দরিদ্র বলিয়া যষ্টিদ্বারা তাড়াইয়া দিল। আমি ওমরাপল্লী ত্যাগ করিয় অনেক পাগোদার সমীপ দিয়া চলিয়া গেলাম। এই সকল পাগোদরে কতকগুলো দুর্ভাগ্য লোক প্রণিপাত ও রোদন কবিতেছিল। আরও কিঞ্চিৎদ্দূরে মোল্লাদিগেব সময় নিবেদনের চীৎকার শুনিয়া মসজীদেব নিকট আসিযাছি বুঝিলাম। এই স্থানে ইউরোপীয়দিগের ধ্বজযুক্ত কুঠী ছিল। তথা হইতে অনববত ''খববদাব খববদার'' করিতেছিল। আমি পরে আব একটি অট্টালিকার নিকট দিযা যাইবাব সময় শৃঙ্খলের ঝন্ ঝন্ শব্দ ও আর্ত্তবব শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম, যে কাবাগাব। আমি চিকিৎসালয় হইতে দুঃখেব ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। তথা হইতে গাড়িপোবা শব নির্গত হইতেছিল। [৫৮] পথে দেখিলাম, চোরেরা দৌড়িয়া পালাইতেছে ও চৌকীদারেবা অনুসরণ করিতেছে। ভিক্ষুদল বাবম্বাব আঘাত খাইয়াও বড়মানুষের দ্বারে উচ্ছিষ্টের নিমিত্ত ভিক্ষা করিতেছে। যাহারা উপজীবিকার্থ অসতী হইয়াছে, এমন স্ত্রীলোকও অনেক দেখিলাম। পরিশেষে এক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। তাহার মধ্যস্থলে বাদশাহের প্রাসাদ। প্রাঙ্গণের চারিধারে নবাবদিগের তাঁবু ছিল। প্রত্যেকের পৃথক্ প্রকার মশাল, নিশান ও চামরযুক্ত বৃহদাকার যষ্টি। দুর্গটী এক পরিখায় বেষ্টিত ও গোলন্দাজ সৈন্যে রক্ষিত। চারিদিকে বাতি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে দেখিলাম, প্রাসাদের চূড়া মেঘস্পর্শী হইয়াছে। আমার প্রবেশ করিতে ইচ্ছা থাকিলেও চারিদিকে যে সকল কোঁড়া ঝুলিতেছিল, তাহা দেখিয়াই প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি কয়েক জন কাফ্‌রি দাসের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সেব্যমান বহ্নিতে শীতঘনীকৃত আপনার অঙ্গকে পুনরুষ্ণ করিলাম।

পরদিন সমাধিস্থানে যাইয়া দিনাতিপাত করিলাম। তথায় প্রেতদিগকে দত্ত আহারের উপযোগ দ্বারা ক্ষুধা শান্তি হইল। আমি ভাবিলাম, জীবিতেরা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের কুসংস্কারের সাহায্য পাইয়া প্রতিপালিত হইতেছি। আমি এই ভাবে প্রতি দিন দিবাভাগ মৃত্যুর নিবেশে ও বজনী পুরমধ্যে ভ্রমণপূর্ব্বক ক্ষেপণ করিতে লাগিলাম। এক দিন এক ব্রাহ্মণী আপনার মৃত

স্বামীব সহগমনার্থ সজ্জিত হইযা কোন [৫৯] আচাব নিষ্পন্ন কবিতে সেই সমাধিস্থানে দেখা দিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইযা সহগমন রূপ দুর্ব্যবসায হইতে নিবৃত্ত কবিলাম এবং তাঁহার বন্ধুবর্গেব মনে "তিনি ডুবিযা গিযাছেন" এই বিশ্বাস উৎপাদনার্থে তাঁহাব অবগুণ্ঠন নদীজলে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে লইযা এই দেশে উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের প্রণযেব ফলস্বরূপ একদুহিতা জন্মগ্রহণ কবিয়া আমাদিগেব অন্তঃকবণেব আনন্দগ্রন্থিস্বরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু ওঃ' বেদনা যেন উন্মীলিত হইতেছে' এই শূন্য কুসংস্কারময় জগতে যে কেবল আমাকে ভাল বাসিত, তাহাব নয়নানন্দ মূর্ত্তি এক ক্রূর মকবদ্বাবা পৃথিবী হইতে অপনীত হইল, এই বলিযা পবিযা নিজ দুহিতাব উৎসঙ্গে পলিত শীর্ষ ক্ষেপপূর্ব্বক বাবম্বাব তাহাব প্রতি সস্নেহ নযনে চাহিযা মূর্ছিত হইল। মুখে শীতল পানীয চর্চ্চা কবিলে পুনরুজ্জীবিত হইল। কহিল যৎকালে আমাব এই হৃদযবত্ন শৈশব দশায় বর্ত্তমান ছিল এবং প্রিয়তমা সহধর্ম্মচাবিণী জীবিত ছিল, সেই কালে একজন সাহেব জগন্নাথের পণ্ডিতেব নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময এই স্থানে আশ্রয গ্রহণ করিয়াছিল। আহা, সে আমাব সুখে কত মমতা প্রকাশ কবিতে লাগিল এবং আমার সারল্যেব কত প্রশংসা কবিল। কিন্তু হায, সে জানিতেছে না যে আমাব সংসারেব প্রায সমুদয় প্রলোভন অপগত হইয়াছে, কেবল এই পীযূষদর্শনা দুহিতা আমাকে অদ্যাপি জীবনে অভিলাষী রাখিযাছে। হায, আমাব দেহ নির্জীব হইল [৬০] এই বিস্তীর্ণ অর্ণবাম্ববায় কে বৎসাব ভাব গ্রহণ কবিবে। আমবা এমন অধম জাতি, যে এই দেশে ইহাব কাহাকেও বক্ষিতা কবিবাব উপায নাই। হা, যদি সহসা আমাব অভদ্র ঘটিয়া উঠে, বৎসে তোর দুর্দশায় কে দৃষ্টিপাত কবিবে, হে পরমেশ্বর এবম্বিধ জীবনগণকে সৃষ্টি করিয়া যে তোমাব কি গূঢ় অভিপ্রায সিদ্ধ হইতেছে মানুষ কি তাহা কখন জানিতে পারিবে না, কেবল অন্ধকাবে পদে পদে স্খলিত হইযা আপনাব কৌতুক ভবে বিদীর্ণ হইবে। ইহা বলিযা দুই পিতা দুহিতায অশ্রুপাত কবিতে লাগিল। আমি বৃদ্ধেব এই আখ্যান শ্রবণ ও স্বচক্ষে তাহার মনোযাতনা নিরীক্ষণ কবিযা সাতিশয ক্ষুব্ধ হইলাম। গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল তাহার সাবল্য, সাধুতা ও দুর্ভাগ্য ভাবিতে ভাবিতে আমাব অন্তঃকবণ আর্দ্র হইল। আমি কহিলাম, "তাত, তুমি আমাব সম্বোধনে বিস্ফারিত নযন হইও না। আমি এই অবলার রক্ষিতা হইযা চিবকাল তোমাকে এই সম্বোধন কবিব। যদি আমাব স্থিরতার প্রতি কোন সংশয হয, যদি তোমাব এরূপ মনে হয, যে আমি রিপুবিশেষেব পরবশ হইযা তোমাব মহার্ঘ্য নিধি, বার্দ্ধক্যেব অবলম্বন, ও জীবনেব সারকে বিনিপাত কুহবে ফেলিবাব চেষ্টা কবিতেছি, তবে হে পরমেশ্বব, তুমি সাক্ষীস্বরূপ হইয়া মনের অন্ধকার দূর কর, তোমাব নয়ন মহীয়ান্ তারামণ্ডল দেখিতে পায, অণু সদৃশ সূক্ষ্ম, বায়ু অপেক্ষাও দ্রুতগামী মানবচিত্তেও তাহার সেই রূপ প্রসাব আছে। তোমাব ইহা অগোচব নাই, যে আমাব এই [৬১] বাক্য মাযিক কি প্রকৃত। আমি তোমার এই গরীয়ান্ কৃতি বিশ্বমন্ডলেব পবিত্র নাম লইয়া শপথ—আমি আবও বলিতেছিলাম, কিন্তু পরিয়া সাতিশয় আগ্রহ সহকাবে "বৎস, বিরত হও, আমি তোমার

অমায়িকতা বিষয়ে কণামাত্র সন্দিহান নহি'' এই বলিয়া দুহিতার অঙ্গুলি আমাব মুখে অর্পণ কবিয়া অবশিষ্ট বাক্যেব উচ্চারণ বিনিবাবিত কবিল। আমি অকৃত্রিম প্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক অবলার করধারণ করিলাম এবং কহিলাম, ''তাত, আমি তোমার উপদেশপূর্ণ চরিত্র হইতে শান্তিসুখ শিক্ষা কবিলাম। আমাব এখন সংসারেব চাকচিক্যময পদার্থে অসারতা বোধ হইল। আমি এরূপ মূঢ় ও উদ্ভ্রান্ত ছিলাম যে, যে বিশ্বে প্রত্যেক বজ্র বৃষভসদৃশ গর্জ্জিত দ্বারা সর্ব্বস্রষ্টার নাম উচ্চারণ করিতেছে, যথায় চকোব চন্দ্রেব প্রতি চাহিয়া সেই নাম বুঝাইয়া দিতেছে এবং চন্দ্র আবাব সুধাময় কিরণদ্বারা চকোবেব নয়নে সেই নাম লিখিয়া দিতেছে, এমন বিশ্বে থাকিয়াও সেই সর্ব্বস্রষ্টাকে জানিতে পারি নাই। কিন্তু আমি এখন তোমার ভক্তি হইতে তাহা শিক্ষা করিলাম, এবং তাঁহার করুণার অসীমতা জানিয়া আমার কিছুমাত্র নিরাশতা নাই। আমি সে পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তোমার দুহিতার এই পাণিগ্রহণ করিলাম। ইহা জীবন থাকিতে পবিত্যাগ করিব না।'' পরিয়া মহাহ্লাদে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। আমি পরিয়াদুহিতার পাণিব সহিত মানসেরও অধিকারী হইয়াছি।

[৬২] এক্ষণে আমার শ্বশুর লোকান্তবিত হইযাছে। আমি তাহাব দেহ সমাহিত করিয়া স্থানের পরিচয়ার্থ মল্লিকার চারা বসাইযা দিযাছি। সেই স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদ আপনাদিগের অঙ্ক রাখিয়া যায় এবং সূর্য্যেব অবিজ্ঞাত হস্ত তাহাব উপরে পুষ্প বর্ষণ করে। আমার এখন সন্তোষরত্নের অধিগম হইযাছে। আমাব এখন বাজ্যলাভেব অভিলাষ নাই, দেশে দিগন্তবিস্তারী প্রখ্যাতি করিবারও ইচ্ছা হয় নাই। আমি সংসারের দুশ্চিন্তা, জনসমাজের অসূয়া, সংহারক সমবের দুর্বার্ত্তা হইতে দূরতর থাকিয়া শনৈঃ শনৈঃ সেই বিধাতার সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছি এবং এক দিন অবশ্যই সেই সাধারণ বিশ্রাম গৃহে শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রা যাইব।

সমাপ্ত

স্বর্ণলতা

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে কোন গ্রামে চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠেব নাম শশিভূষণ ও কনিষ্ঠেব নাম বিধুভূষণ।

বিধুভূষণের বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর তখন তাঁহাব পিতাব মৃত্যু হয়, এজন্য তিনি তাঁহার মাতার বড় স্নেহেব পাত্র ছিলেন। তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহা অপেক্ষা সাত আট বৎসরেব বড় ছিলেন। সুতরাং শশিভূষণ যৎকালে বিদ্যাভ্যাস কবিতেন, তখন বিধুভূষণ কেবল খেলা কবিয়া কাল কাটাইতেন।

শশিভূষণ যেমন বয়সে বড় তেমনি বুদ্ধিতেও তদীয় ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই তিনি পাঠশালায় লেখাপড়া সমাপ্ত কবিয়া ঐ গ্রামেব জমিদারের সরকারে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনেব একটি কর্ম পাইয়াছিলেন। জমিদারের সরকারে কার্যের বেতন নামমাত্র। বোধ হয়, বেতন না থাকিলেও অনেকে জমিদারের সরকারে কর্ম করিতে অসম্মত হন না। ফলতঃ শশিভূষণের বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া উঠিলেন।

শশিভূষণের চাকরি ও বিধুভূষণেব বিদ্যাবস্ত এক সময়েই হইয়াছিল। ভালবাসা কখনই অপ্রতিশোধিত থাকে না। হয়, যে তোমাকে ভালবাসে তুমি তাহাকে ভালবাসিবে, নতুবা তাহাকে ঘৃণা কবিবে। অন্যান্য বিষয়ে নানাবিধ প্রতিশোধ আছে, কিন্তু ভালবাসার প্রতিশোধ এই দুইটি মাত্র। এ দুয়েব মাঝামাঝি আর কিছুই নাই। বিধুভূষণেব মাতা বিধুকে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতেন, মা সরস্বতীও যে, তাঁহার উপর কুপিত ছিলেন এরূপ বলা যায় না। কারণ, প্রথম প্রথম অনেকেই বলিয়াছিল, বিধু ভাল লেখাপড়া শিখিবে, কিন্তু শিখিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। বিধুভূষণ পার্থিব মাতার ভালবাসা, ভালবাসার দ্বারা পরিশোধ করিতেন, কিন্তু মা সরস্বতীর যে কিঞ্চিৎ ভালবাসা ছিল, তাহা ঘৃণার দ্বারা পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মা সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সমর উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে প্রথমতঃ গুরুমহাশয় পবে প্রতিবাসিবর্গ একে একে সকলেই বিধুভূষণের সহিত মা সরস্বতীব সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বিধুভূষণকে যতই তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন, বিধুর ততই আমোদ-প্রমোদে অনুরক্তি ও বিদ্যাভাসে বিরক্তি জন্মিতে লাগিল। মূর্খতাবশতঃ কখনও কুলীনের বিবাহ বন্ধ থাকে না। এজন্য ১৫ বৎসর বয়সের সময়েই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পরে বউও ঘরে এলেন, এদিকে মা সবস্বতীও চিরকালের জন্য বিদায় লইলেন।

বিধুর বিবাহের পর তাঁহার মাতা পাঁচ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। এ পাঁচ বৎসরের মধ্যে শশিভূষণের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ও বিধুভূষণের একটি ছেলের জন্ম

ভিন্ন, এ স্থানে উল্লেখের যোগ্য আর কোন ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই। এজন্য আমরা এইখানেই এ অধ্যায়ের শেষ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনোহারীর দোকান

গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভাবতচন্দ্র বায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন; এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পবলোকেব বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানেব অন্তঃপুব বঙ্কিমবাবুই বা কিরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া ওস্‌মান ও আযেশাব কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? ইহা ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আবও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন। বিষ্ণুশর্মা তো একেবারে বোবা হইতেন। কিন্তু এই শক্তিটি ছিল বলিযাই, লঘুপতনক ন্যায় শাস্ত্রের বিচার কবিতেছে এবং চিত্রগ্রীব অবোধ কপোতদিগকে উপদেশ দিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিমবাবু আড়াই শত বৎসর পূর্বে এক যবনতনযার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপিয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন। এ কথা আমাদিগের বলিবার প্রযোজন এই যে, এই গ্রন্থে উত্তরোত্তব যে সকল বিষয়ে বর্ণনা কবিব তাহা, হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগেব পার্থিব কর্ণ অপেক্ষা সহস্র সহস্র কর্ণ ও চর্মচক্ষুর অগোচর হইলেও ভ্রমূলক নহে। আমবা আপনাদিগেব অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ দেখিতে ও শুনিতে পাই। অতএব সে সমুদয অবিশ্বাস করিবেন না।

এ অধ্যায়টি পাঠ করিবার সময পাঠকবর্গকে বুঝিযা লইতে হইবে যে, শশী ও বিধুভূষণেব মাতার কাল হওযা অবধি চারি পাঁচ বৎসব অতিবাহিত হইযা গিয়াছে; এবং বালক-বালিকাগুলিও পাঁচ সাত বৎসবেব হইযাছে। এক্ষণে তাহারা দৌড়াদৌড়ি কবিয়া বেড়ায় ও ইচ্ছামত নানবিধ পুতুল গড়াইযা খেলা করে। দাস-দাসীব সঙ্গে হাটে বাজাবে যায়; এবং প্রয়োজনমত পাড়ার অন্যান্য বালক-বালিকাদিগেব সহিত দ্বন্দ্ব-বিবাদাদিও করিয়া থাকে।

যতদিন শশিভূষণ ও বিধুভূষণের মাতা জীবিত ছিলেন, ততদিন দুটি ভাইতে যৎপবোনাস্তি সদ্ভাব ছিল। ছোটটির, বড়টির প্রতি হিংসা ছিল না, বড়টিও ছোটটির প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদিগেব মাতাব পরলোকগমনের পর শশিভূষণেব স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্টরূপে বুঝাইযা দিলেন যে, এক সংসারে আব অধিক কাল থাকা আয-ব্যয় সম্বন্ধে সুবিধার বিষয় নহে। শশিভূষণ তথাচ হঠাৎ কোন অসদ্ভাব প্রকাশ কবেন নাই। হাজার হউক, তবু দুই ভাই। উভয়েই এক মায়েব গর্ভে জন্মিয়াছেন, এক মায়ের স্তন্য

পান করিয়াছেন, এক মায়ের ক্রোড়ে পরিবর্ধিত হইয়াছেন। সহস্র বিবাদ হইলেও একজন আর একজনেব প্রতি একেবারে স্নেহ শূন্য হয না। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রীদিগেব মধ্যে তো আব যে রক্তের টান নাই। মাঝে মাঝে তাঁহাদিগেব মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু স্বামীর পোষকতা কেহই পান না, এজন্য এ পর্যন্ত গৃহবিচ্ছেদ ঘটে নাই।

সকলে এই ভাবে অবস্থিত, এমন সময়ে এক দিবস বৈকালে নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ দোকান লইয়া একজন মনোহারী ঐ পাড়ায় আসিযা উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে পাডাব যাবতীয় ছেলেপিলে ও বউ-ঝি তথায় একত্র হইল। কেহ কেহ কিনিতে লাগিল, কেহ কেহ (অর্থাৎ যাহাদের পযসাব অপ্রতুল তাহাবা) জিনিসেব দর জানিয়া চলিযা যাইতে লাগিল। যে সকল ছেলেপিলে খেলনা পাইল, তাহাবা আহ্লাদে নৃত্য আবম্ভ কবিল। যাহারা কিছু পাইল না তাহাবা কান্না ধবিল। প্রমদা (শশীব স্ত্রী) নিজেব মেয়েকে ও ছেলেটিকে একটি বাঁশি কিনিয়া দিলেন, কিন্তু বিধুব ছেলের জন্য কিছু কিনিলেন না। সবলাও (বিধুর স্ত্রী) সেইখানে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট পয়সা ছিল না বলিয়া পুত্রের জন্য কিছু কিনিতে পারিলেন না। তাঁহাব পুত্রও তৎকালে সে স্থানে ছিল না। এজন্য সবলা ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় দূব হইতে 'মা, মা' করিযা গোপাল আসিয়া কহিতে লাগিল,—''মা ওখানে কি, চল আমবা গিয়ে দেখি।''

সরলা কহিলেন, ''ওখানে সব ঝগড়া কবছে। আমবা ওখানে যাব না, গেলে আমাদের মারবে।''

''কেমন কবে ঝগড়া কচ্ছে, কে মাববে আমি দেখব।''

''না, দেখতে নেই: চল আমরা শীগ্‌গিব পালাই।''

''না, আমি যাব।''

প্রমদা, সরলা ও তদীয় পুত্রকে তদবস্থ দেখিযা , তাঁহাব পুত্র কন্যাকে বলিলেন, ''যা না বিপিন, এখানে কি করিস, যা গোপালকে তোর কেমন বাঁশী হয়েছে দেখাগে। যা কামিনী, তুইও যা।''

মাতৃআজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র উভয়ে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গোপালের কাছে আসিযা উপস্থিত হইল। গোপাল তদ্দর্শনে, ''আমায একটা'' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরলা বলিলেন, ''আজ আর নেই, কাল যখন নিয়ে আসবে তখন তোবে একটা দেব।''

গোপাল ''না আছে, আজই দিতে হবে'' বলিযা ক্রন্দন ও মাতাব অঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল।

সরলা কি করেন, অগত্যা মনোহারীর দোকানেব নিকট গমন করিলেন।

গোপাল দোকান দেখিবামাত্রই একটি বাঁশী লইয়া যেখানে বিপিন ও কামিনী খেলিতেছিল, সেইখানে চলিয়া গেল। সরলার নিকট একটিও পয়সা ছিল না, এজন্য তিনি প্রমদাকে কহিলেন—

"দিদি, একটা পয়সা ধাব দেবে?"

দিদি অন্য সময়ে তিন ক্রোশের কথা শুনিতে পান, ঘরের দেয়ালে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া অভ্যন্তরস্থ শিশুর স্বপ্নের কথা বলিয়া দিতে পারেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সরলা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিতে পাইলেন না। সরলা এজন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি একটা পয়সা ধার দেবে?"

দিদি যেন সে দেশেও নাই।

সরলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। এবার কাছে একজন দাঁড়াইয়াছিল; সে কহিল, "শুনতে পাও না, ছোট বউ কি বলছে, উওর দাও না?"

অনেকক্ষণ নিদ্রার পর জাগ্রত হইলে যেমন চেহাবা হয়, প্রমদা তেমনি মুখভঙ্গী করিয়া, এক চক্ষু দ্বারা সরলার পানে তাকাইযা কহিলেন—"কি, কি বলছ?"

সরলা কহিলেন, "একটা পয়সা ধার দিতে পাব দিদি?"

প্রমদা। দিদি তো মহাজন নয় যে ধার দেবে?

"যদি ধার না দাও তো গোপালকে এই বাঁশীটা কিনে দাও।"

প্রমদা। আমি তো আর কল্পতরু হয়ে বসি নি যে, যে যা চাবে তাই দেব।

সরলা কহিলেন, "এ তো তোমাব দান কবা হচ্ছে না। গোপাল তোমাব পর নয়। যেমন বিপিন, কামিনী, তেমনি গোপালও তোমার একটি মনে কব না কেন?"

"লোকে যা মনে করে, তাই যদি হত, তবে কি আব দুঃখ থাকত? আমি যদি মনে কল্লেই রাজরানী হতে পাত্তাম, তা হলে কি আব আমি এমন করে বেড়াই?"

সরলা প্রমদার এই সুমধুর বাক্য শ্রবণ কবিযা অধোবদন হইয়া রহিলেন।

প্রমদা বলিতে লাগিলেন, "কেমনই পৃথিবীব লোক, এদের যতই দাও, ততই এদের আশা বৃদ্ধি হয়। আমার যাহা মাসে মাসে আসে, আমি যদি তা রেখে চলতে পাবতাম, তবে আমার ভাবনা কি? কিন্তু তা তো হবার জো নাই। একজন মাথায় মোট কবে আনবে, আর পাঁচজন তাই ঘরে বসে উড়াবে। উনি যে বোকা, কিছুই বুঝেন না। ওঁর বুদ্ধি যদি থাকত তা হাল কি আজও ওঁব খেটে খেটে মাথার ঘাম পায়ে পড়ত? এতদিন টাকার বস্তার উপর বসে থাকতেন?" প্রমদা আরও বলিতেন, কিন্তু তাঁর স্বামী বোকা এই দুঃখে একেবারে সহস্রধারে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

পাড়ার কোন কোন গিন্নী যাঁরা সময়ে সময়ে প্রমদা বড়ঘরের মেয়ে, কেমন শান্ত, কেমন সুন্দর মুখখানি, কেমন পটলচেরা চক্ষু দুটি, কেমন বাঁশীর মত নাকটি, ইত্যাদি সত্য কথা অপক্ষপাতে বলিয়া দরকারমত নুনটুকু তেলটুকু লইয়া যান, তাঁহাবা প্রমদার রোদনে একবারে গলিয়া গেলেন। কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, দুই এক জন সরলাকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। এক জন বেঁটে স্থূলকায় বিধবা ছিলেন। তাঁহার বিশেষ বাজিয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "ঠিক কথা বলব, তাব আর ভয় কি? সরলার বড় লম্বা কথা; প্রমদার সোয়ামী রোজগার করে, তবু প্রমদার মুখে একটু উচুঁ কথা কেহ শুনতে পায় না।"

একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিলে জঙ্গলের সব শৃগাল যেমন ডাকিয়া উঠে, তেমনি তথায় যত বিধবা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই দিগম্বরীর মতে মত দিয়া সরলার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কথার প্রসঙ্গে কথা উঠে। সবলাব কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিলেন। পরিশেষে স্থিব হইল যে, একেলে মেয়ে একটিও ভাল নয় (প্রমদা ছাড়া)। মানব-প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন বৃদ্ধেবা যদিও যুবকদিগকে 'ছেলেমানুষ' বলিয়া তুচ্ছ কবেন, তথাপি তাঁহারা পুনরায যুবা হইতে পাবিলে তিলার্ধও গৌণ কবিতেন না। ফলতঃ যৌবনকালের তুল্য কাল নাই। সকলেই যুবা হইবার নিমিত্ত শশব্যস্ত। বালকেরা কামাইয়া গোঁফ তোলে, বৃদ্ধেবা কলপ দিয়া চুল কালো কবে। তবে যে প্রাচীনেরা 'ছেলেমানুষ' এই কথাটি গালিস্বরূপ প্রযোগ কবেন, সেটি বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রকৃত ভাব নয়।

সরলা সজলনয়নে কিয়ৎক্ষণ অবাক হইযা বহিলেন। মনোহারী আর তথায অপেক্ষা করা বৃথা মনে করিয়া দোকান বাঁধিতে আবম্ভ কবিল। তদ্দর্শনে সরলা অধিকতর ভীতা হইলেন। এদিকে গোপাল কাছে নাই যে বাঁশীটি ফিরাইয়া দেন, অথচ মূল্যদানেরও শক্তি নাই। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে মনোহাবী গমনোন্মুখ হইল। দিগম্বরী, সেই বেঁটে স্থূলকায় বিধবাটি কহিলেন, ''তোমাব পযসা নে গেলে না?'' মনোহারী উত্তর করিল, ''আমি ও বাঁশীটিব দাম চাই না, অনেক ব্যাপাব করে থাকি, ভাল, একটা নয অমনি দিলাম।'' সবলা এই কথা শুনিযা পূর্বাপেক্ষাও অধিকতব দুঃখিত হইলেন। সুবুদ্ধি মনোহারী তাঁহার মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিয়া বুঝিতে পারিল বিনামূল্যে দানের কথা বলা ভাল হয় নাই। এজন্য পুনরায় কহিল, ''আমি তো প্রায়ই এ পাড়ায় আসি, এবার যে দিন আসব, সেই দিন পয়সা নিযে যাব।'' সরলা এই কথা শুনিয়া যারপরনাই শান্তি লাভ করিলেন। প্রমদা যারপরনাই দুঃখিতা হইলেন। আব উপস্থিত গিন্নিরা পরস্পবের মুখাবলোকন কবিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোনার গাছে মুক্তার ফল

সরলা মনোদুঃখে বাটী আসিলেন এবং নিয়মিত গৃহকর্ম সমাপন করিয়া বিরলে বসিয়া মনে মনে বৈকালের ঘটনার পর্যালোচনা কবিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেব বল-বুদ্ধি সমুদয়ই স্বামী, কিন্তু সরলার যে বল-বুদ্ধি না থাকাব মধ্যে। বিধুভূষণ সমস্ত দিনই পাড়ায় থাকিতেন। আহারের সময় কেবল বাটীতে পদার্পণ করিতেন। গৃহকার্য দেখিতেন না; এক পয়সা উপার্জনের ক্ষমতা ছিল না। গীত, বাদ্য এবং তাস-পাশাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। কিন্তু তিনি যৎপরোনাস্তি ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। দাদার সহিত বিবাদ করা আর পিতার সহিত বিবাদ করা, তিনি এক কথাই মনে করিতেন। লেখাপড়া

দ্বাবা যাহাদের স্বভাব পরিমার্জিত হয় নাই, তাহাবা অত্যন্ত রাগী হইয়া উঠে। বিধুরও এই দোষটি ছিল। তিনি সামান্য কারণে রাগ কবিতেন না বটে, কিন্তু একবাব কবিলে আর সে রাগ সহজে দূর হইত না।

সরলা ভাবিতে লাগিলেন, বৈকালের ঘটনা তাঁহাকে বলা কর্তব্য কি না। বলিলে যে কোন উপকার হইবে, তাহাব কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আবার মনেব দুঃখ ব্যক্ত না করিলেও চিত্তেব স্বচ্ছন্দতা জন্মে না। এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র সবলা অঞ্চল দ্বাবা চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুই কাঁদচিস্ কেন?"

সরলা কহিলেন, "কৈ কাঁদচি?"

"ঐ যে তোর চোক দিয়ে জল পড়ছে?"

সরলা কহিলেন, "আমার পেট ব্যথা কচ্চে।"

গোপাল উত্তর করিল, "আমাব পেট কামড়ালে শ্যামা যে ওষুদ দেহ, সেই ওষুদ খাস না কেন? যাই, আমি শ্যামাকে ডেকে দি, তাব ওষুদ খেলে সেবে যাবে।"

সরলা করিলেন, "না না, শ্যামাকে ডাকতে হবে না; আমার পেট ব্যাথা কচ্ছে না; আমাব চোকে কি পড়েছে, তাই চোক দিয়ে জল বেরুচ্চে।"

"তবে আয় তোর চোকে ফুঁ দিযে দি, তা হলে বেরিয়ে যাবে এখন।" এই বলিযা গোপাল নিকটে আসিল। সরলা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার মুখাবলোকন কবিতে লাগিলেন।

স্নেহেব কি অনির্বচনীয় গুণ! সরলা কাঁদিতেছিলেন কেন, গোপাল তাহাব কিছুমাত্র অবগত ছিল না, কিন্তু তাহাকে কাঁদিতে দেখিযা তাহাব চক্ষু দুইটিও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সরলা গোপালের ছলছল নেত্র নিরীক্ষণ কবিয়া সমুদয় দুঃখ বিস্মৃত হইলেন এবং তাহাকে কোলে লইয়া বাহিরে বেড়াইতে লাগিলেন। গোপাল মাতার স্কন্ধে শিবঃস্থাপন করিয়া চুপ করিযা বহিল। তদ্দর্শনে সবলা তাহাকে কথা কহাইবার জন্য চেষ্টা কবিতে লাগিলেন এবং তাহাকে হাসাইবার জন্য নিজেও হাসিতে লাগিলেন।

সুন্দবী যুবতীর সাশ্রুনয়নে হাসি যে একবার দেখিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পাবিবে না। সোনার গাছে মুক্তাফল, এর সহিত কি তুলনা হইতে পাবে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সোনার চন্দ্রহার

পিতামাতার সদ্‌গুণ সন্তানে সর্বদা বর্তে না বটে, কিন্তু তাহারা দোষের ভাগ সচবাচর সুদসমেত প্রাপ্ত হয়। পিতা পুত্র উভয়েই পণ্ডিত অতি বিরল, কিন্তু উভয়েই চোর একপ প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। প্রমদা তাহাব এক উদাহরণস্থল। তাঁহাব পিতার নাম রামদেব চক্রবর্তী। বাটী শশিভূষণের বাটীর অতি নিকটে। দ্বেষ, হিংসা, কলহপ্রিয়তা

ইত্যাদি কতকগুলি দোষ রামদেব চক্রবর্তীর বংশানুক্রমিক; তাঁহাব বংশেব কন্যা যে পরিবারে গিয়াছে, সেই পরিবারই দ্বন্দ্ব-কলহেব ভদ্রাসন হইয়াছে। প্রমদা এই পৈতৃক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাব পিতাব যে সরলতা একটি গুণ ছিল, তাহার লেশমাত্রও পান নাই। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। বিবাহ হওয়া অবধি প্রমদা দুটি একটি টাকাব মুখ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে যখন শাশুড়ীর মৃত্যুর পর গৃহের একমাত্র কর্ত্রী হইলেন, তখন তিনি আর পৃথিবীকে তৃণজ্ঞানও করিতেন না।

পূর্বে বলা গিয়াছে, বিধুভূষণ কোন কাজকর্ম করিতেন না। কিন্তু সরলাব নিকট হইতে প্রমদা তাহার বিলক্ষণরূপে ক্ষতিপূরণ কবিয়া লইতেন। প্রমদা নিজ গৃহ হইতে কখনই বাহির হইতেন না। রন্ধনাদি এবং গৃহকার্য সমুদয়ই সরলাকে কবিতে হইত। যদি কেহ কখনও এ বিষয় লইয়া প্রমদাকে কিছু বলিত, প্রমদা অমনি বলিতেন, ‘‘কি বা কাজ, যে তা নিয়ে এত কথা হয়, আমার যদি ব্যামো না থাকত, তা হলে এ কাজ দেখতে দেখতে করে ফেলতে পারতাম।’’ প্রমদা যখন তখন এই পীড়ার কথা কহিতেন। পীড়া কি, তাহা বলা দুঃসাধ্য। কারণ সে পীড়াবশতঃ প্রমদাকে একদিনও উপবাস করিতে দেখা যায় নাই, শরীর কখন ক্ষীণ হয় নাই, বরঞ্চ উত্তরোত্তব পুষ্টি দেখা যাইত। পীড়াটির এই এক লক্ষণমাত্র জানা আছে যে, সকালে সকালে আহাব না হইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত। পাঠকবর্গ এখন বুঝুন, এ কোন্ পীড়া।

বৈকালে মনোহারীর দ্রব্যাদি লইয়া প্রমদা ও সরলাব যে কথোপকথন হয়, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সরলা বাটী আসিয়া যাহা কবিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। অতঃপর প্রমদা কি করিলেন, শ্রবণ করুন।

স্বভাবতঃ যেরূপ পদধ্বনি করিয়া থাকেন, তদপেক্ষা দশগুণ অধিক শব্দ করিয়া প্রমদা নিজগৃহে প্রবেশপূর্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন কবিলেন। বাটীব লোকে সেই শব্দ শুনিয়া স্থির করিল, আজ একটা বিভ্রাট ঘটিবে।

প্রমদার বাক্যগুলি এমন মিষ্ট যে, একবার শুনিলে আর কেহ তাহা দুইবাব শুনিতে ইচ্ছা করিত না সুতরাং কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কেহ অগ্রসর হইল না।

বিপিন পাঠশালা হইতে বাটী আসিয়া মাতার নিকট যাইতেছিল, কিন্তু দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া গেল। কামিনী ‘মা, মা’ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমদা তথাপি উত্তর দিলেন না।

বাটীর দাস-দাসী, কর্তাও গৃহিণীরই বশীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু শশিভূষণেব বাটিতে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল না। শ্যামা প্রমদাকে যত ভক্তি না করিত, সরলাকে তদপেক্ষা অধিক ভক্তি করিত; তাহার কারণ উভয়কেই সমান তিরস্কার খাইতে হইত। এজন্য উভয়ের মধ্যে মিত্রতা হইয়াছিল। সরলাকে তিরস্কার করিলে শ্যামার চক্ষে জল আসিত। শ্যামাকে তিরস্কার করিলে সরলা অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না। শ্যামার এক বিশেষ গুণ ছিল যে, যে যেখানে পরামর্শ করুক না কেন, শ্যামা তাহা শুনিতে পাইত।

এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সর্বস্থানে যাইত যে, কেহই তাহা জানিতে পারিত না। কথাটি সমাপ্ত হইলেই তথা হইতেই প্রস্থান করিয়া সরলার নিকট আসিয়া আনুপূর্বিক সমুদয় বর্ণনা করিত। সরলাও শ্যামার নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না।

সরলা শ্যামাকে মনোহারীর দোকান সম্বন্ধীয় সমুদয় বিবরণ কহিলেন। শ্যামা শুনিযা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে ঈষৎ হাস্য কবিযা কহিল, ''আজ আর একখানা গহনা হবে।''

ক্রমে দিবা অবসান হইল। শশিভূষণেব বাটী আসিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া, শ্যামা নিয়মিত জলগাডুটি, গামছাখান, ও খড়মজোড়া বারান্দায় রাখিল এবং ঠাকুরঘবে আহ্নিকের জায়গা কবিযা দিল। সরলার চিত্তে নানাবিধ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রমদা শয্যোপরি শয়ন করিয়া ফোঁস ফোঁসস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন। নেত্রাসার বর্ষণ হইতে লাগিল। পাড়া হইতে খেলা করিয়া বিপিন আসিয়া 'মা-মা' করিতে লাগিল। কামিনী কান্না ধবিল। এমন সময় শশিভূষণ বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

প্রত্যহ যেরূপ প্রথমতঃ নিজগৃহে যাইতেন, অদ্যও শশিভূষণ সেইরূপ যাওযাতে গৃহদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দ্বাবে আঘাত করিলেন। কিন্তু কোন উত্তব না পাইযা 'ঘবে কে আছে' বলিয়া বারংবাব ডাকিতে লাগিলেন, তথাপি কোন উত্তব পাইলেন না। পবিশেষে শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ''শ্যামা, এরা কোথায গিযাছে?''

শ্যামা উত্তর করিল, ''ঐ ঘবের মধ্যেই আছেন।'' এই বলিযা একটি কলসী লইয়া জল আনিবার ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শশিভূষণ এবার কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, ''বলি, দোর খুলে দেবে, না আমি চলে যাব?''

প্রমদা বুঝিতে পারিলেন যে, আব অধিক কস্‌টাইলে লেবু তিক্ত হইবে; এজন্য আস্তে আস্তে উঠিযা দরজা খুলিযা দিয়া পুনবায শযন কবিলেন। শশিভূষণ তাঁহাব আবক্ত নয়ন, মলিন বদন ও ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিযা বুঝিতে পাবিলেন, কাণ্ডটা কি। কাবণ প্রমদার পক্ষে এরূপ রাগ কবা নূতন ব্যাপাব নহে। মধ্যে মধ্যে প্রযোজন হইলেই রাগ হইত। একখান নূতন গহনা কিংবা একখান ভাল কাপড় লইতে হইলেই প্রমদা রাগ কবিতেন। শশিভূষণও প্রার্থিত দ্রব্যাদি দিয়া বাগ ভঙ্গ করিতে ক্রটি কবিতেন না। এজন্য শশিভূষণ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

''আজ আবার কি?''

কোন উত্তর নাই।

''বলি, আজ আবার কি হলো?''

নিরুত্তর। যেন দেওযালের সহিত কথোপকথন হইতেছে।

তৃতীয়বাব জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর না পাইযা, শশিভূষণ মনে করিলেন, আজকার ব্যাপাবটি বড় লঘু নহে, শ্যামাকে ডাকিয়া বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাউক। এজন্য 'শ্যামা

শ্যামা' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাবও উত্তব না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বিপদ, কেউ কি আমাব কথার জবাব দেবে না?"

শ। এই কথা শুনিয়া প্রমদা সকরুণ বচনে কহিলেন, "কি, কি বলছ?" এতক্ষণ পরে হুঁস হলো নাকি? তুমি কি এখানে ছিলে না? না কালা হযেছ যে, আমাব কথা এতক্ষণ শুনতে পাওনি?

প্র। আমি কালাই হই, আর কানাই হই, লোকেব তাতে কি ক্ষেতি? আমাকে যদি কেউ দেখতে না পারে, তবে আমাকে বলে না কেন? তা হলে আমি চলে যাই, তাদের উৎপাত যায়।

শশিভূষণ সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পব বিবক্ত হইযা বাটী আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রোজই বল চলে যাব। কৈ যাও দেখি কোথায যাবে?"

প্র। কেন, আমার কি আর যাবার জাযগা নেই? বাপের বাড়ী গিযে পড়ে থাকলে তাবা চাবটি না দিযে খেতে পারবে না।

বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই, কুলোপানা চক্র। প্রমদাব বাপের বাড়ীব অবস্থা তো অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ। নিকটে বলিয়া প্রমদা মাঝে মাঝে চালটে ডালটে, কখন টাকাটা সিকেটা চুরি করিযা পাঠাইযা দিতেন; এবং তাহাব জোবেই রামদেবেব প্রত্যহ আহাব চলিত।

শশিভূষণ টেব পাইয়াও সে সকল দেখিতেন না। এজন্য প্রমদাব বাপেব বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া তাঁহার হাসি আসিল। বলিলেন, "যাও, এক্ষণেই যাও, কিন্তু আমি চাল ডাল পাঠাতে পারব না।"

বাপেব বাড়ীর নিন্দা কখনই স্ত্রীলোকের সহ্য হয না। বিশেষতঃ প্রমদা বাগ কবিযাছিলেন, এজন্য শশিভূষণের ব্যাঙ্গোক্তি শুনিযা একেবারে মর্মে বেদনা পাইলেন এবং অধোবদনে অশ্রুপাত কবিতে লাগিলেন। শশিভূষণ বুঝিতে পাবিলেন, প্রমদাকে গুরুতব বেদনা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তখনই কোন সান্ত্বনার কথা কহিলে বেদনা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবে, এই ভাবিয়া তথা হইতে চলিযা গেলেন। কিন্তু স্থানান্তব গিযাও অধিক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। এজন্য অর্ধ ঘন্টা আন্দাজ পরে আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, প্রমদা শযন করিয়াই আছেন। কাছে বসিযা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? কি হয়েছে?" প্রমদা উত্তর দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তথাপি কোনও উত্তর পাইলেন না।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শশিভূষণ আরম্ভ কবিলেন, "অদৃষ্টে যার যা লেখা থাকে, কার সাধ্য তাহার খণ্ডন করে। মনে করে আসিতেছিলাম, যে চন্দ্রহারেব জন্য এক বৎসরের দরবার হচ্ছে, আজ তার বাযনা দিলাম; আজ বাড়ি গিয়ে বড় আদব পাব। কিন্তু অদৃষ্টে তা তো নেই, সুতরাং কি প্রকারে তা ঘটবে? আদর পড়ে মরুক, আজ কথাটিও শুনতে পাই না।"

শশিভূষণ পূর্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "বিধু কহিত, 'এখন চন্দ্রহাব স্থগিত বেখে ববঞ্চ বৈঠকখানাঘবটি সম্পূর্ণ করুন।' আমি মনে কবিলাম বৈঠখানা তো হবেই, যেখানে অর্ধেক হয়েছে আর অর্ধেক বাকি থাকবে না।"

প্রমদা আর থাকিতে পাবিলেন না। প্রথমতঃ, সোনাব চন্দ্রহাবের কথা, দ্বিতীযতঃ, তদ্বিষয়ে বিধুভূষণেব প্রতিবন্ধক হওযা, ইহা শুনিলে মৃত হইলেও প্রমদার চৈতন' হইত। তিনি কহিলেন, "ওদেব দুইজনের জ্বালাতেই তো চিরকালটা জ্বালাতন হলাম। আমাদেব এত অনিষ্ট কবেও কি ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না?"

শশিভূষণ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওবা কাবা, আব তোমাকেই বা কি জ্বালাতন কল্লে?"

প্র। কি জ্বালাতন কল্লে আবার জিজ্ঞাসা কবছো? কেন, বাকি রয়েছে কি?

শ। স্পষ্ট করে না বল্লে তো আমি বুঝতে পারি না। আমি তো জান্ নই যে, এক কথাব অর্ধেক না শুনিযাই সম্পূর্ণ বুঝতে পাবব? তুমি তো একা বিধুব নাম কর নাই, 'ওবা' বললে, সে কে কে, তা কি প্রকাবে জানব?

প্র। কে কে? আবাব কে হতে পাবে? কর্তা আব গিন্নী। কর্তাটি আমাব পাছে লেগেছেন; আমার কিছু হলেই যেন তাঁব সর্বনাশ হয। তিনি যেন নিজেব টাকা ভেঙ্গে দিচ্ছেন। আর গিন্নীটি, যাতে পাঁচজনেব কাছে অপদস্থ হই, তাবই চেষ্টায় থাকেন।

শ। কেন, বিধু তোমাকে তো না দেবার কথা বলে নি, সে বলেছিল লোকজনটা এলে স্থানাভাবে কষ্ট হয, এজন্য বৈঠকখানা আগে হলেই ভাল হয।

প্র। ইচ্ছায় বলি কি তোমাব বুদ্ধি কম? তুমি ভালমানুষ, ওসব তো বুঝতে পার না। বিধুটিকে বড় সহজ লোক জ্ঞান করো না। বৈঠকখানার উপব ওব এত যত্ন কেন, তা তো জান না। ও কি বৈঠকখানা হলে তোমাব যে ভাল হবে, তাব জন্য বলে? তা নয়। ও তো এখনও পাড়ায় থাকে, তখনও পাড়ায় থাকবে। তবে কিনা বৈঠকখানা হলে তার ভাগ পাবে; আমাব গযনা হলে তো পথক হবাব সময তাব অংশ পাবে না।

প্রমদা যে শশিভূষণকে বোকা বলিতেন, সেটি বড মিথ্যা কথা নয়; বস্তুতঃ এসব বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি তাদৃশ খেলিত না। কি প্রকাবে প্রজাদিগকে কষ্ট দিয়া পয়সা আদায করিতে হয়, এবং উহার জমা-খরচ করিতে হয় তাহাই বুঝিতেন। এক্ষণে প্রমদা যাহা বলিলেন, তাহা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় সত্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, হাঁ, এতদিনেব পর বুঝতে পারলাম। এইজন্যই ভায়া আমাদের যখন তখন সর্বকার্যেব আগে বাড়ীটি সম্পূর্ণ করা ও বিষয়আশয় করার পরামর্শ দেন; আব স্ত্রীর গয়না দেওয়া আব টাকা জলে ফেলে দেওয়া সমান বলে থাকেন।

এতদূর পর্যন্ত মনে মনে করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমি যদি আগে জানতে পারতাম, তবে একখানিও ইট প্রস্তুত কবতাম না।"

প্র। তুমি তো আমাব কথা শুন না, জিজ্ঞাসাও কব না। তুমি মনে মনে ভাব, তোমার ভাইটি যেন বামেব ভাই লক্ষ্মণ। কিন্তু ওটি যে ভবত, তা তো জান না।

শ। বৈঠকখানা ঐ পর্যন্তই থাকল, দেখি কে কবে? আর কি বলছিলে? গিন্নীর কথা কি বলছিলে?

প্র। বলতেছিলাম গিন্নীটি কর্তাকে হারান, তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কাব সাধ্যি? তাঁর সর্বতোভাবে যত্ন, কিসে আমাকে আব তোমাকে অপমান করতে পারেন!

শ। কি, আমাকে অপমান? যারই খাবেন, তারই বদনাম করবেন?

প্র। সে কথা বলে কে?

শ। কি কি অপমানেব কথা বলেছে বল তো?

প্র। বাকিই বা কি রেখেছে। তুমি শুনলে প্রত্যয় কববে না; আজ একজন মনোহাবী দোকান নিয়ে এসেছিল। বিপিন, কামিনী ছাড়ে না, তাই ওপাড়ার দিগম্ববী ঠাখরুণদিদিব কাছ থেকে দুটি পয়সা ধাব করে ওদেব দুটি বাঁশী কিনে দিলাম। ছোটগিন্নী তাই দেখে রাগ কবে, সেখান থেকে চলে এসে, গোপালকে, ডেকে নিয়ে একটা বাঁশী দিলেন। দাম দেবাব সময বললেন, "দিদি, আমাকে একটা পয়সা ধাব দাও, আমি সুদ দেব।" আমি বললাম, "এক পযসাব আবাব সুদ কি ভাই, আমি তো জানি না।" ছোট বউ বল্লেন, "চিবকাল মহাজনী কবছ, জান না কেন?" আমি শুনে অবাক হয়ে থাকলাম। ছোট বউ তাবপর যা মুখে এলো তাই বললে।

শ। কি কি কথা বললে।

প্র। আমার তত মনে নাই, আমি সাদা মানুষ, অত কথাব প্যাঁচ বুঝি না; ও পাড়ার সকলে ছিল, শুনেছে। তোমাব যদি শুনবাব ইচ্ছা থাকে কাল দিগম্ববী ঠাক্‌রুণদিদিকে ডেকে আনব: সেই সমস্ত বলবে।

শ। হাঁ, এ শোনা উচিত। কাল অবশ্য করে দিগম্ববীকে ডেকে আনা হয যেন।

প্র। তা তো হবে, কালকের কথা কাল হবে, একটা কথা জিজ্ঞাসা কবি, সত্য বলবে?

শ। কেন বলব না, অবশ্য বলব।

প্র। যথার্থ চন্দ্রহারেব বায়না দেওয়া হয়েছে?

শশিভূষণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঁ হয়েছে; কেন?"

প্র। তোমাব কথা শুনে বোধ হচ্ছে হয় নাই।

শ। তবে হয় নাই।

প্র। কেন তবে মিথ্যা কথাটি বললে?

শ। মিথ্যা বলেছি বটে, কিন্তু কাল সত্য হবে। কালই সেক্‌রা ডেকে বায়না দেব। ভেবেছিলাম আগে বৈঠকখানাটাই সমাধা করব, কিন্তু তোমার মুখে যেসব কথা শুনলাম, তাতে আর বাড়ী প্রস্তুত করতে আমার ইচ্ছা নাই। নিজে পরিশ্রম করে কে কোথায় পরকে অংশ দিয়ে থাকে?

প্রমদা আর কথা কহিলেন না।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে শ্যামা দাসীব গুপ্তকথা শোনা একটা রোগ ছিল। দ্বাবে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া উল্লিখিত কথোপকথনের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সরলার নিকটে গিয়া কহিল, "কেমন খুড়িমা, আমি যা বলেছিলাম, তা সত্য হলো কিনা?"

সরলাও কি কথোপকথন হইয়াছে, শুনিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। শ্যামাকে দেখিয়া কহিলেন, "কি শ্যামা? কি সত্য হলো?"

শ্যা। আমি তো বলেছিলাম, যেদিন রাগ কববেন সেই দিনই একখানা গযনা হবে। আজ সোনার চন্দ্রহার।

শ্যামা চন্দ্রহার হইতে আরম্ভ করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত বিববণ সরলাকে কহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
সরলার উৎকণ্ঠা

যে রাত্রিতে প্রমদা ও শশিভূষণ পূর্বাধ্যায়োল্লিখিত কথোপকথন করেন বিধু সে বাত্রি বাটীতে আইসেন নাই। পাড়ায় এক বাটীতে যাত্রা হইতেছিল, তিনি সেইখানেই ছিলেন। স্ত্রীলোকের সকল বল স্বামী; সবলা এসমস্ত বৃত্তান্ত স্বামীকে কিছুই জানাইতে না পাবিযা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন। কি করা কর্তব্য, কিছুই স্থিব কবিতে পাবিলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে করিলেন, আজ নিদ্রা যাই। শযন কবিলেন, নিদ্রা হইল না। শয্যায় উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন, অনেকক্ষণ বসিযা থাকিলে নিদ্রা হইবে। কিন্তু বসিযা থাকিয়াও কোন ফল দর্শিল না। নানাবিধ চিন্তা করিযা স্থিব করিলেন, শ্যামাকে পাঠাইযা দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া আনা কর্তব্য। 'শ্যামা' 'শ্যামা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে শ্যামা উঠিল। সরলা কহিলেন, "শ্যামা, তুই একবাব গিযে ওকে ডেকে আনতে পাবিস।"

শ্যা। কোথা থেকে ডেকে আনব? তিনি কোথায়, কেউ কি জানে?

স। সে যাত্রাব কাছে আছে। আমাকে বলে গিযেছিল, আজ যাত্রা শুনতে যাবে।

রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কাহাকে কোন কাজ কবান বড় সহজ নহে। নিদ্রা তন্দ্রা ইত্যাদিতে পুরুষকেই জড়ীভূত করিয়া ফেলে—শ্যামা তো দূবে থাকুক।

আপাততঃ দুই হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জন করিয়া শ্যামা কহিল,—

"আমি কেমন করে সেখানে যাব, আব অত লোকের মধ্যে আমাকে যেতেই বা দেবে কেন?"

স। শ্যামা, তুই আজ নূতন যাত্রার কাছে যাচ্ছিস না কি? আর কখন কি বেশী লোকের কাছে যাস নি?

"তোমাকে তো আর কথায় পারব না। এই চললাম"—এই বলিয়া শ্যামা প্রস্থান করিল।

শ্যামাকে পাঠাইয়া দিয়া সরলার চিত্তচাঞ্চল্যেব কিয়ৎপবিমাণে হ্রাস হইল। ক্ষণকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া শয়ন কবিলেন। প্রত্যূষেব সুস্নিগ্ধ সমীবণ সঞ্চালনে তাঁহাব নিদ্রাবেশ হইল। সরলা নিদ্রিত হইলেন।

শ্যামা যাত্রার নিকটে গিয়া ক্ষণকাল এদিকে ওদিকে অনুসন্ধান কবিল, বিধুকে দেখিতে পাইল না। তখন যাত্রা শুনিতে আবম্ভ করিল। হঠাৎ যে বাজাইতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল; শ্যামা দেখিল, বিধুভূষণ বাজাইতেছেন। কিন্তু কেন যে তিনি যাত্রার দলে বসিয়া বাজাইতেছেন বুঝিতে পারিল না। শ্যামা তাহার সহিত চক্ষে চক্ষে দেখা হইবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া আবার একাগ্রমনে যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে সরলা নিদ্রিত আছেন। নিদ্রা কি মনোহব। লোকে নিদ্রিত হইলে বোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, সকলই বিস্মৃত হয। নিদ্রাব কি মোহিনী শক্তি! একপ শক্তি আর কাহার আছে? দিবসে সংসাব-কোলাহলে চিত্তে যে সমস্ত উদ্বেগ জন্মে, বজনীতে নিদ্রাকর্ষণ হইলে সে সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায। নিদ্রাব ন্যায় শান্তিদাযিনী সংসাবে আর কিছুই নাই। নিদ্রা মনের প্রিয়তমা সহচবী। চিন্তাদগ্ধ হৃদয়কে নিদ্রা সখীব ন্যায সুস্থ করে। কিন্তু দুঃখীর সুখ কোথাও নাই। চিবদুঃখিনীর ভাগ্যে কুস্বপ্ন নিদ্রাব অবি হইয়া তাহাকে শান্তিসুখ হইতে বঞ্চিত করে।

সরলা পুত্রটি কোলে করিয়া শয্যায নিদ্রিত আছেন। মস্তকের নিকট জানালার উপর একটি তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। বাতাসে দীপশিখা অল্প অল্প নড়িতেছে, এজন্য মুখখানি মাঝে মাঝে ভাল দেখা যাইতেছে না। বাতাস বন্ধ হইলে আবার সুন্দব দেখাইতেছে। মস্তকের বসন বাম পার্শ্বে পড়িয়াছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে। লোহিত ওষ্ঠ দুটি অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে। মুখভঙ্গী চিন্তাশূন্য বোধ হইতেছে না। নিদ্রিত হইয়াও কি সরলা ভাবিতেছেন?

নিদ্রাভঙ্গ হইলে সরলা দেখিলেন, রজনী শেষ হইয়াছে। সুতরাং তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া গোপালের হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঠাক্‌রুণদিদি

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিপূর্বে দিগম্বরী ঠাক্‌রুণদিদির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সহিত আপনাদিগের বিশেষ পরিচয় করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। শশিভূষণের বাটীর দশ-বার বশি পশ্চিমে তাঁহার বাটী। ঠাক্‌রুণদিদির দুইখানি ঘর। একখানি থাকিবার ও আর একখানি রন্ধনশালা। সম্মুখে ছোট একটু উঠান, উঠানের দক্ষিণে ছোট একটু বাগান। বাগানের মধ্যে গুটিকতক ফুলগাছ, একটি কি দুটি পেঁপের গাছ, আর একটি নারিকেল গাছ। বাড়ীখানি এমনি পরিষ্কার যে, সিন্দূরটুকু পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। এই বাটীতে ঠাক্‌রুণদিদি 'বিকল্পে' একাকিনী বাস কবেন।

ঠাক্‌রুণদিদির রূপগুণের পরিচয় দেওয়া বড় সহজ নয়। তাঁহার বর্ণটি জবাফুলের মত নয়, গোলাপ ফুলের মত নয়, মল্লিকা ফুলের মত নয়, আযেশাব মত নয়, ফলেব মত নয়, জলের মত নয়, আশ্‌মানিব মত নয, প্রদীপের আলোকেব মত নয়, মোমবাতির মত নয়। এ সমস্ত মিশ্রিত কবিলে যেমন হয়, তাহার মতও নয। কেমন পাঠকবর্গ! বুঝেছেন তো এখন ঠাক্‌রুণদিদির বর্ণটি কেমন? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে পুস্তকখানি এইখানেই বন্ধ করুন। 'নভেল' পড়া আপনাব কাজ নয়। গ্রন্থকাবদিগের ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয বর্ণনা করিবাব নিয়ম নাই। আর যদিও ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয় কোন বিযয বর্ণনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেব কি ক্ষতি? আপনাদেরই বুদ্ধিব স্থূলত্ব প্রকাশ পায়। অতএব যদি আপনাবা 'অল্পবুদ্ধি' এই গালটি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন, তবে আমি কেবলমাত্র বর্ণ কেন, ঠাক্‌রুণদিদিব সম্বন্ধে যাহা কিছু আমি সমুদয়ের বর্ণনা করিতে পাবি।

ঠাক্‌রুণদিদিব বর্ণ কোন্ কোন্ জিনিসেব মত নয়, তাহা বলা হইয়াছে; কোন্ কোন্ জিনিসের মত, তাহা এক্ষণে বলা কর্তব্য। অর্থাৎ জমিদারী সেরেস্তার কালি, বান্নাঘবেব ঝুল, আলকাতবা ইত্যাদির ন্যায়। ঠাক্‌রুণদিদি বেঁটে স্থূলকলেববা; মস্তকটি প্রায কেশশূন্য, দাঁতগুলি মাঘ মাসের মূলার মতন, চক্ষু দুটি বক্তবর্ণ, পদদ্বয় স্তম্ভাকাব, পায়ের অঙ্গুলিগুলি এখানে একটি ওখানে একটি, যেন পরস্পব বিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়াছে। ঠাক্‌রুণদিদি তাঁহার পিতার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন, এজন্য দশবার বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তাঁহাকে ব্যাটাছেলের মত কাপড় পরাইয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই লইয়া যাইতেন। ঠাক্‌রুণদিদিকে না চিনিত এমন লোকই ছিল না; ঠাক্‌রুণদিদিও সকলকেই চিনিতেন। আপাততঃ তাঁহার প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম। জন্মাবধি বিধবা বলিলেই হয়। বিবাহ হইযা এত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বামীর পরলোকপ্রাপ্তি হয যে, তিনি ক'দিন সধবা ছিলেন, বলা বড় দুঃসাধ্য। ঠাক্‌রুণদিদি বৈধব্যাবস্থায় একবাব শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন; তিন-চাবি দিবসের মধ্যেই কলহ-বিবাদ করিযা তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহাব পিতার কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহাতে জীবিকানির্বাহ হয়। ঠাক্‌রুণদিদিব এই এক অসাধারণ গুণ ছিল যে তাঁহাব বাটীতে যে কেহ যাউক না কেন, কাহাকেও অনাদব করিতেন না। সকলকেই সমভাবে যত্ন করিতেন।

প্রত্যূষে যেমন সরলা গোপালের হস্ত ধারণ কবিযা বাহিব হইবেন, সম্মুখে ঠাক্‌রুণদিদিকে দেখিতে পাইয়া অমনি গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ কবিলেন। ঠাক্‌রুণদিদি অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া প্রমদার ঘবের দিকে চলিয়া গেলেন।

অবিলম্বেই সরলা বাহির হইয়া দেখিলেন, ঠাক্‌রুণদিদি প্রমদার গৃহে প্রবেশ কবিলেন। সরলার গৃহ হইতে প্রমদার গৃহ একপ্রাচীর মাত্র ব্যবধান; এজন্য তিনি নিজগৃহে থাকিয়া কি কথোপকথন হয় শুনিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুই শুনিতে না পাইযা পুনরায় বাহিরে আসিয়া সংসারের কাজকর্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল পর্যন্ত পরামর্শ করিয়া ঠাকরুণদিদি প্রমদার ঘব হইতে বাহিব হইয়া আসিলেন এবং সরলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "একটা কথা শুনে যাও।"

সবলা শঙ্কিতা হইয়া ঠাকরুণদিদির নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "কি?" ঠাকরুণদিদি কিঞ্চিৎ কৃত্রিম দুঃখ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "কথা এই ভাই—আমার দোষ নাই—আমি কি করব ভাই—আমাকে তুমি এক কথা বলে পাঠালে, প্রমদার কাছে বলতে হবে, আর তিনি এক কথা বলে পাঠালে তোমাব কাছে বলতে হবে। আমাকে ভাই গালি দিও না, আমি হয়েছি সীতাহরণে মারীচ—"

সরলা ভূমিকা শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। ঠাকরুণদিদির উপমা শেষ হইতে না হইতেই কহিলেন, "সে সব তুলনায় আর কাজ কি? তোমাকে যা বলতে বলেছেন, তাই বল, তোমাব কথার বাঁধুনি শুনে আমার প্রাণ চমকে যাচ্ছে।"

ঠা। কতকটা চমকাবাব কথাই বটে। তা যেখানে বলতে হবে, একেবারে বলে ফেলাই ভাল। প্রমদা বললেন কি, একত্র থাকলে ক্রমাগত বিবাদ-বিসংবাদ হয। অতএব এ ঝগড়া-বিবাদে কাজ কি। আজ অবধি তুমিও পৃথক হয়ে থাও, আর তিনিও পৃথক হউন। আমার কি ভাই, আমি বলে খালাস।

কথা শুনিযা সরলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। যে ভযে তিনি কখনও মুখ তুলিয়া প্রমদার নিকট কথা কহেন নাই, যে ভযে তিনি এত সহ্য কবিযা আসিযাছেন, হঠাৎ সেই বিপদ উপস্থিত! বিধুভূষণও বাড়ী নাই। এ ঝগডার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না। হয়ত তিনি সমুদয় দোষ সরলাবই মনে কবিবেন।

কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে থাকিয়া সরলা সজলনয়নে কাতবস্বরে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "ঠাকুরও কি এই কথা বললেন?"

ঠাকরুণদিদি একটি কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া কহিলেন, "শিব কি কখন শক্তি ছাড়া থাকেন!"

ঠাকরুণদিদিব এই পৌরাণিক শাস্ত্র-সংবলিত উত্তব শুনিয়া এত দুঃখেও সবলাব মুখে হাসি আসিল। কিন্তু অবিলম্বেই সে হাসি সংবরণ করিযা সকরুণ স্ববে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকরুণদিদি, এখন উপায় কি?"

ঠা। উপায়ের কথা আমি কি বলব, সে তুমিই জান। শশিভূষণ আমাকে বললেন, "ঠাকরুণদিদি, আজ তুমি চারিটি ভাত না দিলে আমায় অনাহারে থাকতে হয়; ওব ব্যামো, ও তো কোন কর্ম করতে পারবে না, কাল নাগাদ অন্য কোন একটা সুবিধা করব।" তাই আমি আজ চারটি রেঁধে দিয়ে যাব। আমাব কি ভাই, আমাকে তুমি ডাকলেও আসতে হবে, আর তিনি ডাকলেও আসতে হবে।

ঠাকরুণদিদি এই কথা বলিয়া রন্ধনশালায় গমন করিলেন, সরলাও আপনার ঘরে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ বাহির হইয়া যাইবাব সময় ঠাকরুণদিদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঠাকরুণদিদি, ওদের রান্না আজকাব মতন ঐ গোয়ালের পাশে হোক, তারপর কাল একখান ঘর ঠিক করে দেওয়া যাবে।"

বিধুভূষণ পূর্বদিবস আহাবান্তে পাড়ায় গিয়া শুনিলেন, মুখুজ্যেদের বাড়ী যাত্রা হইবে, আর তাঁহাকে পায় কে? শুনিবামাত্রই তিনি মুখুজ্যেদেব বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যাত্রা সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিলেন। কখন ফবাস তদাবক কবিতেছেন, কখন সকলে আসিয়া কোথায় বসিবে, তাহার উদ্যোগ কবিতেছেন। কখন এর কানে কানে কথা কহিতেছেন, কখন আর এক জনের সহিত পরামর্শ করিতেছেন—অর্থাৎ যেন তিনিই বাড়ীর কর্তা। ক্রমে যত সন্ধ্যা সমাগত হইতে লাগিল, তাঁহার ততই আমোদ বাড়িতে লাগিল। সকালে সকালে চারিটি আহার করিতে বাটী আসিলেন, কিন্তু রান্না হয় নাই দেখিয়া, "আজ আমি যাত্রা শুনব," এই মাত্র সবলাকে বলিয়া ফিবিয়া গেলেন। বাটীতে যে গোলযোগ হইয়া গিয়াছে, সরলা সে বিষয়ে তাঁহাকে কিচুমাত্র বলিবাব অবকাশ পাইলেন না।

বাটী হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, যাত্রাদলেব প্রধান বাদ্যকবের ওলাউঠা হইয়াছে, এজন্য যাত্রাওয়ালারা সে রাত্রে গান বন্ধ কবিযা বাখিবাব প্রস্তাব কবিতেছে। কিন্তু এদিকে সমস্ত নিমন্ত্রণ কবা হইয়াছে। উপায় কি, কেহ স্থির করিতে পাবিতেছে না। বিধু কহিলেন, "বাজনার জন্য ভয় নাই, আমি নয় বাজাব।" উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন, সকলেই এই প্রস্তাবে মত দিলেন। বিধুব আনন্দেব আর সীমা রহিল না।

নিয়মিত সময়ে যাত্রা আরম্ভ হইল। যাত্রাওয়ালাবা মনে কবিয়াছিল, বাদ্যেব দোষবশতঃ প্রাপ্তি দূরে থাকুক, লজ্জা পাইতে হইবে, কিন্তু দুই একটা গান সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা অকাবণ ভয় পাইয়াছিল। বিধুব বাজনা তাহাদের নিজ বাদ্যকরের অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, সুতবাং তাহাদেব ভয় ঘুচিযা উৎসাহ হইল; এবং যেরূপ প্রত্যাশা কবিয়াছিল, প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার দশগুণ ফল লাভ হইল।

যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলে যাত্রাওয়ালারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ লাভের অংশ দিতে চাহিল। কিন্তু বিধুভূষণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। হৃষ্টচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় শ্যামার সহিত দেখা হইল। শ্যামা গান শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিল। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা তুই কোথায় গিয়াছিলি?"

শ্যা। আপনাকে ডাকতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি যে গোলের মধ্যে বসে বাজাচ্ছিলেন দেখলাম, আমার সেখানে যেতে ভরসা হল না।

"ভয়ই বা কি?"

"সেখানে যে লোক।"

"লোকে কি তোকে ধরে খেত? তুই তো আর পাকা আঁবটি নোস্ যে তোকে পেলেই ধরবে?"

"আপনার ঐ এক রকম কথা। আমি কি বলছি আমি পাকা আঁব?"

বিধু। আমার এই রকম কথা। আমি রোজই তাই বলি, কিন্তু তুই তো তার জবাব আজও দিলি নে।

"যাও, আমি তোমার ওসব কথা শুনতে চাই না। (উভয়েই বাটীর কাছে আসিয়াছে) যে চায় তাকে গিয়া বল।"

"সে কে শ্যামা?"

"বাটীর ভিতর গিয়া দেখ, যে আমাকে ঘুম থেকে তুলে তোমাকে ডাকতে পাঠালে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যেখানে ভাই ভাই সেখানে ঠাঁই ঠাঁই

শ্যামা যে যথার্থই বিধুভূষণকে ডাকিতে গিয়াছিল, বিধুর তাহা প্রত্যয় হয় নাই। তিনি মনে করিলেন শ্যামা যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, পথে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে বলিয়া ওকথা কহিল। আস্তেব্যস্তে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বাহিরবাটীতে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কেহই নাই। রান্নাঘবেব দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, ঠাক্‌রুণদিদি পাক করিতেছেন। বিধু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আজ কি সুপ্রভাত! স্বয়ং লক্ষ্মী ঘবে বিরাজমান।" বিধু ঠাক্‌রুণদিদিকে এইরূপেই সম্ভাষণ করিতেন। ঠাক্‌রুণদিদিও তাহাতে কখন তুষ্ট বই রুষ্ট হইতেন না।

আপাততঃ ঠাক্‌রুণদিদি কথা কহিলেন না। বিধু কহিলেন, "তৃষিত চাতক বাক্যসুধা যাচ্ঞা করিতেছে; কথা কহিয়া তৃষ্ণা দূব করো।" ঠাক্‌রুণদিদি তথাপি কথা কহিলেন না, মুখ ভারি করিয়া রহিলেন। বিধু যাত্রার দলে বাজাইয়া পরম আহ্লাদিত ছিলেন। ঠাক্‌রুণদিদির মুখভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া করপুটে কহিলেন, "দীনজনকে কষ্ট দেওয়া মহতের উচিত নহে। তবে যদি আমার কোন দোষ হয়ে থাকে, ব্যবস্থা তো পড়েই আছে। 'অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড'।"

ঠাক্‌রুণদিদি তথাপি কথা না কহায় বিধুর মনে সন্দেহ জন্মিল। শ্যামা তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছিল, তাহাও স্মরণ হইল। মনে করিলেন, শ্যামার কথা কাল্পনিক নহে। অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নিজের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলা তাঁহার কথা শুনিয়াই দুঃখে ও ভয়ে অশ্রুপাত করিতেছিলেন। সরলাকে তদবস্থ দেখিয়া বিধুব যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মুহূর্ত পূর্বে হাসিতেছিলেন, হাসি দূর হইল, সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল কোথায়? সে ভাল আছে তো?"

সবলা কহিলেন, "গোপাল পাঠশালায় গিয়াছে; ভয় নাই, গোপাল ভালই আছে।"

বিধু। বিপিন, কামিনী?

সর। বিপিনও পাঠশালায় গিয়াছে। কামিনী কোথায় খেলা করছে।

বিধু। তবে তুমি কাঁদছ কেন?

সর। ঠাকুর আমাদের পৃথক করে দিয়েছেন।

বিধু। এই কথা? এরই জন্যে এত কাণ্ড? কি বলে দাদা আমাদের পৃথক কবে দিয়েছেন?

বিধুব বোধ হইল যেন, ইহা অপেক্ষা আর কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না।

সরলা কহিলেন, ‘‘প্রথমে ঠাকরুণদিদিকে দিয়ে বলে পাঠালেন, পরে কাছারি যাবাব সময় ঠাকুর নিজে বলে গেলেন।’’

‘‘কি বললেন?’’

‘‘কাছারি যাবার সময় আমাদের আজকাব মতন গোয়ালে বাঁধতে বললেন, পরে কাল একটা ঘর দেখে দেবেন।’’

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘পৃথক কবে দিলেন কেন?’’

সরলা উত্তর করিলেন, ‘‘আমি তো আর কিছুই জানি না। বোধ হয সেই মনোহাবীব দোকানের কাছে যে কথা হয়েছিল, তাতেই ত্যাগ কবেছেন!’’ এই বলিযা সরলা আনুপূর্বিক সমুদয় বর্ণনা কবিলেন। বিধুভূষণ শুনিযা হাসিযা কহিলেন, ‘‘এব জন্যে আর ভয় কি? দাদা বাড়ী এলেই চুকে যাবে। বোধ হয় তিনি সমুদয শুনতে পান নাই। শুনতে পেলে তিনি এমন কাজ কখনই কবিতেন না। এর জন্যে আব ভাবনা কি?’’

সরলা স্বামীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, ‘‘মা দুর্গা করুন, যেন তাই হয়। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।’’

বিধু। ফুলচন্দন পরে পড়বে, আপাততঃ আমাব মাথায় একটু তেল পড়ুক। কাল রাত জেগে বড় অসুক হয়েছে। তেল দাও, স্নান কবে আসি।

বিধুভূষণ স্নান করিতে গেলেন। সরলা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ঠাকরুণদিদিকে বন্ধনকার্যে সাহায্য করিবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করিলেন। প্রমদা সবলাকে বান্নাঘবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শ্যামাকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্ববে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘শ্যামা, সকলে ঘিলে আবার রান্নাঘরে কেন গেলেন? আমাদের রান্নাঘবে আর কারুর গিয়ে কাজ নেই।’’ শ্যামা তৎকালে বাটী ছিল না। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? প্রমদা যাহাব উপর বাগ করিতেন, তাহার সহিত কথা কহিতেন না, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিতে হইলে, শ্যামাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, শ্যামা তথায় থাকুক আব নাই থাকুক।

প্রমদার কথা শুনিয়া সরলা রান্নাঘর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজগৃহে আসিলেন। শ্যামা বাটী আসিল এবং রান্নাঘরে ঠাকরুণদিদিকে দেখিয়া সরলার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘বলি আজ কি তোমার ছুটি? ঠাকরুণদিদিকে একটিন্ দিয়াছ না কি?’’

শ্যামার মুখে সদাই হাসি। হাসিতে হাসিতে সরলাকে উল্লিখিত প্রশ্ন করায় সরলা কহিলেন, ‘‘শ্যামা, তোর কি আর সময় অসময় নেই, সদাই হাসি।’’

‘‘হাসব না কি তোমার মত বসে কাঁদব? কার জন্যে আমি কাঁদব?’’ এই কথা কহিতে কহিতে শ্যামার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল এবং চক্ষে একবিন্দু বারিও দেখা দিল। শ্যামা যেন লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

সরলা কহিলেন, ‘‘শ্যামা, আমাদের পৃথক কবে দিয়েছেন; ঠাকরুণদিদি ওঁদের জন্যে রাঁধছেন। আমাদের আজ কি হবে ভাবছি।’’

শ্যামা। পৃথক করে দিয়েছেন?

সর। 'হাঁ', এই বলিয়া সরলা শ্যামার নিকট প্রাতঃকালের ঘটনার পবিচয় দিলেন।

শ্যামা পুনরায় হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, ''তবে আমি কোন্ দিকে যাবো? ভাগ্গি আমি বাবুদের মা নই। তা হলে তো আমার গঙ্গা পাওয়া ভার হতো। কিন্তু সাজার দাসীর কি হয় তা তো জানি নে। হাঁ খুড়িমা, কি হয় জান কি?''

সরলা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ''তোর আব হাসি আমার ভাল লাগে না। দুদণ্ডকাল কি তুই না হেসে থাকতে পারিস না?''

সরলার কথা শেষ না হইতে হইতেই, বিপিন ও গোপাল পাঠশালা হইতে বাটী আসিল। গোপাল আসিয়া সরলার নিকট ''মা কি খাবঁ'' বলিয়া উপস্থিত হইল। সরলা অঞ্চল দিয়া গোপালের মুখের কালি পুঁছিয়া দিযা কহিলেন, ''একটু দেবী কর, খাবার দেব এখন।'' বিপিন মায়ের নিকট একটি সন্দেশ পাইল। প্রমদা সন্দেশটি বিপিনের হাতে দিয়া কহিলেন, ''এইখানে বসে খাও। না খেয়ে বাইবে যেও না।'' বিপিন তা শুনিবে কেন? সন্দেশটি পাইবামাত্রই ঘরের বাহিরে আসিয়া গোপালকে ডাকিল; গোপাল বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিপিন সন্দেশ খাইতেছে। দেখিযা জিজ্ঞাসা করিল, ''দাদা, আমারে একটু দেবে?''

বিপিন উত্তর করিল, ''না ভাই, দিলে মা বকবে।''

গো। মা কেন বকবে? আমি যখন যা পাই, তোমাকে দিই, তাতে তো আমার মা কিছু বলে না।

বি। আমি ভাই এখন দিতে পারব না। আমি বড় হলে দেব।

গো। আমিই কি চিরকাল ছোট থাকব? বড় হলে আমি আব তোমার কাছে চাব না। এই কথা কহিতে কহিতে উভয়েই রান্নাঘবেব নিকটে গেল। বিপিন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোনখান হইতে দেখিতেছে কি না, তখন সন্দেশটি ভাঙ্গিযা একটু গোপালের হাতে দিতে গেল। ঠাক্‌রুণদিদি রান্নাঘর হইতে দেখিতে পাইয়া কহিয়া উঠিলেন, ''বিপিন থাক। আমি দেখতে পাচ্ছি; মাকে বলে দেব এখন।''

বি। তুমি কি বলে দেবে? আমি তো কারুকে সন্দেশ দিই নি। এই বলিয়া গোপালকে না দিয়া সন্দেশটুকু আপনার মুখে নিক্ষেপ করিল। গোপাল ম্লানমুখে মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিল। শ্যামা ইত্যবসরে দোকান হইতে একটি সন্দেশ আনিয়াছিল। গোপাল আসিবামাত্রই তাহার হাতে দিল। গোপাল হৃষ্টচিত্তে সন্দেশ খাইতে খাইতে বিপিনেব সঙ্গে গিয়া মিশিল।

বিধুভূষণ স্নান করিয়া বাটী আসিলেন। শশিভূষণও কাছারি হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া বিধু আপাততঃ তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। শশিভূষণ স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন। পাকশাক প্রস্তুত করিয়া ঠাক্‌রুণদিদি স্নান করিয়া শশিভূষণকে আহার করিতে ডাকিলেন। অন্যান্য দিবস আহার করিতে যাইবার সময় শশিভূষণ বিধুকে ডাকিয়া যাইতেন, অদ্য একাকী গম্ভীরভাবে আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে নিজগৃহে

পান তামাক খাইতেছেন, এমন সময় বিধুভূষণ তথায় গিয়া বসিলেন। মনে করিলেন দাদাই অগ্রে কথা কহিবেন। এই ভরসায় ক্ষণেক বসিয়া রহিলেন। কিন্তু দাদার মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না। তখন বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘দাদা, আমাকে নাকি পৃথক হতে বলেছেন?’’

শশিভূষণ কহিলেন, ‘‘হাঁ, আর একত্রে থেকে কলহ-বিবাদ বরদাস্ত হয় না। যদি পৃথক হলে ঝগড়ার শেষ হয়, এই ভেবেই পৃথক হতে বলেছি।’’

বিধু। কার দোষে ঝগড়া হয়, সেটা অনুসন্ধান করে দেখলে ভাল হয় নাকি?

শশি। তা না দেখেই কি আমি পৃথক হবার কথা বলেছি?

বিধু। তুমি কি শুনেছ, আমি কি শুনতে পাই?

শশি। পাবে না কেন? কাল একজন মনোহারী দোকান নিয়ে এসেছিল ঠাক্‌রুণদিদিব কাছ থেকে দুটি পয়সা ধার করে বিপিনকে আর কামিনীকে দুটি বাঁশী কিনে দেয়। ছোট বৌ মা তাতে বললেন, ‘‘দিদি, একটি পযসা ধার দেবে, আমি সুদ দেব।’’ এটা কি ভাল কথা হয়েছে? আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি?

বিধু। আগে ভালো—

শশি। চুপ কর, আগে আমার কথা শেষ হোক্, পরে যা বলবার থাকে বলো। পয়সা ধার চাওয়ায় ওদের কাছে পয়সা ছিল না, কিন্তু তা না বলে ও বললে—‘একটা পয়সা ধার তার আর সুদ কি?’ তার উত্তর হলো এই, ‘কেন, তুমি তো মহাজনি করে থাক।’’ ‘‘আমি একটা কথা বলি—আমি যে কারুকে লক্ষ্য করে বলছি তা নয়—আমি দুইজনকেই বলছি—এই যে ধার-কর্জ করা হয়, এর শোধ কি কেউ বাপের বাড়ী থেকে পয়সা এনে দেন?’’

বিধুভূষণের এতক্ষণ পুনর্মিলনের আশা ছিল, কিন্তু শশিভূষণের শেষ কথা শুনিয়া সে আশা দূর হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, ‘‘তুমি যা বললে তা মিথ্যা নয়, কেউ বাপের বাড়ী থেকে কিছু পয়সা আনে না। কিন্তু ঘটনাটি তুমি যেরূপ শুনেছ, তা সত্য নয়।’’ এই বলিয়া সরলার নিকট তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিলেন এবং কহিলেন, ইহাই সত্য।

শশি। তার প্রমাণ কি?

বিধু। প্রমাণ আবার কি? এ তো মোকদ্দমা নয়। তবে সেখানে যারা ছিল সকলেই জানে।

শশি। সেখানে ঠাক্‌রুণদিদি ছিলেন। আমি তাঁর কাছে সমুদয় শুনেছি। তোমাবই কথা মিথ্যা, তাতে টের পাওয়া গেল।

বিধু। কে বললে, আমার কথা মিথ্যা?

শশি। ঠাক্‌রুণদিদি। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ঠাক্‌রুণদিদি তো আর দুমাস ছমাসের পথ তফাত নয়। রান্নাঘরে আছেন ডেকে জিজ্ঞাসা কর।

বিধু। আর আমার জিজ্ঞাসা করবার দরকার নাই। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ঠাক্‌রুণদিদি যা বলেছেন, তা তো মিথ্যা হবার নয়!

এই বলিয়া বিধু উঠিয়া গেলেন। দুয়ার পর্যন্ত না যাইতে না যাইতেই শশিভূষণ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। কহিলেন, "আজ তো পৃথক খাওয়া গেল। কাল তোমাদের একটা রান্নাঘর দেব, আর বিষয়আশয় পাঁচজন লোক ডেকে ভাগ করে দেব।"

বিধু। লোক ডেকে দরকার কি? আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ করব না। তুমি তো সব জান! যা আমাকে দেবে, আমি তাই নেব। এই বলিয়া বিধুভূষণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রমদা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। বিধুভূষণ চলিয়া গেলে বলিলেন, "দেখছ একবার অহঙ্কারটা? তুমি এক কথা বলেছ, তা নয় দুটি মিষ্টি করে তোমার অনুনয়-বিনয় করুক; তা নয়।"

শশিভূষণ উত্তর করিলেন, "ও অহঙ্কার আর কদিন থাকবে, শীঘ্রই সব সেরে যাবে।" এই বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চিরদিন কখন সমান না যায়

ইং ১৮—সালের পৌষ মাসের—তারিখে ঠিক দুই প্রহরের সময় যদি কেহ কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতার রাস্তায় হাঁসখালির নিকট উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ঐ স্থানের নিকটবর্তী এক বৃক্ষমূলে একটি পথশ্রান্ত পথিককে দেখিতে পাইতেন। দূর হইতে পথিকের বয়স চল্লিশ বৎসরের ন্যূন বোধ হইতেছে না, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলে তদপেক্ষা অন্ততঃ দশ বার বৎসর কম নিশ্চয় বিবেচনা হইত। মস্তকে দুটি একটি পক্ক কেশ দেখা যাইত, কিন্তু তাহা বয়োবৃদ্ধিহেতু নহে। মুখশ্রী ম্লান ও চিন্তাকুল। দেখিবামাত্রই জানিতে পারা যাইত, চিন্তায় পথিককে যৌবনেই বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পথিকের পায়ে এক জোড়া পাঁচ সাত জায়গায় তালি দেওয়া জুতা। তাহাও ধূলায় আবৃত। পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ধূলি। পরিধানে একখানি অর্ধমলিন থানের ধুতি, গায়ে একখানা তালি দেওয়া জামা। জামাটি পূর্বে পশমী কাপড়ের ছিল, কিন্তু কালে দুর্দশাবশতঃ লোমহীন হইয়াছে। জামার উপর একখানা তেহাবা মার্কিনের চাদর। পথিকের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি জলশূন্য হুকা, একটি কলিকা ও একগাছি বাঁশের ছড়ি ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে।

"চিরদিন কখন সমান না যায়।" বিধুভূষণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, তিনি কখন এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইবেন। পাঠকবর্গ! বৃক্ষমূলে আমাদিগের পূর্বপরিচিত বিধুভূষণ, তাহা কি আর বলিবার প্রয়োজন আছে? কিন্তু আপনারা যদি তাঁহাকে পূর্বে দেখিতেন, তাহা হইলে এ ব্যক্তি যে সে-ই, তাহা কখনই বুঝিতে পারিতেন না। বিধুভূষণের আর পূর্বের মতন বেশভূষা নাই, পূর্বের ভাবভঙ্গী নাই; পূর্বের সে প্রফুল্ল মুখমণ্ডল

নাই; সে মুহুর্মুহুঃ হাসি নাই; পূর্বের কিছুই নাই। সকলই গিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা বিধুকে ঘৃণা করিবেন না। এখনও বিধুর যাহা আছে, বোধ করি তাঁহার ন্যায় দুরবস্থায় পড়িলে অনেকের থাকে না। বিধুর অন্তঃকরণের সারল্য কোথাও যায় নাই। এত দুঃখেও তাহার নির্মল চরিত্রে কোন মলিনতা স্পর্শ করে নাই।

বিধুভূষণ বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, " কোথায় যাই? কার কাছে আমার দুঃখ জানাই? কেই বা আমার কথায় বিশ্বাস করবে?"

বিধু শশিভূষণের সহিত পৃথক হইয়া দিনকতক স্বচ্ছন্দে ছিলেন। পরে যখন দোকানে ধাব বন্ধ হইল, তখন বন্ধুবর্গের নিকট কর্জ ধরিলেন। দিনকতক পরে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইল। তখন আজ ঘটিটি, কাল গহনাখানি, পরদিবস ভাল জামাটি বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ দুসন্ধ্যা আহাব বন্ধ হইল। পরিবার চারিটি;———নিজে, সবলা, গোপাল ও শ্যামা। পৃথক হইবার সময় শ্যামা বিধুভূষণের দিকে আসিয়াছিল। একসন্ধ্যা আহার করিয়াও তাহার সরলার সহিত থাকিবার স্পৃহা নিবৃত্তি হয় নাই। একদিবস মলিন বসন প্রযুক্ত বিধুভূষণ বাহির হইতে পারেন না। শ্যামাকে ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কাপড় আসিলে পরিয়া আহারের অন্বেষণে যাইবেন। ধোপা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রমদাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামধন, কার কাপড়?" রজকের নাম রামধন।

রজক উত্তব করিল, "ছোটবাবুব কাপড় ময়লা হয়েছে, বেরুতে পারেন না, তাই তাড়াতাড়ি এই একখান ধুতি, আর একখানা চাদর সাঁজ করে আনলাম।"

প্রমদা কহিলেন, "কাপড় অভাবে বেরুতে পারেন না, তবু বাবু, আব বেশী থাকলে না জানি আরও কি পদবি হত।"

রজক। সে সব আপনাবা জানেন, আমি তার কি বলব?

প্র। রামধন কত করে মাইনে পাও?

রজক। পাঁচ টাকা হিসাবে দেবার কথা আছে।

প্র। দেবার কথা আছে। আজও পাওনি?

রজক। কৈ আর পেলাম। আজ কাল করে এই এক বছর হলো! এই সময়ে ধান চাল সস্তা ছিল, টাকাকড়ি পেলে কিছু কিনে রাখতাম। যাই, আজ আবাব চাইগে, দেখি কি বলেন।

প্র। চাবি, না আদায় করবি?

রজক। না দিলে কেমন করে আদায় করব?

প্র। যদি আমার পরামর্শ শুনিস, তবে আদায় হয়।

রজক। শুনব বলুন।

প্র। তুই কাপড় হাতে করে রেখে গিয়ে বল্, "আজ টাকা না পেলে কাপড় দেব না। যদি দেয় ভালই, নইলে বলিস, "যে কাপড় ধোয়াবার পয়সা দিতে পারে না, তার এত বাবুয়ানা কেন?"

রজক। তা বললে যদি রাগ করেন?

প্র। ওর রাগে তোর ভয় কি? যদি তাতে টাকা না পাস্ যাবার বেলা আমার কাছ দিয়া যাস্, আমি তোকে আপাততঃ দু টাকা ধাব দেব এখন।

রজক প্রথমতঃ শঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রমদার উৎসাহবাক্যে তাহার শঙ্কা দূব হইল। একে ছোটলোক, তাতে নগদ দু টাকা ধার পাইবার আশা রহিল। রজক বাটীব ভিতব গিয়া দেখিল, সরলা দ্বারে বসিয়া আছেন।

রামধন কহিল, ''এই কাপড় তো আনলাম, কিন্তু আমাকে কিছু খবচা না দিলে চলে না।''

সরলা কাতর স্বরে কহিলেন, ''রামধন তুমি আজ যাও, রাজবাটীতে উনি আজ যাবেন, সেখানে নিশ্চয় কিছু পাবেন। কাল তুমি এলে কিছু খরচ পাবে।''

রামধন। আজ আমার নৈলে নয়।

সরলা। রামধন, আজ হাতে কিছু ছিল না বলে আমাদের সকালে খাওযা হয় নাই, থাকলে কি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা কই?

সরলার হাতে দু গাছা পিতলের বালা ছিল। বজক তাহা সুবর্ণ মনে করিয়া কহিল, ''যার পয়সা অভাবে খাওয়া চলে না, তার হাতে আবার সোনার গহনা কেন?''

রজকের কথা শুনিয়া সরলার মুখ চোখ লাল হইল, কিন্তু তখনই ঈষৎ হাস্য কবিয়া কহিলেন, ''রামধন? সেই আশীর্বাদ কর যে হাতের বালা সোনার হউক। সোনা কি আর আছে? একে একে সকল বিক্রি হয়েছে। এ দু গাছি পিতলের।'' এই কথা কহিতে কহিতে সরলা আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না, অঞ্চল দিয়া চক্ষু পুঁছিয়া ফেলিলেন। রজক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাপড়খানি বাখিয়া তথা হইতে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। যাইবার বেলা আর প্রমদার কাছে গেল না।

ধোপা চলিয়া যাইতে না যাইতে শ্যামা পাড়া হইতে ''কৈ গো, ছোট গিন্নী কি করছ?'' বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরলা কহিলেন, ''শ্যামা তোর কি হিসেব কিতেব নেই? অত চেঁচাচ্ছিস, এখনি গোপাল জাগবে।''

শ্যামা কহিল, ''জাগলেই বা, দিনে ঘুমান কেন?''

সরলা। তুই থেকে থেকে অজ্ঞান হোস, এখন জাগলে সে যখন 'খাব খাব' করবে, তখন কি দিবি?

শ্যামা। আমি তার জোগাড় করে এনেছি। ——এই বলিয়া শ্যামা কতকগুলি কলা ও শশা কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিল।

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''শ্যামা, এ কোথায় পেলি?

শ্যামা। তাতে তোমার কাজ কি?

যখন ঘরে কিছু না থাকিত, ''শ্যামা পাড়ায় গিয়া কারু বাড়ী কোন কাজকর্ম করিয়া আসিবার সময় কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য আনিত। এইরূপে বিধুভূষণের ঘরে কিছু না

থাকিলেও গোপালকে কখন উপবাস কবিতে হয নাই। শ্যামা সময়ে সময়ে সকলেরই খাবার আনিত। যদি কাহারও বাটী কিছু না পাইত, তাহা হইলে শ্যামা পূর্বের সঞ্চিত বেতন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খরচ কবিত।

গোপালের উপর শ্যামার স্নেহ দেখিয়া সরলা কহিলেন, ''শ্যামা, তুই-ই যথার্থ গোপালের মা।''

শ্যামা হাসিয়া কহিল, ''তবে তুমি কি হবে? গোপালেব পিসি?''

সবলা সাশ্রুনয়নে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ''শ্যাঁমা, ও আমার গর্ভে হয়েছিল বটে, কিন্তু তুই-ই ওকে বাঁচালি।''

শ্যামার সবল হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া গেল। উভয়ে সজলনয়নে গোপালকে জাগাইলেন।

বিধুভূষণ বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজবাটী গেলেন। যে বাবু বিধুকে সাহায্য কবিবেন বলিযাছিলেন, তিনি আহাব করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। যে সমস্ত ভৃত্য নিকটে ছিল, তাহাদিগকে বাবুর নিকট খবব দিতে কহিলেন। কিন্তু কেহই বাবুকে জাগাইতে ভবসা করিল না। তাহাদেব মধ্যে একজনেব নাম রামা। বিধুভূষণ তাহাকে আব আব দু এক জন অপেক্ষা একটু ভাল মানুষ জ্ঞানে কহিলেন, ''বাম, আজ আমার আহাব হয় নাই। বাবুকে যদি খবব দাও, তবে উপকাব হয়।''

বামা কহিল, ''তুমি ঠাকুর একেবাবে যে বিরক্ত করেই মারলে?''

বিধু কহিলেন, ''বাম, আজ আমার আহার হয নাই।''

বাম। ''তোমার আহাব হয় নাই, তা আমার কি? অমন কত লোকেব আহাব হয় না, আর একটি পযসা পেলেই শুঁড়ীর দোকানে যায।''

বিধু ঈষৎ রাগ করিয়া কহিলেন, ''হাঁ বে, আমাকে দেখে কি মাতাল গুলিখোব বলে বোধ হয়?''

রামা কহিল, ''তার আমি কি জানি? এখন বকাইও না ঠাকুর, গরজ থাকে ঐখানে বসে থাকে। যখন বাবু উঠবেন, তখন দেখা হবে। এখানে চোখরাঙানি ভাল লাগবে না। তোমার তো কেউ চাকর এখানে নয।''

রামার মিষ্ট কথা শুনিয়া বিধুভূষণের স্মবণ হইল আর সে-কাল নাই। ছলছল নেত্রে গৃহের এক কোণে একখানা টুলের উপর বসিয়া রহিলেন। রামা ও অন্যান্য ভৃত্যগণ নিদ্রা যাইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা আগতপ্রায় হইল। রাজবাটী বিধুভূষণের বাটী হইতে নিতান্ত নিকটও নহে। রাত্রি অন্ধকার। সাত পাঁচ ভাবিয়া বিধুভূষণ চলিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় গৃহের অভ্যন্তর হইতে ''রামা রামা'' শব্দ হইল। বাবু জাগিলেন। বিধুভূষণ একটু অপেক্ষা করিলেন।

রামা নিদ্রিত। কিন্তু অন্য এক জন চাকর জাগরিত ছিল। পাছে রামাব উত্তব না পাইয়া বাবু তাহাকে ডাকেন, এজন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে রামার গা টিপিয়া জাগাইযা দিল। রামা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, ''আজ্ঞা যাই।''

রামা যাইবার সময় বিধুভূষণ কহিলেন, ‘‘রাম, বাপু, আমার কথাটা বলো একবার।’’

রামা গৃহের কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, ‘‘তুমি এখনও আছ ঠাকুব?’’

বাবু রামাকে কহিলেন, ‘‘আজ শনিবার, মনে আছে তো? শ্যামবাবু, চন্দ্রবাবু, আর আর সকলে আসবেন, তার জোগাড় আছে তো?’’

রামা। ‘‘জোগাড় আর কি? ওই এক বোতল পোর্ট আছে, আর এক বোতল সেরি।’’

বাবু। এক বোতল সেরি কি রে? তিন বোতল ছিল যে?

রামা তার দু বোতল পার করিয়াছে, বাবু তাব বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

রামা। ঐ জন্যেই তো আমি ওসব জিনিস রাখতে চাই নে। সেদিন যে পাঁচ বোতল গেল, আপনি তো আর হিসাব বাখেন না?

বাবু। সে দিন পাঁ—চ বোতল গেল?

রামা। আজ্ঞা গেলই তো?

বাবু। তবু তো শ্যামবাবু বাপের ভয়ে, আব মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত কবাব ভযে, বেশী খায় না। (জানালা দিয়া বৈঠকখানাব দিকে দৃষ্টি করিয়া) ‘‘ও আবাব কে?’’

রামা। ও এক ঠাকুর এসেছে। আপনি নাকি ওকে কিছু দেবেন কথা ছিল, তাই নিতে এসেছে। বলছে ওব আজ খাওয়া হয় নাই।

বাবু। ওকে আজ যেতে বল। বল আমার ব্যারাম হযেছে। কাল যেন বৈকালে আসে।

রামাকে আব আসিয়া বলিতে হইল না। বিধুভূষণ বাহিবে বসিয়াই সমুদয় শুনিতে পাইয়াছিলেন। শুনিয়াই প্রস্থান করিলেন।

বাবু বিধুভূষণকে আপনা হইতে ভরসা দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে বিফল-মনোবথ হইয়া আসিতে হইবে, বিধু কখনই মনে কবেন নাই, এজন্য বাবুর কথা শুনিয়া তিনি একেবারে ভাবনায় ম্রিয়মান হইলেন। কি কবেন, দুঃখে বাটী ফিবিয়া আসিয়া সরলাকে সমুদয় পরিচয় দিলেন। সরলা কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রমদা কোনরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বিধুভূষণের ঘরে সে দিবস উনন জ্বলে নাই। এজন্য সন্ধ্যার পর বারান্দায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, ‘‘ও শ্যামা, শ্যামা, বলি আজ তোদের কি রান্না হলো?’’

শ্যামা উত্তর করিল, ‘‘যা বিধি মাপিয়েছেন, তাই হলো।’’

প্র। সে কি, এক দিন তো সাবেক মনিব বলে চাট্টি খেতেও বল্লি নে?

শ্যামা। আমায় বলতে হবে কেন, কপালে থাকলে আপনিই হবে।

বিধু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘কি রে শ্যামা? ——কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস?’’

শ্যামা। বড় গিন্নি আমাদের কি কি রান্না হযেছিল জিজ্ঞাসা করছেন।

বিধুভূষণ শ্যামার কথা শুনিয়া জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সরলাকে কহিলেন, ‘‘দেখলে, আচরণটা দেখলে? চণ্ডালেবও এরূপ ব্যবহার নয। যাই দাদার কাছে, তিনি শুনে কি বলেন, তাই দেখি।’’

সরলা কহিলেন, ‘‘না, আর কোনখানে গিয়ে কাজ নাই, ওঁর যা ইচ্ছা বলুন। ওসব কথায় কান না দিলেই হলো।’’

ঘরে গোল শুনিয়া প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘ও শ্যামা তোদের ঘরে অত গোল কিসের? বলি, কারুকে নেমতন্ন করেছিস নাকি?’’

বিধু। (সরলার প্রতি) ‘‘শুনলে, শুনলে, আক্কেলটা শুনলে?’’——বসিয়াছিলেন, এই বলিয়া উঠিলেন।

সরলা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, ‘‘ছি ওসব কথা বলো না। হাজার হউক, গুরুলোক তো?’’

বিধুভূষণ কহিলেন, ‘‘ও কিসের গুরুলোক। আমি চললাম, দাদাকে বলি গে, দেখি তিনি কি বলেন।’’ এই বলিয়া সরলার হস্ত হইতে নিজ হস্ত জোবে মুক্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ‘‘দাদা, দাদা’’ বলিয়া বিধুভূষণ শশিভূষণের ঘরের দিকে চলিলেন। প্রমদা কৃত্রিম ভয় প্রদর্শনপূর্বক অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া গিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ কবিয়া কহিলেন, ‘‘ওই দেখ, তোমার ভায়া মদ খেয়ে আমাকে মারতে আসছে।’’

শশিভূষণ, বিধুভূষণের কথা শুনিয়া কহিলেন, ‘‘কে ও?’’

বিধু কহিলেন, ‘‘আমি। দাদা, একটা বিচার করতে হবে। বউ যা মুখে আসে তাই বলে আমাদের ঠাট্টা করছেন।’’

প্রমদা। ঐ দেখ মদ খেয়েছে। মদ না খেলে অমন মাতালের মত বকবে কেন?

শশিভূষণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ‘‘ওসব মাতলামি আমার কাছে খাটবে না। যাও গে শুয়ে থাক, যদি কিছু বলবার থাকে কাল শুনব।’’

বিধু। মাতলামিটা আবার কি? আমি মাতাল, না তুমি মাতাল?

শশী। কি, তুই আমাকে মাতাল বললি। বেবো আমার বাড়ী থেকে। অমন কববি তো যে ঘর দিয়েছি তাও কেড়ে নেব।

বিধু। ঘর দিয়াছি? ই——ঘব ভিক্ষা দিয়াছেন আর কি?

শশিভূষণ ক্রোধে কম্পমান হইয়া কহিলেন, ‘‘তবু ওইখানে দাঁড়িয়ে মাতলামি করতে লাগলি? হরে—এই মাতালটাকে নিয়ে থানায় দিয়ে আয় তো।’’

বিধু। হরে আসবে কেন, তুমি এস না?

এই কথা শুনিবামাত্র শশিভূষণ দ্বার উদঘাটন করিয়া কাপড় পরিতে পবিতে বাহিরে আসিলেন। রাগ হইলেই তাঁহার কাপড় খসিয়া যাইত। সরলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া বিধুভূষণের হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন। নতুবা একটা হাতাহাতি হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিধুকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিয়া সরলা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বিধুভূষণ ক্ষণকাল আরক্তলোচনে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, ’’সরলা, আর এ বাটীতে থাকার প্রযোজন নাই। আমি আর এ বাটীতে ত্রিরাত্রি বাস করব না।’’

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, ''কপালে যা আছে, তা ভোগ কবতেই হবে। আর কোথা যাবে? বাড়ী থাকলেও আমাব একটা ভবসা থাকে। সে যা হোক কাল হবে, এখন কান্না ত্যাগ কর। চোখ মুছে ফেল। মিথ্যা কাঁদলে কি হবে?''

বিধুভূষণ কহিলেন, ''একটা কথা বলব সরলা, বিশ্বাস করবে? আমি নিজেব জন্য একবিন্দুও দুঃখ করি না। আমার সকল কষ্ট তোমার জন্যে, আব ঐ ছোঁড়ার জন্যে। যদি তুমি আমার হাতে না পড়তে, তা হলে তোমায় এত কষ্ট সইতে হতো না।''

এই কথা শুনিয়া সরলা পূর্বাপেক্ষা সহস্র গুণ দুঃখ পাইলেন। নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল, কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, বাক্য নিঃসরণ হইল না। নিজের অঞ্চল দ্বারা স্বামীব চক্ষু মুছাইতে লাগিলেন।

বিধুভূষণ হস্ত ধরিয়া সরলাকে নিবাবণ করিয়া কহিলেন, ''সরলা আর কষ্ট বাড়াইও না। তুমি যদি অত ভাল না বাসতে, আমার দুঃখে অত দুঃখিত না হতে, যদি অন্য স্ত্রীলোকের মত আমার সহিত বিবাদ কবতে, তা হলে আমার কখনই এত দুঃখ হতো না। এতদিন কিছু বলি নাই, এখন বলি। তুমি আমাকে নিজে থেকে এক একখানি গহনা বিক্রি করতে দিয়েছ, তখন আমার মনে হয়েছে যেন আমার এক এক অঙ্গ ছিঁড়ে গেল। কি করি? না বেচলে নয়, তাই বেচেছি। মাথাব উপর ঈশ্বরই জানেন, সে গহনা বেচে ভাত খাওয়া আমার পক্ষে যেন প্রতি গ্রাসে কালকূট খাওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছাপূর্বক গহনাগুলি না দিতে, তা হলে বোধ হয় আমাব এত কষ্ট হতো না। এখন এক কথা বলি সরলা; তুমি বাপেব বাড়ী দিনকতকের জন্য যাও। আর শ্যামাও অন্যত্র কোনখানে যাউক। এখানে থেকে সে গরীব কেন কষ্ট পায়?''

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ''আমি বাপের বাড়ী গেলে তোমার কষ্ট নিবারণ হতো, তা হলে বাপের বাড়ী কেন, তুমি যেখানে বল সেইখানে যেতে পাবি। কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি স্বর্গে গেলেও সুখী হব না। যখন মনে হবে যে, তুমি হয়তো অনাহারে আছ, তখন কেমন করে আমাব মুখে অন্ন উঠবে? তবে গোপালের জন্যে মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু গোপাল তো আজও উপবাস করে নাই। ওর যত দিন উপবাস করতে না হয়, ততদিন আমি তোমাকে ছেড়ে কোনখানেই যাব না। কিন্তু শ্যামার কথা যা বললে, তা করা উচিত, ও কেন আমাদের সঙ্গে থেকে কষ্ট পায়, আর গঞ্জনা সহ্য করে?''

বিধুভূষণ শ্যামাকে ডাকিলেন। শ্যামা অন্য সময় এক ডাকে তিন উত্তর দিত, আজ কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে আসিল। শ্যামার চক্ষু লাল, মুখ ভার।

বিধুভূষণ কহিলেন, ''শ্যামা, আমরা বিবেচনা করে স্থির করলাম, তোমাব আব আমাদের কাছে থেকে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। তোমার মাইনা পাওয়া দূরে থাক্, দু'সন্ধ্যা খেতেও পাও না। অতএব তুমি অন্য কোন স্থানে যাও। যদি পরমেশ্বর দিন

দেন, তখন আবার এস।'' বিধুভূষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ''আমি কি মাইনে চেয়েছি, না মাইনে নেব বলে এসেছি? আমার টাকার দরকার কি? আমারে যাই বল, আমি গোপালকে ছেড়ে থাকতে পারব না। আমি যদি ভারবোঝা হয়ে থাকি, তোমাদের এখানে আমি খাব না, কিন্তু গোপালকে ছেড়ে আমাকে থাকতে বলো না।''

বিধু কহিলেন, ''শ্যামা, কেঁদ না, স্থির হও। আমি যা বলছি, ভাল কবে বুঝে দেখ। আমাদের সঙ্গে থাকা আর উপবাস করা একই কথা। গোপালকে না দেখে তুমি থাক্‌তে পাব না সত্য, কিন্তু আর কোন বাড়ী গেলেও সেখানে ছেলেপিলে পাবে। আবার সেখানে মন বসলে আর কোন জায়গায় যেতে ইচ্ছা হবে না।''

''ছেলেপিলে পাব সত্যি, কিন্তু আমার সেটির মতন আর কোনখানে পাব না।'' শ্যামা এই বলিয়া উচৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

বিধু কহিলেন, ''শ্যামা স্থির হও, স্থির হও।'' শ্যামা কহিল, ''গোপালেব মতন আমার একটি ছেলে ছিল। আদর করে আমিও তার নাম গোপাল বেখেছিলাম। এখানে থাকলে আমার গোপাল যে নেই, তা আমি ভুলে যাই। আমি এখান থেকে কোন স্থানে যাব না।''

বিধুভূষণ সাশ্রুনয়নে সরলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এব উপায় কি?'' সরলা অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্যামা কহিল, ''আমার কিছু টাকা আছে। মনে করেছিলাম গোপালকে দিয়ে যাব। কিন্তু আমার কথা যদি শোন, তবে এক পরামর্শ আছে। (বিধুর প্রতি) তুমি কোন যাত্রার দলে কাজ নিতে চেষ্টা কর। পাবেই তাব সন্দেহ নেই। আব ততদিন আমবা ঘরে থেকে এই টাকায় চালাই। এর পর সাচ্ছল হয়, আমার টাকা দিও। দিলে গোপালেরই থাকবে।''

শ্যামার সকরুণ বচনে সরলা ও বিধু উভয়েই দ্রব হইয়া গেলেন এবং তাহারই পরামর্শেই কতর্ব্য স্থির করিলেন।

পরদিবস প্রাতে শ্যামার টাকা হইতে রাস্তার খরচস্বরূপ পাঁচ টাকা লইয়া বিধুভূষণ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কলিকাতা যাইবেন স্থির করিয়া কলিকাতার রাস্তা ধরিলেন এবং মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম হেতু হাঁসখালির নিকটবর্তী গাছতলায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন———বাদ্য-গীত ভাল বটে, কিন্তু যাত্রার দলে থাকাটা বড় নীচ কর্ম। বিধুভূষণ চিন্তা করিতেছেন, অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে কিনা, এমন সময় এক পথিক তথায় উপস্থিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

মিত্রলাভ

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে যে পথিকের কথা বলা হইয়াছে, সেই কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার ও অপেক্ষাকৃত কৃশ। বয়স ৩২।৩৩, বাম করে তামাক সাজা কলিকাসহ হুঁকা, বাম স্কন্ধে একখানি ময়লা বস্ত্রাবৃত একটি বেহালা ঝুলান, দক্ষিণ কবে একগাছি ভল্‌তা বাঁশেব ছড়ি, পায়ে জুতা নাই, একখানি মলিন বস্ত্র পরিধানে। কটিদেশ হইতে গলা পর্যন্ত অনাবৃত, মস্তকে চাদর একখানি পাগড়ি করিয়া বাঁধা, কোমরে একটি ক্ষুদ্র বোচকা। এই অবস্থায় পথিক যখন বিধুভূষণের নিকট গিয়া ছড়িগাঁছি রাখিয়া বসিল, তখন তাহাব কলেবর উত্তম কালিতে একটি জীবন্ত ''ঙ''-য়ার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিধুভূষণ অনন্যমনে নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং পথিক অগ্রসব হইয়া যে তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই কিন্তু হঠাৎ হুঁকার টান শুনিয়া সেই দিকে চাহিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন পথিক বৃক্ষ হইতে সেই দণ্ডে নামিয়া আসিল। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ——''তুমি কে?''

বিধুভূষণ ভয় পাইয়াছেন বুঝিয়া পথিক উত্তব করিল, ''আমি মানুষ, ভয় কি? রামার মা যে বলেছিল রাত্রে নদী পার হয়, দিনের বেলায় কাকের ডাকে মূর্ছা যায়, তুমি যে তাই হলে! একা বিদেশে আসতে পার, আর মানুষ দেখে ভয় পাও?''

বিধুভূষণ পথিকের কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, ''ঠিক কথা, কিন্তু আমি তো ভয় পাই নাই। তোমার নাম কি?''

পথিক উত্তর করিল, ''আমার নাম নীলকমল, বাড়ী রামনগর, কালাচাঁদ ঘোষেব ছেলে আমি। আমরা দেবনাথ বোসের প্রজা।''

নীলকমলের বেশী কথা কহা একটা রোগ ছিল। বিধুভূষণ তাহার কথা শুনিয়া তাহার বুদ্ধির দৌড় টের পাইলেন। আরও অধিক কথা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ''দেবনাথ বোস কে?''

নীলকমল বিস্ফারীত চক্ষে বিস্ময়ব্যঞ্জক স্বরে কহিল, ''দেবনাথ বোস কে?'' তাহার বিশ্বাস ছিল, দেবনাথের মতন ধনী আর দ্বিতীয় নাই।

বিধু। হাঁ, দেবনাথ কে? আমি তো জানি না।

নীল। দেবনাথেরা আগে রাজা ছিল। বর্গীর হাঙ্গামে রাজত্তি যায়, কিন্তু এখনও তাঁরা খুব বড় মানুষ। তুমি তাঁদের নাম শোন নি, এ আশ্চর্য কথা।

বিধু ''হবে'' বলিয়া চুপ করিলেন। নীলকমল অনেকক্ষণ হুঁকা টানিয়া, হুঁকাটির মুখ বাম হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বিধুভূষণের দিকে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ''তোমরা, আপনারা?''

বিধুভূষণ হাসিয়া কলিকাটি লইয়া কহিলেন, ''আমরা ব্রাহ্মণ।''

বিধুভূষণ তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি কোথায় যাচ্ছ?''

নীলকমল উত্তর করিল, ''আর কোথায়! পয়সার চেষ্টায়! দুঃখের কথা কি কব? আমরা তিন ভাই, আমার দাদার নাম কেষ্টকমল, আমাব ছোট ভাইয়ের নাম রামকমল। তারা কিছুই করে না। সকলেই আমি যা আনব তাই খাবে। একা মানুষ, জাত-ব্যবসায়ে আর সংসার চালাতে না পেরে এখন বিদেশে বেরিয়েছি। দেখি, বিদেশে টাকা আছে কি না!''

নীলকমলের কথা শুনিয়া বিধুর পক্ষে হাস্য সংবরণ করা অতি কষ্টকর হইল। কিন্তু নীলকমল দুঃখ করিয়া যাহা বলিতেছে, তাহাতে হাসা অনুচিত মনে করিয়া কহিলেন, ''বিদেশে টাকা আছে কি না দেখতে চাও, কিন্তু দেখতে পাবে যে তার প্রমাণ কি?''

নীলকমল দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেহালাটি উঠাইয়া বিধুভূষণকে দেখাইয়া কহিল, ''গুণ! গুণ না থাকলে বলি? ওস্তাদজীর আশীর্বাদে আমাব আর অন্নচিন্তা নাই। এখন বড মানুষ হওয়াই বাকি?''

বিধু মনে করিলেন, হতেও পারে, নীলকমল একজন ভাল বেহালাদার, কিন্তু কথাবার্তা শুনে তো তার কিছু বোধ হয় না। একবার পরীক্ষা করা যাউক। পবে প্রকাশ্যে কহিলেন, ''একবার বাজাও দেখি!''

নীলকমল অবিলম্বে বেহালাটি খুলিয়া দুই চারিবার তার কানমোড়া দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। মাথা এমনি দুলিতে লাগিল যে, বিধুর বোধ হইতে লাগিল, নীলকমলের মৃগী রোগ উপস্থিত হইল; চক্ষু ঘুরিতে লাগিল, এবং সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি গাইতে পার?''

নীলকমল ''হাঁ'' বলিয়া বেহালার গৎ ছাড়িয়া দিয়া গান ধরিল এবং বেহালাব সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আরম্ভ করিল—

''পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব।
আনিয়ে নীল পদ্ম সে নীল পদ্ম চরণ-পদ্মে দিব।''

গান শুনা দূরে থাকুক, নীলকমলের হাবভাব মুখভঙ্গী দেখিয়া বিধু আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। নীলকমল তদ্দর্শনে রাগত হইয়া গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া কহিল, ''দাদাঠাকুর বলেছিল, 'নীলকমল বেণাবনে মুক্তা ছড়াইও না।'' তোমরা এর কি বুঝবে? যদি ওস্তাদজী কি কালীনাথ দাদা হতো তবে তারা বুঝতে পারত। ছেলেমানুষের মত হাসলে হয় না। গোবিন্দ অধিকারী আমাকে দশ টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিল, আমি যাইনি। কত খোশামোদ———তবু না।''

প্রথম প্রথম নীমকমলের বেহালার হাত মন্দ ছিল না। গোবিন্দ অধিকারী মনে করিয়াছিল, ভাল শিক্ষা পাইলে নীলকমল ভাল হইতে পারে; এজন্য পাঁচ টাকা বেতন দিয়া নিজের সঙ্গে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। নীলকমল তদবধি মনে করিল, সে একজন তানসেন হইয়াছে। আর কাহাকেও তৃণজ্ঞান করিত না। যে সকল বোল শিখিয়াছিল, তাহার মধ্যে নিজের টিপ্পনি প্রবেশ করাইল, মাথা কাঁপান ধরিল, মুদ্রাদোষ সংগ্রহ

করিল এবং অন্যান্য নানাকারণ-প্রযুক্ত অল্প দিনের মধ্যেই একজন অসহনীয় বাদাকর হইয়া উঠিল। গোবিন্দ অধিকারী যে নীলকমলকে সঙ্গে রাখিতে চাহিয়াছিল, সেই নীলকমলের শনি হইল। নীলকমল তদবধি লেখাপড়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল। ''লেখা কি?'' নীলকমল কহিত, কলম দিয়া আকর (অক্ষর) বের করা, আর বাজনা———কাঠের ভেতর থেকে কথা বের করা। লেখা ইচ্ছা কল্লে সকলেই শিখতে পারে, কিন্তু বাজনা শিখতে মা-সরস্বতীর বিশেষ করুণা চাই।'' এই অবধি সে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিল। পূর্বে সন্ধ্যার পর একটু একটু বাজাইত, গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া অবধি সমস্ত দিন বেহালা ভিন্ন আর কিছুই নীলকমলের হাতে দেখা যাইত না। কৃষ্ণকমল পাড়ার লোকের গাভী দোহন করিত এবং প্রতি গরুতে দুই আনা বেতন পাইত। যে দিন বেতনগুলি আনিয়া বাটী রাখিত, নীলকমল অবিলম্বে চুরি করিয়া লইয়া একটি নূতন বেহালা কিনিত। উপায়ন্তর না দেখিয়া কৃষ্ণকমল নীলকমলকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নীলকমল গমনকালে বলিয়া গেল, ''তোরা মুড়ি-মিছরি সমান দর কল্লি। কিন্তু আমি যে কত বড় একটা লোক, তা তোরা টের পেলি নে, এই দুঃখ। ভাল, আমি চলেল্লম, ফিরে এলে তোরা যদি আমার দুয়ারে বসে কাঁদিস, তবু একমুট অন্ন দেব না।''

বিধুভূষণ নীলকমলকে সান্ত্বনা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তোমার বিবাহ হয়েছে নীলকমল?''

নীলকমল অতি অহঙ্কার সত্ত্বেও মন্দ লোক ছিল না, এজন্য একটু হাসিয়া উত্তর করিল, ''না, একটা সম্বন্ধ স্থির করে দিতে পার?''

বিধু। চেষ্টা না করলে কেমন করে বলব। কিন্তু আপাততঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ?

নীল। কলিকাতায় গোবিন্দ অধিকারীর কাছে যাচ্ছি। সে চার পাঁচ বছর হলো, আমাকে দশ টাকা করে মাইনে দিতে চেয়েছিল। তারপর আমি কত শিখিছি। দু-এক সময়ে ওস্তাদজীও আমার কাছে এখন লজ্জা পান। এখন বিশ টাকা না হয়, পনের টাকা তো পাবই। তার পাঁচ টাকা খাব আর দশ টাকা বাঁচাব। এক বৎসরের মধ্যেই বিয়ে করতে পারব না?

বিধুভূষণ নীলকমলের প্রফুল্লতা দর্শন করিয়া প্রথমতঃ আহ্লাদিত হইলেন। মনে করিলেন, পাগলের মনে সদাই সুখ বলে, তা বড় মিথ্যা নয়। এর অবস্থা আমার মতনই দেখছি, বেশির মধ্যে আমি যথার্থই ভাল বাজাইতে পারি, এ নির্জলা মূর্খ, তবু কলিকাতায় গেলেই ১৫, টাকা বেতন পাইবে, ইহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। হায়! আমি যদি এর মতন চিন্তাশূন্য হইতে পারিতাম। কিন্তু আবার এই ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। নীলকমল দেখিতেছি কখনই বাটীর বাহির হয় নাই। নৈরাশ্য কাহাকে বলে জানে না। ইহার যে চাকরি হইবে, এ স্বপ্নের অগোচর। যখন জানিতে পারিবে যে, চাকরি হইল না, তখন আর এর দুঃখের সীমা থাকিবে না। ক্ষণকাল এই প্রকার চিন্তা করিয়া বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ''নীলকমল, তুমি আর কখন বিদেশে গিয়াছিলে।''

নীলকমল কহিল, "না।"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি কেমন কবে তবে একা কলিকাতায যাবে, কে রাস্তা বলে দেবে?"

নীল। রাস্তার লোকে বাস্তা বলে দেবে। কানেব জল, জল দিলে বেরোয়।

বিধুভূষণ মনে করিলেন, আমি একাকী, ইহাকে সঙ্গে লইলে হয়, কিন্তু নিজেব খরচের অপ্রতুল, ইহাকে আবার খেতে দিতে হলে তো যাতে পাঁচ দিন চলবে, তা দু-দিনে শেষ হয়েও যাবে। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, তুমি যে কলিকাতায় যাবে খরচপত্র এনেছ?"

নীল। খরচপত্রের মধ্যে এই বেহালা। সকলেই তো আর তোমার মতন বাজনা শুনে হাসে না। রাস্তায় যদি একজন গুণী লোক পাই তো এক দণ্ডে পাঁচ দিনের জোগাড় ক'রে নিতে পারব। যে পদ্ম-আঁখির গানটা শুনে তুমি হাসলে, কতলোক উহা শুনে কেঁদেছে।

বিধু। আমি তো তোমার গানে হাসি নাই। তোমার মাথা-নাড়া দেখে হাসি এলো।

নীল। যদি তুমি গানবাজনা জানতে, তবে অমন কথা বলতে না। তালের সময় তাল না দিয়ে কেউ থাকতে পারে? গাইযে-বাজিয়ে লোকের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

বিধু। তা জিজ্ঞাসা করা যাবে। কিন্তু আমি আর এক কথা ভাবছি। আমিও কলিকাতায় যাচ্ছি। চল, দু-জনে একত্র হয়ে যাই।

নীল। তা হলে তো ভালই হয় কিন্তু একটা বন্দোবস্ত আগে করা ভাল। আমি বাজিয়ে গেয়ে যেখানে যা পাব, তুমি তার ভাগ পাবে না।

বিধুভূষণ সহজেই সম্মত হইলেন। অতঃপর নীলকমল গুন্‌গুন্ করিয়া 'পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে' গাইতে গাইতে আর বিধুভূষণ ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উভয়েই বৃক্ষমূল হইতে প্রস্থান করিলেন।

নীলকমল পদ্ম-আঁখির গানটা বড়ই ভালবাসিত এবং এতই গাইত যে, যদি গানটি কোন জড়পদার্থ হইত, তবে পাষাণের মত কঠিন হইলেও ক্ষয় হইয়া যাইত।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রবাসে প্রথম রাত্রি

সন্ধ্যাকালে নীলকমল ও বিধুভূষণ এক বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় রাত্রিকালে অবস্থিতি করিতে পারেন, এমন একটু স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যেখানে যান, সেইখানেই ঘর পূর্ণ দেখিতে পান। খালি আর নাই। অনুসন্ধান করিতে কবিতে বাজারের একটু দূরে একখানি ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলেন। ঘবখানির সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ গোটাকতক আম্রবৃক্ষ, এজন্য সন্ধ্যার পর হঠাৎ সে ঘরখানি দেখিতে

পাওয়া যায় না ও পথিকেরা বাজারের মধ্যে স্থান পাইলে আর তথায় গমন করে না। বিধু ও নীলকমল তথায় গমন করিয়া দেখিলেন যে, সেখানেও দু একজন পথিক আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি আরও দু একজন থাকিতে পারে, এমন স্থান আছে।

মুদী ঘরে নাই। কিছু দূরে এক হাটে গিয়াছে; তাহার স্ত্রী দোকানের কার্য করিতেছে। বিধুভূষণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"বাছা, এখানে দুজন লোকের থাকবার জায়গা হবে?"

মুদীর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কি লোক?"

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, "একটি ব্রাহ্মণ, আর একটি শূদ্র।"

মুদীর স্ত্রী কহিল, "দুজন ব্রাহ্মণ হলে হতে পারত। দোকানে আর দুটি ব্রাহ্মণ আছেন। এঁদের মধ্যে তো আর শূদ্র থাকতে পারবে না। কিন্তু যদি তোমার ঐ লোকটি গাছতলায় থাকে, তাহলে এখানে জায়গা হতে পারে।"

বিধু নীলকমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি বল নীলকমল?" নীলকমল কহিল, "ঐ তো বারান্দায় জায়গা আছে, আমি ওখানে থাকতে পারব না?"

মুদীর স্ত্রী। ওখানে গরু থাকবে।

নীল। গরুটা কেন গাছতলায় রাখ না?

মুদীর স্ত্রী। গরুটা গাছতলায় রেখে তোমাকে ঘরে জায়গা দেব? তুমি আমার গুরুঠাকুর এলে আর কি? বিদেশে আসতে শিখেছ, গাছতলায় শুতে শেখ নি?

নীলকমল বড় অভিমানী ছিল, সুতরাং মুদীর স্ত্রীর কথা শুনিয়া সহজে তাহার রাগ হইল। বিধুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "চল আমরা গাঁয়ের ভিতর গিয়া কোনখানে থাকি, এখানে থাকা হবে না।" বিধু পথশ্রান্তিতে কাতর ছিলেন, তিনি কহিলেন, "তুমি যাও, আমি এইখানে থাকি।"

নীলকমল আরও রাগত হইয়া কহিল, "থাক তবে, আজও থাক কালও থাক। আমি এই বিদায়। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।" এই বলিয়া নীলকমল প্রস্থান করিল, বিধু ঘরে উঠিয়া বসিলেন।

নীলকমল কিয়দ্দূর গিয়া থামিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, একটু রাগ করিয়া গেলেই বিধুভূষণ তাহাকে ডাকিবেন। বিধুরও ডাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নীলকমলের চরিত্র তাঁহার পূর্বে জানা ছিল, এজন্য তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন, ভাবিয়াছিলেন যে, নীলকমল আপনিই ফিরিয়া আসিবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল। নীলকমল ক্ষণকাল একস্থানে স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, পুনর্বার না ডাকিলে কি প্রকারে যাই। রাত্রি অন্ধকার, অন্য কোন ভয় না থাকিলেও যে কেহ সে রাস্তায় চলিতে পারিত, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। গ্রামের লোকেরই সে রাস্তা দিয়া বিনা আলোকে চলা দুঃসাধ্য। নীলকমল ভাবিয়া চিন্তিয়া দু-এক পা করিয়া পুনর্বার দোকানের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বিধুকে ডাকিয়া কহিল, "রাত্রিকালে তোমাকে একা ফেলে যাওয়া অন্যায়, তাই ভেবে আমি ফিরে এলাম। তুমি ঘরে থাক, করি কি, আমি গাছতলায় থাকব।"

কিন্তু নীলকমলের মনে মনে এই রহিল যে, হয় উভয়েই গাছতলায় থাকিবে, নচেৎ সমস্ত রাত্রি গান করিয়া কাটাইয়া দিবে, অর্থাৎ কাহাকেও ঘুমাইতে দিবে না।

বিধুভূষণের বস্ত্রাদি তাদৃশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়েছে। যে দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার পূর্বে আব দুইটি ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল, তাহাও বলা হইয়াছে। সে দুইটি ব্রাহ্মণের বস্ত্রাদি অতি পরিস্কাব পরিচ্ছন্ন; কথোপকথনে টের পাইলেন, তাহারা কলিকাতার কলেজে অধ্যয়ন কবে। শীতের বন্ধের পর পুনর্বাব কলিকাতায় যাইতেছে।মুদীর স্ত্রী কায়মনোবাক্যে তাহাদেব পাকশাক ইত্যাদির 'তদ্বির। করিয়া দিতেছে। বিধুর কথা বড় শোনে না। দুবার কিংবা তিনবার না চাহিলে একটু তামাক কিংবা জল দেয় না। কোথায় পাক করিবেন, জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিল, ''ঐ খোন্তা আছে, ঘরের ঐ কোণে একটা উনুন কাট, ঐ মাচার উপব হাঁড়ি আছে একটা নেও, ঐ বারান্দায় কাঠ আছে, এনে বাঁদাবাড়া করা।'' এই বলিয়া মুদীব স্ত্রী অপব দুজন ব্রাহ্মণের জন্য হাঁড়ি, জল, কাঠ, ইত্যাদি আনিয়া দিল।

মুদীর স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিধুভূষণেব সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন, ''আমি যদি সব কবব, তবে এখানে এসে আমার লাভ কি?''

মুদীর স্ত্রী মিষ্টি করিয়া কহিল, ''এখানে কোন লাভ না হয়, যেখানে হয় সেইখানে যাও। আমি তো তোমায় বাড়ী থেকে আনতে যাই নি।''

বিধুভূষণ দেখিলেন, এ তাঁহার নিজেব বাটী নহে। রাগ করিলে এখানে কেহই তাঁহার রাগ গ্রাহ্য করিবে না। মনের আগুন মনে রাখিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া রসিকতা ছলে কহিলেন, ''অত চটলে চলবে কেন! তুমি চটলে আমবা দাঁড়াই কোথা?''

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে মুদীর স্ত্রী তাঁহাব বসিকতায় বিবক্ত হইয়া উত্তর করিল, ''আর তোমার পিরীতে কাজ নাই, খোন্তা নিয়ে উনুন কেটে বেঁধে খেতে হয় খাও, না হয় এই বেলা জায়গা দেখ।''

বিধুর আর বরদাস্ত হইল না। বাগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ''তুই ভেবেছিস, এই দোকান ছাড়া বুঝি আর দোকান নাই। চললাম তোর এখান থেকে।'' এই বলিযা ব্যস্ত হইয়া বাহির হইবেন, এমন সময় মুদী বাটী আসিল, এবং মাথার মোট নামাইযা জিজ্ঞাসা করিল, ''তোমরা কিসের গোলমাল করছ?'' মুদীব স্ত্রী কহিল. ''ঐ দেখ, কোথাকার এক খদ্দেব এসেছে, যেন নবাব আর কি. আপনার উনুন আপনি কেটে বেঁধে খেতে পারবে না।''

মুদী বিধুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ''তোমবা, আপনারা?''

বিধু কহিলেন, ''ব্রাহ্মণ।''

মুদী। ব্রাহ্মণ, প্রণাম। আচ্ছা, আমি উনুন কেটে দেব এখন। বসো, ঠাকুব বসো।

বিধুভূষণ বসিলেন।

গোলমাল থামিলে নীলকমল বলিয়া উঠিল, ''মুদীনীর আবার জাঁক দেখ। না দেয় জায়গা, না দেয় আসন, এখনি আমরা অন্য দোকানে যাব।'' কিন্তু এ কথা পূর্বে বলিতে ভরসা হয় নাই।

যে দুটি ব্রাহ্মণের জন্য মুদীর স্ত্রী এত ব্যস্তসমস্ত হইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল, তাঁহারা অল্পবয়স্ক; ১৯।২০ বৎসরের বেশী নহে। উভয়েই ব্রাহ্ম। এই গোলযোগের সময় তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন। অর্থাৎ একজন অতি মৃদুস্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। তাঁহার মুদিত নেত্র হইতে অশ্রুধারা বহিতেছিল। আর একজন হেঁট মুণ্ডে একবার মুদীনীর দিকে সতৃষ্ণনয়নে, আর একবার নিজ সঙ্গীর দিকে সভয় নেত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেঁদে কেঁদে চক্ষের জল দ্বারা সে অগ্নিটুকু সত্বরই নির্বাণ করিয়া ফেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার কিঞ্চিৎ পূর্বে এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে; আড়াই বৎসর মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিয়া পরে চক্ষের জলে নিবিয়া যায়।

মুদীর প্রবেশমাত্রেই যে ব্রাহ্মণটির চক্ষু বাতাসে বিলোড়িত দীপশিখার ন্যায় একবার এদিক্ একবার ওদিক যাইতেছিল, তিনি একাগ্রচিত্তে উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। মুদী তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ''এরা কারা?'' তাহার সহধর্মিণী উত্তর করিল, ''এরা ব্রাহ্মণ, কলেজে পড়ে। এখন ওদের কিছু বলো না, ওরা পরমেশ্বরের নাম করছে!''

মুদী বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রীকে কহিল, ''ওদের আমার ঘরে কে জায়গা দিলে? ওরা ব্রাহ্মণ তোকে কে বললে, দেখতে পাচ্ছিসনে, সব ধর্মঘট করছে? ওদের কি জাত আছে?'' পরে ব্রাহ্মদ্বয়ের প্রতি, '' ওগো, আপনারা ব্রাহ্মণই হও, আর যাই হও, এখন ওটো। আমার ঘরে রান্নার জায়গা হবে না, আমি হিন্দু মানুষ ধর্মঘট-টট কিছু বুঝিনে। ওটো ওটো।''

মুদীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মদ্বয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন সম্মুখে পাঁচ হাত লম্বা এক প্রকাণ্ড মুদীর মূর্তি রাগত হইয়া তাঁহাদিগকে উঠিয়া যাইতে কহিতেছে। অন্ধকার রাত, অজ্ঞাত স্থান! কোথায় যান?

উভয়েই সকরুণ স্বরে কহিলেন, ''আমরা ধর্মঘট করছি তোমাকে কে বললে আমাদের কলেজের পড়া মুখস্ত করিতেছিলাম।''

''পড়াই পড়, আর ধর্মঘট কর, আমার এখানে তোমাদের জায়গা হবে না।'' যে ব্রাহ্মটি উপাসনার সময় একাগ্রচিত্তে এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহার মনে হইল, মুদীর রাগ যেন তাঁহারই উপর বেশী—কথা কহিবার সময় যেন তাঁহারই দিকে চাহিয়া কহিতেছে, এজন্য তিনি নয়নদ্বয় উত্তোলন করিলেন না। উভয়ের উঠিতে অনিচ্ছা দেখিয়া মুদী অগ্রে তাঁহারই হাত ধরিয়া কহিল, ''আমি ভাল-তরে বলছি, এই বেলা ওটো, না ওটো যদি তবে একটা গোলযোগ হবে।'' এই বলিয়া মুদী ঘরের কোণের দিকে চাহিল। কোণে একগাছি স্থূলকলেবরা তালযষ্টি ছিল।

ব্রাহ্মণদ্বয়ও সেইদিকে দৃষ্টি করিলেন এবং দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া গৃহ হইতে বাহিবে আসিলেন।

ঘর পরিষ্কার হইলে মুদী তাহার সহধর্মিণীকে কহিল, ''বড় ধুম, যেন বাড়ীতে কুটুম এসেছে, না? ওরা কে? তোর ভাই নাকি যে তুই দোকানের কাজ ফেলে, দুটো ভাল খদ্দের তাড়িয়ে ইষ্টিদেবতার মতন ওদের সেবা কচ্ছিস্?''

মুদীপত্নী চুপ করিয়া বইল। বোধ হয় তাহার সহিত কথা কহিবার সময়ও মুদী গৃহের কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল।

এইরূপে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া গেলে মুদী তামাক খাইতে আবম্ভ কবিল, বিধু পাকশাকের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন ও নীলকমল গুন গুন কবিয়া ''পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে'' ধরিল। ব্রাহ্মণদ্বয় আস্তে আস্তে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণদ্বয় চলিয়া গেলে, নীলকমলেবও ঘরের মধ্যে স্থান হইল। বিধুভূষণ বন্ধন কবিলেন। উভয়ে আহারাদি করিযা শুইলেন।

বিধুভূষণ আর কখন বাটীর বাহির হন নাই। নূতন স্থান ও বাটীর ভাবনা প্রযুক্ত তাঁহার ঘুম হইল না। নীলকমল শয্যায় শয়ন করিবামাত্রই নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। একে দোকান-ঘব; চারিদিকে খোলা, তাহাতে সম্মুখে কতকগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, আবার রাত্রিকাল, সমুদয় নিস্তব্ধ। গাছের পাতাব একটু একটু শব্দ হইলেই যেন দশগুণ হইয়া বিধুর কানে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। চাম্‌চিকাগুলো উড়িতে আরম্ভ করিল। বিধুর কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল——''নীলকমল'' 'নীলকমল'' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে নীলকমল কহিল, ''তুমি যে আমাকে বিরক্তই কল্লে।''

বিধুভূষণ কহিলেন, ''নীলকমল, একবাব তামাক খাও। অত ঘুমুচ্ছ কেন? বিদেশে, বিশেষ রাস্তায়, বেশী ঘুমান ভাল নয়।''

''বিদেশে রাস্তায় অত ঘুমান ভাল নয়। কেন, মন্দই বা কি? আমার কি আছে যে চোরে নিয়ে যাবে?''

বিধু কহিলেন, ''তা নয় নীলকমল! আমিও বিদেশে এসেছি। কিন্তু তোমাব একটা গুণ আছে, অনায়াসে দু-টাকা করতে পাববে কিন্তু আমার তো কোন গুণ নাই। যদি তুমি বেহালাটা আমাকে শেখাও, তোমার কাছে চিরকাল কেনা রবো।''

নীলকমল বেহালা ও গানের নামে জল হইয়া যাইত। প্রফুল্লচিত্তে কহিল, ''হাঁ শেখাব, তার ভাবনা কি? আজ কি আরম্ভ করব।''

''শুভস্য শীঘ্রং।'' বিধুভূষণ কহিলেন, '' যা শেখা উচিত, তা এখন আবম্ভই ভাল।''

নীলকমল বেহালাটি লইয়া দুই-চারিবার তাহার কানমোড়া দিয়া আরম্ভ কবিল। কহিল, ''আমি, যেমন বাজাই ও গাই, তুমি আগে স্থির হয়ে শোন; পরে তুমি শিখতে পারবে।'' এই বলিয়া নীলকমল ''পদ্ম-আঁখি'' ইত্যাদি আরম্ভ করিল, বিধুভূষণ ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

হেম ও স্বর্ণলতা

বর্ধমান জেলায় বিপ্রদাস চক্রবর্তী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার পৈতিক সম্পত্তি অধিক ছিল না বটে, কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে তিনি কমিসারিয়েটে কর্ম করিতেন। এই কার্যই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির মূল। নূতন বড মানুষ হইলে প্রায়ই কৃপণ হয়; কিন্তু বিপ্রদাসের সে দোষটি ছিল না। তাঁহার সদ্ব্যয যথেষ্ট ছিল। দেবসেবায ও অতিথিসেবায় তাঁহার অনেক টাকা ব্যয হইত। বাটীতে কোন পার্বণ ফাঁক যাইত না। দোল-দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি আস্থা ছিল। সংক্ষেপে তিনি একজন যথার্থ "সেকেলে" ধার্মিক ছিলেন। অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের সময কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিতেন না। এ টাকা লওয়া উচিত নয়, এ টাকা লইলে ক্ষতি নাই, এরূপ কোন চিন্তা করিতেন না। টাকা পাইলেই গ্রহণ করিতেন, এবং ঐ অর্থ দেবসেবা ইত্যাদিতে ব্যয করিতে পারিলেই সার্থক উপার্জন জ্ঞান করিতেন। তাঁহার সহধর্মিণীর পরলোক হওয়া অবধি বিপ্রদাস কার্য পরিত্যাগ করিযা বাটীতেই থাকিতেন। তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা, পুত্রটির নাম হেমচন্দ্র, কন্যাটির নাম স্বর্ণলতা। তাঁহার ন্যায অপত্যবৎসল লোক সচরাচর দেখা যায না।

পূজার সময় যাহারা বিদেশে থাকে, সকলেই বাটী আসিযাছে।

হেম বাড়ী আসিযাছে। মা নাই বলিযা পাছে আদরের ত্রুটি হয়, এজন্য বিপ্রদাস নিজে দুবেলা আহারের সময হেমের কাছে বসিয়া থাকেন। তাঁহার মাতাকে কহেন——বিপ্রদাসের মাতা অদ্যাপি জীবিত আছেন——"মা, আমি তোমার যেমন আদরের জিনিস, হেমও আমার কাছে তেমনি। যখন যা চায়, হেমকে তখনই তাই দিও।"

এক দিবস বিপ্রদাস স্বর্ণকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আজ আমার স্বর্ণ কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?"

স্বর্ণ পাশের ঘরে ছিল। পিতার মুখে তাহার নাম শুনিয়া দৌড়িয়া হস্ত প্রসারণ পূর্বক তাঁহার নিকটে আসিল। কহিল, "এই যে বাবা! আমরা মাঝের ঘরে ছিলাম।"

বিপ্র। এস, মা এস। আমার লক্ষ্মী মা এস। এ কি মা, সমস্ত হাতে মুখে কালি মেখেছ কোথা থেকে?

স্বর্ণ। আমি দাদার কাছে লিখতে শিখছিলাম, দাদা আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল।

বিপ্র। তুমি লিখতে শিখছ। তোমার লেখায় দরকার কি?—এই বলিতে বলিতে হেমও তথায় আসিল।

হেম কহিল, "তাতে দোষ কি? এখন সকল মেয়েই লেখাপড়া করে। কলিকাতায় কত স্কুল হয়েছে, সেখানে কেবল মেয়েরাই পড়ে।"

বিপ্রদাস কহিলেন, ''আচ্ছা বাপু, তোমরা যা ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু তুমি ক'দিনই বা বাড়ী থাকবে? তুমি কলিকাতায় গেলে তখন কে শেখাবে?''

হেম। স্বর্ণ তখন আপনিই শিখতে পারবে। এই তিন চার দিনের মধ্যেই ক, খ লিখতে শিখেছে। আমি কলিকাতায় যাবার আগে ওর ফলা-বানান শেষ হবে।

বিপ্র। বটে? আমার লক্ষ্মী যে মা সরস্বতী হয়েছেন। (ক্রোড়স্থিত স্বর্ণের প্রতি) স্বর্ণ মা, তুমি আমার মা লক্ষ্মী হবে, না মা সরস্বতী হবে?

স্বর্ণ। আমি দুই হবো বাবা।

বিপ্রদাস সস্নেহ নয়নে স্বর্ণলতার প্রতি ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত হইল। পরে শিরশ্চুম্বন করিয়া স্বর্ণলতাকে ভূমে নামাইয়া দিয়া কহিলেন, ''আচ্ছা যাও, তোমার দাদার কাছে গিয়া লেখাপড়া শেখ।'' হেম স্বর্ণের হাত ধরিয়া লইয়া যে গৃহে তাহাকে শিখাইতেছিলন সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিপ্রদাস বহির্দ্বারে আসিলেন।

পূজা সমাগত হইল। মহোৎসবে তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। যতই কেন আমোদ হউক না, যতই গোলযোগ হউক না, বিপ্রদাস এক মুহূর্তের জন্যেও হেম ও স্বর্ণলতার নাম বিস্মৃত হন না। পূজার পর স্কুল খোলা হইলেই হেম পুনর্বার কলিকাতায় গেলেন। স্বর্ণ যথার্থই অতি অল্প দিনের মধ্যে ফলা-বানান শেষ করিল। হেম কহিয়া গেলেন, ''স্বর্ণ, আমি কলিকাতায় গিয়াই তোমার জন্য একখানা বই পাঠাইয়া দিব। আর যদি তুমি আমাকে লিখতে পার, তবে চৈত্র মাসে যখন বাড়ী আসব, তোমার জন্যে দিব্বি একটি খোঁপার ফুল আনব।''

স্বর্ণ সহাস্য বদনে কহিলেন, ''এই কথা তো দাদা! যেন মনে থাকে।''

হেম। তা থাকবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রমদা গৃহকার্যের সদুপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—শশিভূষণের সেজন্য ভাবনা নাই

বিধুভূষণকে পৃথক করিয়া দিয়া প্রমদা তিন চারি দিবস বিনা কলহে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু যেমন অঙ্গারের মলিনত্ব শতবার ধৌত করিলেও যায় না, তেমনি স্বভাবের কখন পরিবর্তন হয় না। প্রমদা ঠাক্‌রুণদিদির প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ঠাক্‌রুণদিদি না কি তেল নুন চুরি করেন, ঠাক্‌রুণদিদি কালো, ঠাক্‌রুণদিদি অপরিষ্কার। প্রমদা এ সকল কথা কি ঠাক্‌রুণদিদির মুখের উপর বলিতেন? তা নয়, মুখের উপর বলিলেই ঠাক্‌রুণদিদি হাঁড়িকুঁড়ি ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন, প্রমদা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। এজন্য পাড়ার অন্যান্য লোকের সহিত এ সমস্ত আলাপ হইত এবং তাহারা অবিলম্বেই এ সমুদয় কথা ঠাকরুণদিদিকে কহিত। ঠাক্‌রুণদিদি একদিন

মুখ ভার করিলেন, পরদিন দুই একটি অসন্তোষের কথা কহিলেন। তৃতীয় দিবস প্রমদার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিবেন ঘোষণা করিয়া দিলেন। কেনই বা না করিবেন? তিনি তো সরলার ন্যায় পরাধীন নন? পরদিবস বৈকালে মহা ঝগড়া উপস্থিত হইল। প্রমদাও চুপ করিবার লোক নন, ঠাক্‌রুণদিদিও নন? এক জন অপরকে পরাস্ত করিবারও জো নাই। উভয়েই কলহবিদ্যাবিশারদ। ঠাক্‌রুণদিদি অনেকক্ষণ ঝগড়ার পর দুই হাতের দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রমদার মুখের কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি তোর দাসী, না তোর রাধুনী যে, যা মনে আসছে, তুই তাই বলচিস্, এই থাকল তোর বাড়ী-ঘর আমি চল্লাম। তুই রেঁধে খাস আর না খাস, তোরই ইচ্ছা, আমার কি"——এই বলিয়া ঠাক্‌রুণদিদি শশিভূষণের বাড়ী ত্যাগ করিলেন। প্রমদা কখন সমকক্ষ লোকের সহিত কলহ করেন নাই। সুতরাং এতদিন পরাস্তও হন নাই। আজ এই প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধে পরাভূত হইলেন।

ঠাক্‌রুণদিদি চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রমদা একাকিনী গৃহে বসিয়া রোদন করিলেন। পরে চক্ষু মার্জনা করিয়া বাহিরে আসিলেন। আজকার বিবাদে অভিমান খাটিবে না, এজন্য নিজহস্তেই কাজকর্ম করিতে লাগিলেন।

শশিভূষণ নির্দিষ্ট সময়ে বাটী আসিলেন। সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাক্‌রুণদিদি কোথায়?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "ঠাক্‌রুণদিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছি।" ঠাক্‌রুণদিদি নিজেই চলিয়া গিয়াছেন বলিতে প্রমদার কোন মতেই ইচ্ছা হইল না, বস্তুতঃ তাহাই সত্য।

শশিভূষণ কহিলেন, "কেন, ঠাক্‌রুণদিদির অপরাধ?"

প্রমদা যাহা মনে আসিল, তাহাই বলিলেন। বিধুভূষণকে পৃথক করিয়া দিবার সময় ঠাক্‌রুণদিদি বড় ভালমানুষ ছিলেন, কিন্তু দশ দিন হইতে না হইতেই ঠাক্‌রুণদিদির এতগুলি দোষ উপস্থিত শুনিয়া শশিভূষণ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কখন কারে স্বর্গে তোল, আর কখন কারে নরকে ফেল, টের পাওয়া ভার। এখন দেখতে পাচ্ছি, না খেয়ে মরতে হবে। তোমার ব্যাম, তুমি পারবে না; আমারও বাঁধবার শক্তি নাই। এখন উপায়?"

প্রমদা কহিলেন, "সেজন্য তোমার ভাবনা কি? তোমার তো সময়ে আহার হলেই হলো?"

শশি। আমার নিজের আহারের জন্য ভাবি না। ছেলেটা আর মেয়েটা আছে তারা পাছে ঘরে চাল থাকতে মারা যায়।

প্রমদা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "পরকে দিয়ে কি কাজ চলে? কাল মাকে আনব; আমি কষ্ট পাচ্ছি শুনলে তিনি অবশ্যই আসবেন। তা হলেই তোমার ভাবনা চুকে গেল।"

প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণ যেন মুহূর্তমধ্যে জড়পদার্থের ন্যায় হইলেন এবং কি বলিতেছেন, না টের পাইয়া কহিলেন, "কেনই বা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম?"

কারণ, প্রমদার মাকে আনা যে সহজ ব্যাপার নহে, শশিভূষণ ইতিপূর্বে তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। প্রথমতঃ মা আসিবেন পরে বৈকালে প্রমদার ভ্রাতা আসিবেন—তাঁহাকে কাজে কাজেই আসিতে হইবে। তিনি বাটী থাকিলে তাঁহাকে কে রাঁধিয়া দিবে? পরদিবস সূর্যদেব উঠিতে না উঠিতে প্রমদার মামা আসিবেন, তিনি একাকী নির্জন পুরীতে থাকিতে ভালবাসেন না। শশিভূষণ যেন নিমেষের মধ্যেই এ সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া কহিলেন, ''কেনই বা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম?''

প্রমদা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ''তুমি পৃথক করিয়া দিলে, তুমিই তার কারণ জান। আমি পৃথক করেও দিইনি, তার কারণও জানি নে।''

শশিভূষণ কিছু উত্তর করিলেন না। চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রমদা বলিয়াছিলেন মাকে আনিলে আর ভাবনা থাকিবে না; সেইজন্যই বুঝি শশিভূষণ যত ভাবনা অগ্রেই ভাবিয়া রাখিতেছিলেন।

প্রমদা শশিভূষণকে চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, ''কেনই বা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম?'' ''কেন দিয়াছিলে, তা তুমিই জান। আমার কি দোষ? আমি তো তখনই বলেছিলাম, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এখনও বলছি। দাও, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তোমরা একত্র হও। কত লোকে তাও তো হয়। একবার পৃথক হইলেই যে জন্মের মত পৃথক হয়, তাও তো নয়।''

প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণের চৈতন্য হইল। বুঝিতে পারিলেন অপরাধ হইয়াছে। প্রকাশ্যে কহিলেন, ''আমি তো আর কিছু বলিনি, কেবল———''

প্রমদা। কেবল কি? আমি তোমার ও বাঁকা-চুরা কথা বুঝতে পারি না। যা বলবার হয়, একবারে বলে ফ্যালো। আমি বকে মরি সুদ্ধ তোমারই ভালর জন্য বৈ তো নয়। আমার কি? আমি এখানে থাকলেও তুমি চারটি না দিয়ে আর থাকতে পারবে না, সেখানে গেলেও তারা আমাকে ফেলে খেতে পারবে না।

বোধ হয় বাপের বাড়ীর কথা লইয়া পূর্বে কি হইয়া গিয়াছিল, প্রমদার তাহা স্মরণ ছিল না। সে কথা মনে থাকিলে আর বাপের বাড়ীর নাম করিতেন না; কিন্তু শশিভূষণ তাহা বিস্মৃত হন নাই। এজন্য তিনি আর সে বিষয় সম্বন্ধে কিছু কহিলেন না। ক্ষণকাল উভয়েই নীরবে থাকিয়া শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ''বিপিন কোথায় গেল? কামিনীই বা কোথায়?''

প্রমদা উত্তর করিলেন, ''বিপিন তার মামার বাড়ী গিয়াছে। কামিনী ঐ শুয়ে আছে।''

শ। শুয়ে আছে? রাত্রে কিছু খাবে না?

প্র। কি খাবে? কে রাঁধবে?

শ। আর কেউ না রাঁধে আমিই রাঁধবো। সব গোছানগাছান আছে তো?

প্র। গোছাগাছান আর কি? ও বেলার সবই আছে, চারটি ভাত হলেই হয়।

প্রমদা কিঞ্চিৎ পরে, ''উঃ, আজ আমার অসুখটা কিছু বেড়েছে'' এই বলিয়া শয়ন করিলেন। শশিভূষণ রান্নাঘরে গিয়া তত্রত্য দারোগাগিরি কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

দস্তুরমত প্রমদার ভাতের থালাটি ঘবে আসিল। বারংবার ডাকাডাকির পর প্রমদা মুখ বাঁকা করিয়া গিয়া আহার করিতে বসিলেন। শশিভূষণ মনে কবিতে লাগিলেন, ইহাতেও যদি মন না পাই, তবে আব কিসে পাব? এই ভাবিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। প্রমদার আহার হইল। অসুখ বাড়িয়াছে বলিয়া যে এক দানা কম খাইলেন, তাহা নয়। রোজই যে পরিমাণ খাইতেন, অদ্যও তাই খাইলেন। আহারেব পর আচমন করিলেন, কিন্তু এতাবৎ একটিও কথা কহিলেন না। কিযৎক্ষণ পরে শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপিনকে তো বলে দিলেই হতো, সে তোমার মাকে ডেকে আনত।"

এই কথা কহিয়া প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা কবিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রমদা চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় অবাক হইয়া থাকিলেন। ফলতঃ বলিবাবও কোন কথা ছিল না। মাকে আনিবার জন্যই বিপিনকে পাঠান হইয়াছিল।

শশিভূষণ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দুই একটা হাই ছাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নাসিকাশব্দ করিয়া নিদ্রিত হইলেন। প্রমদাও শয়ন করিলেন। নিদ্রায় রজনী অতিবাহিত হইল।

প্রমদা বলিয়াছিলেন, "আমি কষ্ট পাইতেছি শুনিলে মা অবশ্যই আসবেন।" কার্যতঃ প্রমদার মাতা সে পর্যন্তও শুনিতে অপেক্ষা করিতেন না। যে প্রকারে হউক, একটা খবর পাইলেই যেখানে থাকুন অমনি পাখীর ন্যায় উড়িয়া আসিতেন । বিপিনেব নিকট যখন শুনিলেন প্রমদা ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, তিনি তখনই আসিতেন কিন্তু তাঁহাব পুত্র তৎকালে বাড়ী না থাকায় সে দিবস আসা রহিত করিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কতক্ষণে রাত পোহাবে"; এবং পুত্রের অনুপস্থিত থাকার জন্য সে দিবস যাওয়া না হওয়ায় মনে মনে তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এমন সময় গদাধর আসিয়া বাটী উপস্থিত হইলেন। প্রমদার ভ্রাতার নাম গদাধব।

গদাধর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, অন্নাভাবে কৃশকলেবর। মস্তকটি ক্ষুদ্র, নাসিকা পর্যন্ত কেশে আবৃত, গলাটি লম্বা, পা দুখানি কূলার মত, লেখাপড়া সম্বন্ধে মা সরস্বতীব বরপুত্র বলিলেই হয়। প্রমদার মা সেজন্য বড় দুঃখিত। যখন তখন কহিতেন, "যারা লেখাপড়া শেখাবে, তারা ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না, তবে আর কেমন করে গদাধরের বিদ্যা উপার্জন হবে।" প্রমদার মাতার বিবেচনায় গদাধরকে লেখাপড়া শেখান প্রমদার একটি অবশ্য-কর্তব্যকর্ম।

আর একটি কথা বলিলেই গদাধরের রূপ-গুণের সমুদয় পরিচয় দেওয়া হয়, অর্থাৎ তিনি "ত"-বর্গ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না এবং তৎপরিবর্তে "ট"-বর্গ প্রয়োগ করিতেন।

সন্ধ্যার পর বাটি আসিয়া বিপিনকে দেখিয়া কহিলেন, "কি বিপিন, টুমি কি মনে করে? কখন এলে?"

বিপিন উত্তর না দিতেই গদাধরের মাতা কহিলেন, ‘‘তুমি এমন সময় কোথায় গিয়াছিলে, গদাধরচন্দ্র?’’ প্রমদা ও প্রমদার মা উভয়েই ‘‘গদাধরচন্দ্র’’ বলিয়া ডাকিতেন, কখনই তাহার অন্যথা হইত না। পাড়ার লোকে কিন্তু ‘‘গদা’’ ছাড়া আব কিছুই বলিত না। ‘‘তুমি কোথায় গিয়াছিলে, গদাধরচন্দ্র? দেখ দেখি, বিপিন এসেছে—কি খাবে, কি হবে, তার কোন উদ্যোগ করলে না, লোকে কি বলবে বল দেখি?’’

গদাধর উত্তর করিলেন, ‘‘আমি কোটায় গিয়েছিলাম, টাটে টোমাব কাজ কি? আমি কাজে ছিলাম। বিপিনের খাবার ভাবনা কি, আমরা যা খাই, বিপিনও টাই খাবে। এটো বিপিনের পরের বাড়ী নয়। বিপিন, বিপিন টামাক খেয়েছ?’’

বিপিন। আমি তামাক খাই নে।

গদা। টুমি খাও না, আমরা টো খাই। মা, একটু টামাক সাজ।

গদাধরচন্দ্র আদরের ছেলে। নিজহাতে কখন তামাক সাজিয়া খান নাই। তাঁব মাতা খাইতে দিতেন না, তামাকের পিপাসা হইলে তিনি নিজে সাজিয়া দিতেন। গদাধবের মা তামাক সাজিতে আরম্ভ করিলে গদাধর ইত্যবকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘বিপিন, টবে কি মনে করে এসেছ?’’

বিপিন। ‘‘দিদিমাকে নিতে এসেছি।’’

গদাধর সহাস্য বদনে কহিলেন, ‘‘মা শুনলি, টুই যে সেডিন বলছিলি, প্রমডাব ডয়া মায়া নেই, কখন ডেকেও পাঠায় না আর খরচপট্র ডেয় না। এই ড্যাক, ডেকে টো পাঠিয়েছে।’’

বিপিনের সম্মুখে গদাধর এরূপ বলায় গদাধবের মা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইযা কহিলেন, ‘‘গদাধরচন্দ্র, তোমার কি এজন্মেও বুদ্ধি হবে না? আমি কবে ওকথা বলেছিলাম?’’

গদাধর। আমার বুড্ডি নেই, টোমার টো আছে, টা হলেই আমার হবে। কিন্টু টোমার মনে ঠাকে না, এই একটা ডোষ। সেডিন টুমি এ-কটা বল্লে, আজ বল, না।

এই সময় গদাধরের মা তামাক সাজিয়া গদাধরকে হুঁকা দিলেন, গদাধরচন্দ্র হুঁকা পাইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন, উপস্থিত কথা ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল তামাক টানিয়া মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘‘মা, একটা ডায় বেঁচে গেলাম, ডিডিডের বাড়ী গেলে আর একটু টামাকের জন্যে টোমার খোসামোড কবটে হবে না।’’

গদাধরের মা। গদাধরচন্দ্র, তোমাব কি বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে?

গদা। টবু ভাল টুমি বল্লে আমার বুড্ডি লোপ পেয়েছে। টবে আমার এককালে বুড্ডি ছিল। এইডিন টো আমার বুড্ডি নেই বোলে টুমি মোরছিলে।

গদাধরের মাতা কহিলেন, ‘‘হ্যাঁ, তোমার খুব বুদ্ধি আছে, এখন দেখ দেখি, জেলেপাড়ায় চাট্টি মাছ পাওয়া যায় কি না। বিপিন এসেছে, ওকে চারটি খাওয়াতে হবে তো।’’

গদা। কেন, ডিডি যে ডাল পাঠায়ে ডিয়েছিল, টা নেই?

গদাধরের মা সক্রোধে গদাধরের মুখের দিকে তাকাইলেন, অর্থাৎ সেসব কথা বলিতে বারণ করিলেন। কিন্তু গদাধর ভয় পাইবার লোক নন। তিনি কহিলেন, ''অমন চোক গরম করে কাকে ভয় ড্যাকাও? আমি বুঝি জানি নে। সেডিন ডাল এসেছিল, সে কি মিঠ্‌ঠে কঠা? সেই ডাল রেঁডো, এখন আমি রাট্রে কোনখানে মাছ আন্টে যেটে পারব না।''

গদাধরের মা সক্রোধে ভ্রূকুটি করিয়া ''গদাধরচন্দ্র—''

গদা। কেন, গডাঢরচন্দ্রকে কেন, এই টো গডাঢরচন্দ্র আছে, টোমাব ভয়ে পালাবে না। গডাঢরচন্দ্র পালাবার ছেলে নয়, কিন্টু যডি বিবক্ট কর, টবে সব কঠা বলে ডেবে।

গদাধরের মা অনুপায় দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। গদাধর তামাক খাইতে খাইতে বিপিনের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন এবং সেই কথোপকথনে আহারেব সময় পর্যন্ত অতিবাহিত হইল। আহারান্তে গদাধর ও বিপিন শযন করিলেন। গদাধবেব জননী ঘবের সমস্ত জিনিসপত্র গোছাইতে লাগিলেন। এবং পরদিবস গমনেব জন্য বস্ত্রাদি নির্বাচন করিলেন। সমস্ত গোছান হইলে তিনিও নিদ্রিতা হইলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে শশিভূষণ শয্যা হইতে উঠিযাছেন, এমন সময়ে ''ডিডি ডিডি'' ববে গদাধরচন্দ্র দেখা দিলেন। তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গদাধবচন্দ্রেব মাতা, সর্বশেষে বিপিন। একে একে তিন জন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কবিলেন। গদাধবকে দেখিযা শশিভূষণেব মনোমধ্যে যে ভাবের উদয় হইল, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন; সহজেই তাহা অনুভূত হইতে পারে। আপাদমস্তক পর্যন্ত তাঁহার কলেবর ঈষৎ কম্পিত হইল। বোধ হয লঘুপতনক, ''দ্বিতীয়কৃতান্তমিব'' ব্যাধকে দেখিযা যত অনিষ্টের আশঙ্কা না করিযাছিল, শশিভূষণ সহধর্মিণীর প্রিয়তম ভ্রাতাকে দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক ভীত হইলেন।

প্রমদা ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া জননী ও ভ্রাতাকে সমাদবে বসাইযা বাটীর সমাচার জিজ্ঞেস কবিতে লাগিলেন। গদাধরচন্দ্র ক্ষণকাল বসিয়া বাটীর চতুর্দিকে পবিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গদাধরচন্দ্র যে বাটীতে থাকেন, সেখানে কোন দ্রব্য গোপন করিয়া রাখিবার জো নাই। তাঁহাব চোখ তাহাতে পড়িবেই পড়িবে; বিশেষ যদি খাবার জিনিস হয়।

শশিভূষণ মনে মনে যারপরনাই বিরক্ত হইয়া কাছারি চলিয়া গেলেন। প্রমদা ''ষোড়শোপচারে'' আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রমদার জননী পাকশাক করিয়া নিয়মিত সময়ে আহার করিলেন। বাটীর অন্যান্য সকলেরও আহার হইযা গেল।

শশিভূষণ এই অবধি আপনার বাটীতে আপনি পরাধীনের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। গদাধরচন্দ্রের মাতা বাটীর একমাত্র কর্ত্রীস্বরূপ হইলেন। গদাধরচন্দ্র স্কুলে বিদ্যাভ্যাসের কারণ ভর্তি হইলেন। প্রমদা পরম সমাদরে সকলকে আহাবাদি করাইতে লাগিলেন; কি জানি ত্রুটি হইলে পাছে লোকে নিন্দা করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সরলার বিরহ ; শ্যামার বিক্রম

কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থকর্তা বলিয়াছেন, ''মৃত্যুকালে যে মহাবিরহ ঘটিবে, তাহাই মনে হয় বলিয়া আমাদের সামান্য বিরহে কষ্ট বোধ হয়।'' এ কথা সঙ্গত বটে। নচেৎ দুঃখের তো কোন কারণই নাই। জানিতে পারিতেছি, আমার ভাই, বন্ধু আজ বাটী হইতে যাইতেছে, আবার প্রয়োজন সমাপ্ত করিয়াই প্রত্যাগত হইবে। কিন্তু তথাপি যে মন প্রবোধ মানে না, তাহার কারণ, সেই মহাবিরহের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন কেহ আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যায়, তখনই যে আমরা মৃত্যুচিন্তা করিয়া থাকি এমন নহে; কিন্তু তাহা না করিলেও বিরহবেদনার যে সেই মূল কারণ, তাহা নিশ্চয়। তুমি কাহাকে পাঁচ টাকা দান করিলে তোমার কোন কষ্ট বোধ হয় না; তোমার দশ টাকা হারাইয়া গেলেও তোমার বিশেষ দুঃখ হয় না, কিন্তু বাজারে যদি চারি পয়সার জিনিস কিনিতে তোমার নিকট হইতে ঠকাইয়া ছ পয়সা লয়, তাহাতে তোমার মর্মান্তিক কষ্ট হয়। কেন? কারণ, তোমার মনে হয়, তোমাপেক্ষা দোকানী অধিক চতুর, অধিক বুদ্ধিমান। লোকে নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিতে চায় না। ঠকিয়া আসিলে নিজের ন্যূনতার স্পষ্টাক্ষরে পরিচয় দেওয়া হয়, এবং সেইজন্যই এত মনঃকষ্ট হয়। কিন্তু ঠকিয়া আসিলে কি কেহ এরূপ তর্ক করিয়া থাকে? ইহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, আমাদের মনে অনেক সময় অনেক ভাবের উদয় হয়। সেই সেই সময় ঐ সমস্ত ভাবের কারণ সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারি না, অথবা ঐ কারণের অনুসন্ধানও করিয়া দেখি না।

বিধুভূষণ বাটী হইতে চলিয়া গেলে সরলার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ''কেনই বা যাইতে দিলাম! বাটী থাকিয়া যদি দুজনে একত্রে উপবাস করিতাম, তাহাও এ যন্ত্রণা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল ছিল।'' আবার ভাবেন, ''আমি কি স্বার্থপর! আমার জন্য তিনি কষ্ট পাইবেন, ইহাও আমার বাঞ্ছনীয় মনে হইতেছে? বিশেষ তাঁহাকে যদি অনাহারে থাকিতে হইত, তাহাও আমি কখনই দেখিতে পারিতাম না!'' কবে বিধুভূষণ কি মিষ্ট কথাটি কহিয়াছেন, কবে অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু বেশী ভালবাসার চিহ্ন দেখাইয়াছেন, সরলার মনে তাহাই উদিত হইতে লাগিল। বিধুভূষণ এক এক দিন রাগ করিতেন বলিয়া, সরলার কত কষ্ট হইত, তিনি কাহারও সহিত বিবাদ করিয়াছেন শুনিলে সরলার কত দুঃখ বোধ হইত, সে সমস্ত কথা এক্ষণে তাঁহার মনে হইল না। তাঁহার কবে কি ব্যামো হইয়াছিল, সরলার তাহাও স্মরণ হইতে লাগিল। বিদেশে যদি সেইরূপ পীড়া হয়, তাহা হইলে কে তাঁহার শুশ্রূষা করিবে? এই সমস্ত ভাবিয়া সরলা ছাতে বসিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতেছেন।

বিধুভূষণকে বাটীর মধ্য হইতে বিদায় দিয়া সরলা ছাতে গিয়া বসিয়াছিলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর অনিমিষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। বিধুভূষণও দু এক পা যান, আর ফিরিয়া ফিরিয়া ছাতের দিকে দৃষ্টি করেন। ক্ষণকাল এইরূপে গমন করিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তাঁহাদিগের দৃষ্টি অবরোধ করিল। বিধুভূষণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। সরলা ঐ ছাতেই বসিয়া রহিলেন। একবার ইচ্ছা করিলেন, ''দৌড়িয়া গিয়া এখনও ফিরাইয়া আনি, কিন্তু কি সুখভোগ করিতে আনিব? না, আমি নিজে অনাহারে মরি তাহাও ভাল, তবু তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইবে না। দিদির দাসী হইয়া থাকিলে যদি মুখ না করিয়া চারিটি চারিটি খেতে দিত, আমি তাহাও হইতে পারিতাম।'' সরলা এইরূপ ভাবিতেছেন। শ্যামা গৃহকর্ম সমস্ত সমাপন করিয়া পাকশাকের আয়োজন করিয়া দিয়া সরলাকে ডাকিতে গেল। বেলা এক প্রহর হইয়াছে, তথাপি সরলার হুঁশ নাই। শ্যামা নিকটে গিয়া কহিল, ''বলি ও ছোটগিন্নী, আর কারুর কি সোয়ামী নেই? না আর কেউ কখনও বিদেশে যায় নাই?''

শ্যামার ডাক শুনিয়া সরলার চৈতন্য হইল। ত্রস্ত হইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''শ্যামা, কি বলছ?''

শ্যামা। কি বলব? আজ কি আর গৃহস্থদের রান্নাবাড়া হবে না? না, তোমার খিদে নেই বলে আমরা সকলেই উপোস করব?

সরলা। শ্যামা, আমার যথার্থই খিদে নেই, তুমি গিয়া রেঁধে খাও, আমি আজ আর কিছুই খাব না।

শ্যামা। আমি খেলে তো আর গোপালের পেট ভরবে না, সে যে পাঠশালা থেকে আসছে, এসে কি খাবে?

সরলা। এত বেলা হয়েছে?

শ্যামা। বেলা হবে কেন, তোমার জন্যে সূর্য্যদেব বসে আছে?

সরলা সূর্যের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, যথার্থই অধিক বেলা হইয়াছে, তখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছাত হইতে নামিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন। পাকশাক হইল। গোপাল খাইল, সরলার ভাতের কাছে বসা মাত্র। শ্যামা আবার বাসন-ঘর মুক্ত করিল। সেদিন গেল, তার পরদিনও গেল। সরলার বিরহানল ক্রমে ক্রমে কম পড়িয়া আসিতে লাগিল। একেবারে যে নির্বাণ হইয়া গেল, তা নয়। কিন্তু সে পাবকের শিখা আর রহিল না। সময় কি চমৎকার চিকিৎসক! শোক-তাপ যদি চিরকালই সমান থাকিত, তাহা হইলে মানবজীবন কি দুঃসহ দুঃখময় হইয়া পড়িত!

বিধুভূষণ ও শশিভূষণের পৃথক্ হইবার দিনকতক পরেই গদাধরচন্দ্রের দল আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধুভূষণ যতদিন বাটীতে ছিলেন, গদাধরচন্দ্র অথবা তাঁহার জননী সরলার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, কিংবা তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতেও সাহস পান নাই। প্রমদা মাঝে মাঝে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন বটে, কিন্তু সরলা তাহা শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু এক্ষণে তিনজন একত্রে সাবেক বাকি সুদসমেত আদায় করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন। একদিবস প্রমদা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও শ্যামা, বলি তোমাদের বাবুজী মহাশয় কোথায় গেলেন, কাপড় ধার করতে, না টাকা ধাব করতে? আজকাল যে বড় গানবাজনাব কথা শুনতে পাইনে?"

শ্যামা কহিল, "যদি বেঁচে থাক, আর পরমেশ্বর তোমার চোক কান বজায় রাখেন, তা হলে শুনতে পাবে।"

প্রমদা শ্যামার কথায় ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "কি বললি?"

শ্যামা কহিল, "আজ মাসের ক'দিন, তাই জিজ্ঞাসা কল্লেম।"

প্রমদা। দেখলে, দেখলে মাগীর আক্কেলটা? থাকত যদি বাড়ী, তা হলে এখনি মুখখান জুতো দিয়ে সোজা করে দিতাম।

সরলা কহিলেন, "শ্যামা ক্ষান্ত দে, শ্যামা ক্ষান্ত দে। ওঁব মনে যা আসে উনি তাই বলুন না, তোর তো গা ক্ষয়ে যাবে না।"

শ্যামা কহিল, "কেন ক্ষান্ত দেব? উনি কোথাকাব কে!" উচ্চৈঃস্বরে প্রমদাকে সম্বোধন করিয়া "কথায় কথায় জুতো মাবব বল। এস, মাব না? আমারও হাত আছে।"

প্রমদা বাগে আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। "থাক্ থাক্, আসুক আগে বাড়ী, তখন তোর কত প্রতাপ দেখাব।"

শ্যামা। কত লোকে দেখিয়েছে, এখন বাকি আছ তুমি। এস না, এখনি দেখাও না? আর তার বাড়ী আসবার দরকার কি?

প্রমদা কথা না কহিয়া গৃহমধ্যে গিয়া বসিলেন। বাগে কর্ণের অগ্র পর্যন্ত রক্তিমাবর্ণ হইয়াছে, ফোঁস ফোঁস কবিয়া ঘনঘন নিশ্বাস বহিতেছে। হস্তপদ সর্বদা নাড়াব দরুন অলঙ্কারেব শব্দ হইতেছে। প্রমদার মাতা দেখিয়া শুনিয়া একবারে অবাক হইয়া বহিলেন। প্রমদাব মাতা সম্মুখ-সমরে সাহায্য করিতেন। কিন্তু শ্যামাব বিক্রম দেখিয়া তাঁহার ভবসা হইল না। তিনি এক্ষণে তনয়াব নিকটে বসিতে লাগিলেন—"মা, স্থিব হও, স্থিব হও। শিখান না থাকলে কি ছোটলোকেব মুখে এসব কথা বেরোয়, তলে তলে টিপ্‌নি আছে, তা তো তুমি টের পাও না। আজ বাড়ী এলে সব বলে দিও। দেখ তিনি কি বলেন। বাপ্ রে বাপ্, আমাব তো আর এবাড়ী তিলার্ধ থাকতে ইচ্ছা করে না। কবে আমাকেই কি বলে বসে?"

প্রমদার মাতার কথা শেষ না হইতে হইতেই গদাধরচন্দ্র কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমদাকে রাগত দেখিয়া ও জননীর মুখে উল্লিখিত কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিডি—কি হয়েছে?" ডিডি কথা কহিলেন না। গদাধর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিডি কি হয়েছে?"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "যা যা, ঐ দিকে যা, কোথাকার গণ্ডমুর্খটা, তোর যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকত তা হলে তোর অদেষ্টে এত দুঃখ কেন?"

গদাধরচন্দ্র অজ্ঞান! তার কপালে কি দুঃখ? তার বিশ্বাস, ক্রমেই তাব সুখ বৃদ্ধি হচ্ছে। দিদির বাটি এসে পর্যন্ত তো আহার-আদি ভালই হচ্ছে, তবে আবাব অসুখ কি? এই ভাবিয়া গদাধর বেকুবের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিযা চাহিতে লাগিলেন।

গদাধরের মা সমুদয় কহিলেন। গদাধর শুনিয়া কম্পমান হইয়া কহিলেন, "চল্লাম আমি, ডেখি ও মাগীর কট প্রটাপ!"

এই বলিয়া লাঠি হাতে করিয়া গদাধর সরলার ঘরের দিকে অগ্রসব হইলেন; "আয় বেটী আয়, ডেখি টোর কট জোর, আর কার প্রটাপে টুই লড়িস্!"

প্রমদা নিষেধ করিলেন না। গদাধবের মাও না। তাঁহাবা ভাবিলেন, যদি দু ঘা এক ঘা দিতে পারে, ভালই।

সরলা গদাধরের আস্ফালন শুনিযা দ্বাব রুদ্ধ কবিতে গেলেন, শ্যামা কোনমতেই দরজা বন্ধ করিতে দিল না। গৃহেব কোণ হইতে তবকারি-কোটা একখানা বঁটি হস্তে লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, "কোথায় সে ন্যাজকাটা বামুন? আয়, আজ তোর নাক-কান না কেটে যদি আমি জল খাই, তবে আমার নাম শ্যামাই নয়!"

বঁটির চোকাল ধার দেখিয়া গদাধরের আর ভবসা হইল না। দূর হইতে কহিলেন, "টুই আমাকে কাট্‌বি, এই চল্লাম আমি ঠানায়? ডারগা বক্‌শী ডেকে আনি।"

শ্যামা। যা তুই যেখানে ইচ্ছা সেইখানে। গিয়ে যা করতে পারিস তা করিস।

থানা সেই গ্রামেই। গদাধরের থানার এক কনস্টেবলের সহিত আলাপ ছিল। গদাধরের বিশ্বাস ছিল, তিনি গেলেই আর কেউ আসে না-আসে, সেই কনস্টেবল তো আসবেই, তা হলেই শ্যামা জব্দ হবে। দৌড়িয়া থানায় গেলেন। দেখিলেন—দাবোগা কি বলিয়া দিতেছেন, আর তাঁহাব আলাপী কনস্টেবল তাই লিখিয়া লইতেছে। গদাধব গিযা কহিলেন, "ডারগা মহাশয়, ডারগা মহাশয়, শ্যামা আমাব নাক-কান কাট্‌টে চায়?"

দারোগা কহিল, "তুমিই বা কে, আর শ্যামাই বা কে?"

গদাধর। আমি শশীবাবুর শালা।

দারোগা। তোমার বাপের নাম কি?

গদাধর। টা বল্লে চিন্‌টে পারবে না। শ্যামা ডাসী আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আমার নাক-কান কেটে ডিটে চায়।

দারোগা কনস্টেবলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বমেশ, একে তুমি চেন?"—কনস্টেবলের নাম বমেশ।

রমেশ গদাধরের কুল, শীল, বিদ্যা, বুদ্ধির পবিচয় দিল। দারোগা শুনিয়া কহিলেন, "ভাল, তোমার মকর্দমা কচ্ছি, এত বড় অন্যায়—তোমার নাক-কান কাটতে চায়।"

গদাধর। অন্যায় না, বড় অন্যায়। আপনি এর একটা সুবিচার করুন।

দারোগা কহিলেন, "আচ্ছ তা করছি। কিন্তু তোমার নাক-কান কেটেছে, না শুধু বলেছে কাটব।"

গদাধর হঠাৎ কানে হাত দিলেন। দারোগা কহিলেন, ''হাঁ, আগে ভাল করে দেখ; দাবি প্রমাণ করা চাই।''

গদাধর কহিলেন, ''কাটে নাই, কিণ্টু বলেছে কাটব।''

দারোগা। একটা স্ত্রীলোক বলেছে তোমাব নাক-কান কাটবে, তাই তুমি দৌড়ে থানায এসেছ? তোমার লজ্জা করে না?

গদাধর। সে টেমনি স্ট্রীলোক বটে। সে টো স্ট্রীলোক নয়, সে স্ট্রীলোকেব বাবা। যে বঁটি টুলেছিল, যডি ডেখটে, টবে বাপ্ বাপ্ করে টুমিও পালাটে।

দারোগা। সত্যি নাকি? তবে তো তাকে জব্দ করা উচিত। তুমি এক কাজ কব। ফিরে যাও, গিয়ে ঝগড়া কর। তোমার কান কেটে দিক আগে, নৈলে তো মকর্দমা হবে না?

গদাধর। আগে যদি কান কেটে ডেবে, টবে আমি কি লয়ে নালিস করব?

দারোগা। কেন, এক কান নিয়ে?

গদাধর বুঝিতে পারিল, দারোগা ঠাট্টা কবিতেছেন। তখন রাগত হইযা কহিল, ''আচ্ছা, টুমি আমার মকড্ডমা না কর, আমি জেলায় যাব।''

দারোগা কহিলেন, ''সেই ভাল। এসব বড় মকর্দমা এখানে হয় না।''

গদাধর উঠিয়া যাইতেছেন। দারোগা কনস্টেবলকে কহিলেন, ''একটু মজা করব দেখবে?''

কনস্টেবল কহিল, ''কি মজা?''

দারোগা অন্য একজন কনস্টেবলকে ''হরি সিং, এই লোকটিকে গারদে দাও তো। ও মিথ্যা এজেহার দিতে এসেছে।''

হরি সিং আজ্ঞা প্রাপ্তমাত্র গদাধরের হস্ত ধাবণ করিয়া গারদে লইয়া গেল। গদাধব রাগত হইয়া বলিলেন, ''টোমরা টের পাও নাই আমি কে? ঠাক, টোমাদের মজা ড্যাকাবো; আমি শশীবাবুর শালা, টা টোমরা জান? আমাকে গারডে ডেওয়া সোজা কঠা নয়।''

কনস্টেবল কহিল, ''তুমি ঠাকুব যা করতে পাব, করো। আমার কি? আমি তো হুকুম মেনেছি। মোদ্দা তুমি আর বেশী কথা কইও না। দারোগাবাবু বললেন, বেশী কথা কইলে হাতকড়া লাগাতে হবে।''

শুনিয়া গদাধরের ভয় হইল, না জানি আবার হাতকড়া কি। তখন কনস্টেবলের পায় পড়িতে লাগিল। ''হরি সিং, টোমার পায় পড়ি, আমাকে ছেড়ে ডেও।''

হরি সিং কহিল, ''আমার ছেড়ে দেবার কি ক্ষমতা?''

গদাধর। টবে একবার রমেশ বাবুকে ডেকে ডেও।

কনস্টেবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ''রমেশবাবু আসতে পারে না!''

গদাধর। আমি রমেশবাবুর এটো কল্লাম, আর রমেশবাবু আমার সঙ্গে একবার ডেকা করলেন না। গদাধর এই প্রকার ক্রমাগত কখন খোশমোদ, কখন রাগ প্রদর্শন কবিয়া

পরে সন্ধ্যাবেলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল। তখন দারোগা গারদে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কেমন, তুমি আর মিথ্যা মকর্দমা করবে?''

গদাধর। না।

''স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঝগড়া করবে?''

গদাধর। না।

''তিন হাত মেপে নাকখত দাও, তবে যেতে পাবে।''

গদাধর নাকে খত দিয় প্রস্থান করিলেন।

গদাধরচন্দ্র থানায় গেলে ক্ষণকাল পরে শশিভূষণ বাটী আসিলেন। অন্যান্য দিন অপেক্ষা সেদিন সকালে কাছারি বন্ধ হইয়াছিল। বাটী আসিয়া প্রমদাকে রাগত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমদা আনুপূর্বিক সমুদয় বলিলেন, কেবল প্রথমতঃ তিনিই যে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, সেইটুকু বাদ দিলেন। শশিভূষণ শুনিয়া প্রথমতঃ চটিয় উঠিলেন। সুযোগ বুঝিয়া প্রমদার মাতাও আবার এই সময়ে দুই একটি টিপ্পনী করিলেন। কিন্তু শশিভূষণ রাগ করিয়া শ্যামার কি করিবেন? তাহাকে ধরিয়া মারিতেও পারিবেন না, কিংবা এই কথা লইয়া মকর্দমাও করিতে পারেন না। সাতপাঁচ ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

হিসাব পাস

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শশিভূষণের বুদ্ধি বিলক্ষণ প্রখর ছিল। সেই বুদ্ধিই শশিভূষণের উত্তরোত্তর উন্নতির মূল। প্রথমতঃ পাঁচ টাকা বেতনে প্রবেশ করেন, কিন্তু এক্ষণে পঁচিশ টাকা হইয়াছে। তাঁহার উপরে একমাত্র দেওয়ানজী আছেন। পরস্পরায় শুনা যাইতেছে, দেওয়ানজী বুঝি বেশী দিন আর না টেকেন। শশিভূষণের বুদ্ধি দর্শন করিয়া বাবু যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় শশিভূষণকে দেওয়ানী কার্যের ভার দিলে তাঁহার আর নিজে কিছু না দেখিলেও চলিবে। হিসেব কিতেব দেখা কি ঝঞ্ঝাটের কাজ? বাবু একবিন্দু বিশ্রাম পান না, আমোদ-প্রমোদ করা তো দূরে থাকুক; ভাবিয়া পান না—তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি কি প্রকারে এ সমস্ত কার্য করিবার অবকাশ পাইতেন। বিশেষ তাঁহাদের সময়ে তা দুই তিনটি বৈ আমলা ছিল না। বাবু স্থির করিলেন, ''সেকেলে'' লোকে খুব পরিশ্রম করিতে পারিত, তাঁহাদের বুদ্ধি তাদৃশ সূক্ষ্ম ছিল না। যাহাদের বুদ্ধি অধিক, তাহারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে পারে না। পরমেশ্বরের নিয়মই এই।

আশ্চর্যের বিষয় এই, লোকে পরস্পরের ঐশ্বর্যেই হিংসা করে, বুদ্ধি বিদ্যার হিংসা করিতে দেখা যায় না। আমা অপেক্ষা এর জমি বেশী, ওর টাকা বেশী, অনেকেই বলে। কিন্তু কে কোথায় কাহাকে বলিতে শুনিয়াছে, ''আমা হপেক্ষা অমুকের বুদ্ধি

বেশী?" বুদ্ধি থাকিলে ধন হয়, জমি হয়, জমিদারি হয়, কিন্তু তথাপি অমুকের মতন আমার বুদ্ধি হউক—এক কথা কেহই বলে না।

বাবুর পিতা পিতামহেরা এক সন্ধ্যা আতপান্ন আহার করিয়া কৃশকায়ে যাহা করিতেন, বাবু তিন বেলা মৎস্য মাংস ও প্রয়োজনমত বলকারক "আরক" সেবন করিয়াও তাহা করিতে পারেন না। তাঁহার বুদ্ধি কম? তা নয়। তবে কি না "সেকেলে" লোকের বরদাস্ত হইত। বাবুর ততদুর সহ্যগুণও নাই, আর ততদূর শারীরিক বলও নাই।

শশিভূষণের বুদ্ধি আছে, বল আছে, সহিষ্ণুতা আছে এবং মিষ্ট কথায় মনের তুষ্টি সম্পাদন করার শক্তিও আছে। তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চ-পদাভিষিক্ত হইবেন, তাহার বিচিত্র কি?

শশিভূষণের অধীনে এক্ষণে সাত আট জন আমলা। সকলেই বিশ্বাসী। শশিভূষণ সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী। তিনি যাহা দেখিয়া দিবেন, তাহাতে "ভুলচুক" থাকিবার জো নাই। সমস্ত খরচ তাঁহারই হাতে।

শশিভূষণ হিসাবের কতকগুলি কাগজ হস্তে লইয়া বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বাবু, শিবমন্দির ও শিবপ্রতিষ্ঠার খরচের হিসাব প্রস্তুত হয়েছে দেখুন।"

বাবু (বন্ধুগণ-পরিবেষ্টিত)। তুমি ভাল করে দেখেছ? কোন ভুলচুক নাই তো?

শশী। আমি তো কিছুই টের পেলাম না। আমার যতদূর বিদ্যা, তার মধ্যে এক পয়সাও তফাত দেখতে পাচ্ছি না। আপনি না দেখলে ভুলচুক আছে কি না, কি প্রকারে বলব।

বাবু মহা সন্তুষ্ট! শশিভূষণের অপেক্ষা এসব কর্ম বেশী বোঝেন। শশিভূষণ তাহা নিজেই স্বীকার করেন। "কহিলেন, তবে আর আমি কি দেখব, তুমি দেখেছ, তা হলেই হলো।"

শশিভূষণ তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্মচারীর সমভিব্যাহারে হিসাব পাস করিতে গিয়াছিলেন। বাবুর কথা শুনিয়া পরস্পর একবার চোখাচোখি করিলেন। তাঁবেদার কর্মচারী ঈষৎ হাস্য করিলেন। কিন্তু সে হাসি শশিভূষণ টের পাইলেন, আর কাহারও টের পাইবার জো নাই; শশিভূষণ ঈষৎ চক্ষু গরম করিলেন, যেন সে স্থানে সে সময়ে সে হাসিটুকুও হাসা ভাল হয় নাই। তাঁবেদার মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

বাবুর একজন বন্ধু ইংরাজীতে কহিলেন, "কাজ হইয়া গেল, এক্ষণে ইহাদিগকে বিদায় করিবার আপত্তি কি?"

বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আর কোন কাগজ উপস্থিত আছে?"

শশী। আজ্ঞা না। আপততঃ তো কিছু দেখছি না। হস্তস্থিত কাগজগুলোকে একবার নাড়িয়া "এটায় মোট কত খরচ হলো, একবার দেখলে ভাল হতো না।"

বাবু শশিভুষণের কাগজ নাড়া দেখিয়া ভাবিলেন, একবার আরম্ভ করিলে তো সহজে শেষ হয়, তাহার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ ছিপিখোলা বোতলটা তক্তাপোশের নীচে রহিয়াছে।

তাহা হইতে কত উড়ে যাইতেছে। গেলাসে যেটুকু ঢালা আছে, সে তো একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রকাশ্যে কহিলেন, ''কত হয়েছে বল।''

শশী। চব্বিশ হাজারের ইস্টিমিট ছিল, কিন্তু একত্রিশ হাজার তিনশত তেব টাকা খরচ হয়েছে।

কথাগুলি কহিয়া শশিভূষণের ওষ্ঠাধর যেন ঈষৎ কম্পিত হইল।

বাবুও যেন একটু আশ্চর্য হইলেন। কিন্তু বয়স্যগণের মধ্যে এই কটি টাকাব জন্য সমুদয় হিসাব দেখা কিছু অপমানের কথা বিবেচনা করিয়া কিছু বলিলেন না। একজন বয়স্য ইংরাজীতে কহিলেন, ''ইস্টিমেটের চাইতে প্রকৃত খরচ তো চিবকাল বেশী হয়ে থাকে।'' বাবু কতক অভিমানেব ভযে, কতক বন্ধুর কথায় শশিভূষণেব হস্ত হইতে কাগজগুলি লইয়া ইংরাজীতে নাম সই করিয়া দিলেন। হিসাব পাস হইল।

হিসাব স্বাক্ষবিত হইলে শশিভূষণ কাগজগুলি লইযা কাছারি আসিলেন। এদিকে তক্তাপোশের নিম্ন হইতে গেলাস ও বোতল উপবে উঠিল। বাবুবা আমোদে আসক্ত হইলেন। শশিভূষণ অধীনস্থ কর্মচারিগণেব সহিত বাটী পৌঁছিয়া লাভ বণ্টন কবিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ পুরাতন বাড়ীটা কি করিবেন?

প্রমদার মাতা ও ভ্রাতার আগমন এবং শশিভূষণেব দেওয়ান হওযা অবধি শশিভূষণের বাটীতে থাকিবার অত্যন্ত অসুবিধা হইল। বাটীতে স্থান অল্প। বৈঠকখানা অর্ধেক হইতে হইতেই বন্ধ রহিয়াছে। শশিবূষণ ভাবিলেন, আর অল্প খরচ কবিলেই বৈঠকখানাটি প্রস্তুত হয়। অতএব তাহাই করা উচিত। কিন্তু প্রমদা এ পরামর্শে অনুমোদন কবিলেন না। ঘরটি প্রস্তুত হইলে বিধুভূষণকে কালে তাহার অংশ দিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় কথা আর কি হইতে পারে? শশিভূষণের প্রমদার কথা লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য হইল না। সুতরাং অন্য একটি স্থান ক্রয় করিয়া শশিভূষণকে বৈঠকখানা প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইতে হইল। কিন্তু স্থান ক্রয় করিবার সময় এই এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল—''কাহার নামে কেনা যায়?'' শশিভূষণের নিজ নামে তো হইতেই পারে না। কারণ, তাহা হইলে পাছে বিধুভূষণ মকদ্দমা করিয়া তাহার অংশ লয়। সেই কারণ প্রযুক্ত প্রমদার নামেও হইল না। পরিশেষে সাতপাঁচ ভাবিয়া গদাধরচন্দ্রের নামে স্থান খরিদ করা হইল। গদাধরের ইহাতে আহ্লাদের সীমা রহিল না।

প্রথমতঃ বৈঠকখানাই প্রস্তুত করিবার কথা, কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটি সুন্দর বাটী হইল। শশিভূষণ সপরিবারে সেই নূতন বাটীতে উঠিয়া গেলেন। সরলা, গোপাল ও শ্যামা সেই পুরাতন বাটীতে রহিলেন। এখন পুরাতন বাটীতে যে অংশ আছে, তাহা কি করিবেন, শশিভূষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পল্লীগ্রামে বাটী ভাড়া হইবার

সম্ভব নাই। শূন্য ফেলিয়া রাখিলেও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। শশিভূষণ প্রমদাকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমদা একটু মিষ্টি হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগে তুমি কি মনে করেছ বল, তারপর আমার মনের কথা বলব।"

শশী। না, আগে তুমি বল।

প্রমদা এবার একটু মন কেড়ে লওয়া-গোছের হাসি হাসিয়া শশিভূষণের নিকট গিয়া বসিলেন এবং সেইরূপ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুমি না বললে আমি বলব না।"

শশী। আমি মনে করেছি, ও-বাড়ীটা সমুদয়ই বিধুকে দিব।——এই সময়ে প্রমদার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, মুখচন্দ্রিমা মেঘাচ্ছন্ন, অমনি পুনরায় কহিলেন, "এই মনে করেছি, কিন্তু তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে কি আমি কোন কাজ করতে পারি? এখন তোমাব বিবেচনায় কি হয় বল।"

প্রমদা। আমার বিবেচনা নিয়ে তুমি কি কববে। তোমাব বাড়ী, তোমার যা খুশি তাই কর।

শশিভূষণ কথার ভাব বুঝিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন? ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আজ এ কথা এই পর্যন্ত থাক, আর এক দিন হবে। দু-দিন থাকলে বাড়ীটে আর পচে যাবে না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নীলকমল কর্তৃক অদৃষ্টের ফলাফল বর্ণন

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পাবে, আমরা বিধুভূষণ ও নীলকমলকে এক মুদীর দোকানে রাখিয়া অন্যান্য বিষয় বর্ণনা কবিতে গিযাছিলাম। তাঁহারা সে রাত্রি সেই মুদীর দোকানেই ছিলেন, তাহাও জানেন। পবদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মুদীর দোকান হইতে পুনরায় কলিকাতার পথে চলিলেন। ক্ষণকাল গমন কবিযা উভয়ে এক বৃক্ষমূলে শ্রান্তি দূর করিবার মানসে উপবেশন কবিলেন। পূর্বদিবস নীলকমল ক্রমাগতই গান করিয়াছিল। অদ্য নীলকমলের মুখে কথা নাই। যে সর্বদা বকে, তাহাকে চিন্তাকুল দেখিলে তাহার সমভিব্যাহারী লোকের মনে এক প্রকার কষ্ট অনুভূত হয়। বোধ হয় তাহা সকলেই জানেন। বিধুভূষণের মনেও সেই কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু কথা কহিতে গেলেই পাছে নীলকমল গান ধরে, এই ভয়ে এতক্ষণ কথা কন নাই; বৃক্ষমূলে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল কি ভাবছ?"

নীলকমল কথা কহিল না।

বিধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল কি ভাবছ?"

নীলকমল কথার জবাব না দিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল. "দাদাঠাকুর, (নীলকমল এই অবধি বিধুভূষণকে দাদাঠাকুর বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল) যে সাহেববা খ্রীষ্টান করেন, তারা যা বলে, সব কি সত্যি?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "কি বলে তা না শুনলে কেমন করে বলব?"

"এই যে তারা বলে, খ্রীষ্টান হলে মেম দেবে, তা কি যথার্থই দেয়?"

বিধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কেন? যদি দেয়, তা হলে তুমি খ্রীষ্টান হবে না কি?"

নীলকমল কহিল, "হতে তো ইচ্ছা করে, কিন্তু জাত যাবে যে? আচ্ছা, বেহ্মজ্ঞানী হলে কি তারা বিয়ে দিয়ে দেয়?"

বিধু কহিলেন, "তা তো আমি বলতে পারিনে।"

নীল। বেহ্মজ্ঞানী হলে জাত যায় না, তাই আমার ইচ্ছা করে বেহ্মজ্ঞানী হই। কিন্তু যদি পাদরি সাহেবরা মেম দেয়, তা হলে খ্রীষ্টানই হই। বাঙ্গালী বে করার চাইতে মেম বে করা ভাল। কেমন দাদাঠাকুর, ভাল নয়?

বিধু। সে যার যেমন ইচ্ছা। তুমি যে মেম বে করবে, তাকে খেতে দেবে কি, আর পারবেই বা কি?

নীল। সেই তো ভাবনা। আমি তাই ভাবছিলাম। যাই, বিদেশে তো যাচ্ছি, কিছু-না-কিছু অদেষ্টে জুটে যাবেই।

বিধু। তার আর সন্দেহ কি?

উভয়ে পুনরায় বৃক্ষমূল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাস্তায় চলিতে লাগিলেন। নীলকমল তথাপি পূর্বদিবসের ন্যায় কথা কহে না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল, "দাদাঠাকুর, যার যা কপালে থাকে, কেউ খণ্ডন করতে পারে না। আমি তার এক গল্প জানি। আমারও যদি কপালে থাকে মেমের সঙ্গে বে হবে, তা হবেই হবে।"

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গল্প বলো দেখি?"

নীলকমল নিম্নলিখিত গল্পটি বর্ণনা করিল।

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার স্ত্রী ও পুত্র ছিল। এক দিবস রাত্রে ব্রাহ্মণ সপরিবারে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় ঘরের আড়কাটা হইতে একগাছি রজ্জু ঝুলিতেছে দেখিতে পাইল। ব্রাহ্মণ পাশ ফিরিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিদ্রা হইল না, পরে হঠাৎ সেই রজ্জুগাছ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এবার পূর্বাপেক্ষা একটু লম্বা বোধ হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিল, ইঁদুরে দড়িগাছা ফেলিয়া দিতেছে। ক্ষণকাল মধ্যে দড়িগাছ একটি সাপের ন্যায় হইল। ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে ডাকিবে, কিন্তু ইতিপূর্বেই সাপ নামিয়া তাহার স্ত্রীকে ও পুত্রকে দংশন করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত হইল। তাহার স্ত্রী ও পুত্র অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করিল। সাপটিও গৃহদ্বারে একটি রন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ সাপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভোর হইলে সাপ ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া এক কৃষকের প্রাণবধ করিল; এবং একটু পরে এক বৃষ হইয়া একটি বালককে নষ্ট করিল। ব্রাহ্মণ এখনও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছে। ক্ষণকাল পরে সেই বৃষ একটি বৃদ্ধ মানুষের আকার ধারণ করিল। তখন ব্রাহ্মণ তাহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধ প্রথমতঃ পরিচয় দিতে অস্বীকার

কবিল; কিন্তু ব্রাহ্মণেব আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কহিল, ''আমি কর্মসূত্র। অর্থাৎ যাহাব যেরূপে মৃত্যু হইবে অদৃষ্টে লেখা থাকে, আমি সেইরূপে তাহার প্রাণ সংহার করি।'' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, ''আমি কিসে মরিব বলিয়া দিন।'' বৃদ্ধ কহিল, ''পাগল! সে কথা বলিতে নাই।'' কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতেই তাহার পা ছাড়িবে না, অগত্যা বৃদ্ধ কহিল, ''তোমাকে গঙ্গায় কুমীরে মাবিবে।''

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া পুনরায় আব বাটী না গিয়া পূর্বমুখে গমন কবিতে আবন্ত কবিল; অর্থাৎ যে -দেশে গঙ্গা নাই। দিনকতক গমনের পর এক রাজার বাজ্য ত্যাগ করিয়া আব এক বাজার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় এক বাটীতে বাসা করিয়া বহিল।

ব্রাহ্মণ যে রাজ্যে গমন করিল, তথাকার বাজার সন্তানাদি হয় নাই। ব্রাহ্মণ শুনিয়া রাজাব নিকট গিয়া নিবেদন করিল, ''মহারাজ, আমি এক স্বস্ত্যয়ন জানি, করিলে আপনাব সন্তান হইবে।'' বাজা তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণকে স্বস্ত্যয়ন কবিতে অনুবোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যযন করিলে মহারাজের এক বৎসবেব মধ্যে একটি পুত্র জন্মিল।

বাজা ব্রাহ্মণকে নিজ বাটী রাখিলেন। এবং বাজপুত্র বড় হইলে ব্রাহ্মণকে তদীয় শিক্ষাকার্যে নিয়োগ কবিলেন। বাজপুত্র ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধ্যয়ন কবিযা দেশভ্রমণে যাইবেন। বাজা ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহাবে যাইতে কহিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল. ''আমি সর্বস্থানে যাইতে পারিব, গঙ্গাতীবে যাইব না।'' বাজা কারণ জিজ্ঞাসা করায ব্রাহ্মণ আত্মবৃত্তান্ত সমুদয় পরিচয দিল। রাজা হাসিযা কহিলেন, ''আচ্ছা, তোমাকে গঙ্গাতীবে যাইতে হইবে না।'' রাজপুত্র ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে নানা স্থান পর্যটন কবিয়া গঙ্গাতীবে যাইবার মানস প্রকাশ কবিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাব সহিত যাইতে অস্বীকার করিল। কিন্তু বাজপুত্র কহিলেন, ''আপনাকে তো আর বাস্তা হইতে কুমীবে লইযা যাইবে না। তবে যাইতে ভয় কি?'' ব্রাহ্মণ অগত্যা সম্মত হইল।

যোগের সময় বাজপুত্র গঙ্গাস্নানে যাইবেন, এজন্য ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহাবে লইয়া যাইবাব ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, ''আপনি তীবে থাকিয়া মন্ত্র পড়াইবেন, তাহাতে ভয় কি?'' ব্রাহ্মণকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাজকুমাবেব সহিত গমন কবিতে হইল। গঙ্গাতীবে সহস্র সহস্র লোক স্নান কবিতেছে দেখিয়া তাঁহার সাহস হইল। বাজপুত্র স্নান কবিবার জন্য জলে নামিলেন; ব্রাহ্মণ তীবে থাকিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। কিন্তু লোকের কোলাহলে বাজপুত্র শুনিতে না পাইয়া কহিলেন, ''আমার লোকে চতুষ্পার্শ্ব ঘিবিয়া দাঁড়াইবে, আপনি মধ্যস্থলে থাকিয়া মন্ত্র পড়ান।'' বলিবামাত্র বাজপুত্রের লোকে তাঁহাকে বেষ্টন কবিল এবং ব্রাহ্মণও সেই বেষ্টনের মধ্যে গিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। মন্ত্র সমাপন হইলে রাজপুত্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ''মহাশয়, আমি সেই কর্মসূত্র।'' এই বলিতে বলিতে কুম্ভীরের রূপ ধাবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া সলক্ষে গভীর জলে চলিয়া গেল।

বিধুভূষণ নীলকমলের গল্প শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ চিন্তাকুলও হইলেন। ক্ষণকাল পরে উভয়ে এক রাস্তার ধারে দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নীলকমল দোকানে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোকানী ভাই, এখানে দু-জন ব্রহ্মজ্ঞানী এসেছিল?"

বিধু কহিলেন, "কেন, সে কথায় তোমার কাজ কি?"

নীল। যদি এসে থাকে, তবে ঐ রাস্তায় যে কথাটা বলেছিলাম, তার মীমাংসা করে যেতাম।

মুদী কহিল, "না বাবু, ব্রহ্মজ্ঞানী-ট্যানী কেউ এখানে আসে নি।" নীলকমল মুদীব কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইল। তার মনে বিশ্বাস ছিল যে, দোকানে আসিয়া পূর্বরাত্রের ব্রাহ্মদ্বয়ের সহিত দেখা হইবে।

অতঃপর উভয়েই সেই দোকানে স্নানাহার করিলেন, এবং পথশ্রান্তিতে অত্যন্ত কাতব থাকায় সে রাত্রিও সেই স্থানে যাপন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শহরের সুখ

পরদিবস প্রাতে আবার উভয়েই চলিতে আবম্ভ করিলেন। তাঁহাবা যতই কলিকাতার সন্নিহিত হইতে লাগিলেন, নীলকমলের ততই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কিন্তু কলিকাতা কেমন স্থান, নীলকমল তাহাব কিছুই জানে না; এজন্য বিধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দাদাঠাকুর, কলিকাতা কেমন জায়গা?"

বিধু। কেমন জায়গা জিজ্ঞাসা কল্লে এখন আমি কি বলব? কত বড় তাই জিজ্ঞাসা করছ, না কেমন জলহাওয়া, এর আমি কোনটির্ জবাব দেব?

নীল। আমি সব জিজ্ঞাসা করছি। কলিকাতায় কি আমাদের দেশেব মত মাটি?"

বিধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমাদেব দেশের মতন, নাকি আর এক রকম মাটি?"

নীল। আচ্ছা, কলিকাতা যে বড শহব বলে——তা শহরটা কি আমাকে বল দেখি।

বিধু। শহর এই যে, মস্ত বাজার, অসংখ্য দোকান, অসংখ্য লোকজন।

নীল। আচ্ছা, আমাদের হাটে যত লোক হয়, তত লোক?

বিধু। কোথায় তোমাদের হাট? কলিকাতায় যত লোক, এত লোক এ দেশে আর কোন জায়গায়ই নাই।

নীল। আচ্ছা, সেখানে ক-দিন হাট হয়?

বিধু। হাট কি? সেখানে কি হাট আছে? রোজই যে-জিনিস ইচ্ছা হয়, তাই কিনতে পাওয়া যায়। কতশত দোকান আছে! রোজ কতশত জায়গায় বাজার বসে।

নীল। আচ্ছা, বোজ বাজার বসে, আর এত দোকান আছে, রোজ খদ্দের হয় কোথা থেকে? আমাদের হাট তো মস্ত হাট, কিন্তু তা তো রোজ হয় না। আর একদিন জিনিস কিনলে আর তিনদিন কিনতে হয় না।

বিধুভূষণ কহিলেন, ''কোথা থেকে খদ্দেব হয়, একটু পবে দেখতে পাবে। আমি আব এখন বকতে পাবি না।''

উভয়ে ক্ষণকাল মৌনভাবে চলিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, ''এখন বল দাদাঠাকুর, কোথা থেকে খদ্দের হয়?''

বিধু কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া কহিলেন, ''বল্লাম এখনকার সময় নয়, তবু জিজ্ঞাসা কববে? অমন কব তো আমি কিছুই বলব না।''

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া গেল। কলিকাতার যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই লোকের সমারোহ বেশী দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা কবিল, ''আচ্ছা দাদাঠাকুর, এত লোক কোথায় যাচ্ছে। বোধ হয় কোন জায়গায় যাত্রা হচ্ছে।''

বিধু। হাঁ, যাত্রা হচ্ছে না তোমাব মাথা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ না, প্রায় কলিকাতায় পৌঁছিলাম। এখানেও লোক হবে না তো কোথায় হবে?

নীল। এত লোক কি সকলেই কলকাতায় যাচ্ছে?

বিধু। হাঁ।

নীলকমল আবাব খানিক চুপ কবিয়া থাকিল। শ্যামবাজার নিকটবর্তী হইয়াছে। একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া নীলকমল বলিযা উঠিলেন, ''দাদাঠাকুর, হ্যাদে দেখ, এ আবার একটা কি?''

বিধুভূষণ হাসিয়া কহিলেন, ''নীলকমল, তুমি কখন গাড়ী দেখ নি?''

নীল। দেখব না কেন? বহিম ঘরামির গাড়ী দেখেছি, আর আর কত লোকের গাড়ী দেখেছি।

বিধু। সে তো গরুব গাড়ী। কখন ঘোড়াব গাডীর নাম শোন নি?

নীল। এরি নাম ঘোড়ার গাড়ী?

বিধুভূষণ উত্তর কবিলেন, ''হাঁ। কেন, তুমি কি কৃষ্ণনগব যাও নাই? সেখানে কত ঘোডাব গাড়ী আছে।''

নীলকমল কহিল, ''আমি ভাবতাম, ঘোড়ারগাড়ী আর গরুর গাড়ী একই বকম, এতে গরু যোড়ে, ওতে ঘোড়া যোড়ে। এ দেখি একখান পালকির মতন, তা কেমন করে টের পাব?''

এই বলিতে বলিতে উভয়ে শ্যামবাজারের পুল পাব হইল। নীলকমল পুল পার হইয়া দেখে, কতকগুলি গাড়ী যাচ্ছে। অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল, ''দাদাঠাকুব, হ্যাদে ডানদিকে দেখ, কত ঘোড়াগাড়ী। বাপ্‌রে?''

নীলকমলের চোখ আব রাস্তার দিকে নাই; ক্রমাগত এদিক ওদিক দেখিতেছে, এমন সময় একখান গাড়ী আসিয়া তাহার গায়ে পড়িবার জো হইল। গাড়োযান ''হট্ যাও''

বলিয়া হাতের চাবুক দ্বারা নীলকমলকে প্রহার করিল। নীলকমল হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল, গাড়ী তাহার উপর চড়িবার উপক্রম করিতেছে। অমনি 'বাবা রে' বলিয়া রাস্তার ডানদিকে চলিয়া গেল।

বিধুভূষণ কহিলেন, ''নীলকমল, এ তোমার গাঁ নয়, তোমার গাঁয়ের হাটও নয়, এখানে রাস্তা দেখে না চল্লে মারা পড়বে। এখনি গিয়েছিলে আর কি!''

নীল। দাদাঠাকুর, এখন অবধি আমি তোমার গা ধরে চলব। ———এই বলিয়া বিধুভূষণের হস্ত ধারণ করিলে বিধু কহিলেন, ''আমাকে ধরলে লাভের মধ্যে এই যে, তুমিও মারা যাবে, আমিও মারা যাব। তা না করে তুমি আমার পিছুপিছু এস, আর মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখ। পাগলের মত এক জিনিসের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেক না।''

বিধুভূষণ যদিও কখন কলিকাতায় আসেন নাই, কিন্তু কৃষ্ণনগরে সর্বদা তাঁহার যাতায়াত ছিল এবং তিনি নীলকমলের মত বেকুব নন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কলিকাতা তত নূতন বোধ হইল না। নীলকমলকে ডাকিয়া কহিলেন, ''নীলকমল, কলিকাতার মধ্যে থাকা তো বড় কষ্ট, চল আমরা কালীঘাট যাই, গঙ্গাস্নান করা হবে, কালীদর্শন হবে, আর সেখানে একটু এর চাইতে কম গোলযোগ শুনিছি।''

নীলকমলের কলিকাতা দেখিবার জন্যে যত স্পৃহা ছিল, দেখিয়া তাদৃশ ভক্তির উদ্রেক হইল না। চাবুকের আঘাতটা এখনও জ্বলিতেছে, সুতরাং কালীঘাটে কম গোলযোগ শুনিয়াই সেখানে যাইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, ''আচ্ছা দাদাঠাকুর, এখানে লোক কী সুখে থাকে? চারিদিক থেকে যে গন্ধ বেরুয়েচে, আর রাস্তায় বেরুলে হয়ত চাবুক খেতে হয়, নয় গাড়ী চাপা পড়তে হয়।''

বিধুভূষণ হাসিয়া কহিল, ''কলিকাতায় থাকবার ঐ সুখ।''

''আমি এখন সুখ চাই নে। চল, এখন কালীঘাটে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। ঘোড়াগাড়ীর যে হাঙ্গামা?''

বিধু। কালীঘাটে তো যাব, কিন্তু রাস্তা চিনি নে তো, শুনেছি কালীঘাট এর দক্ষিণ, চল দক্ষিণমুখে যাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুহৃদ্ভেদ

কালীঘাটে যাইবেন কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিধুভূষণ ও নীলকমল দক্ষিণমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ভবানীপুরের বাজারে আসিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, ''নীলকমল, এই তো কালীঘাট বোধ হচ্ছে। কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর দেখি, কালীবাড়ী কোথায়?''

নীলকমল রাস্তার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, ''কালীবাড়ী কোথায়?''

যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে একজন ঢাকাই চালওয়ালা মহাজন। পূর্বদেশে কখনও কথার সোজা জবাব দেয় না। একটা প্রশ্ন কবিলে তৎপবিবর্তে পাঁচটা জিজ্ঞাসা করাই সে দেশের নিয়ম। নীলকমলের কথা শুনিয়া মহাজন জিজ্ঞাসা কবিল, "আসচো কোয়াহ্থে হে?"

নীলকমল কহিল, "কেষ্টনগর থেকে।"

মহাজন। আব কহন কি কলকাতায় আস নাই?

নীলকমল। তা হলে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা কবব কেন?

মহাজন। যাবা কোয়ানে?

বিধুভূষণের বিরক্তি ধাবিয়া উঠিল। বৌদ্রে চলিয়া চলিয়া মাথা ধরিয়াছে। ক্ষুধায় গা ঘুবিতেছে। ঢাকাই মহাজনেব কথা শুনিযা বলিলেন, "আমবা যাব চুলোয়।"

মহাজন বিধুভূষণের কথা শুনিবামাত্র চটিয়া উঠিয়া কহিল, "এ যে বাবি বরমানুষ দেহি, যেন বাজা রাজবল্লভের নাতি। যা তোবা দেহে নে গে কালী-বারী, আমি তো বল্‌মু না।"

বিধুভূষণ। না বল্লে তো বয়েই গেল। চল নীলকমল, আমরা খুঁজে নিতে পারব।

আবাব খানিক দূর গিয়া বিধুভূষণ মনে করিলেন, বাস্তাব লোকের উপব বিরক্ত হইয়া নিজে কষ্ট পাওয়া অতি নির্বোধের কাজ। এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ গলায় একখানা গামছা, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, হাতে একছড়া ফুলেব মালা, তাঁহাদেব দিকে আসিতেছে। বিধুভূষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "মহাশয, কালীঘাটে কোন দিক্ দিয়ে যাব?"

জিজ্ঞাসা করিবামাত্র ব্রাহ্মণ চিরপরিচিতেব ন্যায় বিধুভূষণের হস্ত ধরিযা কহিল, "তাব জন্যে ভাবনা কি? আমার সঙ্গে এস, আমি সেইখানে যাচ্ছি।" নীলকমল ও বিধুভূষণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ব্রাহ্মণটি মা-কালীব পাণ্ডা। সে যে শিকারে বাহির হইয়াছিল, তাহাই পাইযাছে; রাস্তায নানাবিধ মিষ্টালাপ করিয়া বিধুকে ও নীলকমলকে কালীঘাটে লইযা গেল।

বিধুভূষণ ও নীলকমল প্রায় অপবাহ্নে কালীঘাটে গিয়া পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। নীলকমলের গঙ্গা দর্শন কবিয়া অভক্তি হইল। বিধুভূষণকে কহিল, "দাদাঠাকুর, এই কালীঘাটের গঙ্গা? এরই এত নাম? এর চেয়ে আমাদেব হাঁসখালির নদী ঢেব ভাল, সেখানে কাদাও কম।" বিধুভূষণ বলিলেন, "এই গঙ্গায় এত লোক উদ্ধার হইল, আর তুমি আব আমি কি হতে পারব না?" এইরূপ গল্পে স্নান প্রদর্শন কবিয়া উভয়ে কালীর মন্দিরে গেলেন। পাণ্ডাজী সঙ্গে সঙ্গে আছেন। পথ প্রদর্শন কবাইযা লইয়া যাইতেছেন। মন্দির দেখিয়াও নীলকমলের বড় ভক্তি হইল না, কিন্তু কালী দর্শন কবিয়া একেবারে অভক্তির পবাকাষ্ঠা হইল। "দাদাঠাকুর, দূবে থেকে সব জিনিসের বড় বড় কথা শুনা যায়। তুমি বল্লে বিশ্বাস কববে না, কিন্তু যে দিব্বি বলো আমি করতে পারি, এর চেয়ে আমাদেব গাঁয়ে রামা কুমোর ভাল ঠাকুব গড়তে পারে।" বিধুভূষণ কহিলেন, "আচ্ছা, পারে ভালই, এখন যা কবতে এসেছ করে যাও।"

উভয়ের কালী দর্শন করা হইল। মন্দিরের দ্বারে একজন কালীর পরিচারক ছিল। বিধু ও নীলকমল প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্রেই সে দর্শনী ও প্রণামী পয়সা চাহিল। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, " কত দিতে হবে?"

পরিচারক কহিল, "তাহার নিয়ম নাই, কিন্তু আট আনার কম নয়, অধিক যত দিতে পার, ততই তোমাদেবই ভাল।"

বিধুভূষণ কোমরস্থিত থলি হইতে চারি আনা দিলেন। নীলকমল না দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দিলে না?"

নীলকমল কহিল, "আমি বাবুর চাকব, আমি আর কি দেব?"

উভয়ে মন্দির হইতে বাহিরে আসিলে পাণ্ডা হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিল, "আমাকে কি দেবে দাও।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "তোমাকে আর কি দেব? একবার তো দিয়ে এলাম।"

পাণ্ডা কহিল, " ও তো প্রণামী দিলে। তুমি প্রণামী কেন লাক টাকা দাও না। তাতে তো আমার কোন লাভ নাই। আমি যে তোমাদের সঙ্গে করে এনে কালী দর্শন করালাম, তার বকশিশ কই? আব ফুল দিলাম, সিন্দুর দিলাম, এর দক্ষিণা কৈ?"

বিধুভূষণ ট্যাঁক থেকে আর চারি আনা পাণ্ডাকে দিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কালীঘাটের লোকে যদি একবার টের পায় কাহারও কাছে পয়সা আছে, তাহা হইলে তাহাকে সহজে ছাড়ে না। বিধুভূষণের হাতে পয়সা আছে দেখিয়া অন্ততঃ পঁচিশ জন স্ত্রী-পুরুষে আসিয়া মালা হাতে কবিয়া তাঁহাকে ও নীলকমলকে ঘিবিযা ফেলিল। আর যাইবাব উপায় নাই। সম্মুখে যাইতে গেলে পশ্চাৎ দিক হইতে কাপড় ধবিয়া টানে, পশ্চাতে আসিতে গেলে সম্মুখে টানে, যেদিকে যান অপর দিক্ হইতে তিন চারি জন টানাটানি করে। আর এত আশীর্বাদ ও গোলমাল করিতে লাগিল যে, সেখানে যে না গিয়াছে সে কখন তাহা অনুমান করিতেও সমর্থ হয় না। বলিলেও বিশ্বাস করে না । বিধুভূষণ বিরক্ত হইয়া কোমর হইতে পয়সা সকলকে কিছু কিছু দিতে গেলেন। কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্যেব বিষয়, কোমরে থলি নাই। উচ্চৈঃস্বরে নীলকমলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলকমল, আমার থলি কি হলো?"

নীলকমল কহিল, "আমি আপনাব মাথা বাঁচাতে পারি নে, তা তোমাব থলি কোথায় কেমন করে বলব।"

বস্তুতঃ নীলকমলের মাথা বাঁচান দায় হইয়া উঠিয়াছিল। যে যে-দিক হইতে পারিতেছে, তার কপালে সিন্দুর দিতেছে। সকলেরই যে কপালে পড়িতেছে, তা নয়। কেউ গালে দিতেছে, কেউ কানে, কেউ নাকে, একজন খানিক তার চক্ষুর মধ্যে দিল। মালা এতই দিয়াছে যে, নীলকমলের একপ্রকাব বোঝা হইয়া উঠিল। নীলকমল ক্রমাগতই উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "ওগো আমার কাছে কিছু নেই, আমাকে কেন মিথ্যা কষ্ট দাও।"

অতি কষ্টে বিধু ও নীলকমল গোলের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একজন খোট্টাকে তাঁহাদেরই মত আক্রমণ করিয়াছে। নীলকমল তথায় এক মুহূর্তও দাঁড়াইল না। ''দাদাঠাকুর, ওই আবার আসছে, আমি চল্লাম। আর কোন শালা এখানে থাক্‌বে'' এই বলিয়া দৌড়িয়া পলাইল। বিধুভূষণ আস্তে আস্তে আসিতেছেন। দৌড়িয়া পলায়ন কলিকাতায় সহজ ব্যাপার নহে। নীলকমলের পিছু পিছু অমনি ধর ধর বলিয়া লোক দৌড়াইতে লাগিল। নীলকমল যতই যায়, লোকের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। খানিক দৌড়াইয়া নীলকমল আর পারিল না। তিনদিন রাস্তায় চলিয়াছে, বিশেষ সেদিন কিছুই আহার করে নাই; একটা মোড় ঘুরিবার সময় নীলকমল পড়িয়া গেল। অমনি সকলে আসিয়া নীলকমলের চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইল, কিন্তু কিজন্য তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া আসিয়াছে, কেহই জানে না। লোকে আসন্নকালে যেমন সংসারের দয়া-মায়া পরিত্যাগ করে, নীলকমল সেইরূপচিত্ত হইয়া কহিল, ''দাও দাও, কত মালা আছে আর কত সিন্দুর আছে দাও। একটা চোক গিয়েছে, নয় বাকি যেটা আছে সেটাও যাবে।'' নীলকমলের কথায় লোক মনে করিল এটা পাগল, তাই ভাবিয়া একটু পরে সকলে হাসিয়া চলিয়া গেল। নীলকমলের বেদনায় চক্ষে জল পড়িল, একটু রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফিরিয়া বিধুভূষণের নিকট আসিতে লাগিল। কিন্তু নীলকমল আর পথ চিনিতে পারিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় সন্ধ্যা হইল তথাপি মন্দির খুঁজিয়া পাইল না। ক্ষুধার শরীরে আর সামর্থ্য নাই। ইটের রাস্তায় পড়িয়া গিয়া শরীরে স্থানে স্থানে চর্ম উঠিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় নীলকমল এক বাটীর দরজায় বসিল। একাকী বিদেশে কোথায় যাইবে, কাহার বাড়ীতে থাকিবে ভাবিয়া নীলকমল কাঁদিতে লাগিল।

যে বাটীর দ্বারে বসিয়া নীলকমল রোদন করিতেছিল, সন্ধ্যার সময় সে বাটীর বাবু কাছারি হইতে বাটী আসিয়া নীলকমলকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি কে?''

নীলকমল কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল, ''আমি নীলকমল।''

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এখানে বসে কাঁদছ কেন?''

নীকমল কহিল, ''আমি হারায়ে গিয়েছি।''

বাবু। সে কি রে? তুই হারিয়ে গিয়েছিস কেমন করে?

নীলকমল আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণনা করিল। শুনিয়া বাবুর অত্যন্ত দুঃখ হইল; বাটীর মধ্যে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া তিনি নিলকমলকে জলখাবার দিলেন। আহার করিয়া নীলকমলের শরীর প্রায় পূর্ববৎ হইল। তখন নীলকমল মনে করিল, এই সময় একবার গুণের পরিচয়টা দেওয়া যাউক। এই ভাবিয়া বাবুকে কহিল, ''আমি যাত্রার দলে থাকব বলে এসেছি, ভাল বেহালা বাজাতে পারি।''

বাবু কহিলেন, ''একবার বাজাও দেখি।''

নীলকমল বেহালাটি বাহির করিয়া দেখিল, চার পাঁচ জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নীলকমলের সর্বস্বধন বেহালাটি। সেটির এমন দুর্দশা দেখিয়া নীলকমলেব চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কি?"

নীলকমল কথা না কহিয়া বেহালাটি বাবুব সম্মুখে বাখিল। তদ্দর্শনে বাবুব অত্যন্ত দুঃখ হইল। বাবু কহিলেন, "তুমি কেঁদ না, আমি তোমাকে একটা বেহালা কিনে দিব।"

নীলকমল কহিল, "দেবেন বটে, কিন্তু এমনটি আর হবে না।"

বাবু কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে দোকানে যেও। দোকান থেকে তোমার যেটি পছন্দ হয়, সেটি নিও।"

নীলকমল আশ্বস্ত হইল এবং চক্ষেব জল মুছিয়া ফেলিল। পরে রাত্রে আহাবাদি করিয়া সেই বাটীতে শয়ন করিয়া রহিল।

বিধুভূষণের যথাসর্বস্ব এক থলির মধ্যে—সেই থলি চুরি হওয়ায় তাঁহার যে পর্যন্ত দুঃখ হইল, তাহা অনির্বচনীয়। নীলকমলকে সকলে তাড়াইয়া লইয়া গেল, তাহা দর্শন করিয়া তিনি আরও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন একাকী এখানে আসিয়া কি কুকর্মই করা হইয়াছে। পথশ্রান্তিতে, মনো দুঃখে ও জঠবানল প্রজ্বলিত হওয়ায় বিধুভূষণের চক্ষু হইতে দরদর করিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। মনোদুঃখে একাকী গঙ্গাতীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে তাঁহার পূর্বপরিচিত পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাণ্ডাজী পুনর্বার শিকারে বহির্গত হইয়াছে। বিধুভূষণ পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গেলে তিনি চারিটি অন্ন পান। পাণ্ডা কহিল, "সেজন্য ভয় কি? তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে প্রসাদ দেব এখন।" বিধুভূষণ পাণ্ডার সমভিব্যাহারে আসিয়া কালীর ভোগ হইয়া গেলে প্রসাদ পাইলেন। এবং সন্ধ্যার পর নাটমন্দিরের এক কোণে শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন, পবে নাট মন্দিরের এক কোণে বসিয়া রহিলেন। অবাক্—তিনিও কাহারও সহিত কথা কহেন না, অন্য কেহও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে আইসে না। যখন বড় সমারোহ হইল, একটু এদিক্ ওদিক্ চলিয়া বেড়াইলেন। ভোগ হইয়া গেলে প্রসাদ পাইলেন এবং পূর্বদিবসের মত নিদ্রায় রজনী যাপন করিলেন। এইরূপে বিধুভূষণ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্রদাসের উইল

হেম স্বর্ণলতার লেখাপড়া সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথার্থ ঘটিল। কাহারও কাছে সাহায্য না লইয়া স্বর্ণলতা অতি সত্বরেই পুস্তকাদি পাঠ করিতে শিখিলেন এবং

হেমকে প্রতিশ্রুত পত্রখানি লিখিলেন। পত্র পাঠ করিয়া হেমের যারপরনাই আহ্লাদ হইল। বাটী আসিবার সময় তিনি একটি খোঁপার ফুল খরিদ করিয়া আনিলেন এবং বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্রেই স্বর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, এই তোমার পত্রের জবাব এনেছি।" স্বর্ণ হেমের স্বর শুনিয়া দৌড়িয়া গৃহমধ্য হইতে আসিয়া হেমের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। হেম ফুলটি স্বর্ণের হাতে দিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, এই নাও তোমার ফুল। দেখ, আমি যা বলেছিলাম, তাই করেছি কি না?" স্বর্ণ হেমের হস্ত হইতে হাসিতে হাসিতে ফুলটি লইয়া আপনার খোঁপায় পরিলেন।

হেম যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বিপ্রদাস অনুপস্থিত ছিলেন; কিন্তু ক্ষণকাল পরেই প্রত্যাগত হইলেন। হেম বাটী আসিতেছে শুনিয়া তিনি প্রায় কোন স্থানে যাইতেন না। গেলেও অধিক দেরি করিতেন না। বাহির হইতে হেমের স্বর শুনিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্লনেত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বর্ণ পিতাকে দেখিতে পাইয়া হস্ত প্রসারণপূর্বক তাঁহার কাছে গেল। বিপ্রদাস অমনি স্বর্ণকে কোলে লইলেন। স্বর্ণ কহিল, "এই দেখ বাবা, দাদা আমার জন্যে ফুল এনেছে।"

বিপ্রদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এ পর্যন্ত কথা কহিতে পারেন নাই। স্বর্ণের ফুল দেখিয়াও কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার নেত্রযুগলে দুইটি মুক্তাফল দেখা দিল। বিপ্রদাস প্রেম-অশ্রুপাত করিলেন। তদ্দর্শনে স্বর্ণের চক্ষে সেইরূপ মুক্তাফল ফলিল। হেম মাটির দিকে মাথা নামাইলেন। যে-গৃহে মধ্যে মধ্যে এরূপ মুক্তাফল ফলে না, সে গৃহের গৃহস্থেরা যথার্থ দীন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া হেমকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্নানের বেলা হইলে সকলে স্নানাহার করিলেন।

স্বর্ণলতা পূর্ববৎ হেমের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া হেম বিস্মিত হইলেন। মাঝে মাঝে বিপ্রদাস খাটে শয়ন করিয়া থাকেন এবং স্বর্ণ ও হেম নীচে বসিয়া কি পাঠ করে শ্রবণ করেন। সে সময় বিপ্রদাসের চক্ষে জল ধরে না।

দেখিতে দেখিতে হেমের ছুটি ফুরাইয়া গেল। ছুটি চিরকালই দেখিতে দেখিতে যায়। হেম পুনরায় বাটী হইতে কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বিপ্রদাস এক দিবস কহিলেন, "হেম! আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বিপ্রদাস উত্তর করিলেন, "আমার ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়ছে ছাড়া তো কমছে না? এই বেলা একটু লেখাপড়া কিছু করে যাই। তা না করে যদি মরি, তা হলে যা কিছু আছে, করে কে তোমাদের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে নেবে।"

হেম বিপ্রদাসের কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া হর্ষিত হইয়াছিলেন; কিন্তু কিজন্যে যাইবেন শুনিয়া মুহূর্তেরমধ্যে তাঁহার মুখ ম্লান হইল। বিপ্রদাস হেমের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "উইল করব, তাতে ভয় কি? লোকে কি উইল করলেই মরে।"

হেমেব চক্ষু দিযা দবদর অশ্রুধাবা বহিতে লাগিল। বিপ্রদাস হেমেব চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, ''ছি কানতে নাই। কত লোকে ছেলেবেলাই উইল কবে। একবাব উইল কবে আবার কতবাব বদলায়।''

হেম ক্রন্দন সংববণ করিলেন। নির্ধারিত দিবসে তাঁহারা কলিকাতায় যাইবার জন্য যাত্রা কবিলেন।

বিপ্রসাদেব যে গ্রামে বাটী, সে গ্রামেব বিনযকৃষ্ণ ঘোষ হাইকোর্টের উকিল। বিপ্রদাস হেমেব বাসায় দুই এক দিবস অবস্থিতি কবিযা ভবানীপুরে বিয়নবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন।

বিনযবাবু বিপ্রদাসকে দেখিয়া যত্ন ও ভক্তি কবিয়া বসাইলেন। অন্যান্য গল্পের পর বিযনবাবু বিপ্রদাসের আগমনেব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। বিপ্রদাস কহিলেন, ''বাপু, আমবা তো বুড়ো হযে পড়লাম, এখন কবে মবি তার ঠিক নাই। তাই ভাবলাম, এইবেলা একটা উইল না কবে গেলে পাছে পবে ফাঁকি দিযে নেয়।''

বিনযবাবু উত্তব করিলেন, ''সে ভালই বিবেচনা কবেছেন। উইলেব ভাবনা কি? যখন বলবেন করে দেব; কিন্তু আপনি কাকে কি দিবেন মনে কবেছেন?''

বিপ্র। যা কিছু আছে, মনে করেছি—সমান ভাগে স্বর্ণকে আর হেমকে দিয়ে যাব। ওব আর চুলচিবে ভাগ করায কাজ কি?

বিনয়বাবু কহিলেন, ''তা হলে হেমের প্রতি অন্যায় হয়। মনে করুন, স্বর্ণের বিবাহ হলে তো হেম তার বিষয়েব অংশ নিতে যাবে না?''

বিপ্র। বিয়নবাবু, যা বলছ সত্য বটে, কিন্তু মেয়েটি যে সৎপাত্রে পড়বে, তাব নিশ্চয় কি? বিশেষ হেম ব্যাটাছেলে; বেঁচে থাকলে কত বিষয় কবতে পাববে। আমার বাপ তো আমাকে কিছু দিয়ে যান নাই।

বিনয়। সর্বসমেত কত টাকা রেখে যাচ্ছেন?

''সেকেলে''-লোক সব বিষয়ে খোলা বটে, কিন্তু সঞ্চিত বিষয় কত, কাহাকেও বলে না। বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিলেন, ''আমার যৎকিঞ্চিৎ আছে। তা তুমি যেখানে উইল করবে, তোমার কাছে আর গোপন করলে কি হবে? উইল লেখার দিন টের পাবে।''

বিপ্রদাস এই বলিয়া সে দিবস বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। দিনকতক পরে উপযুক্ত স্ট্যাম্পে উইল লেখা হইল। বিপ্রদাসের ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল। হেমকে তাহার পনের হাজার দিলেন ও স্বর্ণকে পনের হাজার দিলেন। হেম প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে ও স্বর্ণলতার বিবাহ হইলে উইলের শর্ত আমলে আসিবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধর ও শ্যামা

গদাধর থানায় কি হইয়াছিল, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু মনে মনে কিরূপে শ্যামা ও সরলাকে জব্দ করিবেন, এই চিন্তাই সর্বদা করিতে লাগিলেন। প্রমদাও তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী বাটী আসিয়া শ্যামার বিধিমত লাঞ্ছনা করিবেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, তিনি কিছু কবিলেন না, তখন মনে করিলেন, আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি নিজেই শ্যামাকে শাসন করিবেন। কিন্তু শ্যামাকে কিছু বলতে কাহারও সাহস হয় না।

এক দিবস রাত্রিতে আহারাদি কবিয়া শ্যামা ও সরলা শুইয়া আছেন, ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে। প্রমদা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পুরাতন বাটীতে গিয়া সরলার শয়নঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। শুনিলেন, সরলা ও শ্যামা উভয়ে কথোপকথন করিতেছে। সরলা কহিলেন, "শ্যামা, প্রায় তিন মাস হইল, তবু একখান পত্রও পাওয়া গেল না। তিনি কোথায় গেলেন? কি হলো, তার কিছুই টের পেলাম না। আমাব ভাবনায় শরীর শুখিয়ে যাচ্ছে।"

শ্যামা উত্তর করিল, "তার ভাবনা কি? এই পত্র এলো। মনে কব, তিনি একে বিদেশে গিয়েছেন, সেখানে দেখেশুনে নিতেই কত দিন গিয়েছে, একটু স্থিব হয়ে না বসলে তো আর কেউ পত্র-টত্র লিখতে পারে না।"

সরলা। তা সত্য বটে, কিন্তু তিন মাসও তো অল্প সময নয়?

শ্যামা। তিনি যে তিন মাস এক জায়গায় আছেন, তারই বা ঠিক কি? যাত্রার দল তো কখন এক জায়গায় বসে থাকে না। হয়ত আজ এখানে, কাল ওখানে ফিরে বেড়াচ্ছেন, তাই পত্র লিখিবার কোন সুবিধা পান নাই।

সরলা। আমাদের খরচপত্রও বুঝি প্রায শেষ হয়ে এলো, এর পর কি হবে, আমি তাই ভাবছি।

শ্যামা। তার ভয় কি? এখনও যা আছে, তাতে ছয় মাস অনায়াসে চলবে।

সরলা। শ্যামা, তুমি যে ঐ ভাঙ্গা সিন্দুকে টাকা রাখ, এ কিন্তু ভাল নয়। কবে কে টের পেয়ে একদিন সব নিয়ে যাবে।

শ্যাম। কেই বা টের পাবে যে, সিন্দুক ভাঙ্গা। যদি তুমি চুরি কর তা হলে যাবে, আর আমি চুরি করলে যাবে। এ ছাড়া আর চুরি করতে আসবে কে।

প্রমদা এত দূর পর্যন্ত শুনিয়া দ্বারের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহাব বড়ই আহ্লাদ হইল। একবার মনে করিলেন, সেই রাত্রিই টাকাগুলি চুরি কবিবেন। কিন্তু নিজে গেলে পাছে ধরা পড়েন, এই ভাবিয়া বাত্রে চুপ করিযা রহিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে শশিভূষণ কাছারি চলিয়া গেলে গদাধর ও জননীকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন।

গদাধরচন্দ্র আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিল, "ডিডি, টোমার আর কিছু কোরটে হবে না। আমি একলাই পারব, কিন্টু ডুয়ার খোলা পেলে হয়।"

গদাধরের মাতা কহিলেন, "সেজন্য ভয় নাই। আমি আজ পাঁচদিন দেখছি, ওরা দোর খুলে রাখে। কিন্তু গদাধরচন্দ্র সাবধান, শ্যামা যদি জেগে থাকে, তবে তুমি এমন কাজে যেও না।"

গদাধর উত্তর করিল, "ভয় কি মা! আমি গায়ে টেল মেখে যাব, যডিও ঢরে-টরে, একটান মেরে পালাব।"

প্রমদা দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন, দূরে শ্যামাকে আসিতে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "গদাধর চুপ্ চুপ্।" গদাধর চুপ করিল। পরে প্রমদা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "গদাধরচন্দ্র, আজ না তুমি বাড়ী যেতে চেয়েছিলে, যাও না কেন?"

গদাধরও উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "এখন টো রোড হয়ে উঠল, ওবেলা যাব।" সন্ধ্যাব কিঞ্চিৎ অগ্রে গদাধর কাপড়চোপড় পরিয়া বাটী যাইবার জন্য বাহির হইলেন। কিন্তু রাত্রি ১০টা ১১টার সময় পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রমদা দরজা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং গদাধর নিঃশব্দেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রীষ্মকাল, সবলা ও শ্যামা দরজা খুলিয়া শুইয়া আছেন, দু-জনের মধ্যে শুইয়া গোপাল নিদ্রা যাইতেছ, শব্দটি মাত্র শুনা যাইতেছে না। গদাধর সুযোগ বুঝিয়া সরলাব গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক টাকাগুলি লইয়া সেই রাত্রেই বাটি চলিয়া গেলেন। পরদিন ৭টার সময় গদাধর ফিরিয়া আসিলেন। রাস্তায় আসিবার সময় মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বাটীব মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন গোলযোগেব কথা শুনিতে পাইলেন না। পাড়াগাঁযে শহরেব মত প্রত্যহ টাকার প্রয়োজন হয় না। সবলার কোন খবচপত্রের আবশ্যক হয নাই। শ্যামাও সে দিবস সিন্দুক খোলে নাই। সুতরাং সে দিবস কোন গোলযোগও হইল না।

পরদিবস আহাব কবিয়া গোপাল পাঠশালা যাইবার সময় কহিল, "মা, আজ মাইনে দিতে হবে, শুরুমহাশয় কালই নিয়ে যেতে বলেছিলেন, তা আমাব মনে ছিল না। আজ না দিলে হবে না।" সরলার তখন অবসর ছিল না। শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্যামা, গোপালেণ পাঠশালের মাইনে দাও।"

শ্যামা সিন্দুক খুলিয়া যে স্থলে টাকা থাকে খুঁজিয়া পাইল না; মনে কবিল, সরলা টাকা স্থানান্তরে রাখিয়া ঠাট্টা করিতেছেন। এজন্য সরলাকে কহিল, "খুড়ী-মা, আমার সঙ্গে চালাকি?"

সরলা কহিলেন, "সে কি শ্যামা?"

শ্যামা। ইঃ—উনি কিছু জানেন না আর কি?

সরলা কহিল, "শ্যামা, যথার্থই আমি কিছু জানি নে।"

শ্যামা সরলার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, সরলা যাহা বলিয়াছেন যথার্থ। তখন কহিল, "তুমি তো টাকা কোন জায়গায় রাখ নাই।"

সরলা কহিলেন, "আমি তো দু-তিন দিন হলো সিন্দুকেব কাছেও যাই নি।"

শ্যামা কহিল, "তবে যথার্থই টাকা চোরে নিয়েছে।" উভয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সিন্দুকের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। টাকা কোথাও নাই। সরলার মুখ শুকাইয়া গেল। কপালে ঘর্ম বহিতে লাগিল। কাতর স্বরে কহিলেন, "শ্যামা, উপায়?"

শ্যামা কহিল, "আর কিছু না, ঐ বিট্‌লে বামুন নিয়েছে। এ গদার কর্ম। এত দিন না, তত দিন না, হঠাৎ ও পরশু বাড়ী গেল কেন? ও-ই টাকা চুরি করে নিয়ে রেখে আসতে গিয়েছিল। এখন আমার মনে হলো, ওরা সেদিন সকলে ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ কবছিল, আমি ওদের বাড়ীর দিকে গেলাম তখন চেঁচিয়ে কথা কইতে আরম্ভ করলে। চল্লাম আমি থানায়, ও কেমন বামুন আমি দেখব।"

এই বলিয়া শ্যামা গৃহমধ্য হইতে বাহির হইল। প্রমদা গদাধব ও গদাধরের জননী এ দু-দিবস ক্রমাগত চৌকি দিতেছিলেন কখন টের পায়। আপাততঃ সবলার গৃহে উচ্চ কথা শুনিয়া পরস্পর তিন জনে হাসিতে লাগিলেন।

শ্যামা বাহির হইয়া কহিল, "আমি টের পেয়েছি, কে টাকা চুবি কবছে? এ সব গদাধবের কর্ম। সেদিন বাড়ী গেল, যেন কেউ টের পেলে না আব কি? এখন আমি বলছি, ভাল চাও তো টাকাগুলি দাও, না দিলে আমি থানায় খবর দেব। আমি কাউকে ছেড়ে কথা কব না। ধাড়ি বাচ্ছা সকলেবই নাম করে দেব।"

গদাধর বাহির হইয়া কহিল, "কি টুই বকবক করছিস? কে টোর টাকা নিয়েছে? ফের যডি টুই চোর বলিস, টবে আমিই টোকে ঠানায় নিয়ে যাব।"

শ্যামা। তোর আর আমাকে থানায় নিয়ে যেতে হবে না। সেদিন গিয়েছিলি না থানায়? কি কল্লি গিয়ে?

গদাধর মনে করিল, শ্যামা তাহার বিদ্যা টের পাইয়াছে, পাছে বেশী কথা কহিলে সমুদয় প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে ঝগড়া ত্যাগ করিযা ঘরেব মধ্যে প্রবেশ করিল। শ্যামা বলিতে লাগিল, "এই আমি চল্লাম। আমি কাহারো উপবোধ করব না। ঘবে পুলিস এনে খানা তল্লাসি করে তবে ছাড়ব।" শ্যামা এইরূপ বলিয়া বাটীব বাহির হইতেছে এমন সময় শশিভূষণ কাছারি হইতে বাটী আসিলেন। পুলিস খানা-তল্লাসিব কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আবাব কি হযেছে?"

শ্যামা কহিল, "গদাধর আমাদের টাকা চুরি করেছে, যদি ভাল চায এখনই দিক, নইলে আমি চল্লাম, এই পুলিস ডেকে আনি গিয়ে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "শ্যামা আমার সঙ্গে এস——আমি অনুসন্ধান করে দেখি, পরে তুমি থানায় যেও।" শ্যামা শশিভূষণের কথায় ফিরিয়া আসিল।

শশী কাপড়-চোপড় ছাড়িলেন। শ্যামা গদাধরের বাটী যাওয়া ও তাহাব পূর্বে তাহাদিগকে পরামর্শ ও পরে টাকা হারানর বিবরণ সমুদয় বর্ণনা করিল। শশিভূষণ শুনিযা ভালমন্দ কিছুই না বলিয়া শ্যামাকে কহিলেন, "শ্যামা, এখন এই টাকাটি দিয়া গোপালকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দাও। আমি আহারাদি করে ইহার বিচাব কবব।"

শ্যামা তাই করিল।

শশিভূষণ আহারাদি করিয়া সমুদয় পুনরায় প্রমদাব নিকট শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহাব অত্যন্ত সন্দেহ হইল। প্রমদাকে কিছু না বলিয়া পুনরায় কাছারি যাইবার সময় শ্যামাকে ডাকিয়া কহিয়া গেলেন, ''শ্যামা, কে টাকা নিয়েছে ঠিক হলো না। কিন্তু পুলিস আনিয়া গোলের প্রয়োজন কি, তোমার যত টাকা গিয়েছে, আমিই দেব।''

কাছারি হইতে আসিয়া শশিভূষণ শ্যামাকে পুনরায় ডাকিয়া টাকাগুলি গণিয়া দিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গোপালের দুই মা

শশিভূষণের বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে রামচন্দ্র ঘোষের বাটীতে পাঠশালায় গোপাল লিখিতে যায়। রামচন্দ্র ঘোষেব চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসে। পাঠশালায় ষাট সত্তব জন বালক লেখে। বালকেরা সকলে সারি সারি বসিয়া আছে। তন্মধ্যে গুরুমহাশয় হুঁকা-কলিকা-বেত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব শোভা সম্পাদন কবিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের মেজের উপর বেত্রাঘাতপূর্বক ''পড়ে লেখ্ পড়ে লেখ্'' বলিয়া সিংহনাদ করিতেছেন।

বালকেরা যাহার যতদূর গলা, উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া লিখিতেছে। কেহ কেহ পঞ্চমে তুলিয়া ''ক লেখ খ লেখ'' করিতেছে, কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে ''রামকৃষ্ণ পরামাণিক'' ''জন্মেজয় মিত্র'' ইত্যাদি যুক্তাক্ষরে নাম লিখিতেছে। অসংযুক্ত বর্ণের নাম গুরুমহাশয়ের গ্রাহ্য হয় না। কলার পাতায় কেহ হেঁকে হেঁকে ''সেবক শ্রীউত্তমচন্দ্র দেবশর্মণঃ'' পাঠ লিখিতেছে। কাগজলেখক ছাত্রেরা যেন মস্ত মস্ত জমিদাব মহাজন হইয়া পড়িয়াছে। অর্থের প্রতি দৃকপাতই নাই। যেমন তেমন বাংলা কাগজে মহামহিম পাঠ লিখিযা দু-লাখ পাঁচ-লাখ টাকাই কর্জ দিতেছে। কেহ গ্রামকে গ্রামই পত্তনি পাট্টা ইজারা দিতেছে। টাকার সুদ, কি জমির নিরিক লইয়া কোনই গোলযোগ হইতেছে না। এতেও গভর্নমেন্ট জমিদারদিগকে নিন্দা করেন।

নিধিরাম পাততাড়ি কক্ষে করিয়া ডান হাতে দোয়াত ঝুলাইয়া পাঠশালায় দেখা দিল। গুরুমহাশয় নিধিরামের দেরি হইয়াছে বলিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। নিধিরাম উপস্থিত হইবামাত্রই গুরুমহাশয় সমাদরে নিধিরামকে ডাকিলেন——''নিধে, এদিকে আয় তো।'' হুকুম পাস করিয়াই গুরুমহাশয় বেত্র আস্ফালন কবিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে নিধিরামের ওষ্ঠ, তালু শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু গুরুমহাশয়েব হুকুম লঙ্ঘন করিবার জো নাই। নিধিরাম আস্তে ব্যস্তে এজলাসের নিকটে অগ্রসব হইল।

গুরুমহাশয় দক্ষিণ হস্তে বেত্রাস্ফলন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা কবিলেন, ''কেন রে নিধে, আজ তোব দেরি হলো?''

নিধিরামের চক্ষের তারাদ্বয় মস্তকে উঠিয়াছে। যেন নিধিবামেব অন্তিম কাল উপস্থিত। ঢোক গিলিয়া নিধিরাম উত্তর করিল, ''সকালবেলা তামাক ছিল না, তাই তামাক মেখে আনতে দেরি হয়ে গিয়েছে।''

এক কথাতেই গুরুমহাশয়ের রাগ কমিয়া গেল। কলিকাটি নিধিরামের হাতে দিয়া কহিলেন, ''আচ্ছা, সাজ তোর এক কলিকা তামাক। যদি ভাল হয়, তবে কিছু বলব না, মন্দ হলে তোর হাড় এক জায়গায়, মাস এক জায়গায় কবব।''

নিধিরাম বাঁচিয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাততাড়ি ফেলিয়া কলিকা-হস্তে তামাক সাজিতে গেল।

আড়ালে আসিয়া নিধিরাম তামাক সাজিল এবং নিজে দুই এক টান দিয়া গুরুমহাশযেব কাছে লইয়া গেল। নিধিরাম হালি তামাকে দীক্ষিত, সুতরাং যে ইচ্ছা, সেই তামাক তাব কাছে ভাল লাগে। তাহার মুখে ভাল লাগিলে গুরুমহাশয়ের মুখে ভাল লাগিবে এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে গুরুমহাশয়কে কলিকাটি দিয়া নিজের জায়গায় বসিতে যাইতেছে।

গুরুমহাশয় দুই চারি টান টানিয়াই নিধেকে ডাকিলেন। আজি নিধের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। নিধে মনে করিতে লাগিল, ''হায়, আমি সকালবেলা উঠে কার মুখ দেখেছিলাম? অদৃষ্টে যে কি আছে বলা যায় না।''

কিন্তু ভাবিলে আর কি হইবে? এক পা দু-পা করিয়া কম্পিতকলেবরে নিধিবামকে হুজুরে হাজির হইতে হইল।

গুরুমহাশয় কহিলেন, ''তবে রে পাজি, তুই কি এই তামাক আমার জন্য এনেছিস?''

নিধি। আমার দোষ কি গুরুমহাশয়! বাবা কাল হাট থেকে যে তামাক এনেছেন, আমি তাই এনেছি।

''তোর বাবা কেমন তামাক আনে আমি দেখাচ্ছি,'' বলতে না বলতে অমনি গুরুমহাশয় সপাং সপাং করে নিধিরামের পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

গুরুমহাশয় নিধিকে প্রহার করিয়া, বীরভাব ধারণ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ''দোলের পার্বণী যার যার বাকি আছে দাও।''

পাঁজিতে যত পার্বণ আছে, গুরুমহাশয় তার প্রতি পার্বণে পয়সা আদায় করেন। যদি বাপ মা না দিতে চান, গুরুমহাশয় বালকদিগকে চুবি কবিয়া আনিতে শিখাইযা দেন। ছেলেরা যদি সুবিধামতে বাহিবে পয়সা না পায়, তবে বাড়ীর কোন জিনিসপত্র চুরি করিয়া বেচিয়া গুরুমহাশয়কে পয়সা দেয়। গুরুমহাশয়কে সন্তুষ্ট কবা আব দেবতাকে সন্তুষ্ট করা, বালকদের কাছে উভয়ই তুল্য।

দোলের পার্বণী পয়সা যাহারা যাহারা আনিয়াছিল, গুরুমহাশয়কে দিল। গোপাল দিতে পারিল না।

গুরুমহাশয় গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন. ''গোপাল, তোমাব পয়সা কোথায়?

গোপাল সকাতরে উত্তর করিল, ''গুরুমহাশয়, আমি কাল দেব।'' প্রহারেব ভয়ে গোপাল বলিল, কাল দেব, কিন্তু কোথায় পাইবে তাহাব ঠিক নাই। গুরুমহাশয় বলিলেন,

"তুমি আজ তিন দিন দেব বলে দিতে পারলে না; কাল যদি না পাই, তবে তোমাকে নিধের মতন করব।"

গোপাল দাঁড়াইয়া কহিল, "কাল আমি অবশ্যই আনব।"

পাঠশালায় ছুটি হইলে গোপাল বাটী যাইবার সময় ভুবন নামে আর একটি বালককে বলিল, "ভুবন, আমাকে যদি একটা পয়সা ধার দাও, তা হলে আমি বাঁচি, তা নইলে কাল আমার পিঠের চামড়া থাকবে না।"

ভুবন কহিল, "তোমার মায়ের কাছ থেকে এনে দাও না কেন?"

গোপাল। মায়ের কাছে পয়সা নেই, থাকলে কি আমি তোমাব কাছে ধার চাই?

ভুবন। তবে তোমার জলখাবার পয়সা থেকে দাও না কেন?

গোপাল। আমি জলখাবার পয়সা পাই নে। তা যদি পেতাম, তা হলে আমি তোমার কাছে ধার চাইতাম না।

ভুবন। তুমি জলখাবার পয়সা পাও না, তবে জল খাও কি? আজ বাড়ী গিয়ে কি খাবে?

গোপাল। তা তো আমি বলতে পারি নে। যদি কিছু থাকে, তবে মা দেবে। যদি না থাকে, তবে খাব না।

ভুবন। তুমি বাড়ী গিয়ে খাবাব চাও না?

গোপাল। না।

ভুবন। কেন?

গোপাল। যদি চাই, আব যদি না থাকে, তবে মা বড় কাঁদে। মার কান্না দেখলে আমি থাকতে পারি না। আমারও বড় কান্না পায়। এইজন্য আমি কিছু চাই নে। একদিন আমি আর বিপিন বাড়ী গেলাম, বিপি৲ খাবার খেতে লাগল, মা আমাকে কিছু দিতে পারলেন না বলে কত কানতে লাগলেন। সে অবধি আমি আর একত্তর বাড়ী যাই নে। যখন বুঝি, বিপিন বাড়ী গিয়া খাবাব-টাবার খেয়ে খেলা করছে, আমি তখন বাড়ী গিয়াই বিপিনের সঙ্গে খেলা করি। যদি ঘরে কিছু থাকে, মা ডেকে দেন। যদি না থাকে, তা হলে আর কিছু খেতে পাইনে। —এই কথা বলিতে গোপালের চক্ষু হইতে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।

গোপালের অশ্রুপাত দর্শন করিয়া ভুবন সবল চিত্ত দ্রব হইয়া গেল। ভুবন জিজ্ঞাসা করিল, "বিপিন যাহা খেতে পায়, তার কিছু তোমাকে দেয় না?"

গোপাল কহিল, "বিপিনের দেবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু জেঠাই মা দেন না। বিপিনকে খাবার দিলে তিনি নিজে সুমুখে বসে থাকেন, পাছে বিপিন আমাকে দেয়।"

ভুবন। চল, তুমি আমাদের বাড়ী চল। আমার যে খাবার আছে দু-জনে ভাগ করে খাব এখন; আর তোমাকে মার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে দেব।"

গোপাল। তোমার মার কাছে চাইলে দেবে না, তুমি যদি দাও তবে চল যাই।

ভুবন। আচ্ছা চল যাই, আমিই দেব এখন।

উভয়ে অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে বাটী গেল। বাটী গিয়া গোপাল বাহিরে বসিল। ভুবন মায়ের কাছে গিয়া গোপালের কাছে যাহা শুনিয়াছিল, আনুপূর্বিক বর্ণনা কবিল। তিনি শুনিয়া গোপালকে ডাকিয়া আনিতে কহিলেন। ভুবন মাতার আজ্ঞা পাইবামাত্র দৌড়িয়া দ্বারে আসিয়া গোপালকে লইয়া গেল।

ভুবনের মাতা গোপালের ম্লান মুখ ও ছলছল নেত্র দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। দুটি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''গোপাল, তোমরা দু-জনে একত্তর হয়ে পাঠশালা থেকে এলে, তা তুমি বাইরে বসেছিলে কেন?

গোপাল কিছু উত্তর করিল না।

তখন ভুবনের মাতা উভয়কে খাবার দিলেন; এবং দুটি ছোট ছোট গেলাসে জল দিলেন। গোপাল ও ভুবন খাবার খাইয়া জল খাইতেছে। গোপাল এক গেলাস জল খাইয়া শূন্য গেলাসটি হাতে ধরিয়া কহিল, ''আমাকে আর একটু জল দিন।''

ভুবনের মাতা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ''কার কাছে জল চাচ্ছ।''

গোপাল একটু লজ্জিত হইয়া হেঁটমুখে কহিল, ''আপনার কাছে।'' ভুবনের মাতা কহিলেন, ''আমি কে, তা না বল্লে জল দেব না।'' গোপাল আরও লজ্জিত হইল এবং আরক্তিম মুখ হেঁট করিয়া রহিল। ভুবনের মা পূর্বের মতন অল্প হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ''আমাকে যদি বল, 'মা, একটু জল দাও,' তা হলে দেব, নইলে দেব না।''

গোপাল গাঢ়স্বরে কহিল, ''মা, একটু জল দাও।''

ভুবনের মা গোপালকে অবিলম্বে কোলে লইলেন এবং শিরশ্চুম্বন করিয়া আর এক গেলাস জল দিলেন।

গোপাল ক্ষণকাল চক্ষের জলে কিছুই দেখিতে পাইল না। ভুবনের মায়ের স্কন্ধে নিজমস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল। ভুবনের মাতার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল গোপালের বাহুমূলে পড়িতে লাগিল।

গদাধর, তোমারও মা আছে! প্রমদা, তোমারও সন্তান আছে!

অনেকক্ষণ কোলে রাখিয়া ভুবনের মাতা গোপালকে নামাইয়া দিয়া পূর্ববৎ গোপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, 'গোপাল, আগে বল যে, তুমি পাঠশালা থেকে বাড়ী যাইবার সময় রোজ এখানে আসবে, তা নইলে তোমাকে যেতে দেব না।''

গোপাল কহিল, ''আমি রোজই আসব।''

ভুবনের মাতা তখন গোপালের হাতে একটি টাকা দিয়ে কহিলেন, ''যাও, এখন দু-জনে গিয়ে খেলা কর। বাড়ী যাবার সময় আমাকে না বলে যেও না।''

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল যাত্রার দলে

নীলকমল কালীঘাটে বাবুর বাড়ী খায়দায় থাকে, কাজকর্ম করে। বাবু একটি ভাল বেহালা খরিদ করিয়া দিয়াছেন। সকলে কুঠি কাছারি চলিয়া গেলে সেইটি বাজায়। তাহাকে দেখিয়া যদি কেহ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিত, "এটি কে," বাবুর উত্তর করিবার অগ্রে নীলকমল কহিত, "আমি একজন কালওয়াৎ; বাবুকে গান-বাজনা শোনাই, আর বাবুর বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকি।" বস্তুতঃ নীলকমলের দ্বারা বাবুর একটি চাকরের কাজ চলিত। এজন্য বাবু নীলকমলের কথায় একটু হাসিয়া ক্ষান্ত হইতেন, আর কিছু বলিতেন না।

রাস্তা দিয়া ফিরিওয়ালা যখন হাঁকিয়া যাইত, নীলকমল তখনই তাহাদিগকে ডাকিত। নিকটে আসিলে নীলকমল জিজ্ঞাসা করিত, "আজ কোন জায়গায় কারুর যাত্রা হবে বলতে পার?" যে ফিরিওয়ালা একবার নীলকমলের ডাকে আসিয়াছে, সে আর দ্বিতীয়বার আসিত না। নীলকমলও আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিত না। তার বিশ্বাস ছিল, ফিরিওয়ালারা সকল বাটীতে যায়, সুতরাং সব জায়গার খবর জানে।

ক্রমে এক মাস দু-মাস যায়, নীলকমল আর যাত্রার খবর পায় না। নীলকমলের রাত্রে ঘুম হয় না। দিনে দু-দণ্ড স্থির হইয়া এক স্থানে বসে না। কিন্তু কোনখানে গিয়া অনুসন্ধান করিতেও ভরসা হয় না। ঘরের বাহিরে গেলেই হাবাইয়া যাইবে, এই চিন্তা নিয়তই নীলকমলের অন্তঃকরণে জাগরুক। অথচ কোথায় যাত্রা হইবে, কেমন করিয়া সেখানে যাইবে, তাহার উপায়ও না করিলে নয়।

নীলকমল এক দিবস প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া তামাক খাইতেছে এবং কোথায় যাত্রা হইবে, এই চিন্তা করিতেছে, এমন সময় বাবু বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "নীলকমল, নীলকমল!"

নীলকমল অনন্যমনা হইয়া ভাবনা করিতেছিল, সুতরাং বাবুর ডাক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। বাবু নিকটে আসিয়া ডাকিলেন। নীলকমল ফিরিয়া বাবুকে দেখিতে পাইল; বাবুর পোশাকী ধুতি চাদর ও ছড়ি হাতে দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাবেন? আমারে ডাকছেন নাকি?"

বাবু কহিলেন, "হাঁ। চল, যাত্রা শুনে আসি। তুমি নাকি যাত্রা শুনবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছ?"

নীলকমল উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ। আমারে যদি নিয়ে যান, তবে বড়ই ভাল হয়।"

বাবু কহিলেন, "সেইজন্যেই তো তোমাকে ডাকছি। শীঘ্র চল, আবার বাড়ী ফিরে এসে কাছারি যেতে হবে।"

নীলকমলের আর দেরি নাই। অবিলম্বে হুঁকাটি রাখিয়া স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর বাহির হইল। বাবু কালীঘাটের কালীবাড়ীর রাস্তা ধরিলেন। নীলকমল তদ্দর্শনে জিজ্ঞাসা করিল, "যাত্রা হচ্ছে কোথায়?"

বাবু। কালীবাড়ীর কাছে।

নীল। কালীবাড়ীর বড় কাছে?

বাবু। হাঁ।

নীলকমল বাবুর উত্তর শুনিয়া কহিল, "তবে আপনি যান——আমার যাওয়া হবে না।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাওয়া হবে না?"

নীল। যার পাথরের চোখ থাকে, সে যেন কালীবাড়ী দু-বার যায়। আমার মাংসের চোখ, আমি আর সেখানে যাবো না।

বাবু। কেন বল দেখি?

নীলকমল কহিল, "মহাশয়, আমি যখন প্রথম দিন এলাম, তখন এক হাটের লোক ধর্ ধর্ করে পিছুপিছু এসে এক খানার কাছে আমাকে পেড়ে ফেল্লে। কেবল সিন্দুর দেবার জন্যে। আমি আর সেখানে যাই নে। আমার চোখটি যাবার জো হয়েছিল। আর খানিক থাকলেই যেত।"

বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গে এস, তোমার ভয় নাই।"

নীল। অমন দাদাঠাকুরও বলেছিলেন, কিন্তু বিপদের সময় তো ঠ্যাকাতে পারলেন না। তখন যে বামা মাঝির মতন হাল ছেড়ে বসে রইলো। হতো যদি আমার দেশ, তাহলে এক বাঁকের বাড়িতে মাথা ভেঙ্গে দিতাম।

বাবু। তোমার দাদাঠাকুরও তো তোমার মতন শহুরে লোক, তা তোমাকে বাঁচাবে কি? তুমি আমার সঙ্গে এস, কোন ভয় নাই।

নীল। দাদাঠাকুর শহুরে লোক মন্দ কি! সে কেষ্টনগরে থাকতেই কত গাড়ী দেখেছিল।

বাবু। গাড়ী দেখলেই শহুরে হলো? এখন তুমি যেতে হয় তো চল। না যাও বল, আমি যাই।

নীলকমলের যাবার খুব ইচ্ছা, অথচ কালীবাড়ীর কাছে, ভয়ে সহজে স্বীকার হয় না। ক্ষণকাল এক স্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিয়া কহিল, "কোন ভয় নেই তো, এইবেলা ঠিক করে বল।"

বাবু উত্তর করিলেন, "আর কতবার বলব।"

নীলকমল বাবুর কথায় ভর করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। যাত্রার স্থলে গিয়া নীলকমল একবার ঝাড়লণ্ঠনের দিকে চায়, একবার যাত্রাওয়ালাদের দিকে চায়, মাঝে মাঝে উপস্থিত লোকজনের দিকে চায়। এবং যা দেখে, তাহারই সম্বন্ধে বাবুকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। বাবু ক্ষণকাল পরে বিরক্ত হইয়া গেলেন। বেলাও বেশী হইতে লাগিল, কাছারি যাইতে হইবে, এজন্য বাবু নীলকমলকে কহিলেন, "চল তবে এখন যাই।"

নীলকমল কহিল, "আমি যেখানে একবার এসেছি, যাত্রা শেষ না হলে আর যাব না।"

হয় না। ক্ষণকাল এক স্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিয়া কহিল, "কোন ভয় নেই তো, এইবেলা ঠিক করে বল।"

বাবু উত্তর করিলেন, "আর কতবার বলব।"

নীলকমল বাবুর কথায় ভর করিয়া তাঁহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবিল। যাত্রাব স্থলে গিয়া নীলকমল একবার ঝাড়লণ্ঠনের দিকে চায়, একবার যাত্রাওয়ালাদেব দিকে চায়, মাঝে মাঝে উপস্থিত লোকজনের দিকে চায়। এবং যা দেখে, তাহারই সম্বন্ধে বাবুকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। বাবু ক্ষণকাল পবে বিরক্ত হইয়া গেলেন। বেলাও বেশী হইতে লাগিল, কাছারি যাইতে হইবে, এজন্য বাবু নীলকমলকে কহিলেন, "চল তবে এখন যাই।"

নীলকমল কহিল, "আমি যেখানে একবার এসেছি, যাত্রা শেষ না হলে আর যাব না।"

বাবু নীলকমলের কথা শুনিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন নীলকমল, পথ চিনতে পারবে তো?"

নীলকমল উত্তর কবিল, "না চিনি, এত লোক আছে জিজ্ঞাসা করলেও বলে দেবে না?"

"কি জিজ্ঞাসা করবে বল দেখি?"

"কেন, বাবুর কথা।"

"কোন বাবু?"

"যে বাবু কাছারি কাজ করে।"

বাবু হাসিয়া কহিলেন, "তা হলেই তুমি আমার বাড়ী পঁহুছাবে আর কি?"

নীলকমল কহিল, "কেন? হাসলে যে? আর কি কেউ কাছারি কর্ম করে নাকি? এখানে ক'টা কাছারি। আমাদের গাঁয়ে তো একটা বৈ নেই।"

বাবু কহিলেন, "তার হিসাব তো এখন দিতে পারি নে। মোদ্দা যদি আমার বাড়ী যেতে চাও, তবে রামেশ্বরবাবুর বাড়ী কোথায়, বলে জিজ্ঞাসা করো।"

নীলকমল 'রামেশ্বরবাবু' 'রামেশ্বরবাবু' মুখস্থ কবিতে আরম্ভ করিল। রামেশ্বরবাবুর নাম মুখস্থ করিয়া নীলকমলের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কার যাত্রা হইতেছে, এটি নিশ্চয় করা। নিকটস্থ একজন লোককে দু-বার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু উত্তর না পাইযা তার গা টিপিল। টিপ্‌টি বড় সহজ টিপ নয়। টিপ খাইয়া সেই লোকটি "উঃ, কে বে" বলিয়া নীলকমলের মুখের দিকে চাহিল।"

নীলকমল তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার যাত্রা হচ্ছে?" সে কহিল, "তা কি লোকের গা না-টিপে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?"

নীলকমল কহিল, "এত চটো কেন ভাই! যদি তোমার ব্যথা লেগে থাকে, তুমি আমাকে নয় একটা টিপ দাও।"

"গোল মৎ করো, গোল মৎ করো" একজন খোট্টা দাঁড়াইয়া কহিল।

নীলকমলের আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। এমন সময় দু-জন লোক গান শুনিয়া উঠিয়া যাইতেছে। নীলকমলেব নিকটবর্তী হইয়া একজন অপর জনকে কহিল, ''আব গোবিন্দ অধিকাবীর সেকাল নাই।'' নীলকমল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তখন ভাবিতে লাগিল, ''গোবিন্দ অধিকাবীর সঙ্গে তো আমার আলাপ আছে। একবার চোকাচকি হলে হয়। তা হলেই আমাকে ডাকবে, আব আমি আসরে গিযে বসব। এ ব্যাটার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছি বলে চটে গেল, আসরে গিয়ে বসলে ব্যাটা টের পাবে আমি একজন যে-সে নই।'' এইরূপ চিন্তা করিয়া নীলকমল একবাব ডানদিকে চেয়ে থাকে, একবার বাঁদিকে বেঁকে চেয়ে থাকে, কিন্তু চোকাচকি আব হয় না। অগ্রে যাইবারও আর জো নাই। নীলকমল একস্থানে দাঁড়াইয়া ক্ষণেক ওদিক বেঁকিতেছে, এমন সময যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে বাহিবে যাইতে লাগিল, গোল অনেক চুকিয়া গেল। নীলকমলেব অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, নীলকমল আসবে গিয়া বসিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

আশা মরীচিকা

বিধুভূষণ কিয়ৎকাল কালীঘাটে থাকিয়া তিনিও যাত্রাব দলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেখানে যান, সেইখানেই শুনেন, হয়ত তাদের বাদ্যকরের দরকার নাই, অথবা ভাল বাদ্যকবের বেতন দিবাব ক্ষমতা নাই। কালীঘাটে যদিও আহাবের ভাবনা নাই বটে, কিন্তু বিধুভূষণের বস্ত্রাদি এরূপ মলিন হইযা গেল যে, তাঁহার আব কোন স্থানে যাইবাব জো রহিল না। তাঁহাব পাণ্ডা বন্ধু তাঁহাকে তাহাব নিজেব ব্যবসা গ্রহণ কবিতে উপদেশ দিল। কিন্তু বিধুভূষণ নূতন লোক, সকল স্থান ভাল করিয়া চেনেন না। অধিকন্তু কালীঘাটে থাকিয়া মিথ্যা কথা বলা ও প্রবঞ্চনা কবা অপেক্ষা অধিক পাপ আর নাই, এই সমস্ত ভাবিয়া পাণ্ডার উপদেশ গ্রহণ করিলেন না।

এক দিবস একাকী বসিয়া বিধুভূষণ নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করিতেছেন। ''পূর্বেই বা কি ছিলাম, এখনই বা কি হইয়াছি। শবীরে সামর্থ্য মাত্র নাই। যেখানে বসিয়া থাকি, সেইখানেই থাকিতে ইচ্ছা করে, মনে উৎসাহের চিহ্নও নাই, বস্ত্রাদি দেখিলে আর ব্রাহ্মণ কেহই কহিবে না, বাড়ীর খবর পাইলাম না, পত্র লিখি তাহারও জবাব পাই না, পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো, সেই বা কোথায়? আমার অদৃষ্টই বুঝি এমনি যে, যাহার সহিত আমার সংস্পর্শে হইবে, তাহার আর সুখ হইবে না। আহা, সরলার যদি অন্য কাহারও সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে আব কোন সুখ হউক, অনাহারে থাকিতে হইত না।'' সরলাব কথা মনে হইয়া বিধুভূষণের চক্ষু হইতে ঝব্ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ ও প্রমদাব কথা মনে হইয়া তাঁহার চেহারাব আর এক প্রকার ভাবান্তর হইল। চক্ষু লাল হইল। মুখভঙ্গি

ভীষণাকার হইল, এবং দক্ষিণ হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল। পুনরায় গদাধবচন্দ্র ও তদীয় জননীর কথা মনে হইযা মুখে ঈষৎ হাস্য উপস্থিত হইল।

মুখমণ্ডল হৃদয়েব দর্পণস্বরূপ। অন্তঃকবণে যখন যে ভাবের উদয় হয়, মুখে অবিলম্বে তাহা প্রতিবিম্বিত হইযা থাকে। অন্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত হইলে মুখ ম্লান হয়; সুখ উপস্থিত হইলে মুখ প্রফুল্ল হয়। অন্তঃকবণে রাগেব কারণ সঞ্চার হইলে চক্ষু আবক্তবর্ণ হয, ওষ্ঠাধর কাঁপিতে থাকে ও দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত হয। ফলতঃ চিত্ত যখন যে বসে অভিষিক্ত থাকে, মুখমণ্ডলে তখনই তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয। সুতবাং মনুষ্যেব মুখ জীবদ্দশায নিয়তই বিকৃতভাবে থাকে। স্বাভাবিক কাহাব কেমন মুখ, তাহা মৃত্যুব পবে ব্যতীত জানা যায না।

অতি অল্পক্ষণেব মধ্যেই বিধুভূষণেব মুখে দুঃখ, বাগ ও কৌতুকেব চিহ্ন দর্শন কবিযা তাঁহার পাণ্ডা-বন্ধু কহিল, "কি হে, পাগল হইবাব উদ্যোগ কবতেছ নাকি?"

বিধুভূষণ চিন্তায মগ্ন ছিলেন, সুতরাং পাণ্ডা-বন্ধু নিকটে আসিয়াছে, তাহা টেব পান নাই। এজন্য তাহার কথা শুনিযা চমকিয়া উঠিযা কহিলেন, "হাঁ, কি বলছ?"

পাণ্ডা। এমন কিছু না, পাঁচালি শুনবে? আমাদের দেশেব এক দল পাঁচালিওযালা এসেছে। চল, আজ পাঁচালি হবে, শুনে আসি।

বিধুভূষণ সর্বক্ষণই প্রস্তুত। বলিবামাত্রেই তাহাব সঙ্গে চলিলেন। কিযদ্দূব গমন করিয়া পাণ্ডা কহিল, " তুমি যে বলেছিলে, কোন যাত্রাব দলে চাকবি কববে। এই তো উপস্থিত আছে, কর না কেন?"

বিধুভূষণ আগ্রহ সহকাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ? কৈ?"

পাণ্ডা কহিল, "যেখানে আমবা পাঁচালি শুনতে যাচ্ছি, সেইখানেই আছে। আমার সঙ্গে দলের অধীকাবীর দেখা হয়েছিল। তাব বাড়ী আমার গ্রামে। তাদের যে একজন বাদ্যকব আছে, সে তো একে ভাল বাজাইতে পাবে না, আবাব তার উপব মদ খায়। নূতন দল, এ সময়ে একজন ভাল লোক না রাখলে নাম হবে না। এইজন্য আমাকে বলেছিল, 'যদি তোমাব কোন আলাপী লোক থাকে, সঙ্গে করে নিয়ে এস।' কিন্তু এক বন্দোবস্ত করতে হবে। তারা এখন মাইনে দিতে পাববে না। যা পায়, তার বখরা দিতে প্রস্তুত আছে।"

বিধুভূষণের মন এখন হলেই হয়, বখরাই দিক, আর মাইনেই দিক। এই কথা সাঙ্গ না হইতে হইতে তাহারা পাঁচালিব দলে গিয়ে উপস্থিত হইল। আর দুই ঘণ্টা বাদ পাঁচালি আরম্ভ হইবে। পাণ্ডা দলের কর্তাকে কহিল, "এই তোমার লোক এনেছি।"

বিধুভূষণের বেশভূষা দেখিয়া দলের কর্তার কিছু অভক্তি হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বিধুকে কহিল, "আপনি একবার বাজান দেখি?" এই বলিয়া এক জোড়া তবলা তাঁহার কাছে দিল। বিধুভূষণ বাজাইলেন। পাঁচালিওয়ালা বড় ধূর্ত। মনে মনে পছন্দ হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলে পাছে বেশী দর হইয়া যায়, এজন্য মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "হাঁ, চলতে পারে।" পরে পাণ্ডার দিকে মুখ ফিরাইয়া "বন্দোবস্তের কথা বলেছ?"

পাণ্ডা কহিল———"হাঁ।"

অধিকারী। তাতেই স্বীকাব?

পাণ্ডা। তাতেই।

অধিকারী। তবে কবে থেকে মিশবেন?

বিধু। যবে থেকে বলেন।

অধিকারী। তবে আজ।

বিধু। আচ্ছা তাই।

বিধুভূষণের পাঁচালির দলে যাওয়া অবধি যেন দলের অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। অল্প দিবসের মধ্যেই দলের নাম প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং দেশ-বিদেশ হইতে বায়নাপত্র আসিতে লাগিল। "টাকা হইলে লোকের চেহারা ফেবে" সকলেই বলিয়া থাকে, বস্তুত সে কথা যথার্থ, বিধুর এক্ষণে আয় হইল। তাঁহার মলিন বসন দূর হইল, মুখভঙ্গী ভাল হইয়া আসিল, কিন্তু পূর্বের ন্যায় চিন্তাশূন্য আর হইল না। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই ক্রমে ক্রমে প্রাচীন হয়। অধিকাংশই হঠাৎ বিজ্ঞ হইয়া বসে, এমন সর্বদাই দেখা গিয়া থাকে। আজি দিব্য যুবাপুরুষ, অনবরত আমোদপ্রমোদ করিতেছে, কোন ভাবনাচিন্তা নাই, দুঃখক্লেশ কাহাকে বলে জানে না, দেখিলে বোধ হয় যেন চিরকালই তার এই ভাবেই কাটিয়া যাইবে; এমন সময় তাহার পিতা কিংবা মাতা কিংবা জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাল হইল। আব সে প্রফুল্ল মুখে হাসি নাই, সে ক্রীড়াকৌতুকে আসক্তি নাই? একেবারে সমুদয়ই পরিবর্তন হইযাছে। এক রাত্রিতে বৃদ্ধ হইয়াছে। বিধুভূষণ পৃথক হইবার দিন অবধিই বিজ্ঞ হইয়াছেন।

টাকা হাতে পাইবামাত্রেই বিধুভূষণ সরলাকে পত্র লিখিলেন এবং কিছু খবচ পাঠাইয়া দিলেন। লেখাপড়ায় তাদৃশ পারদর্শিতা না থাকা প্রযুক্ত একখানা পত্র লিখিতে কত কাগজই নষ্ট করিলেন। একবার অক্ষর মনোমত হইল না, সেখান ফেলিয়া দিলেন। আর একবার কথা ভাল লাগিল না, সেখানও ফেলিয়া দিলেন। একবার খানিক কালি পড়িয়া গেল, সেখানিও নষ্ট হইল। শেষের খানি ভাল হইল। প্রফুল্লচিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। সরলা পাইয়া যে কত আহ্লাদিত হইবে, সেই ভাবিয়া বিধুর আর আহ্লাদের সীমা নাই। চক্ষু হইতে দুটি মুক্তাফল বর্ষণ হইল। বিধু আহ্লাদে অশ্রুপাত না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

চিঠিখানি ডাকঘরে রেজিস্টারি করিযা পাঠাইয়া দিলেন।

ঐ ডাকঘরে চিঠির জবাব আসিবে। বিধুভূষণের নিকট ডাকঘর তীর্থস্থানে হইয়া উঠিল। রোজই এক একবার যান। "কিন্তু সরলা তো লিখিতে জানে না?" বিধুর ভাবনা হইল, "কে চিঠি লিখিয়া দিবে? গোপাল এত দিন চিঠি লিখিতে শিখিয়াছে, গোপাল লিখিবে।"

প্রত্যহই ভাবিয়া যান, আজ চিঠি আসিবে, কিন্তু আইসে না।

আশা! ধন্য তোমার ছলনা, ধন্য তোমাব কুহকিনী শক্তি! তুমি কি না করিতে পাব? তোমার ন্যায় আর কে প্রবোধ দিতে পাবে? তুমি মুমূর্ষকে বলবান করিতে পাব, অন্ধকে দর্শন করাইতে পার, পঙ্গু দ্বারা গিবি লঙ্ঘন করাইতে পার, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পার। কিন্তু তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনীও আব কেহ নাই। তোমার রূপ দেখিয়াই লোকে ভুলিয়া যায়। তোমাব চবিত্র কেহ অনুসন্ধান কবে না। যাহাকে তুমি বারংবার প্রবঞ্চনা করিয়াছ, সেও তোমার মায়াজাল হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

বিধুভূষণও ডাকঘরে যাইতে ক্ষান্ত হন না, কিন্তু চিঠিও আইসে না। প্রত্যহই আশা কবিয়া যান, প্রত্যহই নিরাশ হইয়া ফিবিয়া আসেন। একদিবস পোস্টমাস্টার কহিলেন, ''আপনার চিঠি পৌঁছিযাছে, রসিদ আসিযাছে।''

বিধুভূষণ আগ্রহ-সহকারে কহিলেন, ''কৈ? কৈ? দেখি।'' পোস্টমাস্টাব পুস্তক খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন। লেখা বহিয়াছে, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিধু হর্ষোৎফুল্লনেত্রে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে নামটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে পোস্টমাস্টাবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আপনি এ কাগজখানা আমাকে দিতে পারেন?''

পোস্টমাস্টার কহিলেন, ''এখানা আমার বসিদ। এখানা হস্তান্তব করিবার হুকুম নাই।''

বিধুভূষণ সতৃষ্ণনয়নে আবও ক্ষণকাল নামটি নিবীক্ষণ কবিযা আর্দ্র চক্ষু বস্ত্র দ্বারা মার্জনা করিয়া ডাকঘব হইতে চলিয়া আসিলেন।

বিধুভূষণের মন অদ্য ইতিপূর্ব্বে কয়েক দিবস অপেক্ষা অনেক ভাল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল ও বিধুভূষণের পুনর্মিলন

হুগলি জেলার অন্তর্গত দেবীপুরে বারওয়ারি পূজায় যাত্রা, পাঁচালি, কবি ইত্যাদি বায়না হইয়াছে। বৈকাল হইতে রাত্রি ১০ টা পর্যন্ত পাঁচালি হইয়া গেল। সকলেই পাঁচালি শুনিয়া প্রসংশা কবিল। কিন্তু তাহারা গানে যত মোহিত না হইল, বাজনা শুনিয়া তদপেক্ষা অধিক প্রীতি লাভ করিল।

এ দলে বিধুভূষণ বাদ্যকর।

শেষরাত্রে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই যাত্রা শুনিতে বসিয়াছে। বিধুভূষণের দলের সকলে প্রাতঃকালে গান শুনিতে গেল। বিধুভূষণও সেই সঙ্গে গেলেন। তাঁহারাও উপস্থিত হইলেন, আর সঙের বাজনা বাজিয়া উঠিল এবং যাত্রার দল হইতে একটি কচি, কৃশকায়, ছিটের ইজের-চাপকান-পরা রাম উঠিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, ''বাছা হনুমান—বাছা হনুমান।'' দুই চারি বার ডাকিয়া চুপ করিল। পুনরায় ''বাছা হনুমান-—বাছা

হনুমান।'' রামটি এমনি কৃশ ও দুর্বল যে, এক এক বার বাছা হনুমান বলিয়া ডাকিতে তাহার আপাদমস্তক পর্যন্ত কম্পিত হইতেছে, গলায় শির উঠিতেছে এবং মুখ কালির বর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তথাপি হনুমানেব দয়া হয় না। হনুমান এসেও আসে না। রামের এদিকে চক্ষু ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, এঁবা মবে আসরে পড়ে ঘুম দিচ্ছেন। রাম বেচারার হিংসা হচ্ছে। মবিতে পারিলেই একটু ঘুমাইয়া বাঁচে। কিন্তু হনুমান না এলে তো যুদ্ধ আবম্ভ হইতে পারে না! হনুমানও আইসে না। দল হইতে একজন তানপুরা ফেলিয়া দৌড়িয়া হনুমানকে আনিতে গেল।

পাঠকবর্গ, চলুন দেখি সাজঘরে হনুমান কি করিতেছে।

নীলকমল গোবিন্দ অধিকারীর দলে গিয়াছিল, পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু নীলকমলের বিদ্যাবুদ্ধি দেখিযা গোবিন্দ অধিকারী তাহাকে নিজে না রাখিযা আব এক রামযাত্রার দলে সুপারিশ করিয়া দিয়াছিল। নীলকমল চারি টাকা বেতন পায়, আর তামাক সাজে, মন্দিরে বাজায়, দু-এক বাব বা বেহালারও কানমোড়া দেয়। কি করবে? বিদেশে চাকবি মেলে না। যা পেয়েছে, তাই করিতেছে। কিন্তু এতদিন তাহাকে কেহ সঙ সাজিতে বলে নাই। আজ আর অন্য লোক নাই, সুতবাং অধিকারী নীলকমলকে হনুমান সাজিতে বলিযাছে। নীলকমল ইহাতে অত্যন্ত বাগত হইয়াছে। চক্ষু লাল কবিয়া কহিল, ''আমার সঙ্গে এমন কোন বন্দোবস্ত ছিল না যে, আমি সঙ সাজব। আর যদি সাজি, তবে রাজা সাজব কিংবা আব কিছু সাজব, আমি হনুমান সাজতে পাবব না।''

অধিকাবী কহিল, ''এতে দোষ কি? যাত্রাব দলে সঙ তো সকলেই সেজে থাকে। আর যদি সঙ সাজতেই হয, তবে হনুমানই বা কি, আর রাজাই বা কি?''

নীলকমল। না, আমি হনুমান হয়ে মুখে চুনকালি দিয়ে কলা খেতে খেতে অত লোকের মধ্যে যেতে পারব না। আমাকে এতে চাই রাখ বা না রাখ।

অধিকারী মহাবিপদে পড়িল। এদিকে ''বাছা হনুমান, বাছা হনুমান'' কবিয়া রামের স্ববভঙ্গ হইবার জো হইয়াছে। এজন্য অধিকারী কহিল, ''তোমাকে এখন অবধি ৫ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া যাইবে, যদি হনুমান সাজ।''

নীলকমল সম্মত হইল, কিন্তু তথাপি লজ্জায় আসরে আসিতে পারিতেছে না। দু-একজন লোক গিয়া হনুমানরূপী নীলকমলকে বলপূর্বক ধরিযা আনিল।

রাম কহিল, ''কি বাছা হনুমান, এতক্ষণে এলে?''

নীলকমল ''হাঁ প্রভু এলাম'' বলিয়া উত্তর করিবে, এমন সময়ে বিধুভূষণকে দেখিতে পাইল। রাস্তায সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, নীলকমল তেমনি চমকিয়া উঠিল। নীলকমল ভাবিল যে, বিধুভূষণ সকলই টেব পাইযাছেন, গোবিন্দ অধিকারীব দলে মিশিতে পাবে নাই তাহাও জানিতে পারিয়াছেন, এখন যে কি অবস্থায কি বেতনে আছে সকলই অবগত হইয়াছেন।

নীলকমল এই সমস্ত মুহূর্তমধ্যে ভাবিয়া রামের কথায় আব জবাব না দিয়া, সভাস্থ লোকের নিকট জোড়হাতে উচ্চৈঃস্ববে কহিল, ''মহাশয়, আমাকে জোর করে হনুমান সাজায়েছে।''

হনুমানের কথা শুনিয়া সভাস্থ সমুদয় লোক হাসিয়া উঠিল। নীলকমল পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ‘‘আপনারা আমার কথায় কি বিশ্বেস করলে না। আমি দিব্বি করে বলতে পারি, আমি হনুমান না, আমার নাম নীলকমল, বাড়ী রামনগর, আমাকে জোর করে হনুমান সাজায়েচে।’’

সভাস্থ লোক আরও হাসিয়া উঠিল। নীলকমল লজ্জিত হইয়া বসিল। রাম ডাকিলেন, ‘‘বাছা হনুমান!’’

নীল। কে তোর হনুমান? আমাকে অমন হনুমান হনুমান করলে তোর ভাল হবে না।

রাম। (অধিকারীর পরামর্শে) হনুমান, এ যুদ্ধ-বিপদ হইতে রক্ষা কর।

নীল। ফের তুই হনুমান হনুমান করছিস? তোর যুদ্ধ হলো না হলো, তাতে আমার কি?

অনেক খোশামোদের পর নীলকমল যুদ্ধে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিল। কিন্তু সে সাহায্য নামমাত্র। রাম ধনুক-বাণ যেই ধরিল, আর অমনি পঞ্চত্ব পাইল। একটু পরে গান ভাঙ্গিয়া গেল। নীলকমল মুখোস ফেলিয়া দিয়া অধোবদনে বসিয়া আছে। বিধুভূষণ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘নীলকমল, কোথা থেকে এখানে জুটলে?’’

নীল। আরে যাও ঠাকুর, তোমার কথায় কাজ নাই। ওরাই নয় হেসে উঠল আমাকে চিনতে পারে না। কিন্তু তুমি কেমন করে হাসলে? তুমি তো আমাকে চিনতে, তুমি কেন দুটো কথা বলে দিলে না।

বিধুভূষণ কহিলেন, ‘‘নীলকমল, আমি তো—তুমি নীলকমল নও ভেবে হাসি নি তোমার কথায় হাসি এল।’’

নীল। আমার কথায় হাসি এল কেন? আমি কি পাগল?

বিধু। আমি তো বলছি না যে, তুমি পাগল।

নীল। আমি আর এ দলে থাকব না।

বিধুভূষণ কহিলেন, ‘‘নীলকমল, তুমি আমাদের সঙ্গে চল। আমাদের পাঁচালির দল, সেখানে সঙ সাজা নেই, সেই বেশ হবে! তুমি এখানে কত বেতন পাও?’’

নীলকমল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ‘‘৬ টাকা।’’ নীলকমল দু-টাকা বেশী করিয়া বলিল। এ রোগ অনেকেরই আছে, খালি নীলকমলের নয়।

বিধুভূষণ এক্ষণে দলের প্রধান হইয়াছেন বলিলে হয়। এ জন্য তিনি কহিলেন, ‘‘তবে তোমার কাপড়-চোপড় নিয়ে এস। আর যা পাওনা থাকে, তাও নিয়ে এস। আমরা তোমাকে ৬ টাকা মাইনে দেব।’’ এই বলিয়া বিধুভূষণ চলিয়া গেলেন।

নীলকমল মনে করিল, ‘‘যদি আর দু-টাকা বেশী করে বলিতাম, তাহা হলেও তো পেতাম। আহা হা! আমি বোকামি করেছি।’’

নীলকমল মনস্তাপে বাসায় ফিরিয়া গেল। দলের কর্ত্তার নিকট কহিল, ‘‘আমার মাইনে হিসাব করে দাও, আমি আর তোমার সঙ্গে থাকব না।’’

দলেব কর্তাও নীলকমলেব উপব বড় চটিয়া ছিল। সুতবাং মাহিযানা হিসাব কবিয়া দিতে আর কোন আপত্তি কবিল না। নীলকমল মাহিযানা ও বেহালিটি লইযা পাঁচালিব দলে আসিল।

নীলকমল পাঁচালির দলে আসিয়া বিধুভূষণকে ডাকিয়া কহিল, "দাদাঠাকুব, আমি চল্লাম।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "কোথায়?"

নীলকমল। যেদিকে পা চলে।

বিধুভূষণ। তার মানে কি নীলকমল?

নীলকমল মুখ আঁধার কবিয়া উত্তব কবিল, "আব আমাব এ জীবনে কাজ কি? দেশে থাকতে পারলাম না। বিদেশে এলাম, এখানেও সুখ হলো না। এখন চল্লাম—যে দেশে আলাপী লোকেব মুখ দেখ্তে না পাই, সেই দেশে যাই।"

বিধু। কেন, কেন, এই তো তুমি বল্লে—আমাদেব দলে থাকবে। আমি সকলকে বলে ঠিকঠাক করলাম। এখন আবাব এমন কথা বলছ কেন?

নীল। এখানে যদি থাক, তোমরা আমাকে নিয়ে কত হাসিঠাট্টা করবে; আমাব তা বরদাস্ত হবে না। হয়ত আমায হনুমান ছাড়া আব কিছুই বলবেই না। রাস্তায আসতে কতকগুলো ছেলে আমাব পাছে লেগে গেল। সদু মিস্ত্রী যেমন বলত—"কাগেব পিছে ফিঙ্গে লাগে," তেমনি সকলেই আমাকে হনুমান হনুমান বলে ডাকে। আমি তো আসছিলাম তোমাদেব দলে থাকবাব জন্য, কিন্তু এমন করলে তো আব থাকা হবে না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "নীলকমল, এখানে তোমাকে হনুমান বলে কেউ ডাকবে না।" এই কথা বলিবার সময় বিধুভূষণেব মুখে একটু ঈষৎ হাসি দেখা দিল।

নীলকমল তাহাতেই রাগত হইয়া কহিল, "ঐ ঠাকুর তুমিই বলছ, তাব আব অন্যে কি ছাড়েবে?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "কৈ, আমি তো তোমাকে তা বলে ডাকি নাই।"

নীলকমল কহিল, "তবে দিব্বি কবে বলো, আর ও-কথা মুখে আনবে না।"

বিধুভূষণ। আচ্ছা, দিব্বি কবেই বল্লাম। এখন হলো তো।

নীল। হলো বটে, কিন্তু তুমি যেন না বল্লে, আর সকলে ছাড়বে কেন? তারা তো "বেঁধে মারে সয় বড়" তা তো বুঝবে না। আমাব যে কত দুঃখ হয়, তারা তো টের পাবে না। দাদাঠাকুর, আমি যদি এ জানতাম, তা হলে কি আমি কখন রামযাত্রার দলে যেতাম?

বিধুভূষণ কহিলেন, আচ্ছা, তুমি এইখানে বসো, আমি গিয়া সকলকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে আসি, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।" বিধুভূষণ এই বলিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। নীলকমল বিধুভূষণের কথায় অনেক আশ্বাসিত হইয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লচিত্ত হইল। এবং ঘুন্ ঘুন্ করিয়া "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে, পদ্মবনে আমি যাব" ইত্যাদি গাইতে লাগিল।

নীলকমল তিন চারি ফেরতা "পদ্মআঁখি" গাইল। এমন সময় বিধুভূষণ ফিরিয়া আসিলেন।

নীলকমল ঘুন্ ঘুন্ ছাড়িয়া ইসারার দ্বারায় জিজ্ঞাসা কবিল, খবর কি?

বিধুভূষণ অনেক দিবসের পব পদ্মআঁখির গান শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া নীলকমলের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিধুর হাসি দেখিয়া নীলকমলের চেহারা গরম হইল। বিধু কহিলেন, "নীলকমল, এবার আমার দোষ নাই, তুমি যদি নিজেই হনুমান স্বীকাব কর, তবে আর লোকের অপরাধ কি?"

নীলকমল কহিল, "কৈ আমি স্বীকার করলাম?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "ঐ গানই তো সকল দোষের মূল। ও গানটার মানে জান?"

নীলকমল কহিল, "আমি জানি না-জানি তোমার কি, তোমার কাছে যখন জিজ্ঞাসা করব, তখন বলে দিও।"

বিধুভূষণ কহিলেন, 'নীলকমল, রাগ করো না। রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করবার জন্য দুর্গোৎসব করেন, তখন নীলপদ্ম কে আনবে, এই কথা ওঠায় হনুমান স্বীকাব হলো, তাই ঐ গানটা হয়েচে। 'পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাবো, আনিয়া নীলপদ্ম সে নীল পদ্ম চরণপদ্মে দিব।"

নীলকমল বিস্মিত হইয়া কহিল, "বটে!"

বিধুভূষণ কহিলেন, "আমি তো ঠিক করে এলাম, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে দি, তুমি আর কখন পদ্মআঁখির গান গেও না। ওটা শুনলেই লোকের মনে হবে।"

নীলকমল কহিল, "আচ্ছা, আজ অবধি ত্যাগ করলাম।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

"শ্যামা কার কি করেছে?"

বিধুভূষণের বাটী হইতে যাত্রা করিয়া বিদেশে গমন অবধি চারি বৎসব অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

যতই দিন যায়, সরলা ততই উৎকণ্ঠিতা হন। এক মাস, দু-মাস, তিন মাস, এই প্রকারে চারি বৎসর অতিবাহিত হইল, তথাপি বিধুভূষণের কোন পত্রাদি পান না। সরলা এমন দেবতা নাই যাঁহার উপাসনা করেন নাই, এমন উচ্চ স্থান নাই যেখানে মাথা খোঁড়েন নাই। ভাবনায় সরলার শরীর শীর্ণ হইয়া গেল। সবলা এক স্থানে বসিলে আর উঠেন না, কেহ পূর্বে কথা না কহিলে কাহাবও সহিত কথা কন না। তাঁহার অন্নে রুচি নাই, যতই শীর্ণ হইতে লাগিল, মুখের শ্রী ততই বাড়িতে লাগিল। বৈকাল হইলে চক্ষু ঈষৎ বক্তবর্ণ হয় ও মুখ আরও টল্‌টলে দেখায়, সবলাব শরীরে যক্ষ্মার সূত্রপাত হইয়াছে।

এত কাল পর্যন্ত শ্যামার যে টাকা ছিল, তাহাতেই এক রকমে চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সে বল ফুরাইয়া আসিল। সরলার ভাবনারও বৃদ্ধি হইল। পতি বিদেশে, তাঁহার কোন খবর নাই, ঘরে অন্ন নাই। সরলার পীড়াও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন ক্ষীণ হইলেন যে, বসিলে আর সহজে উঠিতে পারেন না। শ্যামা তখন উভয়ের মাতা স্বরূপ হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপাল ও সরলা উভয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া পাড়ায় বাহির হয়। কোন বাড়ীতে কাজকর্ম করিয়া দিয়া আপনার আহারের জন্য যাহা পায়, আনিয়া গোপালকে ও সরলাকে খাওয়ায়; পরে নিজে আর এক বাড়ী হইতে খাইয়া আইসে। ঘরে আর এমন জিনিষ পত্র কিছুই নাই যে, বিক্রয় করিলে দু-দিন চলিতে পারে। শ্যামা এক্ষণে পরিবারের জীবনস্বরূপ।

শশিভূষণ সপরিবারে এক্ষণে নূতন বাটীতে গিয়াছেন। গোপাল কোন স্থানে গেলে সরলাকে একাকিনী বাটীর মধ্যে থাকিতে হইত। প্রথম প্রথম একাকিনী থাকিতে সরলা কোন ভয় পাইতেন না, কিন্তু যত কৃশ হইতে লাগিলেন, সরলার ততই ভয় হইতে লাগিল। কে যেন কোথা হইতে আইসে, সরলা টের পান; কিন্তু আর কেহ টের পান না। শয্যায় শুইয়া মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠেন। গোপালের এক্ষণে জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে। দুঃখে পড়িলে অল্পবয়সেই বুদ্ধি পরিপক্ক হয়। গোপাল চুপ করিয়া সরলার শিয়রে বসিয়া থাকে।

সরলা চমকিয়া উঠিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, ''কি মা! অমন করিলে কেন?''

সরলা কহিলেন, ''না বাবা, কিছু না। গোপাল, বাবা, তুমি এইখানেই বসে আছ?''

গোপাল। হাঁ মা; তোমাকে একা রেখে কোথায় যাব?

সরলা। কতক্ষণ বসে আছ? আজ খেলা করতে গেলে না?

গোপাল। এখন তো মা আমি খেলা করতে যাই না।

সরলা ক্ষণেক পূর্বের কথা ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। গোপালের সঙ্গে শেষ কথোপকথনের পর আবার ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া একবার জাগিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্তসমস্ত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, ''মা, কি দেখছ?''

সরলা। না বাবা, কিছু দেখছি না। তুমি এইখানেই বসে আছ?

গোপাল। হাঁ মা, আমি তো তোমার বিছানা ছেড়ে কোনখানে যাই নাই।

সরলা। হাঁ হাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। গোপাল, বাবা আজ কিছু খেলে না?

গোপাল। দিদি পাড়া থেকে ফিরে এলেই খাব।

সরলা। শ্যামা এখনও ফিরে আসে নি? আহা, বাছা আমার কি ক্লেশই পাচ্ছে? সকালবেলা যায় আর দুপুরবেলা আসে; আবার খেয়ে বেরোয় আর সন্ধ্যাকালে আসে। গোপাল, তুমি আমার কাছে একটা দিব্বি কর দেখি?

গোপাল। কি দিব্বি করব মা?

সরলা। দিব্বি কর যে, আমি মলে তুমি শ্যামাকে কখনও অভক্তি কববে না। তুমি আমায় যেমন ভক্তি কর, অমনি চিরকাল শ্যামাকে করবে?

গোপাল। মা, এর জন্যে দিব্বি করতে হবে কেন? আমি কি জানি নে যে, তুমি আমার যেমন মা, শ্যামাও তেমনি।

সরলার চক্ষে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। সরলা চক্ষু মুদ্রিত কবিলেন। গোপাল নিজের বস্ত্র দ্বারা সরলার চক্ষের জল মুছিয়া দিল।

সরলা এক মুহূর্ত পরে কহিলেন, ‘‘গোপাল, বাবা, বালিশ কটা উপরে রাখ দেখি, আমি একবার বসি।’’

গোপাল আস্তে আস্তে বিছানায় বালিশগুলি উপর্যুপবি রাখিল। সরলা বিছানায় বাহুর ভর দিয়া উঠিয়া বালিশ ঠেই দিয়া বসিলেন। এই পরিশ্রমে চারি পাঁচ বার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল। শ্রান্তি দূর হইলে সরলা কহিলেন, ‘‘বাবা গোপাল, একবার এসে আমার কোলে বসো দেখি। এখনও শক্তি আছে—একবাব কোলে করে নিই, আব দিনকতক পরে তাও পারব না।’’

গোপাল সরলার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। গোপালের কথা কহিবার জো নাই। তাহার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রুপাত হইতেছে।

সরলা বুঝিতে পারিয়া গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া আপনার বামদিকে বসাইলেন। গোপাল সরলার বক্ষোপরি শির স্থাপন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

সরলা হস্ত দ্বারা গোপালের মুখ ফিরাইয়া অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, হাসিয়া কহিলেন, ‘‘ভয় কি গোপাল, আমি কি তোমাকে ফেলে কোনখানে যেতে পারি? আমি শীঘ্রই ভাল হব।’’

গোপাল পূর্বাপেক্ষা গুরুতর বেগে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সরলা দুই হাত দিয়া গোপালের মস্তক ধারণ করিয়া সস্নেহে বারংবার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

একটু পরে শ্যামা আসিল। বহুকাল পরে সরলার মুখে হাসি দেখিয়া শ্যামার আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্যামা বিছানার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘খুড়ী-মা, আজ একটু ভাল আছ না? রোজ যদি এমন করে একটু একটু গোপলকে নাও, আর গোপালের সঙ্গে কথা কও, তা হলে পনের দিনের মধ্যেই আবার তুমি যেমন মানুষ, তেমনি হতে পার।’’

সরলা কহিলেন, ‘‘শ্যামা, আজ আমি ভাল আছি। তোমার মত মেয়ে আর গোপালেব মত ছেলে কাছে থাকলে যে হতভাগিনী ভাল না থাকে, সে স্বর্গেও ভল থাকবে না।’’

শ্যামার চক্ষে জল টলটল করিতেছে। ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া কহিল, ‘‘আবার শ্যামার মতন মেয়ে, শ্যামার মতন মেয়ে করতে লাগলে কেন? শ্যামা কার কি করেছে?’’

সরলা সজল নেত্রে হাসিয়া কহিলেন, ‘‘আমার আপনার মা যা না করেছে, শ্যামা তার বেশী করেছে। এর চাইতে পৃথিবীতে কি আর কারু বেশী করতে পারে?’’

শ্যামা সরলার কথা শেষ না হইতে হইতেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। শ্যামা নিজের প্রশংসা শুনিতে পারে না। সমাজের খবরের কাগজের মত একটা ভাল কাজ করিয়া বলিয়া বেড়াইতে পাবে না। শ্যামাব দান কেহ দেখিতেও পায় না, জানিতেও পারে না। কোন কাগজেও ছাপা হয় না, কোন সভাতেও সে বিষয়ে বক্তৃতা হয় না। কাগজে ছাপান সৎকর্ম সেই কাগজের সঙ্গেই মৃত্তিকাসাৎ হইবে। শ্যামা, তোমার কীর্তি সেই অক্ষয় পুরুষ অক্ষয় কাগজে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিতেছেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের নূতন বাড়ী

শশিভূষণের নূতন বাটীতে গদাধরচন্দ্রের এক ভিন্ন বৈঠকখানা। সুন্দব একটি ছোট ঘর। ঘরের মেঝে জুড়ে একখানি শতরঞ্জি পাতা। শতবঞ্জিব উপর তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র একখানি গালিচা পাতা, গালিচাখানি জুড়ে তাহার উপর একখানি জাজিম পাতা। জাজিমের উপর একটি তাকিয়া, তাহার সম্মুখে দুইটা রূপা-বাঁদা হুঁকা বৈঠকেব উপব বসান। তাকিয়ার পশ্চাদ্ভাগে একটি আলনার উপর তিন-চারখানি কোকিল-পেড়ে সিমলাই ধুতি কোঁচান, একখানি চাদর ও দুটি পিরান। আলনার নিম্ন থাকের উপর দু-জোড়া জুতা ও আলনার ধারে একগাছি বেতের ছড়ি। আলনার অপর ধাবে একটি আম্রকাষ্ঠের সিন্দুক।

অদ্য গদাধরচন্দ্র এখনও এখানে বসিয়া কেন? এমন সময়ে গদাধরচন্দ্র তো কখন বাড়ী থাকেন না? সূর্যদেবও অস্ত যাইতে থাকেন, গদাধবচন্দ্রেরও চক্ষু ফুটিতে থাকে। গদাধর একজন নিশাচর বলিলে হয়। কিন্তু আজি গদাধরের মুখ বিরস বিবস বোধ হইতেছে। গদাধর একবার বসিতেছেন, একবার উঠিতেছেন। একভাবে পাঁচ মিনিট থাকিতেছেন না; মাঝে মাঝে জানালা দিয়া বাস্তাব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতেছেন। আজি গদাধর কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন না কি? কৈ, কেহই তো আসিতেছে না। গদাধরচন্দ্র "দূর হোক্ গে" বলিয়া উঠিয়া আলনার উপর হইতে একখানি কোঁচান ধুতি পরিলেন, একটা পিরান গায়ে দিলেন। তৎপরে পৈতায় ঝুলান চাবিটি লইয়া সিন্দুকটি খুলিলেন। সিন্দুকটি খুলিয়া গদাধর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটি বোতল বাহির করিয়া লইলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা একটি কাচের গেলাস ধরিলেন। বোতল হইতে একটু আরক গেলাসে ঢালিয়া, তাহাতে খানিক জল মিশাইয়া সেবন করিলেন। পান করিয়াই একবার মুখ বক্র করিলেন। এবং অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন "শালা বামঢনা ব্রাণ্ডি ডেবে, টা না ডিয়ে রোম ডিয়েছে।" কিন্তু রোম বলিয়া যে বোতলটি রাখিলেন, তা নয়। তিন চার বার বোতল হইতে ঢালিলেন, তিন চার বার জল মিশাইলেন, এবং তিন চার বার মুখ বাঁকাইয়া "ডান হাতে" করিয়া প্রথমবারের মতন খাইলেন।

যখন দেখিলেন, কিস্তি বেশ বোঝাই হইয়াছে, তখন বোতলটির ছিপি বন্ধ করিয়া আলোকের দিকে উঁচু করিয়া ধরিলেন এবং অতি মৃদুস্বরে "এখনও দশ আনার বেশী আছে" বলিয়া পুনরায় তাহাকে সিন্দুকে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। পরে চাদরখানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া বাম হস্ত দ্বারা কোঁচার অগ্রভাগ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ছড়িগাছটির মস্তক ধবিয়া বাহির হইলেন।

গদাধরচন্দ্রের বৈঠকখানা হইতে বাহির হইতে গেলে শশিভূষণের দিয়া যাইতে হয়। বড়লোকের বাড়ীর বেড়ালটা পর্যন্ত মকবিব; সুতরাং দুই এক জন উমেদার তাঁহার নিকট দরবার কবিতে আসিল। গদাধর তাহাদিগকে দুই এক কথা বলিয়া রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। দুই চারি পদ গমন করিয়াছেন, এমন সময় রমেশ নামক কনস্টেবলের সহিত দেখা হইল। রমেশ গদাধবচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন। গদাধরচন্দ্র রমেশকে দেখিয়া কহিলেন, "রমেশবাবু নাকি? টবু ভাল। আমি মনে করেছিলাম, টুমি বুঝি ভুলে গেলে।"

রমেশ কহিল, "যেখানে আসব বলেছি, সেখানে কি আর ভুল হয়? আমরা পুলিসের লোক, আমাদের যেমন কথা, তেমনি কাজ।"

উভয়ে অল্পে অল্পে আসিয়া গদাধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। গদাধর পুনরায় সিন্দুকের চাবিটি খুসিয়া বোতলটি বাহির করিলেন এবং খানিক জলও আরক মিশাইয়া রমেশের হাতে দিলেন।

রমেশ গেলাসটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা কবিল, "কি?"

গদাধর। বোম।

রমেশ। জল দিয়াছ নাকি?

গদাধর। হাঁ।

বমেশ। তবে ওটা তুমি খেয়ে ফ্যাল। আমি পান্তাভাত খেতে পারি না। আমরা পুলিসের লোক। গরম জিনিস নইলে আমাদের মুখে ভাল লাগে না।

গদাধর সে গেলাসটি সেবল কবিলেন। রমেশ নিজের হাতে এক গেলাস ঢালিয়া নির্জলা খাইলেন।

গদাধর বোতলটি আবার সিন্দুকে বাখিযা দিলেন, বমেশ কহিলেন, "ছুটি দিচ্চ নাকি?"

গদাধর কহিলেন, "না, জানি কি যডি কেউ আসে। ও ঢাকা ঠাকা ভাল। রমেশ কহিলেন, "তবে আমি আর এক গেলাস একেবারে খাই"। রমেশ কথা কার্যে পরিণত করিলেন। গদাধর বোতল বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টবে এখন কাজের কঠা কও।"

রমেশ কহিলেন, "কাজের কথা যা বলেছি তাই, আমরা পুলিসের লোক, বেশী কথা কই না।"

গদাধর কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হইয়া কহিলেন, "ডেখ ডেখি ভাই, টোমার কি অন্যায়? আমি সকল করলাম, ঝুকি সমুডায় আমার। টুমি ভাই ফাঁকের ঘরে এসে অটো চাইলে চলবে কেন?"

রমেশ কহিলেন, "আমি আর কত চাইলাম। আজকাল তাদের যে অবস্থা হয়েছে, আমি যদি বলে দি, তা হলে তারাই আমাকে তিন ভাগ দিতে পারে।"

গদাধর। ডেখ ডেখি ভাই, আমার কট কষ্ট। আজ আবার ডাকহরকরা এসেছিল। চিঠিখানা ডিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি যে চিঠি ন্যান, আপনি তার কে হন? আমি বল্লাম, "আমি টার ভাই। ড্যাক ডেকি ভাই, আমি এট মিট্যা কটা কয়ে জাল করে টাকাগুলি করলাম, টুমি টার টিন ভাগ চাও। আমার পক্ষে টা হলে অন্যায় হয়।"

রমেশ। তুমি মিথ্যা কথা বল্লে, জাল করলে সত্যি, কিন্তু তোমাকে শিখালে কে? তুমি তো পত্র পেয়েই তাদের দিতে যাচ্ছিলে। আমি যদি না পরামর্শ দিতাম, তাহলে তোমার তো এক পয়সাও থাকত না।

গদাধর। টুমি টো পরামর্শ ডেও নি, ডিডিই আমাকে পরামর্শ ডিয়েছিলেন। টোমাকে এ যে ডিচ্ছি, এ কেবল আমার বোকামির জন্যে বৈ ট নয়! টোমাকে না বল্লে কি টুমি টের পেটে?

রমেশ। আমাকে না বল্লে এতদিন তোমাকে পুলিস পাকড়াও করে ফেলত। আমিই তোমাকে বল্লাম যে, রসিদে নিজের নাম সই না করে গোপালের নাম সই কবো। তা হলে আর কোন গোল থাকিবে না। কেমন, এ কথা আমি বলি নাই?

গদাধর। টা টুমি বলেছিলে বটে, কিন্টু ডেখ ডেখি, টোমার ডাবিটা অন্যায় কট? এখন ছ-শ টাকার চাব-শ টোমাকে ডিলে আমার ঠাকে কি? আবার টার মড্যে ঠেকে ডিডিকে ডিটে হবে।

রমেশ একটু কৃত্রিম বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া কহিল, আমি কিছু চাইনে। যার টাকা সেই পায়, এই আমার ইচ্ছা। চল, আমার কাছে যা আছে আর তোমার কাছে যা আছে, সমুদয় গোপাল ও গোপালের মার কাছে দিয়ে আসি। আমি ও-টাকা চাইনে, কখন চাইও নি। তোমার ইচ্ছা হয়, সমুদয় নেও। আমি যা জানি, তাই করব এখন।" এই বলিয়া রমেশবাবু উঠিতে উদ্যত হইলেন।

গদাধর একটু হাসিয়া কহিলেন, "রমেশবাবু, চটলে না কি? আমি টো ভাই চটবার কঠা কিছুই বলি নাই। আচ্ছা, যার টাকা, টাকেই ডেওয়া যাবে; এখন টুমি বসো, বোটলটা খালি করা চাই টো?"

রমেশ বসিলেন।

পাঠকবর্গ বোধ হয় টের পাইয়াছেন যে, বিধুভূষণের রেজেস্টারী চিঠিগুলি কোথায় গিয়া পড়িয়াছিল।

বিধুভূষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান না করিয়া আর দেশে প্রত্যাগত হইবেন না। মাঝে মাঝে বাটীর খরচপত্রের জন্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠাইয়া দিতেন। চিঠির কোন জবাব পাইতেন না, বটে, কিন্তু গোপালের স্বাক্ষরিত রসিদ দেখিয়া মনে কবিতেন টাকা সরলার হস্তেই পতিত হইতেছে। গোপাল ছেলেমানুষ, ভাল করিয়া লিখিতে শিখে নাই বলিয়াই তাঁহাকে পত্র লেখে না।

বিধুভূষণেব প্রথম চিঠি গদাধবেব হস্তে পতিত হয়। গদাধবচন্দ্র চিঠিখানি খুলিয়া নোট দেখিতে পাইয়া অমনি প্রমদার নিকট গিয়া জানাইলেন। প্রমদা তাঁহাকে রসিদ সই করিয়া চিঠিখানি রাখিতে পরামর্শ দেন। গদাধর নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র রাখিবেন স্থির করিয়া বাহিরে আসিলেন। নোট পাইয়া গদাধরের আর আহ্লাদের সীমা নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তাহার পরম বন্ধু রমেশবাবু আসিয়াছেন। গদাধর অবিলম্বে রমেশবাবুর নিকট চিঠিখানি দেখাইয়া প্রমদার উপদেশের কথা কহিলেন। রমেশ গোপালের নাম লিখিয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। গদাধব সেই পরামর্শের বশবর্তী হইয়া গোপালের নাম লিখিয়া দিলেন। বিধুভূষণ কখনও গোপালের হস্তাক্ষর দেখেন নাই। তিনি সই দেখিয়া মনে করিলেন, 'এই গোপালের লেখা।'

গদাধরের সহিত রমেশের প্রণয় এই ঘটনা অবধি ঘনীভূত হইতে লাগিল। এই প্রণয়ের উপব নির্ভর করিয়াই শ্যামার নামে নালিশ করিতে গিযাছিলেন। রমেশ যথার্থই পুলিসেব লোক। অপর লোক উপস্থিত থাকিলে গদাধরের সহিত এইরূপ কথাবার্তা কহিতেন যে, সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না যে তাঁহাদের সহিত বড় অধিক প্রণয় আছে।

যতবার রেজেস্টারী চিঠি আসিয়াছে, গদাধর হস্তগত করিয়াছেন। গদাধরেরা পুরাতন বাটী হইতে নূতন বাটীতে আসিলে রমেশ হরকরাকে নূতন বাড়ী দেখাইয়া বলিয়া দেয়, ‘‘ঐ বাড়ীতে সরলা থাকেন।’’ ডাকমুন্সী ও খোঁয়াড়-রক্ষক এক ব্যক্তিই। সে থানায়ই থাকিত, সুতরাং যখন রেজেস্টারী চিঠি আসিত, রমেশ জানিতে পারিত।

এতাবৎ কাল পর্যন্ত গদাধর ও রমেশ সমান ভাগ করিয়া টাকাগুলি লইয়াছেন। কিন্তু শেষ চিঠিতে বিধুভূষণ সত্বরে বাটী আসিবেন লিখিয়া দিয়াছেন। চিঠিখানি সকালবেলা পাইয়া পড়িবার সময় গদাধরের মুখ রক্তহীন হইয়া গেল, এবং হাত কাঁপিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হরকরা মনে করিল, কোন বিপদের সংবাদ আসিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘গোপালবাবু, এ কার চিঠি?’’ হরকরা গদাধরকে গোপালবাবু বলিয়াই জানিত। গদাধর অম্লান বদনে উত্তর করিলেন, ‘‘আমার দাদার।’’

হরকরা কহিল, ‘‘খবর তো ভাল সব?’’

গদাধর উত্তর করিলেন, ‘‘ভাল’’।

সেই চিঠি অবিলম্বে গদাধর রমেশকে দেখান। রমেশ যখন-তখন বলিতেন, ‘‘আমরা পুলিসের লোক। চিঠিখানি দেখিয়া তিনি গদাধরের ভয় আরও দশগুণ বাড়াইয়া দিলেন। তখন বন্ধুতা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, ‘‘আমাকে দুইশত টাকা দাও, নচেৎ আমি সমুদয় প্রকাশ করে দেব।’’

গদাধর কহিলেন, "টোমাকে ২০০ টাকা ডেবো কেন? টুমি কি এর মড্যে নও? টোমারও যে বিপড, আমারও সেই বিপড।"

রমেশ কহিল, "আমি কি টাকা নিয়েছি যে আমার বিপদ?"

গদাধব আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "সে কি রমেশবাবু? টুমি কেমন করে বল্লে যে, টুমি টাকা নাও নাই?"

রমেশ। আমি টাকা নিয়েছি, কে দেখেছে?

গদা। আমি ডেকেছি।

রমেশ। তুমি আসামী, তুমি তো সকলকে জড়াবেই। তোমার কথা কে বিশ্বাস করবে?

গদাধর অতল জলে পড়িলেন। ঘোর বিপদ। এখন উপায়? সর্বসমেত ছয় শত টাকা চুরি করিয়াছেন। তার অর্ধেক রমেশ বাবু লইয়াছেন। বাকি অর্ধেকেরও দুই শত চান।

বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া রমেশ এক শত টাকায় নামিলেন।

গদাধর এক শত টাকা দিতে রাজী হইয়া বাটী আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় রমেশকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "সন্ধ্যাব পর একবার আমাডের বাড়ী অবশ্য করে যেও।" রমেশ গদাধরকে বাগে পাইয়া নিজে গম্ভীর হইল; কহিল, "যদি অবকাশ পাই, তবে যাব। আমারা পুলিসের লোক, আমাদের কি অল্প কাজ?"

গদাধর বাটী আসিয়া ঘন্টায় ঘন্টায় রমেশের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। রমেশ আসি আসি বলিয়া সন্ধ্যার সময় আসিলেন। গদাধর রমেশকে তুষ্ট করিবার জন্য এক বোতল রম রামধন শুঁড়ীর দোকান হইতে আনাইয়া রাখিয়াছেন। ব্রাণ্ডির কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু রামধনের পাড়াগেঁয়ে দোকান, সর্বদা ভাল বিলাতী জিনিস থাকে না, এজন্য রমই পাঠাইয়া দিয়াছিল।

গদাধর কহিলেন, "রমেশবাবু, বসো, বোটলটা খালি করা চাই টো?"

রমেশ বসিলেন, কিন্তু কহিলেন, "আজ আমার শরীরে কিছু অসুখ হয়েছে, বিশেষ আজ বড় কাজ আছে, আর খেলে কাজ করতে পারব না। এখন কাজের কথা বল, তা না হলে বৃথা বসে থাকা।"

গদাধর পৈতা দিয়া রমেশের দুই হাত জড়াইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "রমেশ বাবু, এ বিপড ঠেকে আমাকে উড্ডাব কর। টোমায় এক-শ টাকা ডিটে হলে আর বাঁচি নে। যডি আমার হাটে টাকা ঠাকটো, টা হলে টুমি যা চাইটে আমি টাই ডিটাম, কিন্টু আমার হাটে একটি পয়সাও নেই।" এই পর্যন্ত বলিয়া গদাধরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় রমেশের হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার পা ধরিলেন, এবং শ্রাবণের ধারার ন্যায় নেত্রাসার বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

গদাধরেব রোদনে রমেশের হৃদয় কিছুমাত্র আর্দ্র হইল না। কহিল, "ছি গদাধরবাবু, ও কি? অমন কর তো আমি এখনই সব কথা ভেঙ্গে দেব, চুপ করে বসে কাজের কথা বল, আমারা পুলিসের লোক, কত ব্যাটা আমাদের পায় ধরে থাকে।"

গদাধর পা ধরিয়াই আছেন। রমেশ ছাড়াইতে পারিলেন না। ক্ষণকাল নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিয়া পুনরায় কহিলেন, ‘‘রমেশবাবু টোমার কি ডয়া মায়া নাই? আমার ঢন, মান, প্রাণ, সকলই টোমার হাটে। টুমি যডি না রক্ষা কর, টবে আমি আর বাঁচি নে।’’

রমেশ। (এবার গদাধরকে ঠাট্টা করিয়া গদাধরের স্বরে কহিল) ‘‘টোমার মান, ঢন, প্রাণ, সকলই টোমারই হাটে। টুমি যডি না রাখ, টবে আমার সাঢ্য কি আমি রাখি।’’

গদাধর। রমেশবাবু, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ডিও না।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। গদাধর মনে করিলেন, রমেশের দয়া হইল, পা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘টবে কি বল রমেশবাবু?’’

রমেশ। নগদ কোম্পানি সিক্কা এক শত টাকা।

গদাধর। টবে আমাকে কেটে ফ্যালো।

রমেশ। আমি কাটব কেন, যারা কাটবার, তারাই কাটবে।

গদাধর দেখিলেন, একশত টাকার কমে কোন মতেই ছাড়ে না। তখন রমেশকে বসিতে বলিয়া নিজে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

রমেশ একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘‘বাছাধন ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি। এখন, হয়েছে কি? আগে জেলে যাউন, তখন সুখ পাবেন। ভগিনীপতির টাকায় বাবুয়ানার ফল পাবেন। আর লম্বা কোঁচা, বাঁকা সিঁতি থাকবে না।

অর্ধ ঘন্টা আন্দাজ বাটীর মধ্যে থাকিয়া গদাধরচন্দ্র ম্লান মুখে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, রমেশ যেখানে ছিলেন সেইখানেই বসিয়া আছেন। গদাধরকে দেখিয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘কি খবর?’’

গদাধর। আব ভাই খবর! আমি টোমাকে বলেছি, আমার হাটে এক পয়সাও নাই। ডিডির কাছ ঠেকে টাকা বের করা কি সহজ কটা?

রমেশ গদাধরের কথা শেষ হইতে-না-হইতে কহিল, ‘‘কাজের কথা কি এখন বল। ও-সব কথা রেখে দাও। আমি আর দেরী করতে পারি না। জান তো ভাই, আমরা পুলিসের লোক, কোনখানে দু-দণ্ড থাকবার জো নাই। এক রকম জবাব পেলেই চলে যাই। পরের কাজে মিথ্যা সময় নষ্ট করা কি উচিত?’’ রমেশের ধর্মশাস্ত্রেও উত্তম জ্ঞান আছে।

গদাধর কহিলেন, ‘‘ভাই বিশেষ কেঁডে কেটে বলায় ডিডি ডিটে স্বীকার হয়েছে। প্রঠমে কিছুই ডেবে না, টার পর পঞ্চাশ টাকা। টার পর আমি বলে কয়ে আর মা অনেক কেঁডে কেটে ১০১ টাকা ডিটে স্বীকার করিয়ে এসেছি। টোমার ১০০ টাকা আর ঐ রোমের (গদাধর রমকে রোম বলিতেন) ডাম এক টাকা।

রমেশ কহিল, ‘‘তবে টাকা আনো।’’

‘‘আজিই?’’

রমেশ। এখুনিই।

গদাধর। টা টো হবে না।

রমেশ। তা না হলে চলে কই। তোমার কাছ বলব ভাই, তার দোষ কি? কারণ, তোমার কথা সাক্ষীর মধ্যে গণ্য নয়। সকালবেলা ঐ চিঠিটে শুনে অবধি আমারও গা কাঁপছে। বলা যায় না, ফৌজদারির হ্যাঙ্গামা, কোথা থেকে কোথায় যায়। আমার ইচ্ছা করছে, আমিই আগে প্রকাশ করি, তা হলে তো আমি বেঁচে যাব। হয়ত এতক্ষণ বলে ফেলতাম, তা তোমার বিস্তর অনুরোধে বলি নাই। আর কেউ হলে আমি ছেড়ে কথা কইতাম না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাদা কথা। তোমাকে ভাই, এত ভালবাসি বলেই বলি নাই। যদি এ বিপদে আর কেহ পড়ত, তা হলে কি আমি পাঁচ-শ টাকার কম ছাড়তাম? তবে তুমি নিতান্ত আত্মীয় বলেই ১০০ টাকায় সম্মত হয়েছি। যদি নগদ পাই, তবে "পেটে খেলে পিঠে সয়" মনে করে থাকি। কিন্তু নগদ না পেলে ভাই, বড় সুবিধা হবে বোধ হয় না।

রমেশের কথা শুনিয়া গদাধরচন্দ্র পুনরায় ম্লানবদনে বাটীর মধ্যে গেলেন। এবং ঘণ্টাখানেক পরে এক শত টাকা আনিয়া রমেশের হাতে গণিয়া দিলেন। রমেশ টাকা লইয়া থানায় গমন করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিধুভূষণের দেশে প্রত্যাগমন—সরলার ঋণ পরিশোধ

ভাদ্রমাস। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। পূর্বের সাত দিবস অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে। রাস্তা কর্দমময়। অধিকন্তু গাড়ীর চাকায় কাটিয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল হইয়াছে, সেগুলি জলে পরিপূর্ণ। তাহার দুই পার্শ্বে মৃত্তিকা উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। অসাবধানতাপ্রযুক্ত তথায় পদপ্রক্ষেপ করিলে পিচকারির ন্যায় বেগে পঙ্কিল সলিল উঠিয়া সমুদয় বস্ত্রাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। যেখানে রাস্তার ধারে বৃক্ষাদি আছে, সেখানে শুষ্ক পত্র পড়িয়া জলসংযোগে পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতি গৃহ হইতে ধূম উঠিতেছে। গৃহস্থেরা বেলা থাকিতে থাকিতে বাহিরের কর্ম সমাধা করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিতেছে। ঝিঁ ঝি, মশা ইত্যাদি নানাবিধ কীট-পতঙ্গ উড়িতেছে, ভেককুল আনন্দে রব করিতেছে, ঝিল্লীগণের কর্কশ স্বরে কর্ণে তালা লাগিতেছে। গাভী, ছাগ, মেষ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু একটিও বাহিরে নাই। মনুষ্যের গতায়াত অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়াছে।

এমন সময় দুইটি পথিক কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাইতেছে। পথিকদ্বয়ের বাম হস্তে একটি একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ, দক্ষিণ হস্তে একটি একটি কাপড়ের ছাতি; গায়ে পিরান, মস্তকে চাদরের উষ্ণীব, পদযুগ বিনামাশূন্য। যে অগ্রে যাইতেছে, তাহাকে দেখিলে বড় শ্রান্ত বোধ হয় না। কিন্তু যে পশ্চাৎ যাইতেছে, তাহার পদপ্রক্ষেপ দর্শন করিলে বোধ হয়

যেন তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। সন্ধ্যাও হইল, পথিকদ্বয়ও এক গ্রামে প্রবেশ করিল। এতক্ষণ তাহারা পরস্পরে কথা কহে নাই, কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করিয়া পশ্চাবর্তী অগ্রগামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ''দাদাঠাকুর, আজ আর চলে কাজ নেই, এই গ্রামেই থাকা যাউক।'' এই কথাটি এমন মৃদু স্বরে কহিল যে, কোন তৃতীয় ব্যক্তি শুনলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত, পথিক কোন-না-কোন প্রকার ভয় পাইয়াছে। বোধ হয়, কথা শুনিয়া পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বক্তা নীলকমল এবং যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তিনি আমাদের বিধুভূষণ।

প্রথমবার কোন উত্তর না পাইয়া নীলকমল পুনবায় পূর্ববৎ মৃদু স্বরে কহিল, ''দাদাঠাকুর, পূজার সময় রাত্রে রাস্তা চলা কিছু না, এস আমরা এক বাড়ী থাকি, কাল রাত থাকতে থাকতে উঠে চলে যাব।''

বিধু একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, ''কেন নীলকমল, এখন ভয় কর কেন? আগে তো তুমি চোরের ভয় করতে না?''

নীলকমল কহিল, ''আগে কিছু ছিল না, এখন কিছু হয়েছে। কিন্তু যা বল্লাম, সে কথার কি?''

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন, ''এই গ্রামের পরেই হাঁসখালি। হাঁসখালি গেলেই তো বাড়ী গেলাম। এই একটুকুর জন্যে এখানে থেকে কষ্ট পাওয়া কি ভাল? তুমি যে ভয়ের কথা বলছ, এখানে সে ভয়ের কোনই কারণ নাই। এ কৃষ্ণনগরের নিকট, এখানে কি রাস্তার লোক কেউ মেরে নিতে পারে?''

''তবে চল। কিন্তু যদি আমার কথা শোন, তবে এইখানেই থাক উচিত।''

বিধুভূষণ নীলকমলের কথা না শুনিয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। নীলকমল (অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্বক) তাঁহার অনুসরণ করিল. কিয়দ্দুর নীরবে গমন করিয়া বিধুভূষণ সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ''নীলকমল, সেই গাছতলা দেখা যাচ্ছে।'' নীলকমল একটু হাসিয়া উত্তর করিল, ''দাদাঠাকুর, সেই এক দিন, আর এই এক দিন।''

পুনর্বার কিয়দ্দুর নীরবে গমন করিয়া সেই বৃক্ষের সমীপবর্তী হইলে, বিধু কহিলেন, ''নীলকমল, চল—গাছতলায় বসে আর একবার তামাক খাই।''

নীলকমল উত্তর করিল, ''দাদাঠাকুর, অম্রার মা যা বলেছিল তাই, তুমি মনের কথা টেনে বলেছ।''

উভয়ে বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন। নীলকমল অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল, ''দাদাঠাকুর, তুমি ঠিক যেখানে বসেছ, ঐখানেই বসেছিলে, আর আমিও এইখানে এসে বসেছিলাম। তুমি আমাকে দেখে ডরিয়ে উঠেছিলে।''

বিধুভূষণ চতুর্দিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হায়! আমাদের যে দিনটি যায়, সেটির মতন আর আইসে না। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া কে ক'দিন সুখভোগ করিয়াছেন? কাহার চিত্ত আর নবযৌবনের ন্যায় সৌহার্দ্য বা প্রণয়রসে

অভিষিক্ত হইয়াছে? স্বভাবের শোভা দর্শনে কাহার অন্তঃকরণে আর সেরূপ প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে? সংসার, তোমাকে ধন্যবাদ! তোমাতে প্রবেশ করা আর বিস্মৃতিহ্রদে অবগাহন করা, উভয়ই সমান। বিদ্যালয়ে থাকিতে যে সুহৃদকে অবলোকন কবিলে ভাবনা-চিন্তা দূর হইয়া যাইত, যাহার মুখে হাসি দেখিলে হৃদয়াকাশে শরচ্চন্দ্রের জ্যোতির ন্যায় প্রভা বিকীর্ণ হইত, যাহার বিরহ মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর বোধ হইত, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যাহার চিরসহচর হইব মনে হইত, এখন সে প্রিয় সুহৃদ কোথায়? সকলেই স্বার্থপরতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া অগ্রপশ্চাতে কে আছে দেখিবার অবকাশ নাই।

চারি বৎসর অগ্রে বিধুভূষণের চিত্ত একরূপ ছিল। এখন আর একরূপ হইয়াছে। অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি প্রকৃত সুখের সঙ্গে চিরবিদায় লইযাছেন। নবযৌবনেব সুখের সহিত সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা তুলনা কবিলে কাহার হৃদয়ে না শোকানল জ্বলিয়া উঠে? কে দীর্ঘনিশ্বাস না ছাড়িয়া থাকিতে পারে?

নীলকমল চক্‌মকি ঠুকিয়া আগুন বাহির করিল। উভয়ে তামাক খাইযা বৃক্ষমূল হইতে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

বহুকাল বিদেশে থাকিয়া বাটী আসিবাব সময় মনোমধ্যে কত প্রকাব ভাবেব উদয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কখন কখন আনন্দে হৃদয় উচ্ছলিত হইতে থাকে, কখন কখন ভয়ে শরীরকে কম্পিত করে। যাহাদিগকে বাটী রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহাগিকে সুস্থকায় দেখিতে পাইব ভাবিলে মনে কতই আহ্লাদ হয়, কিন্তু তাহাই যে দেখিতে পাইব তাহারই বা প্রমাণ কি? এরূপ চিন্তায হৃদয়কে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। বিধুভূষণ পর্যায়ক্রমে ভাল মন্দ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাটীব দ্বারে সমীপবর্তী হইলেন। বাটী হইতে যাইবাব সময় দেখিয়া গিয়াছিলেন, বাটীতে লোক ধরে না। তখন শশিভূষণের নূতন বাটী প্রস্তুত হয় নাই। শশিভূষণ, তাঁহার সন্তানাদি, গদাধরচন্দ্র ও তদীয় জননী প্রভৃতি সকলেই এক বাটীতে থাকিতেন। সুতবাং অহর্নিশি বাটীতে গোলমাল থাকিত। বিধুভূষণ এখন বাটীর নিকটবর্তী হইযা গোলমালের চিহ্নমাত্রও শুনিতে পাইলেন না। ভয়ে তাঁহার শরীব কম্পিত হইতে লাগিল। দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া নীলকমলকে কহিলেন, ‘‘নীলকমল, তুমি ডাক দেখি একবার, ‘‘বাড়ী কে আছে’ বলে?’’ বিধুভূষণের নিজে উচ্চ কথা কহিবার সামর্থ্য হইল না। নীলকমল উচ্চৈঃস্বরে ‘‘বাড়ী কে আছে’’ বলিয়া দুই তিন বাব চিৎকার কবিল। কোনই উত্তর নাই। বিধুভূষণ কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, ‘‘সর্বনাশ হয়েছে।’’ নীলকমল পুনর্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। এবার শ্যামা বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, ‘‘এত রাত্রে তোমরা কারা দরজায় ঘা দিচ্ছ?’’

নীলকমল। বাহির হইয়া দেখ।

শ্যামা দরজা খুলিয়া দেখিল দুটি লোক। একটি দবজার ধারে বসিয়া, আর একটি দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া পুর্নবার জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘তোমরা কারা?’’

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ''শ্যামা, তোমরা সব ভাল আছ?''

শ্যামা বিধুভূষণের স্বর জানিতে পারিয়া কম্পিত কলেবরে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ''তুমি কোথা থেকে এলে?''

বিধুভূষণ কহিলেন, ''শ্যাম্া স্থির হও। বাটীর সকলে ভাল আছে?''

শ্যামা একটু বিলম্বে কহিল, ''প্রাণে প্রাণে। তুমি কোথা থেকে এলে?''

বিধুভূষণ শ্যামার কথা শুনিয়া ''মা দুর্গা'' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ''শ্যামা আমি কোথা থেকে এলাম যে জিজ্ঞাসা করলে——আমাব পত্র কি পাও নাই?''

শ্যামা কহিল, ''তুমি বাড়ী ছাড়া অবধি পত্র পাওয়া দূবে থাকুক, কোন লোকের মুখেও তোমাব খবর পাই নাই। খুড়ী-মা ভেবে ভেবে প্রায় ''এখন তখন'' এমনি অবস্থা হযেছে।''

বিধু। আর গোপাল——সে কেমন আছে?

শ্যামা। সে ভাল আছে।

বিধু। তবে চল শ্যামা, বাড়ীর মধ্যে যাই।

শ্যামা কহিল, ''এখন বাড়ীব মধ্যে গেলে খুড়ী-মা মূর্ছা যাবেন। তোমবা এইখানেই বস, আমি আগে গিয়া তাঁকে বলি, তারপর তোমাদের নিয়ে যাব।''

বিধু কহিলেন, ''শ্যামা, সবলা কি এতই কাহিল হয়েছে যে, আমাদের বাড়ী আসার খবর শুনে মূর্ছা যাবে?''

শ্যামা। বড় কাহিল।

বিধুভূষণ শ্যামার নিকট সরলার অসুস্থতার খবর পাইয়া বড় অধিক কাতর হইলেন বোধ হইল না। তাঁহাকে এত ভালবাসেন যে, তাঁহার বিরহে কাহিল হইয়াছেন শুনিয়া যেন বিধুভূষণের দুঃখের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুখের উদয় হইল। যেন অন্ধকার রজনীতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ খেলিল। হায়! ভাবিয়া ভাবিয়া সরলার যে যক্ষ্মারোগ হইয়াছে, বিধুভূষণ তা জানিতে পারিলেন না।

প্রায় অর্ধ ঘন্টা পরে শ্যামা আসিয়া বিধুভূষণকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিধুভূষণ সরলার গৃহের দ্বার পর্যন্ত প্রায় হাসিতে হাসিতে গমন করিলেন বলিলে হয়। কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি বসিয়া পড়িলেন। সরলাকে আর চেনা যায় না, একপ কৃশা; কিন্তু তথাপি বিধুভূষণের নাম শুনিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন। বিধুভূষণকে দেখিয়া সাশ্রুনয়নে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ''এত দিনের পব কি দুঃখিনীকে মনে পড়েছে?''

বিধুভূষণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, ''সরলা, এত কাল তোমার নাম জপ করে বেঁচেছিলাম। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তোমাকে এইরূপ অবস্থায দেখব।''

সরলা হাসিয়া উত্তর করিলেন, ''এখন ভাল হব। কিন্তু আজ আব অধিক বসতে পারছি না, আমার মাথা ঘুরছে, সর্বাঙ্গ শরীর অবশ হয়ে আসছে।'' এই বলিয়া সরলা শয়ন করিলেন। শ্যামা নিকটে বসিয়া সরলার কেশ একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিল।

রজনী প্রভাত হইলে সরলা প্রত্যুষে নিজে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছেন তদ্দর্শনে শ্যামার যার-পর-নাই আহ্লাদ হইল। শ্যামা মনে করিল, ভাবিয়া ভাবিয়া সরলা এরূপ কৃশ হইয়াছিলেন। সরলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ''খুড়ী-মা, দেখ দেখি, আমি তো বলেছিলাম, খুড়াঠাকুব বাড়ী এলেই তোমাব ব্যামো সব আবাম হয়ে যাবে।''

সরলা কহিলেন, ''শ্যামা, তুমি আমাব লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি আমাব অন্নপূর্ণা। তোমাব কথা সত্যি হবে না তো কার কথা সত্যি হবে?''

সরলার কথা শুনিয়াই শ্যামা বাটী হইতে বাহির হইযা গেল। শ্যামার মহৎ দোষ, সে নিজের প্রশংসা শুনিতে পারে না। আহা, শ্যামার পরকালে কি উপায় হবে? ''পৃথিবীসংশোধনী সভায়'' যদি শ্যামা অন্ততঃ যদি দু-দিন যাইতে পারিত, তাহা হইলে শ্যামাব একপ দুষ্প্রবৃত্তি থাকিত না।

রজনীর প্রথম ভাগে চিন্তায় বিধুভূষণের নিদ্রা হয নাই। শেষ বাত্রে একটু ঘুম হইয়াছিল। এজন্য বিধুভূষণ সকালে উঠিতে পারেন নাই। শ্যামা পাকশাকেব উদ্যোগ করিয়া দিয়াছে, এমন সময় বিধুভূষণ শয্যা হইতে উঠিলেন। সবলা উঠিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া বিধুভূষণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সরলা অত্যন্ত কাহিল হইল বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে বেড়াইতেছেন এবং একপ প্রফুল্লচিত্তে কথাবার্তা কহিতেছেন যে, সকলে দেখিয়া যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইল। সরলা রন্ধন করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু শ্যামা কোন মতেই তাঁহাকে রান্নাঘরে যাইতে দিবে না। সবলা বলিলেন, ''আমি না রাঁদলে কে রাঁদবে শ্যামা?''

শ্যামা কহিল, ''ঠাক্‌রুণদিদিকে ডেকে আনি।''

সরলা কহিলেন, ''শ্যামা, ঠাক্‌রুণদিদি কি আসবেন?''

শ্যামা। ''খুড়ী-মা, পয়সা হলে সকলই হয়; আমাদের ভাবনা কি?'' বস্তুত শ্যামা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই কার্যে পরিণত হইল। ঠাক্‌রুণদিদি যেই শুনিলেন যে, বিধুভূষণ অনেক টাকা লইযা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অমনি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া চলিয়া আসিলেন। সবলাকে দেখিয়া ঠাকরুণদিদি কহিলেন, ''সরলা, তুমি এমন কাহিল হয়েছ, আমাকে এক দিনও বল নাই?''

সরলা একটু হাসিলেন, আর উত্তর করিলেন না।

বিধুভূষণ অনেক টাকা লইয়া বাটীতে আসিয়াছেন, একথা মুহূর্তমধ্যে সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। সকলেই দেখা করিতে শশব্যস্ত। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, গদাধরচন্দ্র স্বয়ং আসিলেন। আগে যাহারা ঘৃণায় কথা কহিত না, এক্ষণে যেন তাহারা চিরসুহৃদের ন্যায় হইয়া উঠিল। 'রজতে'র কি মহিমা!

লোকের সহিত আলাপ করিতে বিধুভূষণেব প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। বাটীর মধ্যে আসিয়া যে সরলাব কাছে দু-দণ্ড বসেন, সন্ধ্যার অগ্রে তাঁহার এমন অবকাশ হইল না। সন্ধ্যার সময় সকলে চলিয়া গেল বিধুভূষণ বাটীর মধ্যে আসিলেন।

সরলা প্রাতঃকালে শরীরে এরূপ বল পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাব মনে হইয়াছিল, তিনি যেন পূর্বের ন্যায় নীরোগ অবস্থাতেই আছেন। বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত সহাস্যবদনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাজকর্ম করিলেন। কিন্তু দুই প্রহরের পর হইতে তাঁহার হস্ত-পদ বলশূন্য হইয়া আসিতে লাগিল। কাহাকে কিছু না বলিয়া আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। শ্যামা যে-কোন কার্যেই ব্যাপৃত থাকুক, তাহার এক চক্ষু নিয়তই সরলার উপর থাকিত। সরলা শয়ন করিলে শ্যামা তাঁহার বিছানার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়ী-মা আবার শুলে যে?" সরলা উত্তর করিলেন, "শ্যামা, কাল রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই। ঘুমে আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। আমাকে জাগাইও না, আমি একটু ঘুমাই।" সরলা এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শয়ন করিলেন। শ্যামা আপনার কাজ করিতে গেল।

ক্ষণকাল পরে শ্যাম আবার সরলাব বিছানার নিকটে গেল। সরলা এখনও নিদ্রা যাইতেছেন। মুখমণ্ডলে আর কোন চিন্তার লক্ষণ নাই; প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বায়ু শীতল হইয়াছে, তথাপি সরলার ঘর্ম হইতেছে। শ্যামা অঞ্চল দ্বারা আপনার হস্ত পরিষ্কার করিয়া আস্তে আস্তে সরলার কপাল স্পর্শ করিল। কপাল শীতল। কিন্তু শ্যামার হস্তস্পর্শে সরলা চমকিয়া উঠিলেন। পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় শ্যামা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তথা হইতে চলিয়া আসিল।

শ্যামা বাহিরে আসিয়া ভাবিল, "এখন গ্রীষ্ম কিছু নেই, তবু গা ঘামে কেন?" কিন্তু সরলা বহুকাল শয্যাগত ছিলেন, আজি উঠিয়া বেড়াইয়া কাজকর্ম করিয়াছেন, সুতরাং শ্যামার কোন ভয় হইল না। পরন্তু মনে করিল, শ্রান্তিপ্রযুক্ত সরলার শরীরে ঘর্ম হইতেছে।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, সরলাব তথাপি নিদ্রাভঙ্গ হইল না। বিধুভূষণ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া সরলাকে নিদ্রিত দেখিয়া শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা, সেই ঘুম এখনও ভাঙ্গে নাই? শ্যামা কহিল, "না।" শয্যার শিয়রে বসিয়া সরলার কপালে হাত দিলেন। কপাল যেন হিম পাথর। বিধুভূষণ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া "সরলা, সরলা" বলিয়া তিন-চারিবার ডাকিলেন।

সরলা চক্ষু মেলিয়া বিধুভূষণকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন, "কে তুমি?" বিধুভূষণের উত্তর দিবার পূর্বেই পুনর্বার কহিলেন, "না, আমার ভুল হয়েছিল। চিনেছি এখন, তুমি বুঝি আমার গোপালকে নিতে এসেছ? তা পাবে না। আমি যাচ্ছি।"

সরলা প্রলাপ বকিতেছেন।

বিধুভূষণ তিন চারি বার বড় বড় করিয়া সরলার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। সরলা উত্তর করিলেন, "কি? এক-শ বার ডাক কেন? এই যাচ্ছি।"এই বলিয়া সরলা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বিধুভূষণ রোদন করিতে করিতে ঘরের বাহিরে আসিলেন। শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্যামা, সরলা বুঝি ফাঁকি দিলে। তুমি ঘরে যাও, আমি দেখি, যদি একজন ডাক্তার পাই।"

শ্যামা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঘরে আসিল। দেখিল, সরলা পূর্ব্ববৎ নিদ্রা যাইতেছেন। "খুড়ী-মা," "খুড়ী-মা" করিয়া ডাকিল, সরলা উত্তর করিল না। নিশ্বাস স্বাভাবিক বহিতেছে, মুখভঙ্গী স্বাভাবিক আছে। কিন্তু সরলার শরীর শীতল হইয়াছে। শ্যামা পায়ের কাছে বসিয়া সরলার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

গোপাল অনেক দিনের পর আজি মাতাকে একটু ভাল দেখিয়া ভুবনের সহিত খেলা করিতে গিয়াছে। বিধুভূষণ ডাক্তার ডাকিতে যাইবার সময় ভুবনদের বাড়ী ভুবনের মাতাকে সরলার অবস্থা জানাইয়া গোপালকে সে রাত্রে সেইখানে রাখিতে বলিয়া গেলেন।

প্রায় দেড় ঘন্টা পরে বিধুভূষণ ডাক্তার সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তারবাবু আসিয়াই রোগীকে একটু আরক খাওয়াইয়া দিলেন। পরে বসিয়া শ্যামা ও বিধুভূষণের নিকট সমুদয় বিবরণ অবগত হইলেন। ঘড়ি খুলিয়া সরলার নাড়ীর গতিক দেখিলেন, তৎপরে যন্ত্রদ্বারা সরলার বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ পরীক্ষা করিলেন। তখন বিধুভূষণ চিন্তাকুলচিত্তে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখলেন মশায়?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "রোগ সাংঘাতিক। বাংলায় ইহাকে যক্ষ্মা বলে। এ রোগ কখনও আরাম হয় না। পুস্তকে লেখে বটে যে, দৈবাৎ আরোগ্য হলেও হতে পাবে, কিন্তু আমি এই ৩০ বৎসরের মধ্যে একটিকেও আরাম হতে দেখি নাই। রোগীর চেহারায় বোধ হচ্ছে, চার পাঁচ বৎসর এ রোগের সূত্রপাত হয়েছে। বোধ হয় প্রথমাবধি যত্ন করলে আরও দুই এক বৎসর বাঁচার সম্ভবনা ছিল, কিন্তু সে অনুমান মাত্র। এ রোগে কখন মৃত্যু হয়, তার স্থিরতা নাই। এখন যে এত মন্দ দেখা যাচ্ছে, তবুও এমন হতে পারে যে, এখনও পাঁচ ছয় মাস বেঁচে থাকলেও থাকতে পারেন। কিন্তু তা নিতান্ত অসম্ভব। আমার বোধ হচ্ছে, আজ শেষ রাত্রেই এঁর প্রাণত্যাগ হবে। আজ সকালবেলা হতে দুই প্রহর পর্যন্ত ভাল ছিলেন; সে কেবল আপনার আগমনপ্রযুক্ত। তাতেই রোগীর মনে উৎসাহ উৎপাদিত হয়েছিল। কখন কখন সুসমাচার পেলে অন্তঃজলের রোগীও পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করে, চার পাঁচ দিন বেঁচেও থাকে। বোধ হয়, আপনি যদি এমন সময় বাড়ী না আসতেন, তা হলে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতেন। কোন উৎসাহ হলেই কিঞ্চিৎ পরে তাহার বিপরীত ফলোৎপত্তি হয়। রোগীর তাই হয়েছে। বাঁচতেও পারেন, নাও পারেন। কিন্তু আজ বাঁচলেও অধিক দিন জীবিত থাকবেন না।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া বিধুভূষণ ম্রিয়মান হইলেন। "হায়, আমিই সরলার মৃত্যুর কারণ" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আপনি যদি অমন ছেলেমানুষের মতন কাঁদেন, তাহা হলে আপনি এ ঘরে থাকবার যোগ্য নন। এখনও বলা যায় না কি হবে। হয়ত বাঁচতে পারেন। কিন্তু অমন গোলমাল করলে সে সম্ভাবনা তত থাকবে না।

বিধুভূষণ কহিলেন, "মহাশয়, আর না, আর কাঁদব না। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, আমি বাড়ী না এলে আর কিছুকাল বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা ছিল—— এ কথা শুনে কি আমি না কেঁদে থাকতে পারি?"

ডাক্তার সস্নেহে বিধুভূষণের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "সে অনুমান মাত্র, আমি তো পূর্বেই বলেছি। কিন্তু তা না হলেও গত বিষয় লয়ে কষ্ট পাবার দরকার কি? যে বিষয় আর সংশোধিত হবার জো নাই, তা মনে না করাই ভাল।"

বিধুভূষণ চুপ করিয়া বসিলেন। ডাক্তারবাবু অনন্যমনা হইয়া সরলার মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে সরলার ঠোঁট নড়িল। সরলা অস্পষ্টস্বরে যেন জল জল বলিলেন, শ্যামা জল দিতে গেল। ডাক্তারবাবু শ্যামার হস্ত হইতে গেলাস লইয়া একটি ঝিনুকে জল ও আর একটু আরক একত্র করিয়া সরলাকে খাওযাইয়া দিলেন। সরলা খাইয়া মুখ বক্র করিয়া কহিলেন, "বড় ঝাল।"

ক্রমে ক্রমে সরলার চৈতন্য হইল। বিধুভূষণ আর থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সরলাকে কহিলেন, "সরলা তোমার আর এক দিনের তরে সুখ হলো না।"

সরলার এক্ষণে উত্তম জ্ঞান হইয়াছে। মৃত্যুর অগ্রে প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। একদৃষ্টে বিধুভূষণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি কাঁদছ কেন?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা——তুমি চল্লে, আর আমি কাঁদছি কেন জিজ্ঞাসা করছ?"

সরলার প্রেমময়ী মুর্তি অবলোকন করিয়া ডাক্তারবাবু রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

সরলা কহিলেন, "আমি যাচ্ছি সত্য, কিন্তু আমার সুখ হয় নাই কে বল্লে? পতির সেবা ও সন্তান পালন করা আমাদের প্রধান সুখ; তা আমার হয়েছে। যেটুকু দুঃখ ছিল, তা কাল তুমি বাড়ী আসায় দূর হয়েছে। আমার ন্যায় সুখী কজন হয়েছে?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা, তুমি আর ও-কথা বলো না, তা হলে আমার বুক ফেটে যাবে।"

সরলা বিধুভূষণের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "শেষকালে আমার এক অনুরোধ আছে।" এই বলিয়া শ্যামার দিকে চাহিলেন। সরলার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল বহিতে লাগিল। বাক্য নিঃসরণ হইল না; শ্যামা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। ডাক্তারবাবু থামাইবেন কি, তাঁহারও আর কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। অবিশ্রান্ত কেবল রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

বিধুভূষণের হস্ত সরলার হাতেই আছে। তিনি একটু পরে কহিলেন, "অনুরোধ এই যে, শ্যামাকে কখন দাসী বলে মনে করো না। চিরকাল তোমার যেন জ্ঞান থাকে যে, শ্যামা তোমার আপন মেয়ে।" সরলা আবার চুপ করিলেন।

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা, শ্যামা শুধু আমার মেয়ে নয়। শ্যামা আমার মা। শ্যামা ছিল বলেই আমরা এখনও বেঁচে আছি।" শ্যামা গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু অনেক চেষ্টা করিয়া চক্ষু মুছিয়া ঝিনুকে করিয়া আর একটু ঔষধ সরলার কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন, "এইটু খাউন দেখি?"

সরলা কহিলেন, "আর কেন? ঔষধে আর আমার দাকার কি?"

বিধুভূষণ কহিলেন, "সরলা খাও! এখনও তোমার পীড়া তত শক্ত হয় নাই।"

সরলা কহিলেন, "আমার নিজের শরীরের ভাব আমি বুঝি। আমি এত দিন মরে যেতেম। কেবল তোমাকে দেখব বলে জীবনটি বেরোয় নাই। একবার আমার গোপালকে ডেকে দাও!"

বিধুভূষণ ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিলেন। ডাক্তারবাবু কহিলেন, "এখন আর কি? যা বলছেন, তাই করো।"

শ্যামা দৌড়িয়া গিয়া গোপালকে কোলে করিয়া আনিল। সরলার নিকট আনিয়া নামাইয়া দিতে গেল। সরলা কহিলেন, "না———না, অমনিই থাক।" তখন গোপালের এক হাত ও শ্যামার এক হাত ধরিয়া কহিলেন, "গোপাল, তুমি, সেদিন যে দিব্বি করেছিলে, তা মনে আছে তো? শ্যামা তোমার মা, তোমাব যথার্থ মা! দেখো, যেন তোমার দিব্বি মনে থাকে।" পরে শ্যামার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শ্যামা তুমি আমার বিস্তর করেছ। আমার মা-বাপও এমন করতেন না———আমার গর্ভের মেয়ে এমন করত কি না সন্দেহ। তোমার ধার এ-জন্মে তো হলই না, আর কোন জন্মে যে শোধ দিতে পারব, তাহাও অসম্ভব। আমি তোমাকে কি দেব? আমার সর্বস্বধন গোপাল। শ্যামা, গোপালকে আমি জন্মের মত তোমাকে দিয়ে গেলাম।"

সরলার কথা শুনিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। চক্ষের তারা দেখিতে দেখিতে মস্তকে উঠিল।

সকলে ধরাধরি করিয়া সরলাকে বাহিরে আনিল। মুহূর্তেকে সরলা জন্মের মতন চক্ষু মুদিত করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

নানাবিধ

শশিভূষণের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে বাবুর বাটীতে সর্বময় কর্তা হইয়াছেন। তাঁহার উপর বাবুর বিশ্বাস অসীম, তিনিই এখন জমিদাব বলিলে হয়। বাবু বেশভূষা ও সুরার খরচ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন।

পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। শশিভূষণের উচ্চ পদ হইল বটে, কিন্তু সে পদ নিষ্কণ্টক হইল না। পূর্বে যে সমস্ত আমলারা শশিভূষণের উন্নতির জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই কিসে শশিভূষণের অবনতি হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাবেক দেওয়ানের আমলে তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিতেন না, ইচ্ছাপূর্বক কর্ম বন্ধ করিয়া অলসভাবে থাকিতে পারিতেন না, এ জন্য মনে করিয়াছিলেন

শশিভূষণ যাঁহাদের সমান পদের লোক, তিনি দেওয়ান হইলে তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুরূপ কর্ম করিতে পারিবেন। কিন্তু শশিভূষণ দেওয়ান হইলে তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অবস্থার কোন ইতরবিশেষ হইল না। পূর্বেও যেমন দেওয়ানকে ভয় করিয়া চলিতে হইত, এক্ষণেও সেইরূপ করিতে হয়; সুতরাং তাঁহারা সকলে একমত হইয়া কিসে শশিভূষণ কর্মচ্যুত হন, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস মুহুরি, হিসাবনবিস, খাজাঞ্চি, ইত্যাদি আমলাবর্গ একত্র হইযা কি প্রকারে তাঁহাদিগেব অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহার বিবেচনা কবিতে বসিলেন। অনেকে অনেক প্রকার উপায়ের কথা বলিলেন। কিন্তু কোনটিই সর্ববাদিসম্মত হইল না। পরিশেষে রামসুন্দরবাবু কেরানী কহিলেন, ''বাবু তো মদ খেয়ে খেয়ে এক রকম পাগলের মতন হয়েছেন। তাঁর হাতে বিষয়-আশয় রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট। এই মর্মে কর্তা ঠাক্‌রুণের দ্বাবায় কালেক্টর সাহেবের নিকট একখান দরখাস্ত কবাতে পারলে একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হতে পাবে। তা হলে শশীবাবুকে বিদায় হতে হবে।''

রামসুন্দরবাবুর পরামর্শ সকলেই ভাল বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু খাজাঞ্চি কহিলেন, ''আমার এক আপত্তি আছে। সকলে যেখানে একত্র হযেছি, সেখানে মনেব কথা খুলে বলাই ভাল। আমার ভয় হচ্ছে, ম্যানেজার হলে এখন যে দু-এক পযসা পাচ্ছি, তাও পাব না।''

এই কথা শুনিয়া সকলেই একটু ভাবিত হইলেন। কিন্তু রামসুন্দববাবু কহিলেন, 'সে আপনাদের ভ্রান্তি মাত্র। ম্যানেজার নিযুক্ত হইলে সে বিষয়ে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবে না। শশীবাবু যেমন সব বিষয়ে খোঁজ রাখে, ম্যানেজার তা করবে না। কাগজপত্র সাফ সাফাই আর তহবিল দুরস্ত রাখতে পারলেই হলো। বিশেষ এখন যে কাজে পাঁচ টাকা ব্যয় হয়, তখন তাতে পনের টাকা হলেও কেউ কিছু বলবে না। কোম্পানির রেটের বেশী না হলেই হল।''

বামসুন্দর বাবুর কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ করিয়া যে যাহার বাটী চলিয়া গেলেন।

সরলার মৃত্যুর পর দশ দিনের দিন শ্রাদ্ধ হইল। সেটি বন্ধ করিবোর জো নাই। বঙ্গদেশের কি চমৎকাব প্রথা! জীবিতাবস্থায় যাহার জন্য লোকে এক টাকা ব্যয করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে মরিলে তাহার শ্রাদ্ধে অনায়াসে দশ টাকা ব্যয় করিতে পারে। যদি শ্রাদ্ধের টাকা দিয়ে লোকে চিকিৎসা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক অকালমৃত্যু রহিত হইতে পারিত।

সরলার মৃত্যু অবধি বিধুভূষণে চিত্তে উদাসীনের ন্যায় ভাব হইল। কোনখানে যান না; কোন কাজকর্মে মনোনিবেশ করিতে পারেন না; নিয়তই এক স্থানে বসিয়া ভাবেন ও মাঝে মাঝে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করেন। শ্যামা বিধুভূষণকে একাকী থাকিতে দেয না। সর্বদাই গোপালকে তাঁহার নিকট বসাইয়া রাখে। গোপাল বাটী না থাকিলে নিজেই তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ গল্প করে। এক দিবস গল্প করিতে করিতে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ''শ্যামা, তোমরা কি আমার একখানাও চিঠি পাও নাই?''

শ্যামা উত্তর করিলেন, ‘‘না?’’

‘‘তবে রেজেস্টারী চিঠিতে গোপালের নামে কে রসিদ দিত?’’

শ্যামা কহিল, ‘‘গোপালের নামে কখন কোন চিঠি আসেও নি, সে রসিদও দেয় নি। গদাধর রেজেস্টারী চিঠি পেত, সে রসিদ-টসিদ দিত। কিন্তু গোপাল তো কখন দিত না।’’

বিধুভূষণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘গদাধর কোথা থেকে রেজেস্টারী চিঠি পেত?’’

শ্যামা। তার মামা নাকি ডাকে টাকা পাঠিয়ে দিত।

বিধুভূষণ বসিয়াছিলেন, শ্যামার কথা শুনিয়া অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চাদর লইয়া কহিলেন, ‘‘শ্যামা, টের পেয়েছি। সব চিঠিগুলো আর টাকা ঐ গদাই নিয়েছে।’’ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের বাহির হইলেন। শ্যামা বুঝিতে পরিল না, কি প্রকাবে তাঁহার চিঠি গদাধবের হস্তগত হইবার সম্ভব। এজন্য বিধুকে ফিরাইবার জন্য সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু কোন মতেই ফিরাইতে পারিল না।

বিধুভূষণ দেরি না করিয়া একেবারে ডাকঘরে গেলেন তথায় ডাকমুন্সীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘গোপালের নামে যে রেজেস্টারী চিঠি আসত, তা কার নিকট দেওয়া হত?’’

ডাকমুন্সী কহিল, ‘‘সেসব চিঠি গোপালবাবুকেই দিয়াছি। তাঁর হাতের রসিদ আছে।’’

বিধু। রসিদ আমি চাই না। হরকরাকে বলুন, আমাকে সেই গোপালবাবুকে দেখাইযা দিক।

বলিবা মাত্র ডাকমুন্সী হরকরাকে বিধুভূষণের সহিত পাঠাইয়া দিল। হরকরা বিধুকে শশিভূষণের বাটী লইয়া গেল। গদাধব যে যথার্থই চিঠি লইয়াছিল, সে, বিষয়ে এখন আর বিধুর সন্দেহ বহিল না। শশিভূষণের বাটীর দ্বারে আসিয়া তিনি গদাধরেব রূপ বর্ণনা করিয়া কহিলেন, ‘‘কেমন, গোপালবাবুর তো এমনি চেহারা?’’

হরকরা উত্তর কবিল, ‘‘হাঁ মহাশয়! আপনি ঠিক বলেছেন।’’

বিধু কহিলেন, ‘‘তবে আর চেনাবার দরকার নেই। তুমি ঘরে যাও; আমি বুঝেছি। কিন্তু খবরদার, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়, টাকা গোপাল পায় নাই। অন্য একজন নিয়েছে। প্রকাশ হলে চোর ধরা যাবে না।’’

বিধুভূষণের কথা শুনিয়া হরকরার মুখ শুকাইয়া গেল। কম্পিত কলেবরে কহিল, ‘‘মশায়, এতে আমার অপরাধ নেই। আমাকে উনি বল্লেন. ‘আমি গোপালবাবু,’ সুতরাং আমি ওঁকেই চিঠি দিয়েছি। দেখবেন, যেন গরিব না মারা যায়।’’

বিধু। তোমার ভয় কি? কিন্তু যদি এ কথা প্রকাশ হয়, আর যদি আসামী পালায়, তা হলে আমি তোমাকেই ধরবো।

হরকরা ‘‘আমার দ্বারা এ কথা প্রকাশ হবে না’’ এই বলিয়া চিন্তাকুল চিত্তে চলিয়া গেল। বিধুভূষণ থানায় দারোগার কাছে গেলেন।

বিধুভূষণ থানায় দারোগার নিকট এ সমস্ত কথা বলিলে দারোগা বাবু কহিলেন, "আজ সন্ধ্যা হয়েছে, এখন গেলে আসামী ধরা যাবে না। কাল সকালে আসবেন। লোকজন নিয়ে যাব, তা হলে অনায়াসে আসামী ধরা পড়বে।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "যদি এ কথা রাত্রের মধ্যে প্রকাশ হয় আর যদি আসামী পালায়, তা হলে কি হবে?"

দারোগাবাবু উত্তর করিলেন, "আমি তাব উপায় করছি।" এই বলিয়া রমেশ কনস্টেবলকে কহিলেন, "রমেশ, আজ চারজন কনস্টেবল যেন শশীবাবুব বাড়ীতে রোঁদে থাকে। কাল খানাতল্লাসি করতে হবে। আসামী ঐ বাড়ীতে আছে, কিন্তু খবরদার, যেন এ কথা প্রকাশ না হয়। প্রকাশ হলে আসামী পাওয়া যাবে না।"

রমেশ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ডায়রিতে চারি জন কনস্টবলের নাম লিখিয়া শশীবাবুর বাটীতে পাহারায় থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। পরে ভাবিতে লাগিল, "গদাধরকে এ বিষয়ে সংবাদ দেব কি না?" অনেকক্ষণ আন্দোলন করিয়া স্থির করিল, এত চক্ষুলজ্জা থাকিলে পুলিসে চাকবি করা সুকঠিন হইবে।

গদাধর নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। বিধুভূষণ বাটী প্রত্যাগমন করিলে তিন চারি দিবস অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় কাল যাপন করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, চার পাঁচ দিবস কোন গোল উপস্থিত হইল না, তখন ভাবিলেন, আর ভয় নাই। বিধুভূষণেব সহিত যে তিনি দেখা করিতে গিয়েছিলেন, সে কেবল তাঁহাব নির্দোষিতা দেখাইবাব জন্য।

রাত্রিতে শশিভূষণের বাটী কনস্টেবল পাহারা দিল, কিন্তু তাহা শশিভূষণ কিংবা তাঁহার বাটীর আর কেহ টের পাইল না। পরদিন প্রত্যুষে শশিভূষণ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া কাছারি যাইবেন, সম্মুখে একজন কনস্টবলকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মনে করে?"

কনস্টবল কহিল, "আপনি একটু দেবি ক'রে কাছারি যাবেন। আমাদেব বাবু এখানে আসছেন। এই বাটীতে আমাদের আসামী আছে।"

শশিভূষণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "আমার বাড়ী কিসের আসামী?"

কনস্টবল কহিল, "গদাধববাবু পবের নামের রেজেস্টারী চিঠি নিজের বলে নিয়েছেন, তাই এখন প্রকাশ হয়েছে। আমরা গদাধরকে ধরতে এসেছি।"

শশিভূষণের তখন স্মরণ হইল, গদাধর একখান রেজেস্টারী চিঠি পাইয়াছিল। সে সময় তাঁহার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় নাই। সুতরাং তাহার কোন অনুসন্ধানও করেন নাই। গদাধর বলিয়াছিলেন, চিঠি পৌঁছিবে না ভয়ে তাহার মামা রেজেস্টারী চিঠি পাঠাইয়াছেন। শশিভূষণ তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কনস্টবলের মুখে প্রকৃত বিষয় শুনিয়া তিনি রাগত হইয়া গদাধরকে ডাকিলেন। গদাধর নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে তোমার মামার রেজেস্টারী চিঠি পেয়েছিলে, সেই চিঠিখানা আন দেখি।" গদাধর শশিভূষণের রাগত ভাব ও কনস্টেবলকে দেখিয়া দৌড়িয়া খিড়কির দরজার দিকে গেল। অন্তঃপুরে প্রমদার সহিত দেখা হইল। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"গদাধরচন্দ্র, দৌড়াচ্ছে কেন?" গদাধব উত্তর না করিয়া একেবাব খিড়কির দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল। প্রমদা ও প্রমদার মাতা কারণ জানিবার জন্য গদাধবেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। গদাধব খিড়কির দবজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইবে, এমন সময় সেখায় আব একজন কনস্টেবল দেখিতে পাইযা "বাবা বে" বলিয়া বেগে প্রত্যাবর্তন করিল। গদাধবের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গদাধরচন্দ্র?"

গদাধব উচ্চৈঃস্ববে রোদন কবিয়া কহিল, "আর গডাধর চণ্ড! গডাধবচণ্ড এই বাব মোলো।"

প্রমদা ও প্রমদাব মাতা "ষাট্ ষাট্" কবিযা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? কি হলো?"

গদাধব কহিল, "সেই রেজেস্টারী চিঠি—"

এমন সময শশিভূষণ বাটীর মধ্যে আসিয়া রাগতস্ববে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কোথায় গেল সে হতভাগাটা?"

গদাধব ভূতলে পড়িযা রোদন করিতেছেন। প্রমদা ও প্রমদার মাতা পরস্পরের মুখাবলোকন কবিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, "কেন? এখন কাঁদ কেন? যেমন কর্ম তেমনি ফল। এই বুঝি তোমাব মামাব রেজেস্টাবী চিঠি? তুই আপনিও গেলি, আমাব নামেও কলঙ্ক দিয়ে গেলি।"

প্রমদা ও প্রমদার মাতা শশিভূষণেব কথায় অত্যন্ত বাগ কবিলেন। গদাধর যে দোষ করিয়াছে, সে কিছুই নয়। কিন্তু শশিভূষণেব কর্কশ কথা তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত অন্যায় বোধ হইল। প্রমদাব মাতা সককণ স্ববে প্রমদাকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন, "দেখ দেখি বাছা, আমি বলেছিলাম, 'প্রমদা, আমাদের নিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু শেষকালে অপমান হয়ে আসতে হবে।' দেখ দেখি, এখন তা সত্যি হলো কি না?" তুমি বলেছিলে, 'মা, আমার বাড়ী, আমার ঘব, কে তোমাকে অপমান করবে?"

প্রমদা কহিলেন, "আর সে কথায় কাজ কি? অদেষ্ট ছাড়া তো পথ নেই?"

শশিভূষণ কহিলেন, "এখন অদৃষ্টের কথা রেখে দাও। যদি গদাকে বাঁচাতে চাও, তবে ওরে একখানা শাডী পবাও, আব কেউ জিজ্ঞাসা করলে তোমার ভগ্নী বলে পবিচয় দিও। আমি সদর দবজায় চললাম, সেখানে দারোগা এসেছে।"

শশিভূষণ বাহিব-বাটীতে আসিলে দারোগাবাবু কহিলেন, "আপনার বাটীতে আসামী আছে। হয় বাহিব কবিয়া দিন, নচেৎ আমরা খানাতল্লাসি করব।"

শশি। মহাশয, হিসেব করে কথা কবেন। এ ছোটলোকের বাড়ী নয়। আপনারা যে যাবেন, যদি আসামী না পান তখন কি হবে?

দারোগা বিধুভূষণেব দিকে চাহিলেন। বিধু কহিলেন, "এই বাড়ীতেই আসামী আছে।"

শশিভূষণ আরক্ত নয়নে বিধুভূষণেব দিকে চাহিলেন। বিধুভূষণ কিছু বলিলেন না। পরে সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই গদাধরকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বিধুভূষণ কহিলেন, "একবার রান্নাঘরটা দেখা যাউক।" দারোগা কহিলেন, "হাঁ, উচিত বটে।" এবং শশিবাবুকে কহিলেন, "আমবা এইখানেই দাঁড়াই,

পরিবারদিগকে আমাব সম্মুখ দিয়া যাইতে বলুন।'' শশিভূষণ প্রথমতঃ আপত্তি কবিলেন কিন্তু দারোগাবাবু কোন মতেই শুনিলেন না। সুতবাং শশীবাবু পরিবারদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ''তোমরা এক এক করে বাহির হয়ে যাও।''

প্রথমতঃ প্রমদা, পরে স্ত্রীরূপী গদাধব, সর্বশেষে প্রমদাব মাতা বাহির হইলেন। বিধুভূষণ গদাধরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কবিয়া দেখাইয়া দিলেন। দাবোগা শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''মধ্যে যিনি যাচ্ছেন, তাকে থামতে বলুন। উনি কে?''

শশিভূষণ উত্তর করিবার অগ্রে প্রমদার মাতা কহিলেন, ''ও আমার বড় মেয়ে গদাধবচন্দ্র।''

দাবোগা শুনিয়াই একজন কনস্টেবলকে কহিলেন, ''পাকড়াও।''

গদাধর অমনি ''ঐ ঢরলে ডিডি'' বলিয়া দৌড়িয়া ঘবে প্রবেশ করিল। কনস্টেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবিযা গদাধরকে ধৃত কবিল।

গদাধর যথাক্রমে থানা ও মেজেস্টারি পাব হইযা সেসন জজের নিকট হইতে ১৪ বৎসর কারাবাসের আদেশ পাইলেন।

গদাধবের শাস্তি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে বিধুভূষণের মনে কোন শান্তি হইল না। তাঁহাব আর ও-বাটীতে থাকিতেও ইচ্ছা বহিল না। তথায় যে সমস্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহাই নিযত তাঁহার স্মরণ হইয়া পুনরপি তাঁহাকে সেই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইত। যে কিছু সুখভোগ করিয়াছিলেন, তাহা দুঃখে পড়িয়া একেবাবে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থও ক্রমে শেষ হইতে লাগিল। নানা প্রকার চিন্তা করিয়া শ্যামা ও গোপালকে লইয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া গোপালকে এক বাটীতে রাখিয়া দিলেন। তথায় রন্ধনাদি করিবে ও ডফ্ সাহেবের স্কুলে পড়িবে। শ্যামাও সেই বাটীতে দাসী হইল। বিধুভূষণ ভাবিলেন, —এখন আমি কি করি? পাঁচালির দলে গেলে টাকা হয় বটে, কিন্তু কর্মটি বড় হেয়; এই প্রকার ভাবিয়া তিনি আর যাত্রার দলে না গিয়া একজন ডেপুটি কলেক্টরের সহিত ঢাকা জেলায় গমন কবিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল

নীলকমল বিধুভূষণের সহিত একত্র আসিয়া সে রাত্রি বিধুভূষণের বাটীতে ছিল। পরদিবস প্রাতে আব কেহ না উঠিতে উঠিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। রামনগরের নিকটে এক মহকুমা আছে, তথায় গিয়া এক জোড়া ধুতি ও চাদর খরিদ করিল। এবং বাজার অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া সেই ধুতি ও চাদর পবিধান করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। নীলকমলেব বহুকালের আশা ফলবতী হইল। নীলকমল দু-এক পা যায়, আর আপনার পরিচ্ছদের উপর দৃষ্টি করে। এইরূপে গমন করিতে করিতে বেলা এক প্রহরের সময় বাটী গিয়া উপস্থিত হইল।

নীলকমলের স্বব শুনিয়াই নীলকমলের মাতা ও দুই ভ্রাতা আসিয়া নীলকমলকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণকমল ও রামকমলেব চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহাদিগের মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। নীলকমল বাটী হইতে বাগ করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু চাবি বৎসরেব পব সকলকে পাইয়া আর অশ্রু সংবরণ করিতে পাবিল না।

নীলকমল বাটী আসিয়া একটি ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ হইল। দশটাব মধ্যে তাহাব আহাব ... হইলে নয়। কৃষ্ণকমল ও বামাকমল ভয়ে কিছু বলিতে পাবে না। চাকুবে ভাই, যাহা কবে তাহাই শোভা পায়। আহাবান্তে নীলকমল পাড়ায় গিয়া যাত্রা গান ও নানাবিধ গল্প করে। কিন্তু সুখ কখন চিরস্থায়ী নহে। নীলকমলেব সুখ দেখিতে দেখিতে অবসান হইল।

এক দিবস নীলকমল গৌবহবি ঘোষেব বাটীতে গিয়া বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছে; পল্লীস্থ সকলে একত্র হইযা শুনিতেছে। ইতিমধ্যে এককজন জিজ্ঞাস কবিল, ''নীলকমল, তুমি কি সাজতে?''

প্রশ্ন শুনিয়া নীলকমলেব চেহাবা অপ্রতিভেব ন্যায় হইল। তদ্দর্শনে আব একজন ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিল। নীলকমল এবাব একটু বাগত হইল। কিন্তু বাক্য দ্বাবা সে বাগ প্রকাশ না করিয়া কহিল, ''পাঁচালিব আবার সঙ সাজা কি?''

প্রথম প্রশ্নকাবী উত্তব কবিল, ''তুমি তো ববাবব পাঁচালিব দলে ছিলে না? আগে যখন যাত্রাব দলে ছিলে, তখন কি সাজতে?''

নীলকমল এবাব বাগ গোপন কবিতে পারিল না। চিৎকার করিয়া কহিল, ''তোমাদেব সেসব কথায় কাজ কি? যত পাড়াগেঁযে ভূত বৈ তো নয়।''

নীলকমলকে বাগত দেখিয়া একজন কৌতুক কবিয়া কহিল, ''নীলকমল তামাক সাজিত।''

নীলকমল শুনিয়া একটু হাসিল। ভাবিল, উৎপাত কাটিয়া গেল। কিন্তু অবিলম্বেই অন্য একজন কহিল, ''নীলকমল হনুমান সাজিত!''

নীলকমল এই কথা শুনিযা রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ''কে তোকে বল্লে আমি হনুমান সাজতাম?'' এই বলিয়া নীলকমল তথা হইতে উঠিল। কিন্তু তাহাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া আর চাব পাঁচজন ''হনুমান, হনুমান'' কবিয়া ডাকিতে লাগিল। নীলকমল বাগ কবিয়া তাহাদের একজনকে ধাবিযা প্রহাব কবিতে গেল। অমনি আর সাত আট জন ''বাছা হনুমান, বাছা হনুমান'' বলিয়া নীলকমলের কর্ণকুহবে মধুসিঞ্চন কবিতে লাগিল।

নীলকমল যাহাকে প্রহার কবিতে গিয়াছিল, তাহাকে ধরিতে পাবিল না। সুতরাং বাগত হইয়া বাটীব দিকে ফিরিল। অমনি দশ বার জন ''বাছা হনুমান, বাছা হনুমান'' বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নীলকমল যে দিকে যায়, তাহারাও সেই দিকে চলিতে লাগিল। এবং যত যায়, তাহাদিগেব সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া নীলকমল বাটী আসিল। বলকেরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী আসিল এবং অনবরত নীলকমলের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। নীলকমল এক এক বার রাগিয়া ক্ষিপ্তেব ন্যায় হইতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে নীলকমলের মাতা কহিল, "ওরা বল্লেই বা বাছা হনুমান, তুমি ক্ষ্যাপো কেন?"

নীলকমল কহিল, "ওরা তো পর—বলবেই, তুমি বলতে আরম্ভ করলে? আমার দেশে থাকা হলো না।" এই বলিয়া আপনাব বস্ত্রাদি সেই কেম্বিসের ব্যাগটির মধ্যে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইল। নীলকমলের মাতা তাহাকে ফিবাইবার জন্য বিস্তর যত্ন করিলেন, কিন্তু নীলকমল কোন ক্রমেই তাঁহার কথা শুনিল না।

নীলকমল চলিল, বালকেরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজগ্রামে ছিল, ততক্ষণ সেই গ্রামের বালকেরা তাহাকে ক্ষেপাইতে লাগিল। নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিলে আবার সেই নূতন গ্রামেব বলকেরা জুটিল।

কৃষ্ণকমল ও রামকমল বাটী আসিয়া মাতার নিকট বিববণ জ্ঞাত হইয়া নীলকমলের উদ্দেশে গেল, কিন্তু দেখা পাইল না। পরদিবসও গেল, তথাপি দেখা পাইল না। রামনগর হইতে চারি-পাঁচ ক্রোশ দূরে গিয়া শুনিল যে, একজন "বাছা হনুমান" বললে ক্ষেপে, এমন লোক এসেছিল বটে, কিন্তু সে যে কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারিল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গোপাল ও হেমচন্দ্র

কলিকাতার বকুলতলা স্ট্রীটে হেমচন্দ্রের বাসা। দু-তলা বাটী, কিন্তু উপরতলায় একটিমাত্র ঘর। সে ঘরটি হেমচন্দ্রের শয়নাগাব। নীচের তলার রাস্তার ধাবের ঘরটি বৈঠকখানা। ঐ বৈঠকখানায় হেমচন্দ্র অধ্যয়নাদি করেন। হেমচন্দ্রেব বাসার একটু দক্ষিণে এক বাটীতে গোপাল থাকেন। গোপাল ডফ্ সাহেবেব ইস্কুলে পড়েন, ইস্কুলে যাইবাব সময় হেমচন্দ্রেব বাসার সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। হেমচন্দ্র প্রত্যহই গোপালকে দেখিতে পান। গোপাল তাঁহার ঘড়িস্বরূপ; গোপালকে যাইতে দেখিলেই হেমচন্দ্র ইস্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

এক দিবস ইস্কুলের ছুটির পর গোপার বাটী আসিতেছেন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। গোপালের ছাতি নাই। সেলেটখানির উপর পুস্তকগুলি রাখিয়া উপুড় করিয়া মাথায় দিয়া আসিতেছেন। হেমচন্দ্রের বাটীর নিকট আসিলে প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গোপাল দৌড়িয়া আসিয়া হেমচন্দ্রের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

হেমচন্দ্র একটু পূর্বে বাসায় আসিয়াছেন। গোপালকে প্রত্যহ তাঁহার বাসর ধার দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার মনে ইচ্ছা হইয়াছিল, গোপালের সহিত আলাপ করেন। এত দিন সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। আজি গোপালকে দরজায় দেখিয়া হেমচন্দ্র তাঁহাকে বিছানায় আসিয়া বসিতে বলিলেন।

গোপাল কহিলেন, ''মহাশয়, আমি যেখানে আছি, সেইখানে থাকি। আমি বিছানায় যাব না।''

হেমচন্দ্র দরজাব নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''যাবেন না? বৃষ্টি এখন শীঘ্র থামছে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

গোপাল হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন এবং মাটিতে পা রাখিয়া তক্তাপোশের ধারে বসিলেন। হেমচন্দ্র কহিলেন, ''উপবে এসে বসুন।''

গোপাল নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিয়া কহিলেন, ''না মহাশয়।''

হেমচন্দ্র কহিলেন, ''কেন? কতক্ষণ অমন করে বসে থাকবেন?'' গোপাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া অবনত মুখে কহিলেন, ''আমার জুতো ছেঁড়া, পায়ে কাদা লেগেছে, বিছানার উপর পা দিলে বিছানা নষ্ট হয়ে যাবে।''

হেমচন্দ্র অবিলম্বে চাকরকে পা ধুইবাব জল দিতে বলিলেন। গোপাল অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্বক পা ধুইয়া তক্তাপোশের উপর বসিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহার হাত ধরিয়া তাকিয়ার কাছে লইয়া বসাইলেন। একটু বিলম্বে চাকর জলখাবার আনিল। হেম চাকরের নিকট হইতে রেকাবখানি লইয়া গোপালকে খাইতে কহিলেন।

হেমচন্দ্রের আদর দেখিয়া গোলাপ প্রথমতঃ লজ্জিত হইলেন, পবে অবনত মুখে কহিলেন, ''আমি কিছু খাব না। আমার এ সময় খাওযা অভ্যাস নাই।''

হেমচন্দ্র গোপালেব হাতে খাবাব তুলিয়া দিলেন। গোপাল অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্বক জল খাইলেন। বৃষ্টি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইযা গেল। লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হইল। তদ্দর্শনে গোপাল কহিলেন, ''বৃষ্টি আর এখন শীঘ্র থামবে না। সন্ধ্যাও হলো, আমি এখন যাই।''

হেমচন্দ্র কহিলেন, ''কি বল্লেন মহাশয়? এই বৃষ্টিতে যাবেন?'' গোপাল কহিলেন, ''আমার প্রয়োজন আছে। এখন না গেলেই নয়।'' হেমচন্দ্র কহিলেন, ''আপনার কি প্রয়োজন?''

গোপাল প্রকৃত না কহিয়া বলিলেন, ''কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছে, না ছাড়লে অসুখ হবে।''

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, ''আপনি কি এখানে একখান কাপড় পাবেন না?'' এই বলিয়া চাকরকে একখানা ধুতি আনিতে কহিলেন।

গোপাল লজ্জিত হইয়া কহিলেন, ''না মহাশয়, আমার কাপড় ছাড়বার তত প্রয়োজন নাই। আমার আরও কিছু প্রয়োজন আছে।''

হেমচন্দ্র গোপালের কাপড়ে হাত দিয়া দেখিলেন, কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন, ''কাপড় ছাড়বার প্রয়োজন নাই! এত ভিজলেও যদি ছাড়ার প্রয়োজন না থাকে, তবে আর কখনই প্রয়োজন হয় না।''

গোপাল কহিলেন, ''মহাশয়, আমি এখন কাপড় ছাড়ব না। আমি বাসায় যাই।'' এই বলিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

হেমচন্দ্র গোপালের হাত ধরিয়া বসাইলেন; কহিলেন, ‘‘এ সময় আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি না।’’

গোপাল লজ্জাবনত মুখে কাতর স্বরে কহিলেন, ‘‘মহাশয়, আপনার সহিত আলাপ করা আমার বহু কাল বাসনা ছিল। আমি পুস্তক কিনিতে পারি না। আপনার নিকট হতে দু-একখানি নিয়ে যাব মনে করতাম, আজ আপনার সহিত দৈবাৎ আলাপ হয়ে আমার বড় আহ্লাদ হয়েছে। আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন আছে; না গেলেই নয়।’’

‘‘আপনার আবার বিশেষ প্রয়োজন কি?’’

‘‘আপনি আমার উপর যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে না বল্লে আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হয়। আমি এক বাসায় পাকশাক করি এবং বেতন-স্বরূপ সেইখানে থাকি আর খাই।’’ গোপাল এই কথা বলিয়া মাটির দিকে মুখ নামাইয়া বসিলেন।

হেমচন্দ্র গোপালের কাতর স্বর ও কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উপস্থিত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে কথা ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘আমার সহিত এত দিন আলাপ করতে ইচ্ছা ছিল, করেন নাই কেন?’’

গোপাল কহিলেন, ‘‘আপনারা বড়মানুষ; কি জানি, যদি আপনি কথা না কন, এই ভয়ে এতদিন আপনার এখানে আসি নাই। আজ বৃষ্টি এলো, কি করি?’’

হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, ‘‘কৈ আমি বড়মানুষ? আমি তো আপনার চাইতে অধিক বড় না; যদি অধিক হই, তবে এক ইঞ্চি লম্বা হবো।’’

গোপাল হাসিয়া কহিলেন, ‘‘আমি সে বড়র কথা বলছি না।’’

হেমচন্দ্র কহিলেন, ‘‘সে যাহা হউক, এখন এই ধুতিখানা পরুন দেখি।’’

গোপাল কি করেন, ধুতিখানি পরিলেন এবং আপনার খানি হাতে করিয়া লইতে গেলেন। হেমচন্দ্র লইতে দিলেন না। কহিলেন, ‘‘কাপড় ও বই এইখানেই থাকুক, কাল ইস্কুলে যাবার সময় নিয়ে যাবেন।’’ এই বলিয়া একটি ছাতি দিলেন ও চাকরের হাতে আগে আগে একটি লণ্ঠন দিয়া পাঠাইলেন।

গোপাল যে বাটীতে থাকিতেন, সেই বাটীতে কানাই নামে তাঁহার সমবয়স্ক একটি বালক ছিল। তিনি বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। গোপালকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, ‘‘তবু ভাল, গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা পাওয়া গেল। বাবু বুঝি এখন লণ্ঠন নৈলে চলতে পারেন না?’’

গোপাল কহিলেন, ‘‘কানাইবাবু, আমার অপরাধ হয়েছে। বৃষ্টিতে আসতে পারি নাই। একটু চুপ করুন, কর্তাবাবু টের পাবেন।’’

কানাই। কর্তাবাবু আর আমি কি পৃথক্? তিনি তা টের পেয়েছেন।

কানাইয়ের কথগুা শুনিয়া বাবু টের পাইলেন—গোপাল আসিয়াছে। তখন কহিলেন, ‘‘চাকর বামুনের এত বাবুয়ানা কেন? বৃষ্টি হয়েছে বলে কি খাওয়া-দাওয়া হবে না? আমি এমন বাবু বামুন চাই নে। কাল অবধি যেন অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা দেখে।’’

গোপাল কিছু না বলিয় বাটীর মধ্যে গেলেন। গিয়া দেখিলেন শ্যামা সমুদয় উদ্যোগ করিয়া বসিয়া আছে। গোপলকে দেখিয়া কহিল, ''আজ কোথায় ছিলে, দেখ দেখি কত বকছে?'' শ্যামার নেত্রযুগল হইতে ধারা বহিতেছে।

গোপাল কহিলেন, ''দিদি, যে বাবুটির কথা রোজ বলি, যাঁর বাড়ীতে অনেক বই আছে, আজ তাঁর বাড়ীর কাছে এসে বৃষ্টি হলো, আর আসতে পারলাম না; সেইখানে গিয়া দাঁড়ালাম। বাবু এসে আমাকে ছড়েন না, ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জল খাওয়ালেন, আর এই ধুতিখানা পরতে দিলেন। আসতে দিতে চান না, বিস্তর বলে-কয়ে চলে এলাম। আসবার সময় একজন চাকর দিয়ে লন্ঠন পাঠায়ে দিলেন। বাবুটি যেমন দেখতে, তেমনি ভদ্র।''

শ্যামা গোপালের কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে কহিল, ''তিনি বেঁচে থাকুন—আমার মাথায় যত চুল, এত প্রমাই তাঁর হউক।''

''দিদি, তাঁর নাম কি জানিস?''

শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, ''কি নাম?''

গোপাল উত্তর করিলেন, ''আমার তাঁর নাম জানবার জন্যে বড় ইচ্ছা হলো, কিন্তু একে বড়মানুষ, তাতে আমার চাইতে বয়সে বড়, জিজ্ঞাসা করতে ভবসা হয় না। তার পর একখান বই খুলে দেখলাম, কিন্তু ভাবলাম, যদি আর এক জনের বই হয়। তার পর দুখানা তিনখানা খুলে দেখলাম একই নাম—হেমচন্দ্র। বেশ নামটি, না দিদি?''

শ্যামা। হাঁ, কিন্তু নামে কি করে; গুণ থাকলে খারাপ নামও ভাল হয়।

গোপাল। দিদি, তুমি দেখ, তবে টেব পাবে তিনি কেমন ভদ্র, আমাকে বলেছেন, আমার যখন যে বই দরকার হবে আমাকে নিয়ে আসতে দেবেন।

শ্যামা। আমাকে একদিন দেখিযে দাও দেখি বাবুটি কে? তাঁদের বাড়ী পরিবার আছে?

গোপাল। না।

ক্ষণকাল পরে গোপাল রাঁধিতে রাঁধিতে কহিলেন, ''দিদি, হাঁড়িতে একটু তেল দাও।''

শ্যামা। আর তেল নাই।

গোপাল। আমার তেল আর নাই?

শ্যামা। একটুখানি আছে, কিন্তু তা দিলে তুমি পড়বে কিসে?

গোপাল। আজ আমার একে দেবি হয়েছে। তায় তেল কম হলে আরও কত বকবে। আজ আর আমি পড়ব না।

গোপাল পড়িবার জন্যে শ্যামার বেতন হইতে পয়সা দিয়া তৈল কিনিয়া আনিতেন। প্রায়ই সেই তৈল হইতে মাঝে মাঝে ঘুস দিতে হইত। তাহা না হইলে বাবুর স্ত্রী বলিতেন, ''সব চুরি করিল।''

গোপাল রন্ধনাদি করিয়া থালায় থালায় ভাত বাড়িয়া বাবুকে, বাবুর স্ত্রীকে, কানাইবাবুকে ও খোকা খুকীকে দিয়া আসিলেন। পরে শ্যামাব জন্যে ভাত বাড়িয়া নিজে আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় কানাইবাবু কি চাহিলেন ; গোপাল গিয়া জিজ্ঞাস কবিলেন, ''আর আপনাদের কিছু চাই ?''

কর্তাবাবু সক্রোধে কহিলেন, ''তুমি যে দিন দিন নবাব সেরাজুদ্দৌলা হচ্চো। ভাত দিয়ে একটু দাঁড়াতে পাব না? অমন কবলে আমার এখানে চাকরি করা পোষাবে না।''

কানাইবাবুর মুখে আর হাসি ধরে না। গোপাল অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কানাইবাবু কহিলেন, ''সেরাজুদ্দৌলা! মাছ আছে আর ?''

গোপাল সে দিবস বাবুদিগের মনস্তুষ্টি কবিবার জন্য যা কিছু ভাল জিনিস ছিল, সকলই বাবুদিগকে দিয়াছিলেন, সুতরাং কানাইবাবুকে কহিলেন, ''আর মাছ নাই।''

বাবুব স্ত্রী কহিলেন, ''চার পয়সার মাছ সব ফুরিয়ে গেল ?''

গোপাল। সবই আপনাদের দিয়েছি।

কানাইবাবু কহিলেন, ''আচ্ছা, তরকাবির জাযগাখান দেখি।''

গোপাল নিজের জন্যে ও শ্যামার জন্যে যাহা পাতে বাখিয়াছিলেন, একত্র কবিয়া কানাইবাবুর কাছে লইয়া দেখাইলেন। কানাইবাবু দেখিয়া বলিলেন, ''তুমি নীচে রেখে এসেছ।।''

গোপাল দুঃখিত হইয়া কহিলেন, ''তবে আমি এইখানে থাকি, আপনাদের আহাব হলে আমাব সঙ্গে আসিয়া দেখুন!''

কানাইবাবু রাগ করিয়া কহিলেন, ''যত বড় মুখ তত বড় কথা ?'' গোপাল আর উত্তর করিলেন না। বাবুদিগের আহারাদি হইলে নিচে আসিয়া শ্যামাকে কহিলেন, ''দিদি, তুমি খাও ; আজ আমি খাব না।''

শ্যামা জিজ্ঞাস করিল, ''কেন খাবে না ?''

বাবুদিগেব কথা শুনিয়া গোপালের অত্যন্ত কষ্ট হইযাছিল। কিন্তু তিনি সে কথা না বলিয়া কহিলেন, ''আজ হেমবাবুদের বাড়ী জল খেযে আমার আর ক্ষুধা নাই।''

গোপাল কি জন্যে আহার করিলেন না, শ্যামা বুঝিতে পারিল এবং নিজেও আহার না করিয়া শয়ন করিতে গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্যামার অভিপ্রায় জানা চাই

হেমচন্দ্র গোপালকে বিদায় দিয়া রামকুমার নামক চাকরকে ডাকিলেন। রামকুমার বাটীর বহুকালের চাকর, হেমকে হইতে দেখিয়াছে, তাঁহাকে কোলে কবিয়া মানুষ করিয়াছে, তাঁহাকে অপত্যনির্বিশেষে স্নেহ কবে ও প্রভুর ন্যায় ভক্তি কবে। কলিকাতায রামকুমার

হেমের অভিভাবক-স্বরূপ থাকে, চাকর-স্বরূপ নহে। যুবকেরা প্রায়ই ‘‘কর্তাদেব’’ আমলের চাকরদিগের উপর বিরক্ত। কারণ, তাহারা প্রভুকে প্রভুর মতন দেখে না; স্নেহেব পাত্র-স্বরূপ জ্ঞান করে। তাহাদিগের উপর হুকুম চলে না। যখন তাদেব ইচ্ছা হয়, তখনি কাজ করে। কিন্তু বামকুমার বৃদ্ধ, তাহার কাজ করিবার সামর্থ্য নাই। কেহই তাহাকে কিছু করিতে কহে না, সুতরাং তাহার উপর কাহাবও রাগ হইবার কাবণ নাই।

হেমের ডাক শুনিয়া রামকুমার কাছে আসিয়া তক্তাপোশের উপর বসিল। হেম জিজ্ঞাসিলেন, ‘‘রামকুমার, যে ছেলেটি এসেছিল, তাকে দেখেছ?’’

রামকুমার। হাঁ, এই তো দেখলাম।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, ‘‘কেমন দেখলে?’’

বামকুমার উত্তর কবিল, ‘‘দেখতে তো ভালই দেখলাম। বেশ শিষ্ট, শান্ত; কিন্তু পেটে কি গুণ আছে, তা আমি কেমন কবে জানতে পারব?’’

হেম একটু হাসিয়া কহিলেন, ‘‘বামকুমার, তুমি সহজে কাকে ভাল বলতে চাও না।’’

রামকুমার উত্তর কবিল, ‘‘তোমাবও যখন আমব মতন বয়স হবে, তখন তুমিও সহজে কারুকে ভাল বলবে না। কিন্তু আমি তো নিন্দে করি নাই। ছেলেটিব নাম কি?’’

হেমবাবু কহিলেন, ‘‘নাম তো জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু লেখাপড়ায় বেশ। কেমন মিষ্টি কথাগুলি, কেমন বিনয়!’’ এই কথা বলিয়া হেম বামকুমাবের মুখের দিকে তাকাইলেন, রামকুমারের অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য।

রামকুমার কথা কহিল না। একবার ঊর্ধ্বাধোভাবে মুখ নড়িল।

হেমবাবু কহিলেন, ‘‘রামকুমার, ছেলেটি অতি কষ্টে আছে। এক বাসায় থেকে রেঁধে খেয়ে ইস্কুলে পড়তে হয়। দেখলে ছেলেটিকে গরিব লোকের ছেলে বোধ হয় না। হাত দুটি কেমন নরম। বোধ হয়, কোন দৈব ঘটনায় দরিদ্র হয়েছে।

রামকুমার বিষাদিত মুখে কহিলেন, ‘‘হবে।’’

রামকুমারের উত্তর হেমের নিকট বড় ভাল লাগিল না। গোপালের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া পর্যন্ত, হেমের ইচ্ছা হইয়াছে, গোপালকে আনিয়া নিজবাটীতে রাখেন। কিন্তু এ প্রস্তাব রামকুমারের মুখ হইতেই প্রথমে নির্গত করাইবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং রামকুমার সে সম্বন্ধে কিছু না বলায় কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

একটু পরে আবার কহিলেন, ‘‘আচ্ছা রামকুমাব, আমরা যদি হঠাৎ গরিব হয়ে যাই, তা হলে কি হবে?’’

রামকুমার একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, ‘‘মা কালীর ইচ্ছায় তা তোমরা হবে না। যদি বিদ্যা শিখিতে পার, তবে তোমার টাকার ভাবনা কি?’’

রামকুমার তথাপি পথে আইল না।

হেমচন্দ্র কহিলেন, ''আচ্ছা, যদি বিদ্যা না শিখবাব আগেই গরিব হই, তা হলে আমাদেরও হয়তো কারুর বাড়ী ভাত রান্‌তে হবে।''

রামকুমার কহিল, ''না না। এমন কথা মুখের আগায়ও আনতে নাই।''

এমন সময় আহারেব জায়গা কবিয়া ব্রাহ্মণ হেমবাবুকে আহার করিতে ডাকিল। হেমবাবু বিরস বদনে আহাব কবিতে গেলেন। আহারান্তে উপবে গিযা শযন করিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে রামকুমারও আহার কবিয়া উপরে গেল। রামকুমাব বাবুব শযনঘরেই শুইয়া থাকে।

হেমচন্দ্র পান খাইতে খাইতে পুনরায় কহিলেন, ''রামকুমাব, আমবা খাওযা-দাওয়া করে শুলাম; কিন্তু সে ছেলেটি বোধ হয় এখনও বাঁধছে।''

রামকুমার উত্তব কবিল, ''সকলের অদেষ্ট কি সমান? তা হলে পৃথিবী চলত না। সকলেই তো তা হলে মুনিব হত! চাকব আর পাওয়া যেত না।''

বামকুমারের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া বহিলেন, পবে কহিলেন, ''রামকুমার, ছেলেটিকে দেখে আমার বড় দুঃখ হয়েছে। আমার ইচ্ছা কবছে, ওকে এনে আমাব এইখানে রাখি। তা হলে ওর কষ্ট থাকবে না, অনায়াসে চাবটি রাঁধা-ভাত পাবে।''

বাসককালাবধি হেমচন্দ্রের যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাই সম্পাদিত হইয়াছে। বিশেষ তাঁহার মাতার কাল হওয়া অবধি তাঁহাকে কেহ উচ্চ কথাটি কহে নাই। রামকুমাব হেমের কথা শুনিয়া কহিল, ''তোমাব ইচ্ছে হয়ে থাকে আন।''

হেম কহিলেন, ''বাবা কি কিছু বলবেন?''

বামকুমার উত্তর করিল, ''তিনি কি কখন কিছু তোমাকে বলেছেন যে আজ বলবেন? না তিনি চারটি ভাত দিতে কাতর? শত শত লোক দুর্গার আশীর্বাদে তোমাদের বাড়ীতে খাচ্ছে! আজ একজনেব কথা শুনেই কি তিনি বাগ কববেন?''

হেম। তবে তাঁকে একখানা পত্র লিখি; আর ও ছেলেটিকেও কাল এখানে আনি।

রাম। পত্র লিখলেও হয়, না লিখলেও হয়।

হেম রামকুমাবের আশ্বাসবাক্যে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। প্রফুল্লচিত্ত হইয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু সহসা নিদ্রা না হওয়ায় উঠিয়া বসিলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে হেমচন্দ্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কবিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। একটু এ-পুস্তক ও-পুস্তক পাঠ করিয়া হীরে নামক চাকরকে ডাকিযা গোপালকে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। গোপাল প্রাতঃকালে রন্ধনাদিতে ব্যস্ত থাকেন, সুতবাং হেমের নিকট আসিতে পাবিলেন না। কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি ইস্কুলে যাইবার সময় হেমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।

অন্যান্য দিবস অপেক্ষা অদ্য গোপাল সত্বরে পাকশাক সমাধা করিয়া বাবুদিগকে আহার করাইলেন এবং নিজে চারিটি নাকে মুখে দিয়া ইস্কুলে যাইবার জন্য বাহিব

হইলেন। হেমবাবুর ধুতিখানি যত্নপূর্বক পাট করিয়া একখানি কাগজে মুড়িয়া লইয়া চলিলেন। হেমবাবুর বাসার কাছে আসিয়া গোপালের যেন শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। রাস্তায় একটু থামিয়া পুনর্বার চলিলেন। হেমবাবু রাস্তার ধারে জানালার কাছে বসিয়া ছিলেন; গোপালকে দেখিতে পাইয়া সত্বরে বাহিরে আসিয়া গোপালের হাত ধরিয়া লইয়া তক্তাপোশের উপর বসাইলেন। গোপাল ধুতিখানি আস্তে আস্তে বিছানার উপর রাখিলেন। হেম জিজ্ঞাসিলেন, "এ কি? আপনি এ আনলেন কেন?"

গোপাল কহিলেন, "যখন আপনার চাকর গিয়েছিল, তখন শুখায় নি বলে পাঠিয়ে দিতে পারি নাই।

হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমি হীরেকে কাপড়ের জন্যে পাঠাই নাই। আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম।"

গোপাল কথা কহিলেন না।

হেম পুনরায় কহিলেন, "কাল রাত্রে আমি এক বিষয় স্থির করেছি। আপনাকে বলব মনে করেছি, কিন্তু বলতে শঙ্কা হচ্ছে।"

গোপাল মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমার সহিত আপনি কথা কন, এ আপনার অনুগ্রহ। শঙ্কা কি?"

হেম উত্তর করিলেন, "তবুও শঙ্কা হচ্ছে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তো বলি।"

গোপাল কহিলেন, "আমি আর কি মনে করব? কিন্তু এই মাত্র অনুরোধ করতে ইচ্ছা করি যে, আপনি আমাকে 'আজ্ঞা মহাশয়' বলে কথা কবেন না।"

হেম হাসিয়া উঠিলেন। গোপালও হাসিয়া কহিলেন, "আমি রসুয়ে বামুন; আমাকে 'আজ্ঞা মহাশয়' বলে কথা কইলে আমার বড় লজ্জা হয়; আর লোকেই বা শুনে কি বলবে?"

হেম হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তবে কি বলব?"

গোপাল কহিলেন, "আমার নাম ধরে ডাকবেন।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তবে আমার একটা কথা আপনার রাখতে হবে।"

গোপাল। কি কথা?

হেম বলিতে গিয়া একটু হাসিয়া আর বলিলেন না। ইতিমধ্যে হীরে তামাক দিয়া গেল। হেম তামাক খাইতেছেন আর ভাবিতেছেন, কি প্রকারে তাঁহার মনোগত বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন। ক্ষণকাল তামাক টানিযা গোপালকে হুঁকা দিয়া কহিলেন, "খান মহাশয়।"

গোপাল হুঁকাটি লইয়া বৈঠকে রাখিলেন।

হেম কহিলেন, "তাও তো বটে, আপনি তামাক খান না। তবে আমাকে দিলেন না কেন, আমিই রাখতাম।"

এই কথার পর উভয়ে একটু চুপ করিয়া রহিলেন। গোপাল হেমের আলমারির দিকে চাহিতে লাগিলেন। হেম এই অবকাশ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আপনি বলেছিলেন বই নিয়ে যাবেন, কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে না? হয়তো এক সময়ে আপনার ও আমার এক বইয়েরই দরকার হতে পারে।''

গোপাল কহিলেন, ''আপনার দরকার হলে অবশ্য আমি নেব না। তবে আপনার যে-সমস্ত বই দরকার না হবার সম্ভব, তাই যদি মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে দেন, তাহা হলেই আমার যথেষ্ট উপকার হয়।''

হেম উত্তর করিলেন, ''আমি সে অভিপ্রায়ে বলি নাই। আমার মনোগত ভাব এই যে, দু-জনে এক স্থানে থাকলে ভাল হয়।''

গোপাল হেমের মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, ''আপনার না এক জন ব্রাহ্মণ আছে?''

হেম। আপনাকে কি আমি ব্রাহ্মণ হয়ে থাকতে বলছি? আমিও যেমন থাকব, আপনিও তেমনি থাকবেন, এই আমার ইচ্ছা।

গোপাল কথা কহিলেন না। অবনত মুখে মাটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। হেমও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, ''কি বলেন?''

গোপাল গাঢ়স্বরে কহিলেন, ''মহাশয় আমি একলা নই। আমার এক দিদি আছে। আমরা দু-জনেই এক জায়গায় থাকি।''

হেম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ''আপনার কেমন দিদি?''

গোপাল ছল ছল নেত্রে উত্তর করিলেন, ''মহাশয় আমাদের অবস্থা চিরকাল এরূপ ছিল না। আমার মায়ের শ্যামা নামে এক জন দাসী ছিল, সে-ই আমাকে প্রতিপালন করেছে বল্লে হয়। যত মায়ের ধার না ধারি, শ্যামার কাছে তদপেক্ষা সহস্র ঋণী আছি। এককালে কোন দুর্ঘটনাবশতঃ আমাদের অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা হয়েছিল; তখন শ্যামার পূর্বসঞ্চিত কিঞ্চিৎ ধন ছিল, তাতেই আমাদের জীবন রক্ষা হয়েছে। মা মরবার সময় আমাকে শ্যামার হাতে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন। সেই অবধি আমরা যেখানে যাই, দুজনেই একত্র যাই, শ্যামা আমাকে না দেখলে তিন দিনেই মরে যাবে।''

গোপালের কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল।

রামকুমার এমন সময় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। হেম কহিলেন, ''রামকুমার, আমি যা বলেছিলাম তাই।''

রামকুমার জিজ্ঞাসিল, ''বাবু কবে বাসা তুলে আনবেন?''

হেম শ্যামার বৃত্তান্ত রামকুমারকে কহিলেন। রামকুমার কহিল, ''সে তো ভালই। তুমি তো বলেছিলে, একজন দাসী রাখবে। শ্যামা একটু একটু যদি কাজকর্ম করতে পারে, তা হলে আর একজন রাখবার দরকার হবে না।''

গোপাল কহিলেন, ''আমি কেমন করে ওখান থেকে ছেড়ে আসব?''

হেম। তারা কি তোমাকে এত ভালবাসে?

গোপাল কহিলেন, ''না।''

হেম পুনর্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

গোপাল উত্তর কবিলেন, ‘‘চাকবকে কে ভালবাসে মহাশয়? কাল আপনি যেতে দেন নাই বলে কত বকলে, আব—’’ এই বলিযা থামিলেন।

হেম একটু চুপ করিযা জিজ্ঞাসিলেন, ‘‘আর—কি?’’

গোপাল। না মহাশয়! যার অন্ন খেযেছি, তাব নিন্দা কবব না।

হেম। আচ্ছা সে কথা যাক্, এখন আসবাব কি?

গোপাল। দিদির কাছে না জিজ্ঞাসা কবে বলতে পাবি না।

হেম। তবে কখন বলবেন?

গোপাল। আজ সন্ধ্যাব সময ইস্কুল থেকে এসে বলব।

গোপাল ইস্কুল হইতে বাটী আসিযা বান্না চড়াইযা দিযা শ্যামাব নিকটে সমুদয বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া শ্যামাব চক্ষু হইতে ধাবা বহিতে লাগিল। একটু পরে কহিল, ‘‘হেমবাবুর বাড়ী গেলে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তাব বাড়ীব অন্যান্য লোক কেমন? তারা যদি দূর ছাই করে, তা হলে কি হবে? এখানে তবু এক বকম চাকরের মত থাকি, কেহই জানতে পাবে না। কিন্তু সেখানে তুমি সব কথা বলে ফেলেছ, সেখানকার চাকব-বাকবেব উঁচু কথা ববদাস্ত হবে না।’’

গোপাল কহিলেন, ‘‘দিদি, তিনি এমনি করে জিজ্ঞাসা কবতে লাগিলেন, আমি যে না বলে থাকতে পারলাম না।

শ্যামা। আমি সেজন্য তোমাকে দোষ দিচ্ছি না।

ক্ষণকাল উভয়ে চুপ করিয়া থাকিযা শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘তোমাব মত কি?’’

গোপাল কহিলেন, ‘‘আমার সেইখানে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তুমি যদি যেতে না বল, তবে যাব না; আমি তো কখন তোমাব অবাধ্য হয়ে কোন কাজ কবি নাই।’’

শ্যামা কহিল, ‘‘আমারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু এদের তো খবব দেওযা উচিত। কাল সকালে যদি আমারা চলে যাই, তবে এদের কি উপায হবে?’’

শ্যামার কথা শুনিয়া গোপালেব যাব-পব-নাই আহ্লাদ হইল। বন্ধন শেষ হইলে এক দৌড়ে হেমবাবুর বাটীতে গিয়া শ্যামাব মত বলিয়া আসিলেন। হেমবাবুও শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ কবিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নবনারী

পূজা আসিতেছে। শরতের সমাগমে বসুন্ধরা উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। বৃদ্ধেরা সম্বৎসরের পর মহামায়ার শ্রীচরণে জবা বিল্বদল দিবে বলিয়া আনন্দে ভাসিতেছে। বিদেশস্থ যুবকেরা প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টি কবিবাব নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে; বিরহিণী মনে মনে কতই বসপূর্ণ কথার হার গাঁথিতেছে। বালকেরা ইস্কুল বন্ধ হইবে বলিয়া কতই

আমোদ করিতেছে। দীন দুঃখী সম্বৎসবের পর একখানি নূতন বস্ত্র পবিতে পাইবে বলিয়া মনে মনে কতই উল্লসিত হইতেছে।

এক স্থানে বাসজনিত গোপাল ও হেমেব পরস্পর অত্যন্ত সৌর্হার্দ্য জন্মিল। গোপাল হেমকে দাদা বলিয়া ডাকেন এবং হেমও গোপালকে সহোদবেব ন্যায় স্নেহ কবেন।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "গোপাল তুমি কি বাড়ী যাবে? যদি না যাও, তাহলে আমাদেব বাড়ী চল।"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আমার বাড়ী যাওয়া হবে না। আপনি যদি নিয়ে যান, তবে আপনাদের বাড়ী যাই।"

হেম ও গোপাল বাড়ী আসা অবধি স্বর্ণলতা গোপালকে "গোপাল দাদা" বলিয়া ডাকেন। গোপাল দাদা না পড়াইলে স্বর্ণলতার পড়া হয না। কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে গোপাল দাদার কাছে যান। গোপাল যেন যথার্থই স্বর্ণেব সহোদব।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, "স্বর্ণ, তুমি আজ ক'দিন পড়লে না?"

স্বর্ণলতা হাসিয়া কহিলেন, "পডব না কেন? আমি তো রোজই পডি।"

হেব। তোমার বই আন দেখি, আমি পড়াই।

স্বর্ণ হাসিতে হাসিতে একখানি নবনাবী আনিয়া হেমের সম্মুখে বাখিলেন।

হেম জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় পড়বে?"

স্বর্ণ উত্তর করিলেন, "সীতা।"

হেম সেইখানে খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং এক এক ছেদ পর্যন্ত পড়িয়া স্বর্ণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বুঝেছ তো?"

স্বর্ণ ক্ষণকাল মনোনিবেশপূর্বক শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দাদা, তুমি বড় তাড়াতাডি পড়, আমি তোমাব কাছে পড়ব না। গোপাল দাদার কাছে পড়ব।"

হেম। তবে ডাক তোমার গোপাল দাদাকে।

স্বর্ণ হেমের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। গোপালকে ডাকিবার আজ্ঞা পাইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গেলেন। গোপাল বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন।

স্বর্ণলতা তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিলেন, "গোপাল দাদা, তোমাকে দাদা ডাকছে।

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?"

স্বর্ণ। এস তো তবে টের পাবে।

স্বর্ণ গোপালের হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন, গোপাল হাসিতে হাসিতে স্বর্ণেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যে ঘরে হেমচন্দ্র বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে লইযা গিয়া স্বর্ণ গোপালকে হেমের নিকটে বসাইলেন। গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "দাদা, আমাকে ডেকেছ কেন?"

হেম কহিলেন, "গোপাল, তুমি অমন পরের মতন বাইবে বাইরে থাক কেন? তুমি কি এ পরের বাড়ী মনে কর?"

গোপাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "বৈঠকখানায় সকলে বসে আছে, আমিও ছিলাম।"

হেম। "স্বর্ণ তো আর আমার কাছে পড়বে না। আমার পড়ান ওর মনোমত হয় না।"

গোপাল পড়াইতে আবম্ভ করিলেন। একটি একটি কথা পড়িয়া তাহাব একটি একটি প্রতিশব্দ দিয়া স্বর্ণলতাকে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বর্ণেব চক্ষু পুস্তকে নাই। তিনি একদৃষ্টে গোপালের মুখপানে চাহিয়া আছেন। এক ছেদ সমাপ্ত হইলে পুস্তক হইতে চক্ষু উত্তোলনপূর্বক স্বর্ণলতাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুঝেছেন তো?" স্বর্ণলতাব মুখপানে দৃষ্টি করিবার সময় গোপালের মুখ আরক্তিম হইল। স্বর্ণ ঈষৎ হাস্য কবিযা উত্তব করিলেন, "গোপাল দাদা, তুমি 'আপনি' বল কাবে?"

গোপালের মুখ কর্ণ পর্যন্ত লোহিতবর্ণ হইল।

তিনি পূর্বে স্বর্ণলতাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন কবিতেন, আজ 'আপনি' বলিলেন কেন?"

হেমচন্দ্র বিছানায় শয়ন করিয়া গোপালেব পড়া শুনিতেছিলেন। ক্ষণকাল পবে তথা হইতে চলিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। তদ্দর্শনে গোপাল কহিলেন, "দাদা কোথায় যাও? একটু দেরি কর, আমিও যাব, এইটুকু পড়ানো হলেই হয়।"

হেম কহিলেন, "তুমি পড়াও, আমি এখনই আসব।" এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

গোপাল অবনত মুখে স্বর্ণলতাকে পড়াইতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "গোপাল দাদা, আজ তোমার কি হযেছে? তুমি মাটিব দিকে চেযে আছ কেন?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "না, কিছু হয নি। আপনি পড়ুন।"

স্বর্ণ কহিলেন, "গোপাল দাদা, আজ আবাব ও একটা নূতন কথা শিখলে কোথা থেকে? আমাকে তো আগে তুমি 'আপনি' বলতে না।"

গোপাল একবাব স্বর্ণলতার মুখপানে নিবীক্ষণ কবিলেন। পুনবায মৃত্তিকাব দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "স্বর্ণ, আমি বড় গবিব মানুষ। আমি একজনেব বাড়ী বসুযে বামুন ছিলাম। আমার মতন লোকেব মান্য করে কথা কওয়া উচিত।"

এই কথা কহিয়া গোপাল পুনরায স্বর্ণলতার মুখপানে চাহিলেন। স্বর্ণ দেখিলেন, তাঁহার গোপাল দাদাব চক্ষে জল আসিয়াছে।

স্বর্ণ গোপালের মন অন্যদিকে লইয়া যাইবার জন্য জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল দাদা তোমাদের বাড়ীতে পূজা হবে।"

গোপালের দুঃখ যে এ কথায় দ্বিগুন হইবেক, তাহা স্বর্ণ বুঝিতে পারেন নাই।

গোপাল ম্লানমুখে কাতর স্বরে কহিলেন, "আমবা গবিব মানুষ, আমাদেব বাড়ী কেমন করে পূজা হবে?" গোপালের চক্ষে জল আসিয়াছিল, তাহা এক্ষণে ঝবঝব ঝরিতে লাগিল। গোপাল মাটির দিকে চাহিলেন।

উভয়ে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "গোপাল দাদা, তোমার ঠাকুর-মা কোথায়?"

গোপাল উত্তর কবিলেন, "আমার ঠাকুর-মা নাই।"

স্বর্ণ। মা?

গোপাল। মা-ও নাই।

স্বর্ণলতার মুখ ম্লান হইল। কাতর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, ''গোপাল দাদা, আমার মা-র কথা কিছু জান?

গোপাল। কেন?

স্বর্ণ। আমি পাড়ায় যাদের সঙ্গে খেলা করতে যাই, সকলেরই মা আছে, আমারই নাই। ঠাকুর-মাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সকলের মা থাকে না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কাঁদেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কথা কন না। তুমি আমার মা-র কথা কিছু জান?

গোপাল কহিলেন, ''স্বর্ণ, তোমার মা মরেছেন।''

স্বর্ণ। তোমার মাও কি মরেছেন?

গোপাল। হাঁ, তিনিও মরেছেন।

স্বর্ণ। তবে আমরা দু-জনেই সমান।

স্বর্ণলতার কথা শুনিয়া গোপালের শোকাবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। অধোবদনে বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া হাসিয়া কহিলেন, ''গোপাল দাদা, তুমি কাঁদ কেন? আমার তো মা নেই; কিন্তু আমি তো কাঁদি না।'' এই বলিয়া স্বর্ণলতা গোপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, ''গোপাল দাদা, চল যাই ঠাকুর দেখি গে। তোমাদের দেশে এমন ঠাকুর হয়?''

গোপাল কথা কহিলেন না।

স্বর্ণলতা পুনর্বার কহিলেন, ''গোপাল দাদা, শীঘ্র চল না। তুমি কি চলতে পার না?''

কিছুদূর আস্তে আস্তে গিয়ে গোপালের চক্ষের জল শুকাইল, পরে একটু হাসিয়া কহিলেন, ''স্বর্ণ, আমার এ কান্নার কথা দাদার কাছ বলো না।''

স্বর্ণ কহিলেন, ''তবে আমি যে মা-র কথা বল্লাম, এও কারু সঙ্গে বলো না।'' গোপাল কহিলেন, ''না, আমি বলব না।'' স্বর্ণ কহিলেন, ''তবে আমিও বলব না।''

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন নূতন ভাব

এই অবধি স্বর্ণলতার সহিত গোপালের এক গোপনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। গোপাল স্বভাবতই লাজুক; কিন্তু এই অবধি তাহার লজ্জা যেন সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইল। গোপাল আর অন্তঃপুরে যান না। সর্বদাই বর্হির্বাটীতে বাসিয়া থাকেন। পূর্বে পূর্বে সর্বদাই কথাবার্তা কহিতেন, কিন্তু এখন আর কথাবার্তা কহিতে ভালোবাসেন না। যেখানে অধিক লোকজন বসিয়া থাকে, আস্তে আস্তে তথা হইতে গিয়া অন্য এক স্থানে বসেন। হেমচন্দ্র একবৎসর

পব বাটী আসিয়াছেন। এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাইতেই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। যখন গোপালের সহিত সাক্ষাৎ হয় গোপালের বিরস বদন দেখিয়া মনে করেন, গোপাল বাটীব ভাবনা ভাবিতেছে। হঠাৎ দুই এক দিবস গোপালেব অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার চক্ষেব জল দেখিলেন। দুই এক দিবস গোপালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন; গোপাল জানিতে পাবেন নাই। শব্দ করিলে চমকিয়া জিজ্ঞাসা কবেন, "কেও?"

একদিবস হেম জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল, তুমি এমন হয়ে গেলে কেন? তোমাব কি কোন অসুখ হয়েছে?" গোপাল উত্তব কবিলেন, "অনেকদিন বাবার কোন সমাচার পাই নাই, তিনি কেমন আছেন টেব পেলাম না।"

হেমচন্দ্র, গোপাল যে তক্তাপোশে বসিয়াছিলেন, তাহার উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন, "ভয় কি, তিনি ভালই আছেন। তুমি তাঁকে পত্র লিখেছ?" গোপাল কহিলেন, "না।"

হেমচন্দ্র বলিলেন, "তবে একখান পত্র লেখা উচিত।" এই বলিয়া কাগজ কলম আনিযা পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খানিক লিখিয়া কহিলেন, "গোপাল, আমার লেখাটা ভাল বোধ হচ্ছে না; হযতো আমাব হাতেব পত্র পেয়ে তিনি মনে করবেন, তোমাব কোন পীড়া হয়েছে, তাই তুমি লিখতে পারলে না। তুমিই পত্রখান লেখ।" গোপাল পত্র লিখিলেন।

চিঠির জবাব আসিল। বিধুভূষণ লিখিয়াছেন, "আমি ভাল আছি, সেজন্য চিন্তা করিবে না। হেমবাবু ও তোমাব কুশল সমাচার লিখিবে।" আগে হেমবাবুর নাম, পবে "তোমার কুশল সমাচার।" হেমবাবুর তাহাতে বড় আহ্লাদ হইল। পিতার চিঠি পাইয়া গোপালের চিত্তও অপেক্ষাকৃত ভাল হইল।

যে দিবস গোপাল ও স্বর্ণলতার পূর্বপ্রকাশিত কথোপকথন হইয়া যায় সেই অবধি স্বর্ণলতাবও অন্তবে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইল। সে কোন্ ভাব? স্বর্ণলতা বলিতে পাবে না, সে কোন্ ভাব। গোপালকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আব গোপালেব কাছে যাইতে পারেন না। আব পূর্বের মতন তাঁহাব হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবাব ক্ষমতা হয না, হেম অন্তঃপুবে আসিলে যদি গোপাল সঙ্গে না থাকিতেন, তাহা হইলে স্বর্ণলতা পূর্বে জিজ্ঞাসা করিতেন, "দাদা, গোপাল দাদা কোথায়?" কিন্তু এখন আব সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। হেমকে দেখিলেই তাঁহাব হৃদয় কম্পিত হয়। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর কেহ আসিতেছে কি না, উঁকি মারিযা দেখেন। যদি আর কাহাকে না দেখিতে পান, তবে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কার্যান্তরে, কি স্থানান্তরে, গমন করেন। গোপাল যখন হেমেব সঙ্গে সঙ্গে আসিতেন, স্বর্ণলতা আর সেদিকে নিরীক্ষণ করিতে পাবিতেন না। দৈবে তাঁহার ও গোপালের চারি চক্ষু একত্র মিলিত হইলে উভয়েই অন্যদিকে চাহিতেন। কিন্তু অন্যদিকে চাহিয়াও অধিকক্ষণ থাকিতেন না। স্বর্ণলতা আর গোপালকে "গোপাল দাদা" বলিয়া সম্বোধন কবেন না। নাম উল্লেখ দূরে থাকুক, কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থি না থাকিলে গোপালের সহিত এক স্থানে থাকেন না। হঠাৎ একাকিনী

গোপালের সম্মুখে পড়িলে তাঁহার মুখ চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে। পুস্তকে মন লাগে না; গোপাল দাদাকে আব পড়িবাব জন্য ডাকেন না। গোপাল দাদাকে না দেখিলে চিত্ত যার-পর-নাই চঞ্চল হয়, কিন্তু গোপাল সম্মুখে থাকিলে তাহার মুখপানে নিরীক্ষণ করিতে ভবসা হয না।

স্বর্ণলতা যেন হঠাৎ বালিকাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে অধিরূঢ়া হইলেন। পূর্বে যে সমস্ত আমোদ-প্রমোদে তাঁহার মন নিবিষ্ট হইত, এক্ষণে তাহাতে ঘৃণা জন্মিল; খেলা আর ভাল লাগে না। খেলিবার নাম শুনিলে তাঁহাব হাসি পায়। ঠাকুরমাব উপন্যাস আর সত্য বলিয়া বোধ হয় না। চিন্তাই যেন তাঁহাব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

পূজা অন্তে গোপাল ও হেম এক দিবস বসিয়া আছেন। বিপ্রদাস তথায় আসিলেন। কর্তাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের কথা বন্ধ হইল। বিপ্রদাস হেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কলিকাতায় যাবার দিন স্থিব করা হলো?''

হেম উত্তর কবিলেন, ''আপনি যে দিন স্থিব করে দেবেন, সেই দিনই যাব।''

বিপ্রদাস একটু চুপ কবিয়া থাকিয়া কহিলেন, ''স্বর্ণের তো আর বিবাহ না দিলে নয়, তাব কি বলো দেখি?''

হেম। সে বিষয়ে আমি কি বলব? আপনাব যে অভিপ্রায়, তাই হবে।

এই কথায় গোপালের বোধ হইল, যেন আপনার মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহিব হইতেছে। তথা হইতে উঠিয়া যাইবাব জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। বিপ্রদাস কহিলেন, ''কোথা যাও বাবা? বসো বসো. উঠে যাবার দবকাব নেই।''

হেম কহিলেন, ''না, গোপাল একটু বেড়াক। ওব শরীর বড় ভাল নাই।''

গোপাল কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, ''তিন চার জায়গা থেকে প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু আমার কোনটাই মনোমত হয় না। শ্রীরামপুরের কাছে একটি পাত্র আছে সে না-জানে লেখাপড়া, না তাকে দেখতে শুনতে ভাল; কিন্তু ঠাকুরমহাশয়'' (বলিয়া বিপ্রদাস গুরুচবণে প্রণাম করিলেন) ''সেইখানেই শুভকর্ম কবতে অনুরোধ করেছেন।''

হেম উত্তর করিলেন, ''সে পাত্র যদি ভাল না হয়, আর যদি লেখাপড়া না জানে, তা হলে সেখানে শুভকর্ম করা কোন মতেই উচিত নয়।''

''আমিও তো বাপু তাই বলি'' বিপ্রদাস কহিলেন। ''আমিও তো তাই বলি। এইজন্যে আমি কোন জবাব দিই নাই, বলেছি—তোমাব সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কথা বলতে পারি না।''

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আর কোথা থেকে প্রস্তাব এসেছে?''

বিপ্রদাস। আরও দুই তিন স্থান হতে এসেছিল, কিন্তু আমি তাহাদের জবাব দিয়েছি। কোনখানের পাত্রই ভাল বোধ হয় না।

হেমচন্দ্র একটু বিলম্বে কহিলেন, ''গোপালের সহিত বিবাহ দিলে হয় না।''

বিপ্রদাস। কোন্ গোপাল?

হেম। এই যে আমাদের গোপাল; এই মাত্র উঠে গেল।

বিপ্রদাস হেমের কথা শুনিয়া একটু চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন, "তুমি বল্লে না, ওদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ? পাত্রটি মনোমত বটে। যেমন দেখতে শুনতে, তেমনি লেখাপড়া বোধ আছে। কিন্তু বড় গরিব।" এই বলিয়া বিপ্রদাস একটু মুখ বাঁকাইলেন।

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি স্বর্ণকে যে টাকা উইল করে দিলেন, তা পেলে আর স্বর্ণের ভাবনা কি? ঐ রেখে খেতে পারলে কত পুরুষ বড়মানুষের ন্যায় চলতে পারবে। বিশেষ, রূপ, গুণ ও ধন তিনই একত্রে মেলা সুকঠিন।"

বিপ্রদাস আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাও বটে। গোপাল কুলীনের সন্তান, স্বভাব ভাল। আজকাল অমন কুলীন মেলা ভার।" এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু অবিলম্বে পুনর্বায় কহিলেন, "তোমার প্রস্তাব সঙ্গত বটে। আমি বিবেচনা করে দেখি; কিছু বিষয়-আশয় থাকলে আর কথাই ছিল না অর্থাৎ সে-ই উৎকৃষ্ট হইত। কিন্তু তুমি যা বল্লে সে সত্য, তিনই এক স্থানে মেলে না।" এই বলিয়া বিপ্রদাস ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। হেমও গোপালের অনুসন্ধানে গমন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দায়মাল—কিন্তু ধরা পড়িল না

গোপাল, হেমচন্দ্র ও বিপ্রদাসের নিকট হইতে বৈঠকখানার দিকে আসিলেন। দীন নয়নে গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহাকে দেখিতে পাইলেন? স্বর্ণলতাকে। স্বর্ণলতা সেখানে কিজন্যে আসিয়াছিলেন?

প্রাতঃকালে দূর হইতে গোপাল ও হেমকে দালানের বারাণ্ডায় দেখিতে পাইয়া স্বর্ণলতা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তাঁহার পিতা কোথায়? একটু পরে তাঁহাকেও দালানের বারাণ্ডায় দেখিতে পাইলেন। স্বর্ণলতা মনে করিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সত্বর তথা হইতে স্থানান্তরে যাইবে না। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন কেহই নাই। কম্পিত হৃদয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, কোন শব্দ করিব না, কিন্তু যত জিনিষপত্র, আজি যেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দিবার জন্যই তাঁহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল। একখানা চেয়ারের কাছ দিয়া যাইতে সেখানা পড়িয়া যাইবার জো হইল। সেখানাকে ধরিতে গিয়া একখানা পুস্তক মেজের উপর হইতে পড়িয়া গেল। পুস্তকখানি তুলিয়া দেখিলেন, সেখানি মেঘনাদবধ কাব্য। প্রথমের সাদা পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে "গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" লেখা রহিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া একটু পুস্তকখানি সাদর নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন। পরে আস্তে আস্তে সেখানিকে মেজের উপর রাখিয়া বৈঠকখানার ধারে কাপড় রাখিবার আলনার নিকট গেলেন। আলনার উপর গোপালের ধুতি ও চাদর রহিয়াছে। ধুতিখানি ও চাদরখানি স্বর্ণলতার পিতা

পূজার সময় গোপালকে দিয়াছিলেন। গোপাল সেইখানি পরিয়া ভাসান দেখিতে গিয়াছিল। স্বর্ণলতা তাহা জানেন। কিন্তু হেমচন্দ্র কোন্ কাপড়খানি পরিয়া ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা স্বর্ণের স্মরণ নাই। গোপালের চাদরের এক পার্শ্ব মাটিতে পড়িয়াছিল; যত্নপূর্বক চাদরখানি তুলিয়া রাখিলেন। পরক্ষণেই আবাব সেখানিকে পাড়িলেন। পাড়িয়া নিজেব গায়ে দিলেন। পবে অস্ফুট বচনে কহিলেন, "এইবকম কবে গায়ে দিযেছিলেন।"

যেই স্বর্ণলতার মুখ হইতে উল্লিখিত কথা নিঃসৃত হইল, অমনি তিনি বৈঠকখানার বহির্দ্বারে পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। চমকিয়া মুখ ফিবাইয়া দেখিলেন, গোপাল। স্বর্ণলতার কণ্ঠার মূল অবধি কর্ণের অগ্রভাগ পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া চাদবখানি ফেলিয়া দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে প্রস্থান করিলেন। সেখানি তুলিয়া আলনায় বাখিবাব অবকাশ পাইলেন না। গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কি স্বর্ণলতা?"

স্বর্ণলতা সে দেশেও না। তখন তিনি আস্তে আস্তে চাদবখানি তুলিয়া আলনায বাখিলেন এবং বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

উপুড় হইয়া বালিশেব উপর মুখ রাখিযা গোপাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাব অজ্ঞাতসাবে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে আরম্ভ কারিল। মনে মনে কহিলেন, "বামন হয়ে চাঁদে হাত কেন তোমাব? দুরাশা ভাল নয়। দুরাশা করে কারও কখন ভাল হয নাই। কি আশ্চর্য! লোকের সহিত কিছু বলবার জো নাই, বল্লেই পাগল বলবে।" (দীর্ঘনিশ্বাস) "টাকা না থাকলে বেঁচে থাকা বৃথা! আজ টাকা থাকলে আমার ভাবনা কি?" (দীর্ঘনিশ্বাস) "কবিরা বলেন, টাকা অনর্থেব মূল। কিন্তু তাঁবা বই লিখে মবেন কেন? বিক্রি না হলেই বা দুঃখ করেন কেন? পৃথিবী শঠতায় পবিপূর্ণ, এখানে কেহই মনেব কথা কহে না। কহিবেই বা কেন? মনের কথা প্রকাশ করলেই লোকে যেখানে পাগল বলে, সেখানে চুপ কবে থাকাই ভাল।" (দীর্ঘনিশ্বাস) "স্বর্ণলতার বাপ যদি উইল কবে এত টাকা স্বর্ণকে না দিতেন, তা হলে এক দিন কারুকে দিয়ে বলাতে পারতাম। কিন্তু উইল করেই সে পথ বন্ধ হয়েছে!" (দীর্ঘনিশ্বাস) "আমি টাকা চাই না। এখনও তো উইল ওলটান যায়। কিন্তু আমি টাকা চাই নে বলে স্বর্ণ টাকা ছাড়বে কেন? আমি তাকে যেমন ভালবাসি, সেও কি আমাকে তেমনি ভালবাসে? কখনই হতে পারে না। আমি গরিবেব ছেলে, আমাকে বড়মানুষে কেন ভালবাসবে? সেদিন আমাব অবস্থার কথা শুনে অবধি আমার সঙ্গে কথা কহে না, আমাকে ডাকে না, আমি যেখানে যাই সেখান থেকে চলে যায়।" (দীর্ঘনিশ্বাস) "সে যদি আমাব জন্যে না ভাবে, আমি কেন তার জন্যে ভেবে মবি? ভেবেই বা ফল কি? আব দুই তিন দিন পরে আমি চলে যাব। হয়ত আর এ জন্মে দ্বিতীয় বার দেখা হবে না।" (দীর্ঘনিশ্বাস) "দূব কবো ভাবনা।" এই বলিয়া একখানি পুস্তক হাতে লইযা পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু হাতে লওযাই সার। পড়িতে আরম্ভ করিয়া তিন চারি পংক্তি পর্যন্ত মনসংযোগ করিয়া পাঠ কবিলেন। পরে মন অন্যদিকে গেল। খানিক পড়িয়া দেখেন, যা পড়িযাছেন সকলই মিথ্যা হইয়াছে। এক বর্ণও মনে নাই। আবার প্রথম হইতে আরম্ভ কবিলেন।

পুনর্বার তিন চারি পংক্তি পড়িয়া অন্যমনস্ক হইলেন। আবার খানিক টের পাইলেন, কিছুই মনে নাই। সেই প্রথমকার তিন পংক্তি ভিন্ন আর বুঝিতে পাবেন নাই। বিবক্ত হইয়া সেখানা ফেলিয়া দিয়া আর একখানা পুস্তক লইলেন। সেখানিও পড়িতে গিয়া ঐরূপ হইতে লাগিল। পূর্বাপেক্ষা অধিক বিরক্তি হইয়া সেখানিও রাখিয়া দিলেন। মনে করিলেন পত্র লিখি। কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ কবিলেন। উপরে তাবিখ দিলেন। দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কাহাকে লিখি। এ, ও, সে, এক এক করিয়া কত নাম উপস্থিত হইতে লাগিল। কাহাকেও লিখিতে ইচ্ছা হইল না। পরে পিতাকে পত্র লিখিবেন স্থির করিলেন। কাগজের উপর ইংবাজীতে তারিখ দিয়াছিলেন, সেটুকু ছুবি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। পরে বাঙ্গলায় লিখিতে লাগিলেন। খানিক লিখিয়া পড়িয়া দেখিলেন ভুল হইয়াছে। এক এক করিয়া ভুলগুলি সংশোধন কবিলেন, কিন্তু তাহাতে চিঠিখানি অত্যন্ত অপরিস্কার দেখা যাইতে লাগিল। এজন্য সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আর একখানি কাগজ লইলেন, তাহাতেও ভুল হইতে লাগিল, ‘‘দূর হোক’’ বলিয়া সেখানিও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

হেমচন্দ্র এদিকে ওদিকে অনুসন্ধান করিয়া বৈঠকখানায আসিলেন। গোপালকে বৈঠকখানার বিছানায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘গোপাল তুমি এইখানেই আছ, তবে আমার ডাকে উত্তর দাও নাই কেন?’’

গোপাল কহিলেন, ‘‘তুমি কখন ডাকলে?’’

হেম। বিলক্ষণ; ডেকে ডেকে আমাব গলা ভেঙে যাবার জো হযেছে যে? (গোপালের হাত ধরিয়া) চল যাই, স্নান করি গিয়ে।

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, ‘‘কলিকাতায় যাবার দিন কবে স্থির হলো?’’

হেম। এখনও হয় নাই। বাবা পাঁজি দেখবেন, তবে স্থিব হবে।

গোপাল। ‘‘স---র—’’ স্বর্ণেব বিবাহের বিষয় কি কথা হইল, জিজ্ঞাসা কবিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ‘‘সর’’ বলিয়া চুপ কবিলেন, আর অধিক কহিতে পারিলেন না। ভাগ্যক্রমে হেমের মন অন্য বিষয়ে নিয়োজিত ছিল। সুতরাং গোপালেব কথা তাঁহাব কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

উভয়ে স্নান করিয়া আসিলেন এবং আহারাদি করিয়া বৈঠকখানার বিছানায় বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীলকমল ও বিধুভূষণ তথা শশিভূষণ

গোপালকে কলিকাতায় রাখিয়া বিধুভূষণ একজন ডেপুটী-কলেক্টরের সহিত ঢাকায় গিয়েছিলেন, তাহা পাঠককে বলা হইয়াছে। যে ডেঃ কলেক্টববাবু বিধুকে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বড় গীতবাদ্যপ্রিয় ছিলেন। বিধুভূষণকে ঢাকা জেলায় লইয়া গিয়া তাহাকে এক

মহুবিগিবি কর্ম দিলেন। বিধুভূষণ প্রথমতঃ সে কর্ম সুচারুপে চালাইতে পারিতেন না, কিন্তু সত্ত্বরই সে বিষয়ে তাঁহার পটুতা জন্মিল। দিবসে কাজকর্ম কবিতেন। সায়ংকালে ডেপুটীবাবুকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গীতবাদ্য শিক্ষা দিতেন। যে বেতন পাইতেন, তাহাতে নিজেব খবচপত্র চলিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত, গোপালকে পাঠাইযা দিতেন।

এক দিবস বিধুভূষণ বাজাবে এক দোকানে কাপড় খবিদ কবিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় কোলাহল শুনিতে পাইলেন। সকলেই বাহিব হইযা দেখিতে গেল। বিধুভূষণও সেই সমভিব্যাহারে বাহিবে আসিলেন। দেখিলেন, আগে আগে এক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকায পুরুষ আসিতেছে ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি বালক ''বাছা হনুমান'' বলিয়া চিৎকার কবিতে কবিতে তাহাব অনুসরণ কবিতেছে ও রাস্তাব ধূলি লইযা তাহার গায দিতেছে। দেখিবামাত্রেই বিধুভূষণ নীলকমলকে চিনিতে পাবিলেন। নীলকমলেব আর সে পূর্ব্বেব শবীব নাই। তাহাব কেশ লম্বা হইযাছে, দাড়ি বক্ষঃস্থল ব্যাপিযা পড়িযাছে, চক্ষু বক্তবর্ণ হইযাছে ও শরীব যাব-পব-নাই কৃশ হইযা পড়িযাছে। নীলকমল অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। বালকেবা তাঁহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিৎকার কবিতেছে। যখন ববদাস্ত করিতে না পাবিতেছে, তখন এক একবার বালকদিগকে প্রহার কবিবার জন্য ফিরিতেছে এবং তদ্দর্শনে তাহারা প্রথমে পলাইতেছে; কিন্তু অবিলম্বেই একত্রিত হইযা পূর্ব্ববৎ ''বাছা হনুমান'' বলিতেছে।

বিধুভূষণ নীলকমলকে চিনিতে পাবিয়াই তাহার নিকট গেলেন। নীলকমল বিধুভূষণকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহাব মুখ দেখিবামাত্রই কহিল, ''দাদাঠকুর! আমি টের পাই নাই। আমাকে যে জ্বালাতন কবছে, আমাব আব আপন পর ঠাওর নাই। এখন আমি মবতে পারলেই বাঁচি।''

বিধুভূষণ কহিলেন, ''নীলকমল! কি হয়েচে? তুমি এখানে এলে কবে?''

পশ্চাৎ হইতে নিযত ''বাছা হনুমান, বাছা হনুমান'' শব্দ হইতেছে। নীলকমলের কান সেই দিকেই রহিয়াছে, বিধুভূষণ কি কহিলেন, শুনিতে পাইলেন না। একটু পরে কহিল, ''দাদাঠাকুর, আমারে আগে রক্ষা কর, পরে সব কথা শুনব।''

বিধুভূষণ বালকদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এক দিক্ হইতে তাড়ায়ে দিলে অপর দিকে গিয়া জোটে। বিরক্ত হইয়া তিনি নীলকমলের হাত ধরিয়া দোকানের মধ্যে লইয়া গেলেন। বালকেরা দোকানে প্রবেশ করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

নীলকমলকে লইয়া বিধুভূষণ এক স্বতন্ত্র গৃহে গেলেন। গিয়া উভয়ে উপবেশন কবিলেন। নীলকমল শ্রান্তি দূর করিয়া কহিল, ''দাদাঠাকুর, তুমি এখানে কোথা হতে এলে?''

বিধুভূষণ কহিলেন, ''আমি তোমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি কোথা থেকে এলে? তোমার দিব্যি কর্ম ছিল, তা ছেড়ে দিলে কেন?''

নীলকমল উত্তর করিল, ''দাদাঠাকুর অদেষ্টে না থাকলে অতি বড় সুখও অনেক দিন থাকে না। তোমাদের বাড়ী থেকে বাড়ী গেলাম। সেখানে এই গোলের সুরু হলো। তারপর যেখানে যাই সেখানেই এই গোল। দাদাঠাকুর, তুমি আমাকে বারণ করা অবধি আমি সে গানও গাই নে, তার কথাও কই নে, তবু আমাকে লোকে ছাড়ে না।''

বিধুভূষণ বুঝিতে পারিলেন, নীলকমল পদ্মআঁখির গানের উল্লেখ করিতেছে। তিনি আর কথা কহিলেন না।

নীলকমল জিজ্ঞাসিল, ''দাদাঠাকুর, এখন কোথায় গেলে বাঁচি, আমাকে বলে দাও।''

বিধুভূষণ কহিলেন, ''নীলকমল, তুমি খেপো কেন? তাতেই ওরা খেপায়।''

নীলকমল। দাদাঠাকুর, ঐ কথা আমিও বলি যে, আমি খেপি কেন? কিন্তু কথাটা শুনলে যেন আমার বুদ্ধি লোপ পায়, আমি যেন পাগল হই।

নীলকমল কথাটা শুনিয়া যে পাগলের মত হয়, তাহা আর বলিবার সাপেক্ষ রহিল না। বিধুভূষণ তাহার চেহারা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয়ে সেই দোখানঘরে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পরে বিধুভূষণ কহিলেন, ''নীলকমল, চল আমাদের বাসায় যাই। সেইখানে খেয়ে শুয়ে থাকবে।''

নীলকমল। দাদাঠাকুর, আমার কি আর খাওয়াদাওয়া আছে?

বিধুভূষণ। সে কি?

নীলকমল। আজ তিনদিন জলবিন্দুও খাই নাই, তবু খিদে নেই।

নীলকমলের কাতরোক্তি শুনিয়া বিধুভূষণ কহিলেন, ''নীলকমল, তুমি এইখানে বসো, আমি এখুনই খাবার আনি।''

নীলকমল। না না।

চন্দ্রের আলোকে বিধুভূষণ দেখিতে পাইলেন, নীলকমলের চক্ষু এই কথা কহিবার সময় ভয়ানক হইয়া আসিল। বিধুভূষণ বিস্তর সান্ত্বনা-বাক্যের দ্বারা বাসা পর্যন্ত আনিলেন। বাহিরের ঘরে বসাইয়া নিজে কিঞ্চিৎ খাবার আনিবার জন্যে বাটীর মধ্যে আসিলেন; কিন্তু ফিরিয়া গিয়া দেখেন, গৃহ শূন্য পড়িয়া আছে। নীলকমল নাই। এদিক্ ওদিক্ অনুসন্ধান করিলেন, কোন স্থানেই তাহার উদ্দেশ পাইলেন না।

বিধুভূষণ ডেপুটী বাবুর সহিত যেরূপ সুখে আছেন, বোধ হয় ইহার পূর্বে তিনি কখনও এমন সুখে কাল যাপন করেন নাই। কিন্তু শশিভূষণ ঐশ্বর্যশালী হইয়া অট্টালিকায় শয়ন করিয়া কেমন আছে দেখা যাউক।

রামসুন্দরবাবুর ষড়যন্ত্রের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। কর্ত্রীঠাকরুণ দরখাস্ত করিয়াছেন। মেজেস্টর সাহেব দরখাস্ত পাইয়া স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন।

মেজেস্টর সাহেব বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাবু মাটিতে বিছানা করিয়া বসিয়া আছেন। তাহার বামভাগে একটি বনাত-মোড়া টেবিল। টেবিলের উপর কতকগুলি হাতীর দাঁতের পুতুল; তাহার পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি চীনে-মাটির পুতুল, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ার রহিয়াছে, বাবুর সম্মুখে আমবর্গ বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। মেজেস্টর সাহেব আসিবেন বলিয়া বাবু আজি স্বয়ং কাজকর্ম করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ স্ফীত ও জবাফুলের মত লাল। কথা কহিতে গেলে কথা স্পষ্ট নির্গত হয় না। অনবরত পাখার বাতাস করিতেছেন, তথাপি মুখে মাছি বসা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

বাবুকে দর্শন করিয়াই মেজেস্টর সাহেবের অভক্তি হইল। পরে দুই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু নিজের বুদ্ধিতে কোনটির উত্তর দিতে পারিলেন না। শশিভূষণ যাহা শিখাইয়া দিলেন, তাহাই বলিলেন। মেজেস্টর সাহেব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, শশিভূষণই সর্বময় কর্তা। তদ্দর্শনে মেজেস্টব সাহেব হুকুম দিলেন যে, যত দিন পর্যন্ত সবকাব হইতে ম্যানেজার না নিযুক্ত হয, তত দিন কাছারির কার্য বন্ধ থাক। আর শশিভূষণ কি প্রকাবে জমিদারি শাসন কবিয়াছেন, তাহার হিসাব তলব কবিলেন।

শশিভূষণের শিরে বজ্রাঘাত হইল; ভবিষ্যতে কাজ কবিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহার কোন চিন্তা হইল না। তাঁহাকে যে পূর্বের হিসাব দিতে হইবেক, এ-ই তাঁহাব প্রধান ভয়ের কারণ। যদি তাঁহাকে একেবারে কর্মচ্যুত কবিযা দিত, তাহা হইলে তিনি ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী হইতেন।

শশিভূষণ বিরসবদনে বাটী আসিলেন। অন্যান্য দিন তিনি কাছাবি হইতে উঠিলে সকলেই সসম্ভমে উঠিয়া দাঁড়াইত, আজি সকলেই নিজ নিজ কর্ম করিতে লাগিল। তাঁহাকে কেহ গ্রাহ্য কবিল না। রাস্তা দিয়া বাটী চলিয়া যাইবার সময় দু-ধারেব লোকে সেলাম করিল না। শশিভূষণ ভরসা কবিযা উর্ধ্বে দৃষ্টি কবিতে পাবিলেন না। হেঁটমুখে বাটী আসিয়া শয্যায় শয়ন কবিলেন।

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, ''সাহেব এসে কি বল্লে?''

শশিভূষণ কহিলেন, ''আর কি বলবে? আমার সর্বনাশ কবে গেল।''

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, ''কি সর্বনাশ?''

শশি উত্তর করিলেন, ''আমার কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে। আব যতদিন বুঝানো শেষ না হবে, ততদিন অন্য কার্যে হাত দিতে পাবব না।''

প্রমদা শুনিয়া আর কোন প্রশ্ন বা উত্তর করিলেন না।

সন্ধ্যার পূর্বে শশিভূষণ গিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, আজ আর আমলাবর্গের মধ্যে কেহই আসিল না। এক এক বার দ্বাবে শব্দ হয় আব শশিভূষণ উৎসাহে চাহিয়া দেখেন, কিন্তু কি দেখিতে পান? হয়তো চাউলের মহাজন, নতুবা কাপড়ের দোকানদাব আপনার প্রাপ্য টাকা লইতে আসিয়াছে। বাত্রি ৮ টাব সময়ে শশিভূষণ আমলাদিগের বাটী লোক পাঠাইযা দিলেন।

পূর্বে যাহারা তাঁহার বাটী ছাড়িত না, আজি তাহাদেব সকলেরই ''প্রয়োজন আছে।'' কেহই আসিতে পাবিবে না। ৯ টার সময় শশিভূষণ বামসুন্দরবাবুব বাটীতে গেলেন। সেইখানে গিয়া সকলকে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন। অন্য অন্য দিবসের মত অদ্য আর কেহ উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল না। বামসুন্দরবাবু অগ্রে শশিভূষণেব সম্মুখে তামাক খাইতেন না; আজ বুঝি পূর্বক্ষতি পূবণ করিবার জন্যেই অনবরত হুঁকা টানিতেছেন। শশিভূষণ যে তামাক খান, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

শশিভূষণ বসিয়া আছেন। কেহই তাঁহার সহিত কোন কথা কহে না। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া সকলে উঠিবার উদ্যোগ করিলেন; তদ্দর্শনে শশিভূষণ কহিলেন, ''আমি আপনাদের কাছে এলাম।''

খাতাঞ্জি ব্যঙ্গ কবিয়া কহিলেন, "এত অনুগ্রহ? আমার নিকট কি কোন প্রয়োজন আছে?"

মুহুরি কহিলেন, "আসুন, বাত হলো।"

শশিভূষণ কহিলেন, "একটু অনুগ্রহ কবে বসুন। আমি আপনাদেব সকলেবই কাছে এসেছি।"

শশিভূষণের কথা শুনিয়া সকলে বসিলেন। শশিভূষণ কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, "আপনারা বক্ষা না করলে তো আমার নিস্তার নাই, তাই আপনাদেব শরণ নিতে এলাম।"

রামসুন্দরবাবু উত্তর কবিলেন, "আমার সাধ্যই বা কি, ক্ষমতাই বা কি? আমি কেরানী মানুষ; আমাব হাতেও কেউ নাই, আমিও কাক হাতে নই।

শশিভূষণ কহিলেন, "তা সত্য, কিন্তু এ বিপদে আপনি না বক্ষা করলে আর আমার উপায়ন্তর নাই।"

অন্যান্য যাঁহারা বসিয়া ছিলেন, এই কথা শুনিয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন; কহিলেন, "তবে আমাদেব কাছে কোন প্রয়োজন নাই?"

শশিভূষণ কহিলেন, "আপনাদেব সকলেবই কাছে আমাব দববাব" এই বলিয়া তিনি গলায় বস্ত্র দিয়া জোড়হস্তে এক পার্শ্বে বসিলেন। শশিভূষণেব চক্ষু হইতে ধাবা বহিতে লাগিল।

খাতাঞ্জি প্রভৃতি সকলেই শশিভূষণকে গলবস্ত্র দেখিযা নরম হইলেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডাব পর স্থির হইল, শশিভূষণ চারি জনকে চারি হাজাব টাকা দিতে পাবিলে তাঁহাবা শশিভূষণেব অপরাধ ঢাকিয়া লইবেন, কিন্তু এই কড়ারে যে, শশিভূষণেব নির্দোষিতা সপ্রমাণ হইলে তিনি স্বেচ্ছাপূর্বক কার্য ত্যাগ কবিয়া যাইবেন। শশিভূষণ আব উপাযান্তর না দেখিযা তাহাতেই সম্মত হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"গোপাল কোথায়"

বিপদ কখন একক আইসে না। একবাব আসিতে আরম্ভ কবিলে দলবদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে। হেমচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পবিবাবেরা সে কথা বিস্মৃত হইতে না হইতেই হেমচন্দ্র বসন্তবোগে আক্রান্ত হইলেন। সে বৎসব কলিকাতায ভয়ানক বসন্তের প্রার্দুভাব হইয়াছিল এবং ঐ রোগে বহুসংখ্যক লোক কালগ্রাসে পতিত হয। কলেজেব একজন সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তাব তৎকালে কলিকাতাব বায়ু পবীক্ষা কবিয়া তন্মধ্যে বসন্তের পুঁজ দেখিতে পাইয়াছিলেন। যাহাদেব একবাব বসন্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদেরও পুনরায় বসন্ত হইয়াছিল।

হেমচন্দ্রের জ্বর হইয়া তৃতীয় দিবসে তাঁহার শবীরে বসন্তেব গুটি দেখা দিল। হেমচন্দ্র গোপালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "গোপাল, তোমাব টীকা হয়েছে?" গোপাল উওর

করিলেন, ''হাঁ হয়েছে।'' তখন হেম কহিলেন, ''আমার শরীরে বসন্ত দেখা দিয়েছে; তোমরা সাবধান হয়ে থাক।''

গোপাল হেমের শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিলেন; দেখিলেন, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ছোট ছোট লাল রঙের ঘামাছির ন্যায় গুটি হইয়াছে। দেখিয়া তাঁহার শরীর কম্পিত হইল। কিন্তু হেমকে কিছু বলিলেন না, নিজে চাদর লইয়া অবিলম্বে ডাক্তারের নিকট গেলেন। ডাক্তার সাহেব আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ''হাঁ, বসন্তই বটে।''

দুই তিন দিবসের মধ্যে হেমের সর্বশরীর স্ফীত হইল। কণ্ঠার বেদনায় কথা কহিতে পারিল না এবং জলটুকু পর্যন্ত গলাধঃকরণ করিবার শক্তি রহিল না। সমস্ত দিবস অনাহারে নীরবে শয্যার শয়ন করিয়া থাকেন।

গোপালের আর আহার নিদ্রা নাই। নিয়ত হেমের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। আহারের সময় সেইখানে তাঁহাকে চারিটি অন্ন দিয়া যায়; কোন দিন খান, কোন দিন বা যেমন ভাত তেমনি পড়িয়া থাকে। হেম এক দিবস অতি কষ্টে কহিলেন, ''গোপাল, ভাই, তুমি এখানে সমস্ত দিন বসে থেক না, কি জানি যদি তোমার বসন্ত হয়।'' গোপাল কোন উত্তর করিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, ''গোপাল, আমার ব্যারামের কথা বাড়ীর কি কারুকে লিখেছ?''

গোপাল উত্তর করিলেন, ''না। কাহাকেও লিখি নাই।''

হেম কহিলেন, ''তবে আর কারুকে লিখো না।''

একটু পরে গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, ''দাদা, বাড়ী থেকে দুখানা চিঠি এসেছে, পড়বে কি?''

হেম উত্তর করিলেন, ''তুমি খুলে পড়। পড়ে যে উত্তর লিখতে হয়, লিখে দাও। আমার পীড়ার কথা উল্লেখ করো না।''

গোপাল চিঠি পড়িয়া জবাব দিলেন, ''সকলে ভাল আছে।''

ইহার দুই তিন দিবস পরে হেমের আর সংজ্ঞা রহিল না, সমস্ত দিন রাত কেবল প্রলাপ বকেন। তন্মধ্যে স্বর্ণ ও গোপালের নামই অধিক। গোপাল শিয়রে উপবেশন করিয়া ক্রমাগত নেত্রযুগল হইতে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে থাকেন।

শ্যামা আপনার কাজকর্ম সমাধা করিয়া হেমের নিকট সমস্ত দিবস বসিয়া থাকেন। এক দিবস অশ্রুপূর্ণ নয়নে গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, ''দিদি, এমন হয়ে কেউ কি বাঁচে?''

শ্যামা উত্তর করিল, ''ভয় কি? এ তো সামান্য বসন্ত হয়েছে। আমি এর অপেক্ষা কত বেশী বসন্তওয়ালা রোগীকে বাঁচতে দেখিছি।''

গোপাল কহিলেন, ''আমার মাথার দিব্বি, বল দেখি বাঁচে কি না?'' শ্যামা কহিল, ''আমি মিথ্যা কথা বলছি? কত লোক এর চাইতে বেশী বসন্ত হয়ে বেঁচে উঠেছে।''

গোপাল ক্ষণকাল অশ্রুপূর্ণ নয়নে নীরবে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হইল এবং হেমচন্দ্রের বাসার কাছে আসিয়া শব্দ থামিয়া গেল। গোপাল শ্যামাকে কহিলেন, "দিদি, দেখ দেখি, বুঝি ডাক্তারসাহেব এসেছেন?"

শ্যামা উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ডাক্তারসাহেবই এসেছেন। ডাক্তার সাহেব রোগীর শয্যার নিকট আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া নাড়ীর গতি দেখিলেন। পরে মুখ বক্র করিয়া কহিলেন, "একপ অজ্ঞানের ভাব কতক্ষণ পর্যন্ত হয়েছে?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "আজ সকালবেলা পর্যন্ত আর একটিও কথা কন নাই।"

ডাক্তারসাহেব আবার মুখ বক্র করিলেন।

গোপাল ডাক্তারসাহেবকে জিজ্ঞাসিলেন, "রোগ কি কঠিন হয়েছে?"

ডাক্তারসাহেব উত্তর করিলেন, "খালি কঠিন নয়, রোগ সাংঘাতিক হয়েছে।"

গোপালের চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ডাকক্তারসাহেব কহিলেন, "কেঁদ না। যত্নপূর্বক রোগীর সেবা শুশ্রূষা কর; এখনও বাঁচবার আশা আছে।"

গোপাল আশ্বাসিত হইলেন। ডাক্তারসাহেব যাহা করিতে বলিলেন, সে সমস্ত লিখিয়া লইলেন এবং ঠিক সেইরূপ রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারসাহেব চলিয়া গেলে গোপাল শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এত দিন বাড়ীতে কোন খবর পাঠাই নাই, কিন্তু এখন আর চুপ করে থাকা যায় না। তুমি কি বল?"

শ্যামা কহিল, "খবর পাঠান উচিত। যদি এখানে ভালমন্দ ঘটে, তা হলে তাঁরা ভাববেন যে, পরের হাতে পড়ে কিছু শুশ্রূষা হয় নাই, বিনা-চিকিৎসায় বিনাযত্নে মারা পড়েছে।"

গোপাল শ্যামার কথা শুনিয়া স্বর্ণলতাকে একখানি পত্র লিখিলেন।

স্বর্ণ!

দাদার অত্যন্ত বসন্ত হইয়াছে। এতদিন তোমাদিগকে বলিতে দেন নাই। অদ্য প্রাতঃকাল অবধি তাঁহার এক রকম চৈতন্য নাই বলিলে হয়। ডাক্তার বলিয়াছেন, এখনও জীবনের আশা করা যাইতে পারে। যদি তোমরা আসিতে ইচ্ছা কর, তবে আসিবে, আমি ও শ্যামা যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতেছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পত্র ডাকে পাঠাইয়া গোপালের চিত্তচাঞ্চল্য পূর্বাপেক্ষা অনেক লাঘব হইল। কোন অনিষ্ট হইলে পাছে লোকে বলে, বিনা-চিকিৎসায় কিংবা বিনা-যত্নে মারা পড়িয়াছে, এই ভয়ে তিনি প্রায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন।

গোপাল নিয়তই হেমের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই। আর কাহাকেও হেমের নিকট রাখিয়া তাঁহার মন স্বচ্ছন্দে থাকে না। হেম ওষ্ঠ নাড়িলেই তিনি টের পান—কোন্ দ্রব্য চাহিতেছেন। আর কেহই তাহা টের পায় না।

গোপালের চিঠি পাইয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার পিতামহী যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন। গৃহে যা যেখানে ছিল, সেইখানেই রাখিয়া দুই জনে পালকি করিয়া রেলওয়ে স্টেশনে আসিলেন। কিন্তু কলিকাতার মধ্যে হেমের বাসা কোথায়, তাঁহারা কেহই জানেন না। শ্রীরামপুরের নিকটে তাঁহাদের গুরুঠাকুরের বাড়ী। স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, "স্বর্ণ, চল আমরা প্রথমে গুরুঠাকুরেব বাড়ী যাই। আমি তাঁর বাড়ী চিনি। সেখানে থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাব।"

স্বর্ণ সম্মত হইলেন। উভয়ে টিকিট লইয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে সন্ধ্যার সময় গুরুঠাকুরেব বাটী পৌঁছিলেন।

গুরুদেবের নাম শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিবি। তিনি স্বর্ণলতার ও তাহাব পিতামহীর আগমণ শ্রবণ করিয়া আগ্রহ সহকারে দ্বারে গিয়া তাঁহাদিগকে আনিলেন। স্বর্ণলতার পিতামহী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব, হেমের অত্যন্ত পীড়া হয়েছে, জীবন সংশয়। আমরা তার বাসায় যাব। কিন্তু তার বাসা কোথায তা জানি না। এজন্য আপানার এখানে এসেছি। একজন চাকর যদি সঙ্গে দেন, তা হলে আমরা অনাযাসে বাসা অনুসন্ধান করে নিতে পারি।" গুরুদেব কহিলেন, "চাকর দরকার কি, আমি নিজেই যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পীড়াটা কি? তজ্জন্য কিছু দৈবকার্য করলে ভাল হয় না?"

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, "পীড়া বসন্ত। আপনার অভিপ্রায়ে যদি দৈব-শান্তি করলে ভাল হয়, তাই করুন। খরচপত্রের জন্য সঙ্কুচিত হবেন না।" এই বলিয়া অঞ্চল হইতে একখানি ৫০ টাকাব নোট খুলিয়া দিলেন।

গুরুঠাকুর আলোকের নিকট গিয়া নোটখানি দর্শন কবিলেন। আহ্লাদে হাসি তাঁহার আর অধরে ধরে না, কিন্তু মনোগত ভাব গোপন কবিয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আপাততঃ যা দিয়াছ, এতেই ব্যয় সমাধা হবে, কিন্তু সমস্ত স্বস্ত্যয়ন যে ঐ খরচে হবে, তাহা আমার বোধ হয় না।"

স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, "আপনি ঐ টাকায আরম্ভ করুন, এর পর যা লাগবে, তা দেওয়া যাবে।" ঠাকুরমহাশয় কহিলেন, "তা যেন হলো, কিন্তু আজ রাত্রে তোমরা কি প্রকারে কলিকাতায় যাবে, আমি স্থির করতে পারছি না।"

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, "কেন, আর গাড়ী নাই?"

গুরুঠাকুর উত্তর করিলেন, "না।"

স্বর্ণলতার পিতামহী কহিলেন, "তবে একখান নৌকা ভাড়া করিয়া দিন। আমাদের না গেলেই নয়।"

স্বর্ণলতার পিতামহীর আগ্রহাতিশয্য দর্শন করিয়া গুরুদেব গঙ্গাতীরে এক জন লোক পাঠাইয়া দিলেন। একটু পরে সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আজ নৌকা যাবে না।"

স্বর্ণলতা ও তাহার পিতামহী অগত্যা গুরুদেবের আলয়ে সে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে সূর্য না উঠিতে উঠিতে উভয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায়

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, ক্ষণকাল বিলম্বে শশাঙ্কশেখর গাত্রোত্থান করিলেন; এবং শিষ্য বাড়ী আসিয়াছে বলিয়া, কপালময় গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কাটিয়া স্বর্ণলতা ও তদীয় পিতামহীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুঠাকুরকে দর্শন পাইয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার পিতামহী উভয়ে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শশাঙ্কশেখর ''দীর্ঘায়ুরস্তু'' বলিয়া উভয়কেই কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ''স্বর্ণের টিকা হয়েছে?''

স্বর্ণের পিতামহী উত্তর করিলেন, ''আমাদের পরুষানুক্রমে টীকা নাই। স্বর্ণের টীকা হয় নাই।''

গুরুঠাকুর কহিলেন, ''তবে স্বর্ণের কলিকাতায় যাওয়া আমার মতে উচিত বোধ হচ্ছে না।''

স্বর্ণের পিতামহী কহিলেন, ''আপনার যে অভিপ্রায়, আমরা সেই মতেই কার্য করব।''

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, ''তবে স্বর্ণকে আমার বাটীতে রেখে তুমি কলিকাতায় যাও। নচেৎ স্বর্ণেরও নিশ্চয় বসন্ত হবে।

স্বর্ণলতার পিতামহী তাহাতে সম্মত হইলেন। স্বর্ণ কহিলেন, ''আমি কলিকাতায় যাব তাহাতে আমার বসন্ত হয় তাও স্বীকার।''

তাহার পিতামহী কহিলেন, ''স্বর্ণ, তোমার যাওয়া হয না। প্রথমতঃ তোমার টীকা হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ গুরুদেব নিষেধ করছেন। এ অবস্থায় তোমাকে কি কবে কলিকাতায় নিয়ে যাই?''

স্বর্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। গুরুদেব কহিলেন, ''মা তুমি এখানেই থাক। হেম কেমন থাকে, তুমি প্রত্যহই খবর পাবে।''

স্বর্ণলতা অগত্যা গুরুর আলয়ে বাস কবিতে সম্মত হইলেন। শশাঙ্কশেখর স্বর্ণের পিতামহীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় উপনীত হইলেন।

অদ্য তিন দিবস হেমচন্দ্র অজ্ঞান হইয়া আছেন। ডাক্তারসাহেব প্রাতঃকালে নিয়মিতরূপে রোগীকে দেখিতে আসিলেন। হেমের চেহারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে। ডাক্তারসাহেব প্রফুল্লিত হইলেন। ঘড়ি খুলিয়া হাত দেখিয়া কাইলেন, ''আর ভয় নাই, এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।''

শুনিয়া গোপাল যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন। এমন সময় হেমের পিতামহী ও শশাঙ্কশেখর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটী পৌঁছিবামাত্রই তাঁহারা হেমের শয়নাগারে গমন করিলেন।

হেম চক্ষুরুন্মীলন করিয়া গোপালকে দেখিতে না পাইয়া কহিলেন, ''গোপাল?''

তাঁহার পিতামহী কহিলেন, ''এই দাদা, আমি এসেছি, কি চাও?'' এই বলিয়া তিনি শর্য্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

হেম কহিলেন, ''গোপাল কোথায়?''

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি

শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি হেমের পিতামহীকে কলিকাতায় রাখিয়া সেই দিবসই বাটী আসিলেন। স্বর্ণলতা শশাঙ্কশেখরকে জিজ্ঞাসিলেন, ''দাদাকে কেমন দেখে এলেন?'' শশাঙ্ক উত্তর করিলেন,''কোন চিন্তা নাই, তাঁর পীড়া অনেক বিশেষ হয়েছে। সত্বরই আরোগ্য লাভ করবেন।''

শশাঙ্কশেখরের কথা শুনিয়া স্বর্ণলতা অনেক আশ্বস্ত হইলেন ও জিজ্ঞাসিলেন, ''আমি সেখানে কবে যেতে পারব?''

শশাঙ্কশেখর উত্তর করিলেন, ''তিনি ভাল করে আরোগ্য না হলে তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। কি জানি, যদি তোমারও বসন্ত হয়, কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন স্বর্ণ? তোমার কি এখানে অযত্ন হচ্ছে?''

স্বর্ণলতা আগ্রহ সহকারে উত্তর করিলেন, ''না না, আমার কোনই অযত্ন হয় নাই। আমি ভাবছি, দাদার পাছে কোন অযত্ন হচ্ছে। সেইজন্যেই আমি যেতে এত ব্যগ্র হয়েছি।''

শশাঙ্কশেখর বলিলেন, ''সে বিষয়ে কোন চিন্তা করো না মা; সেখানে যে গোপাল নামে ছেলেটি আছে, সে থাকতে তোমার দাদার কোন অযত্ন হবে না। স্বর্ণ, গোপাল তোমার দাদার যেরূপ সেবাশুশ্রূষা করছে, অমন কেউ কারুকে করে না।''

শশাঙ্কের কথা শুনিয়া স্বর্ণের হৃদয়ে অনির্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তিনি আর কিছু কহিলেন না। শশাঙ্কও তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

বহির্দ্বারে গিয়া শশাঙ্ক আপন ভৃত্যকে দিয়া তাঁহার প্রতিবাসী হরিদাস মখোপাধ্যায়কে ডাকাইলেন। হরিদাস আসিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ''আমাকে ডাকলে কেন?''

শশাঙ্ক কহিলেন, ''একটা বড় গোপনীয় কথা আছে।''

হরিদাস। এইখানে বলবে, না অন্যত্রে যেতে হবে?

শশাঙ্ক। চল ঐদিকে গিয়া বলি।

উভয়ে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। সূর্যদেব অস্তাচলে চলিয়া গিয়াছেন। পূর্ণিমার চন্দ্র প্রাচীদেশ হইতে পরম রমণীয় কিরণজাল করিতেছেন। বসন্তের সমীরণহিল্লোলে শরীরে অনির্বচনীয় উৎসাহ অনুভূত হইতেছে। কলকল রবে কর্ণ শীতল করিয়া গঙ্গা সাগরসঙ্গমে যাইতেছেন। নিকটবর্তী উদ্যান হইতে নানাবিধ পুষ্পের সৌরভ আসিয়া দশদিক্ আমোদিত করিতেছে। এই পরম রমণীয় সময়ে কত স্থানে কত লোক ঈশ্বরের করুণায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কবিতেছে। কিন্তু শশাঙ্কশেখর ও হরিদাস সে সময়ে কি পরামর্শ করিতেছেন?

উভয়ে গঙ্গাতীরে গমন করিয়া ঘাসের উপর উপবেশন করিলেন। হরিদাস জিজ্ঞাসিলেন, ''কি কথা বলবে বল। রাত্রি হলো, এর পর সন্ধ্যাহ্নিক করতে হবে।''

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, ‘‘এত ব্যস্ত হলে কেন? এসব কি ব্যস্তের কাজ?’’

হরিদাস। তোমার কাজই কি, তাই টের পেলাম না; তা কেমন করে জানব ব্যস্তের কি সুস্তের?

শশাঙ্ক কহিলেন, ‘‘তবে শুন। আমরা এতকাল যার পরামর্শ করে আসছি, আজ দেবতাই তার আনুকুল্য করেছেন। সেই বর্ধমানের কন্যাটি, যার সহিত তোমার পুত্রের বিবাহ দিবার প্রস্তাব হয়েছিল; সেটি হস্তগত হয়েছে।’’

হরিদাস আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, ‘‘সে কেমন?’’ শশাঙ্ক উত্তর কবিলেন, ‘‘বিপ্রদাস জীবিত থাকতেই এ প্রস্তাব করা হয়, তাহা তুমি তো জানই। বোধ হয় বিপ্রদাসের মতও হয়েছিল। আমার কথা সে কখনও লঙ্ঘন করত না। কিন্তু তার পুত্রের জন্যই কার্যটা হতে পারে নাই। সে বৎসর পূজার আগে আমাকে বলেছিল, ‘‘আপনি যে আজ্ঞা আমাকে করেছেন, আমার তাহাই কর্তব্য, কিন্তু আমার পুত্রটি এখন যোগ্য হয়েছে, একবার তাহার পরামর্শ লওয়া উচিত।’’

হরিদাস কহিলেন, ‘‘ওসব কথা বহুকাল শুনেছি, এখন কিছু টাটকা থাকে, তবে বল।’’

শশাঙ্ক। অত ব্যস্ত হইও না। এসব ব্যস্তের কাজ নয়। আমি যা বলি, মনোযোগপূর্বক শোন। সেই পূজার পর যখন আমি গেলাম, তখন বিপ্রদাস কহিল, ‘‘মহাশয়, আমার কোন অপরাধ নাই। আমি নিজে বৃদ্ধ লোক; এখন উপযুক্ত পুত্রের কথা না-শোনা ভাল নয়। হেমের কোনমতেই ইচ্ছা নয় যে, আপনার প্রস্তাবিত কর্ম করা হয়।’’

হরিদাস। তারপর।

শশাঙ্ক। তারপর তো তুমি জানই। কত স্থান হতে সম্বন্ধ এল, কত স্থান হতে ফিরে গেল। বিপ্রদাসের ইচ্ছা এই, পাত্রটির আর কোন গুণ থাকে না-থাকে, ঐশ্বর্য থাকলেই হলো। আর ইংরাজিতে দু-চারটা কথা বলতে পারলেই হলো। আজকাল যে সকলেরই দালান গোত্র ইংরাজি গাঁই চাই।

হরিদাস। আমার ছেলে ইংরাজিও জানে। আমার বাড়ীতে দালানও আছে, তবে আমার ছেলের সহিত হলো না কেন?

শশাঙ্ক। হাঁ, যা বলছ যথার্থ। কিন্তু আমি পূর্বেই তো বলেছি, এতে বিপ্রদাসের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিপ্রদাস এমনি পুত্রবৎসল যে, সেই পুত্রটির কথাতেই ভুলে গেল। তাহার মত এই, স্বর্ণের টাকার ভাবনা নাই। বাপের মৃত্যুর পর যে ধনের উত্তরাধিকারিণী হবে, তাতেই যথেষ্ট। কিন্তু পাত্রটির লেখাপড়া ভালমতে জানা চাই ও দেখতে শুনতে ভাল হওয়া চাই।

হরিদাস। তাতেও আমার ছেলে ফেলা যায় না। ইংরাজিতে বি. এ. পাস করেচে, দেখতে শুনতেও দশটির মধ্যে একটি।

শশাঙ্ক একটু হাসিয়া কহিলেন, ‘‘সে তোমার চক্ষে। যদি সকলেই তোমার চোখ দিয়ে দেখত, তা হলে আর তোমার ছেলের ভাবনা কি?’’

হরিদাস কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া কহিলেন, ''কেন, কেন? আমার চক্ষে কেন?''

শশাঙ্ক কহিলেন, ''চোটো না। চট্‌বার প্রয়োজন নাই, আমরা যে কাজ হাতে নিয়ে বসেছি, ব্যস্তসমস্ত কিংবা চটাচটি করলে এ সমাধা হবার নয়। তোমার ছেলে মন্দ, তা আমি বলছি না। সে যে দশটির মধ্যে একটি তাও মিথ্যা নয়। পৃথিবীতে কত কুরূপ আছে, তা বলা যায় না। তাদের মধ্যে ছেড়ে দিলে, দশটি কেন, হয়ত ৫০টির মধ্যে তোমার ছেলে একটি হতে পারে।'' এইসময় আবার হরিদাসের চক্ষু গরম দেখিয়া শশাঙ্কশেখর কহিলেন, ''চোটো না। এ চট্‌বার কাজ নয়। আর যা বলি, মনোযোগ করে শোন।''

হরিদাস কহিলেন, ''আচ্ছা, বল বল।''

শশাঙ্কশেখর পুনর্বার আরম্ভ করিলেন, ''হেমের মত ছিল, যেটির সঙ্গে বিবাহ দেয়, সেটির কাছে তোমার পুত্র বানরটি।''

হরিদাস রাগত হইয়া কহিলেন, ''মহাশয়, বিবেচনা করে কথা কবেন।''

শশাঙ্কশেখর কহিলেন, ''আমি অবিবেচনার কোন কথা বলি নাই। তুই সেই ছেলেটিকে দেখ নাই, সেইজন্য এমন কথা বলছ। আমি তাকে দেখেছি। ছেলেটি যেন কার্তিকবিশেষ। লেখাপড়াতেও বিলক্ষণ চতুর। ছেলেটির সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহ দেবার জন্য হেমের ইচ্ছা ছিল। বুঝতে পেরেছ তো? ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এক্ষণে নাই বল্লেই হয়; কারণ যার ইচ্ছা ছিল, সে-ই এক্ষণে বসন্তরোগে শয্যাগত। এখন তখন। যদি সে পাত্রটির ঐশ্বর্য থাকিত, তা হলে তো এতদিন বিবাহ হয়েই যেত। কিন্তু তা যেখানে হয় নাই, সেখানে আর না হবারই সম্ভব।'' হরিদাস আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, ''কিসে টের পেলে না-হবার সম্ভব আছে।''

শশাঙ্ক কহিলেন, ''এইজন্য বলি, যদি হেমের মৃত্যু হয়, তা হলে তার পিতামহী এ কর্ম করবে না। তার ইচ্ছা টাকা। যে বরের টাকা বেশী, তাহারই সহিত বিবাহ দেবে। আর বোধ হয় আমি একটা অনুরোধ করলেও রাখতে পারে। এখন তোমার ভরসা হেমের মৃত্যু; যদি হেম মরে, তা হলে নিশ্চয়ই আমি তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়ায়ে দিতে পারব।''

হরিদাস কহিলেন, ''কে কত দিন বাঁচে, তার তো স্থিরতা নাই। কত লোক অন্তর্জল হতে ফিরে আসে। আমাদের কি এমন অদৃষ্ট হবে যে, যে—''

গুরুঠাকুর মহাশয় শিষ্যদিগের বড় হিতৈষী কিনা, তিনি অবলীলাক্রমে হেমের মৃত্যুর কামনা করিলেন। হরিদাসের মনে মনে যে ভাব, তাহা তো জানাই গিয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রকাশে তিনি অমন দুরূহ কথাটি কহিতে পারিলেন না।

শশাঙ্কশেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, ''যা বল্লাম, তা যদি ঘটে, তবে তো কোন কথাই নাই; কিন্তু তা না ঘট্‌লেও আর এক উপায় আছে; তাতে তুমি সম্মত আছ কি না?''

হরিদাস কহিলেন, ''সকলে প্রাণে প্রাণে বজায় থেকে যদি কোন উপায়ে শুভ কর্ম হতে পারে, আমার মতে তাই করা কর্তব্য। তাতে কিঞ্চিৎ কষ্ট, কি ব্যায় বেশী হলেও আমি কাতর হব না।''

শশাঙ্ক কহিলেন, ''হেমের পীড়া এক্ষণে সাংঘাতিক বলতে হবে। তিন-চারি দিবসের মধ্যে, কি হবে টের পাওয়া যাবে। যদি অধোগতি দেখা যায়, তবে তো কথাই নাই। সেইখানে বসে দুই চারি বিন্দু চোখের জল ফেলতে পারলেই কাজ হাঁসিল হলো; কিন্তু যদি ক্রমশঃ আরোগ্য দেখা যায়, তা হলে আমার মতে গোপনে বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য।''

হরিদাস কহিলেন, ''গোপনে বিবাহ কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে? বড়মানুষের মেয়ে, একে আনা আর বামী শামীকে আনা সমান নয় তো? সে দিবস আমার এক প্রজার বিবাহ দিলাম। কন্যাটি তার বাপের সহিত শুয়ে ছিল। নিতান্ত শৈশব, পাঁচ বৎসর বয়স। অনায়াসে দুয়ার ভেঙ্গে তার বাপকে তিন চারি জনে ধরে রইল, মেয়েটিকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও গোটা দুই পুতুল দিয়ে কাজ সমাধা করে দেওয়া গেল। কিন্তু এ স্থলে তো আর সেটি খাটবে না। পাত্রী কি প্রকারে হস্তগত করবে?''

শশাঙ্ক কহিলেন, ''পাত্রী হস্তগত করা আমার ভার রইল। টাকা হলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়। তুমি খরচ করতে যদি কুণ্ঠিত হও, সে দোষ তোমার। আমার হবে না। তোমার টাকা চাই আর সাহস চাই। আমার কৌশল চাই।''

হরিদাস। তা তো আমি বুঝি, কিন্তু তুমি কি কৌশলে মেয়েটিকে আনবে বল দেখি? তারপর অন্য সব কথা।

শশাঙ্ক। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হলো না? আমি বল্লাম, মেয়ে আনা আমার ভার রইল; তুমি এখন টাকার কথা বল।

হরিদাস। আগে আমি কন্যাটি দেখতে চাই, কিংবা কি উপায়ে আনবে তা শুনতে চাই, পরে যদি সঙ্গত বোধ হয়, তবে আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হব।

হরিদাস শশাঙ্কের প্রতিবাসী বলিয়া তাঁহার চরিত্র বুঝিতেন। প্রবঞ্চনা করিয়া লোকের নিকট হইতে টাকা লওয়া শশাঙ্কের নিত্যকর্ম। এইজন্যই তিনি এত সতর্কতাপূর্বক কথা কহিতেছিলেন।

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, ''আমি বলছি, তোমার মেয়ের জন্যে ভাবনা নেই, তুমি টাকার কথা বল. তবু তুমি শুনবে না। তুমি টাকার কথা কইলেই তো আর আমি পেলাম না। আগে বন্দোবস্ত কর। তুমি কন্যা দেখে আমাকে টাকা দিও।''

হরিদাস কহিলেন, ''হাঁ এ কথা সঙ্গত বটে। কিন্তু টাকার কথা তুমিই বল। তোমার যা বিবেচনা হয়, আমি তাই দেব।''

শশাঙ্ক কহিলেন, ''এ তো বাজারের দর নয়। এর তো মূল্য নাই। আমি যৎকিঞ্চিৎ পেলেই সাহায্য করব।''

হরিদাস শশাঙ্কের কথায় ভুলিবার লোক নন। যদি তাঁহার চরিত্র না জানিতেন, তাহা হইলে এমন কথা শুনিলে ভাবিতেন যে, যথার্থ অল্প টাকায় শশাঙ্ক সম্মত হইবেন। কিন্তু গুরুদেবের চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তিনি ইহাতে হর্ষিত হইলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন, ''তা বটেই তো।''

শশাঙ্ক। তা বটেই তো বলে চুপ করলে? কাজের কথা কও।

হরিদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, ''শুভকর্ম সমাধা হলে আপনাকে এক হাজার টাকা দেব।'' এই বলিয়া শশাঙ্কের মুখের দিকে চাহিলেন।

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিলেন, ''ভায়া, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছ না কি?''

হরিদাস কহিলেন, ''কেন কেন?''

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, ''বলি উইলখানায় কত টাকা আছে, তা জানা আছে তো?''

হরিদাস। উইলের টাকা আর জলের মাছ সমান। হাতে না আসলে বিশ্বাস নাই। সেই টাকা পাব বলেই কি আমি এ বিবাহে এত যত্নবান হয়েছি মনে করলে?

শশাঙ্ক। না, তা মনে করব কেন, তা মনে করব কেন! কন্যাটির বিবাহ হচ্ছে না, কেউ গ্রহণ করতে চায় না, নানান দোষ আছে; তাই তুমি অনুগ্রহ করে তোমার ছেলের সহিত বিবাহ দিতে চাচ্ছ।

চাতুরিতে হরিদাস কম নন; শশাঙ্ক তো সে বিদ্যায় বিশাদর। ''শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।''

হবিদাস কহিলেন, ''না, তা নয়, তা নয়।''

শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, ''তাই বটে। মেয়েটির বিবাহ হচ্ছে না, তুমি কৃপা করে ক্ষতি স্বীকার করে আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিবে। আর আমি কন্যাটির পক্ষে একটু উপকার করব বলে আমাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকার করছ। তুমি একজন পরম দয়াবান দেশহিতৈষী মহাশয় ব্যক্তি কি না?''

হরিদাস বলিলেন, ''আমি ঠাট্টা করেছিলাম।''

শশাঙ্ক। তবে এখন ঠাট্টা ছেড়ে প্রকৃত কথা কও।

হরিদাস। আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব।

শশাঙ্ক। এবারও ঠাট্টা হলো। এবার ঠাট্টা ছাড় না?

হরিদাস বলিলেন, ''না, এবার ঠাট্টা করি নাই। মনে কর, পনের হাজার টাকার অধিক আর উইলে নাই। কিন্তু প্রথমতঃ এই চুরি করে বিবাহ দিয়ে তা নিয়ে মোকর্দমা করতে হবে; পরে যদি উইলে কোন গোলমাল হয়—যদি কেন? হবেই নিশ্চয়। হেম কিছু সহজে পনের হাজার টাকা ছেড়ে দেবে না। তা নিয়ে কত মামলামোকর্দমা করতে হবে; এ ছাড়া হাজার অন্য খরচ আছে। মনে কর দেখি, সে সব বাদ দিলে আমার কি কিছু থাকবে? অগ্রপশ্চাৎ দেখতে হয়।''

শশাঙ্ক। তোমার মোকর্দমা করতে হবে, আর আমি কি ফাঁকে যাব নাকি? সে হেমও ইংরাজিম্যান। সে গুরুপরুত কেয়ার করে না। তাদের সঙ্গে দেখা করতে এখন

ভয় হয়, পাছে প্রণাম না করে। সে কি আমাকে সহজে ছাড়বে? তবে যদি পেটে খাই তো পিঠে সবে। আমি এক কথা বলে যাই, যদি অর্ধেক দিতে পার, তবে এর মধ্যে আছি, নচেৎ না।

হবিদাস। তা পারি নে।

শশাঙ্ক। তবে আর ও বিষয়ে কথা বলে ফল কি? চল যাই।—এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; হরিদাস তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলেন। "আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে বিবেচনা কবে কাল বলব। এখন তুমি মেয়ে কেমন করে আনবে বল দেখি?"

শশাঙ্ক। মেয়ে আমার ঘবেই আছে।

হরিদাস। না?

শশাঙ্ক। যথার্থ, আমি এই গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবেলা কি মিথ্যা বলছি?

হবিদাস। যাবার সময় দেখাতে পারবে?

শশাঙ্ক। হাঁ, পারব।

এই কথার পর শশাঙ্ক ও হরিদাস উভয়ে গঙ্গাতীরে নামিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে গেলেন।

যাহার যে ব্যবসায়, তাহার তাহাতে ভক্তি হয় না। গয়লারা দুগ্ধ খায় না, ময়বারা সন্দেশ খায় না, চিকিৎসকেরা ঔষধ খায় না, শুঁড়ীবা মদ খায় না, আর যদি লোকজন সম্মুখে না থাকে, তবে ভট্টার্যরা সন্ধ্যাহ্নিক কবেন না।

শশাঙ্ক গঙ্গাতীবে দু-এক বার জল নাড়িয়া কহিলেন, "হবিদাস, চল যাই। সংক্ষেপে সেরে নাও।"

পূজা করা হরিদাসের ব্যবসায় নহে, সুতরাং তিনি প্রতি দিন যেরূপ কবিযা জপ করেন, অদ্যও সেইরূপ করিয়া, উভয়ে একত্র হইযা চলিয়া গেলেন।

রাস্তায় শশাঙ্কশেখবেব বাটী গিয়া হবিদাস স্বর্ণলতাকে চাক্ষুষ দেখিযা প্রত্যয কবিলেন, "কন্যা যথার্থই হস্তগত হইযাছে।"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"আনায় মাঝারে"

হেমচন্দ্র এক্ষণে আরোগ্য হইতে লাগিলেন। আজ যেরূপ থাকেন, কাল তদপেক্ষা ভাল হন। কিন্তু এ পর্যন্ত বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিবে আসিতে পাবে নাই। গোপাল পূর্ববৎ সমস্ত দিন রাত্রি হেমের শয্যার নিকট বসিযা থাকেন। হেম আর কাহাবও নিকট কিছু চান না। গোপাল তাঁহাকে খাওয়াইবে, তাঁহার হাত ধুইয়া দিবে, তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া বসাইবে, তাঁহার সহিত গল্প করিবে। গোপাল হেমের জীবনসর্বস্ব।

শশাঙ্কশেখর প্রত্যহ রেলগাড়ীতে কলিকাতায় যান, আবার সন্ধ্যার সময় বাটী আইসেন। হেমের পিতামহীব কৃতজ্ঞতা আব বাখিবার স্থান নাই, কিন্তু শশাঙ্ক কি অভিপ্রায়ে প্রত্যহ আইসেন যান, তাহা টের পান না!

স্বর্ণলতা শশাঙ্কশেখরের নিকট কতই কৃতজ্ঞ হইতেছেন। অন্য লোককে বিশ্বাস না করিয়া প্রত্যহ আপনি গিয়া হেমচন্দ্রের খবর আনেন। ইহা অপেক্ষা দয়ার কার্য আর কি হইতে পারে? শশাঙ্কের আসিবার সময় হইলে স্বর্ণলতা বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকেন। শশাঙ্কশেখরকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। এক দিবস স্বর্ণলতা কহিলেন, ''ঠাকুর মহাশয়, আপনার ঋণ আমি এ জন্মে দূরে থাকুক, জন্ম-জন্মান্তরেও পরিশোধ করতে পারব না। আপনি প্রত্যহ এত কষ্ট স্বীকার করে খবর আনেন বলেই বোধ হয় আমি এত দিন এখানে। তা না হলে এতদিন লুকিয়ে কলিকাতায় যেতাম।'' শশাঙ্কের দয়ার কথা কহিতে কহিতে স্বর্ণলতার চক্ষু হইতে দু-এক বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার প্রতি কথায় যেন শশাঙ্কের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। দস্যুরা কোন বাটী আক্রমণ করিবার সময় বালকদিগকে কিছু বলে না। মৎস্য ধরিতে বসিলে লোকে ছোটগুলিকে পুনরায় জলে ছাড়িয়া দেয়। শশাঙ্ক অতিশয় নিষ্ঠুর হইলেও সরল-হৃদয়া স্বর্ণলতার কথায় তাহার অন্তঃকরণ দমিয়া গেল। একবার আত্মগ্লানিও উপস্থিত হইল। স্বর্ণের চক্ষের জল যেন উত্তপ্ত দ্রবীভূত লৌহবিন্দুর ন্যায় শশাঙ্কের হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল।

কিন্তু মরুভূমিতে সিঞ্চিত বারি কতক্ষণ থাকে? স্বর্ণলতা তথা হইতে চলিয়া গেলেই আবার যে শশাঙ্ক, সেই শশাঙ্কই হইলেন। রজতের মোহিনী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তিনি হরিদাসের বাটী গমন করিলেন। দেখিলেন, হরিদাস বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। শশাঙ্কশেখর কহিলেন, ''কি মহাশয়, বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করেছেন না কি?''

হরিদাস কহিলেন, ''আসুন; আমি জমাখরচটা লিখে রাখছিলাম।''

শশাঙ্ক কহিলেন, ''শুভস্য শীঘ্রং। এদিকে আর সময় নাই। আর এক সপ্তাহ দেরি করলে সব অভিসন্ধিই মিথ্যা হবে।''

হরিদাস কহিলেন, ''আমার কোন দেরি নাই। কিন্তু তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ দেখে আমি অগ্রসর হতে পারছি না। উইলের অর্ধেক টাকা আমার দেবার শক্তি নাই।''

শশাঙ্ক দেখিলেন, দেরি করিলে কিছুই পাওয়া যাইবে না। অতএব যা হাতে আইসে, সেই ভাল। এই ভাবিয়া কহিলেন, ''তবে তুমি কি দিতে ইচ্ছা কর?''

হরিদাস। আমি ছয় হাজার দিতে চাই।

শশাঙ্ক তাহাতেই সম্মত হইলেন; কহিলেন ''তবে পাত্রের গায়ে হলুদ দাও, পরশ্ব দিবস শুভকর্ম সম্পন্ন করা যাইবেক।''

যেমন বিহঙ্গম ব্যাধবিন্যস্ত জালের মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে নৃত্য করিয়া বেড়ায়, স্বর্ণলতা তেমনি প্রফুল্লচিত্তে শশাঙ্কের বাটীতে বাস করেন। হেম প্রত্যহ আরোগ্য হইতেছেন; তাঁহার সেবাশুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইতেছে না, স্বর্ণের আর ভাবনা কি? প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গুরুকন্যা ও প্রতিবাসী সমবয়স্ক বালিকাদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে আরম্ভ করেন। স্নানাহারের পর পানভোজন করিয়া রাত্রে প্রফুল্লচিত্তে নিদ্রা যান। তিনি যে ''আনায় মাঝারে'' নিপতিত হইয়াছেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না।

সন্ধ্যা হইল। শশাঙ্ক গঙ্গাতীরে নিত্যসায়ংক্রিয়া সমাধা করিতে গেলেন। শশাঙ্কেব একটি ছোট ছেলে অত্যন্ত রোদন করিতেছে। স্বর্ণলতা কাছে না বসিলে সে বিছানায় শুইবে না। শশাঙ্কের স্ত্রী বিস্তর চেষ্টা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইতে না পাবিয়া স্বর্ণকে ডাকিলেন। স্বর্ণ দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''মা, আমাকে ডাকলে কেন!'' শশাঙ্কের স্ত্রী গুরুপত্নী; স্বর্ণ তাহাকে মাতৃসম্বোধন করেন।

শশাঙ্কের স্ত্রী কহিলেন, ''মা, এস দেখি একবার; এ ছেলেটার কাছে বসো, একে তো বিছানায় শোয়াতে পারি না।''

স্বর্ণলতা নিকটে গেলে ছেলেটি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া শয়ন কবিল। স্বর্ণলতাও সে বিছানায় শয়ন করিলেন। ঝিরঝির করিয়া বসন্তের বাতাস তাঁহার গায়ে লাগিতে লাগিল। স্বর্ণলতা আস্তে আস্তে নিদ্রিত হইলেন।

শশাঙ্ক নিয়মিত সময়ে বাটী আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিলেন। উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলে শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, ''খোকার কাছে শুয়ে কে?''

শশাঙ্কের স্ত্রী কহিলেন, ''স্বর্ণ।''

শশাঙ্ক। জেগে আছে, না ঘুমিয়েছে?

স্বর্ণ, শশাঙ্ক বাটী আসিবামাত্র জাগ্রত হইযাছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সহিত ফিসফিস করিয়া কথা কহিতেছেন শুনিয়া কপট-নিদ্রিত হইলেন। শশাঙ্কেব স্ত্রী স্বর্ণের কাছে আসিয়া তাঁহাব মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ''ঘুমিয়েছে।''

শশাঙ্ক। (অস্ফুট স্বরে) তবে তুমি একবাব আস্তে আস্তে এইদিকে এস।

শশাঙ্কের স্ত্রী অগ্রসর হইলেন। শশাঙ্ক মৃদুস্ববে দুইটা চাবি দেখাইয়া কহিলেন, ''এই দুইটা চাবি দেখছ, একটা সদবে, একটা খিডকির। আমি দু-দিকেবই দ্বার বন্ধ করেছি; দেখো, যেন বাড়ী হতে অন্য কোনরূপে বাহিব হতে না পাবে।''

শশাঙ্কেব স্ত্রী কহিলেন, ''সেকি? বাড়ী থেকে বেবোবে কেন?''

শশাঙ্ক কহিলেন, ''তোমার সে কথায় কাজ কি?''

শশাঙ্কের স্ত্রী। আমার কাজ আছে। আমাকে বলতে হবে, না বল্লে আমি এখনই একথা প্রকাশ করে দেব।

শশাঙ্ক সমুদয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাঁহার স্ত্রী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এবং স্বর্ণলতার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। শশাঙ্কের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে শশাঙ্ক কহিলেন, ''তুমি তো আমাকে জানই; যদি তোমা কর্তৃক আমার মনস্কামনা বিফল হয়, তা হলে তোমাকে———।'' এতদূর পর্যন্ত স্পষ্ট বলিয়া, পরে অস্ফুট স্বরে দুই-তিনটি কথা কহিয়া শশাঙ্ক বর্হিবাটিতে গমন করিলেন।

স্বর্ণের যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু জাগ্রত থাকিয়া কি প্রকারে নিদ্রাভঙ্গের ভান কবিবেন, স্থির করিতে না পাবিয়া, ক্রোড়স্থ শিশুটির গায়ে একটি টিপ দিলেন। ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। স্বর্ণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কাতর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, ''মা, তুমি

ঘুমিয়েছিলে?'' স্বর্ণ ''হাঁ'' বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। খিড়কির দ্বারে গিয়া দেখেন, দ্বার রুদ্ধ। দৌড়িয়া সদর দরজায় গেলেন। সদব দবজা বাহির দিক হইতে বন্ধ দেখিলেন। স্বর্ণলতা যেন পিঞ্জরে বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় হইলেন। এতদিন ঐ বাড়ীর মধ্যে ছিলেন, তাহাতে কোন কষ্ট বোধ হয নাই। কিন্তু আজি তথাকাব বায়ু তাঁহাব নিকট বিষময় বোধ হইতে লাগিল, সে বায়ু সেবন করিয়া জীবন ধারণ করা ক্লেশকর হইয়া উঠিল। দৌড়িয়া যে ঘরে ছিলেন, পুনরায় সেই ঘবে আসিলেন। শশাঙ্কের স্ত্রী স্বর্ণলতাকে দেখিয়া ডরাইয়া উঠিল। তাঁহার মূর্তি এতই পরিবর্তন হইযাছে। স্বর্ণলতা অবশেন্দ্রিয়ের মতন হইয়া ঘরের মেজেয় বসিলেন। শশাঙ্কেব স্ত্রী দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ''কি মা, কি হয়েছে?''

স্বর্ণ আর মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। রোদন কবিতে করিতে কহিলেন, ''আমি সকলি শুনেছি। আমারে তোমরা মেরে ফ্যালো। বিষ খাওযায়ে দাও।''

স্বর্ণের কথা শুনিয়া শশাঙ্কের স্ত্রীর অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া গেল। ফলতঃ তিনি তাঁহার স্বামীর ন্যায় নির্দয় ছিলেন না। শয্যা হইতে উঠিয়া স্বর্ণের নিকট উপবেশনপূর্বক স্বর্ণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ''তুমি কেঁদ না মা, আমি তোমার উদ্ধাবেব উপায় কবে দেব।''

শশাঙ্কের স্ত্রীর কথা শুনিয়া স্বর্ণ অমনি তাঁহার পা ধবিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি সাদরে স্বর্ণকে ভূমি হইতে তুলিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। কহিলেন, ''মা, তুমি তো লেখাপড়া জান?''

স্বর্ণ কহিলেন, ''একটু একটু জানি।''

''পত্র লিখতে পাববে তো?''

''পারব; কিন্তু কাকে লিখব? দাদাব বিছানা হতে উঠিবার জো নাই। তাঁহাকে লেখাও যে, না-লেখাও সেই।''

''আর কোন লোক নেই? যাকে লিখলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে।''

এই কথা শুনিয়া স্বর্ণের মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। মাটির দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ''আর কাকেই বা লিখব।''

''এই যে শুনেছি, তোমাদের বাসায় আর একটি কে থাকে? কি না তার নামটা? গোপাল। হাঁ হাঁ, গোপালকে লেখ না কেন?''

স্বর্ণের মুখ আবও লাল হইল। তিনি কহিলেন, ''না, দাদাকেই লিখি, তা হলে তিনি দেখতে পাবেন।''

''তোমার দাদাকে লেখায় লাভ কি? তিনি তো শয্যাগত।''

স্বর্ণলতা মাটিব দিকে মুখ করিয়া কহিলেন, ''দাদাকে লিখলে গোপাল দাদা দেখতে পাবেন।''

শশাঙ্কের স্ত্রী কালি কলম কাগজ আনিয়া দিলেন। স্বর্ণলতা চিঠি লিখিলেন। পরদিবস প্রাতে যখন শশাঙ্কের দাসী বাজার করিতে যায়, চিঠিখানি গোপনে লইয়া গিয়া ডাকঘরে দিয়া আসিল।

ঊনচত্বরিংশ পরিচ্ছেদ

গোপালের কারাবাস

পোস্ট-অফিসের সনাতন নিয়মানুসারে অগ্রে সাহেবদিগের চিঠি বিলি হয়, তৎপরে যদি সময় থাকে এবং যদি মহানুভব হবকরা মহোদয় ক্লান্ত না হন, তাহা হইলে অন্যান্য সকলের চিঠি বিলি হইবার সম্ভবনা। কিন্তু যদি হরকরা মহাশয় ক্লান্ত হন, বিশেষ যদি দূরের কোন স্থানের একখানি চিঠির অতিরিক্ত না থাকে, তবে সুবিবেচক হরকরা সে চিঠিখানি ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দেন। ক্রমে সেই স্থানের দশ পাঁচখানি একত্র হইলে এক দিবস অপরাহ্নে গজেন্দ্রগমনে সেগুলিকে বিলি করিতে যান। স্বর্ণলতা যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, সাধারণ নিমানুসাবে সেখানি পরদিবস প্রাতেই হেমের বাসায় পৌছান উচিত ছিল; কিন্তু উল্লিখিত সনাতন নিয়মেব কোন এক ''ধারার মর্মে'' চিঠিখানি দেরি করিয়া তিনটার সময দর্শন দিল। চিঠিখানিব শিবোনামায হেমের নাম। গোপাল ইতিপূর্বে স্বর্ণলতার হস্তাক্ষর দেখেন নাই। বাটী হইতে যে সমস্ত চিঠিপত্র আসিত, তাহা বাটীর গোমস্তাই লিখিত। সুতরাং এখানি বাটীর চিঠি নয় ভাবিযা তিনি খুলিলেন না। হেম নিদ্রিত আছেন, তাঁহাকেও জাগাইলেন না।

একটু পরে হেমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। গোপাল চিঠিখানি হেমের হস্তে দিলেন। শিরোনামা দেখিয়া হেম কহিলেন, ''স্বর্ণের চিঠি, গোপাল।'' গোপাল কম্পিতকবে চিঠিখানি গ্রহণ কবিযা মনে মনে পাঠ করিলেন। কিন্তু কি পড়িলেন, হেমকে কহিলেন না। হেম জিজ্ঞাসিলেন, ''কি লিখেছে?''

গোপাল তাচ্ছিল্য করিয়া চিঠিখানি খাটের নীচে ফেলিযা দিযা কহিলেন, ''আব কি লিখবে, তুমি কেমন আছ তাই জিজ্ঞাসা কবে পাঠায়েছে।''

হেম সন্তুষ্ট হইয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইলেন, কিন্তু তখন যদি গোপালের মুখপানে নিবীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখ জবাফুলের ন্যায় লাল ও কপালে ঘর্ম দেখিতে পাইতেন। ''আমি আসি'' বলিয়া গোপাল চিঠিখান কুড়াইয়া লইয়া নীচে হেমের পিতামহীর নিকট আসিলেন এবং শ্যামাকে হেমের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পরে চিঠিখানি হেমের পিতামহীকে পড়িয়া শুনাইলেন। হেমের পিতামহী শুনিয়া রাগে কম্পিতকলেবরা হইয়া গুরুদেবকে গালি দিতে লাগিলেন।

গোপাল কহিলেন, ''আপনি অত গোলমাল কববেন না। দাদা শুনলে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন। আমি চল্লাম, চারটা বেজেছে, ছটার সময় বিবাহ। এখনি না গেলে গাড়ী পাব না।'' এই বলিয়া একখানি চাদব স্কন্ধে ফেলিযা ও একগাছি ছড়ি লইযা

হেমের পিতামহীকে পুনবায় কহিলেন, "আপনি এ কথা কারুকেও কইবেন না। আপনি এইখানেই থাকুন, নচেৎ উপরে গেলে প্রকাশ কবে ফেলবেন। দাদা আমাব কথা জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, আমার কোন নিজেব বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ ভবানীপুরে চল্লাম। হয়ত আসতে পারব না।" এই বলিয়া বাহিব হইয়া গেলেন, একটু পবে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "আমাকে কিছু খরচ দিন। শীঘ্র, দেরি না হয়।"

পিতামহী বাক্স খুলিয়া একখানি নোট দিলেন। গোপাল নোটখানি পকেটে রাখিযা দৌড়িয়া ঘরের বাহির হইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে রাস্তায় বাহির হইযা দেখিলেন, একখানা খালি গাড়ি যাইতেছে। গাড়োয়ানকে কহিলেন, "আমাকে গাড়ী ছাড়বার আগে যদি হাবড়া-ঘাটে পৌঁছিয়ে দিতে পার, তবে তোমাকে ভাল বকশিশ দেব।"

গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল। গোপাল অবিলম্বে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কবিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিবামাত্রই গাড়ী প্রবল বেগে চলিল। দেখিতে দেখিতে হাবড়া-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপাল হাবড়া-ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলেন, স্টীমার ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে। পকেট হইতে নোটখানি বাহির কবিয়া দেখেন কুড়ি টাকাব। গাড়োয়ানকে কহিলেন, "তোমার কাছে টাকা আছে?" সে কহিল, "না"।

নিকটে একজন ভাগে ভাগে পয়সা বাখিয়া বিক্রয় করিতেছে। গোপাল নোট-খানি তাহাকে দিয়া কহিলেন, "আমাকে পনের টাকা আর গাড়োয়ানকে পাঁচ টাকা দাও।" টাকাগুলি লইয়াই দৌড়িয়া ঘাটে গেলেন। অমনি স্টীমার "হুস হুস" করিয়া যেন তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

গোপাল নিরুপায় ভাবিয়া একখানি নৌকায় উঠিলেন। মাঝিকে কহিলেন, "গাড়ী ছাড়বার পূর্বে যদি আমাকে পার কবে দিতে পার, তাহলে তোমাকে এক টাকা বকশিশ দেব।" এই বলিয়া টাকাটি ফেলিয়া দিলেন।

মাঝি কহিল, "হয় কর্তা, তা পারমু। আপনি বৈসেন।" এই বলিয়া টাকাটি কুড়াইয়া লইয়া নৌকা খুলিয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িবার পূর্বক্ষণ, বংশীধ্বনিসদৃশ হইতেছে, এমন সময় নৌকা কূলে লাগিল। গোপাল তদ্দণ্ডে লাফ দিয়া তীবে উঠিয়া যাইবেন, কিন্তু মাঝিরা আসিয়া ভাড়া চাহিল। গোপাল কহিলেন, "একেবার দিয়েছি তো?"

মাঝি কহিল, "হয় কর্‌তা, ও তো বক্‌শিশ দিছেন। এখন ভাড়া দ্যান্‌ না।"

গোপাল মাঝির কথা শুনিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। গাজি বদরের চর গোপালের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল।

গোপাল পকেট হইতে একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া চলিলেন। তিনিও স্টেশনে পৌঁছিলেন, গাড়ীও ছাড়িল। গোপাল দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া লাফ দিয়া গাড়ীর চবণাধারে চড়িলেন এবং পরক্ষণেই দুয়ার খুলিয়া গাড়ীব মধ্যে প্রবেশ করিলেন। টিকিট লওয়া হইল না।

গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গোপালের মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং সর্বাঙ্গ শরীর অবশ হইয়া আসিল। হেমের পীড়া হওয়া অবধি তাঁহার সুচারুপে আহার নিদ্রা হয় নাই। তদ্ব্যতীত রেলওয়ে আসিতে যে কষ্ট হইয়াছিল, এই সমস্ত কারণে গোপাল মূর্ছিত হইবার উপক্রম দেখিয়া গাড়ীতে শয়ন করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে সমীরণ সঞ্চালনে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। গোপাল নিদ্রিত হইলেন।

কোথায় বা শ্রীরামপুর, কোথায় বা স্বর্ণলতা! গোপাল নিদ্রা যাইতেছেন। এমন গাঢ় নিদ্রা গোপালের কখনও হয় নাই। কত স্থানে গাড়ী থামিল, কত নূতন লোক আসিল, কত পুরাতন লোক চলিয়া গেল, গোপালের নিদ্রভঙ্গ হইল না।

রাত্রি নয়টার সময় গাড়ী গিয়া বর্ধমানে উপস্থিত হইল। জনৈক রেলওয়ের কর্মচারী এক এক করিয়া গাড়ী খুলিয়া টিকিট লইতেছে। লোকজন চতুর্দিকে গোলমাল করিতেছে। তথাপি গোপালের ঘুম ভাঙ্গে না। পরে যে গাড়ীতে তিনি ছিলেন, রেলওয়ে কর্মচারী তাহার দ্বারে দাঁড়াইয়া লণ্ঠন দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে আলোক নিক্ষেপ পরিল। গাড়ীতে এক মাত্র গোপাল। রেলওয়ে কর্মচারী ''বাবু'' ''বাবু'' বলিয়া দুইচারি বার ডাকায় গোপাল উঠিলেন। ''এই শ্রীরামপুর?''

কর্মচারী কহিল, ''তুমি স্বপ্ন দেখছ নাকি? এ বর্ধমান।''

কর্মচারীর কথা শুনিয়া গোপালের মাথা ঘুরিয়া গেল; মুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ড দেখিলেন। যেমন বসিয়া ছিলেন, অমনি বসিয়া রহিলেন। উঠিবার শক্তি রহিল না।

কর্মচারী কহিল, ''এখন এস, টিকিট দাও।''

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, ''আমার কাছে টিকিট নাই। দাম লও।''

কর্মচারী কহিল, ''টিকিট নাই অনেকক্ষণ টের পেয়েছি; এখন চল স্টেশনে সাহেবের কাছে চল।'' এই বলিয়া তাহার হস্তধারণপূর্বক স্টেশনে লইয়া চলিল।

কিন্তু সাহেব তৎকালে তথায় উপস্থিত না থাকায় বড়বাবু গোপালকে সে রাত্রি গারদে রাখিবার জন্য হুকুম দিলেন।

সে রাত্রি গোপালের কষ্ট অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু বর্ণনাতীত! প্রথমতঃ ভাবিলেন, 'স্বর্ণলতা হইতে জন্মের মতন বঞ্চিত হইলাম'। গোপাল স্পষ্ট কিছুই শোনেন নাই, তথাপি তাঁহার মনের কেমন এক বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার স্বর্ণলতা লাভ হইবেক। এক্ষণে একেবারে সে বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। দ্বিতীয় ভাবনা এই———'কেন আমি দাদাকে চিঠির মর্ম বলিলাম না? কেন আমি আপনার ইচ্ছামত এই গুরুতর কার্যের ভার গ্রহণ করিলাম? হয়ত দাদা শুনিলে অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার করিতে পারিতেন। গ্রহণ করিয়াই বা কেন আমি প্রাণপণে সে কার্যসাধনে যত্ন করিলাম না? হায়! কেন বা নিদ্রিত হইয়াছিলাম? এখন কি প্রকারে ফিরিয়া গিয়া দাদার নিকট মুখ দেখাইব? দাদা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি কি কৃতঘ্নের কাজ করিলাম। স্বর্ণলতাকে আমি চিরদুঃখিনী করিলাম। আমি যদি তাঁহার চিঠি তাঁহাকে দিতাম অথবা পড়িয়া শুনাইতাম, তাহা হইলে হয়ত কখনই এরূপ হইতে পারিত না।

স্বর্ণলতা এ বিবাহের পব আত্মহত্যা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমাবও তাই করা উচিত। এ পাপে আর তাহা ভিন্ন কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পাবে? হায়! এতক্ষণ স্বর্ণলতা দাদাকে নিন্দা করিতেছে, কিন্তু আমিই যে তাহার সর্বনাশ কবিলাম, তাহা জানিতে পারিতেছে না।''

গোপাল এইরূপ বিলাপ করিয়া বজনী প্রভাত করিলেন। কিন্তু নিজে যে কাবাগারে আছেন, সেজন্য তাঁহার চিন্তার লেশমাত্র হইল না। মনে করিলেন, ''আমি তো রজনী অবসান হইলেই মুক্ত হইব, কিন্তু স্বর্ণলতাব শৃঙ্খল আর এজন্মেও ভাঙিবে না।''

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তরী ডুবু ডুবু

আজি স্বর্ণের বিবাহ; বরের বাড়ীতে মহাধুম। কলিকাতা হইতে ইংরাজি বাদ্য আসিয়াছে। পাড়ায় ছেলেতে এবং রাস্তার লোকে সদরবাটীর উঠান পরিপূর্ণ। পাত্রটি সহজেই দেখিতে সুশ্রী নয়। একে কালো, তাহার উপরে লাল চেলী পরিয়া শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধের বক্তবীজেব ন্যায ভীষণাকার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিযাছেন, বর তাঁহাদিগের মধ্যে বসিয়া আছেন।

বিবাহের দিবস বর-কন্যার কতই আদর? দীন-দুঃখী হইলেও সেদিন লোকে তাহাদিগকে যত্ন করে; যার-পর-নাই কুৎসিত হইলেও তাহাদিগকে দেখিতে আইসে। যাহারা জন্মাবধি প্রত্যহই দেখিতেছে, তাহারাও আজি একবাব নূতন করিয়া বর দেখিতে আসিতেছে। মাঝে মাঝে একজন লোক গিয়া বরকে ডাকিয়া আনিতেছে। বর বয়স্কদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশপূর্বক উঠিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে অনিচ্ছাটি আন্তবিক নয়।

শশাঙ্কশেখর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, ''স্বর্ণ, আজ তুমি কিছু আহার করো না।''

স্বর্ণ যেন আশ্চর্য হইয়াছেন ভাল করিয়া কহিলেন, ''কেন?''

শশাঙ্ক বিকট হাস্য হাসিয়া কহিলেন, ''আজ তোমার বিবাহ।''

শশাঙ্কের বিকট হাস্যে স্বর্ণের হৃৎকম্প হইল। অন্যান্য দিন শশাঙ্কের যেরূপ চেহারা দেখিতেন, আজ যেন তাঁহার চক্ষে আর সে চেহারা নাই। তিনি পুস্তকে যেসব দৈত্য-দানবের কথা পাঠ করিয়াছেন, শশাঙ্ক যেন তাহারই একজন বলিয়া স্বর্ণের বোধ হইতে লাগিল।

শশাঙ্ক পুনর্বার কহিলেন, ''আজ তোমার বিবাহ স্বর্ণ'' এবং কথা সমাপন কবিয়া আর একবার পূর্বাপেক্ষা ভীষণতর বিকট হাস্য হাসিলেন।

শশাঙ্কের ভাব ও মূর্তি দেখিয়া স্বর্ণলতার লজ্জা পলায়ন করিল। রোষে কম্পিতকলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ''আমার বিবাহ কে দেবে? কোথায় হবে?''

শশাঙ্ক পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল, ‘‘তোমার বাপ বেঁচে থাকলে তিনিই দিতেন, তাঁর অবর্তমানে আমিই দেব, যেখানে বিবাহ হবে তা তুমি জান, সেদিন রাত্রে সব শুনেছ।’’

স্বর্ণের শরীর রাগে ও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কপট-নিদ্রিত ছিলেন, এ কথা শশাঙ্ক কি প্রকারে জানিতে পারিল? কোনও বিদ্যাবলে কি মনের ভাব গণনা করিয়া স্থির করিতে পারে?

স্বর্ণ কহিলেন,‘‘তুমি পরম হিতকাবী গুরুঠাকুরই বটে!’’

শশাঙ্ক উত্তর করিল, ‘‘পরের হিত না করি, নিজের হিত তো করি।’’ একটু পরে আবার কহিল, ‘‘পরেরই বা হিত কিসে না করলাম! যে বিবাহের সম্বন্ধ করেছি, তাতে তোমার বাপেরও মত ছিল।’’

স্বর্ণ সরোষে কহিলেন, ‘‘কখনও না।’’

শশাঙ্ক আবার বিকট হাস্য হাসিয়া কহিল, ‘‘আচ্ছা, তাঁর না ছিল, আমাব আছে।’’

স্বর্ণ কহিলেন, ‘‘তোমার মত থাকল আর না-থাকল, তাতে কার বয়ে গেল? যার বে, তার মত নাই।’’

শশাঙ্ক। তারও আছে। পাত্রের মত সর্বাগ্রে হয়েছে।

স্বর্ণ। পাত্রের মত হলো না হলো, তাতে আমাব কি? আমাব মত নাই।

‘‘ঐ তো তোমাদের দোষ!’’ শশাঙ্ক আরম্ভ করিলেন, ‘‘কি দু-এক পাতা পড় আর শোন; সেই পড়ার জোরেই একবাবে এত আত্মবিস্মৃত হও যে লজ্জাসরম থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তোমার ভালর তরে বলছি, গোলমাল করো না। শুভকর্মে গোলমাল করা ভাল নয়।’’ শশাঙ্ক এই বলিয়া তথা হইতে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

স্বর্ণ কহিলেন, ‘‘তুমি কোথায় যাও? কাল অবধি আমাকে চাবি বন্ধ করে বেখেছ, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও? আমি কলিকাতায় যাব।’’

শশাঙ্ক। আজ না। বিবাহের পর কলিকাতায় যেও।

স্বর্ণ গৃহেব দরজার নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন, ‘‘আমি এইখানে খুন হলো বলে চেঁচাই, রাস্তাব লোক দুয়ার ভেঙে বাটীর মধ্যে আসবে।’’ স্বর্ণ এই বলিয়া যেমন বাহির হইবেন, শশাঙ্ক তাহার হস্ত ধবিয়া ঘরের দিকে টানিতে লাগিল। স্বর্ণ দু-এক বার বাহিরের দিকে টানিলেন, কিন্তু তাঁহাব সাধ্য কি যে, শশাঙ্কের সহিত জোরে পাবেন? গুরুদেব তাঁহাকে গৃহমধ্যে রাখিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দরজায় চাবি বন্ধ করিল। স্বর্ণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। শশাঙ্ক কহিল, ‘‘এখন তোমার যত খুশি কাঁদ।’’ এই বলিয়া আবার একবাব বিকট হাস্য হাসিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

বরের বাটীতে গিয়া শশাঙ্ক বাদ্যকরদিগকে আপন বাটীতে আনিল এবং কহিয়া দিল, ‘‘যখন বাড়ীর মধ্যে কান্না শুনবে তখন বাজাবে।’’

স্বর্ণলতা কত কাঁদিলেন, কত রাগ করিয়া তিরস্কার করিলেন, কত করজোড়ে স্তুতি করিলেন, নিষ্ঠুর শশাঙ্ক কিছুতেই শুনিল না।

স্বর্ণ শশাঙ্ককে কহিলেন, ''আমার বিবাহ দিয়ে তুমি যত টাকা পাবে, আমি তোমাকে তার দ্বিগুণ দেব, আমাকে ছেড়ে দাও। বাবা আমাকে যত টাকা দিয়ে গিয়েছেন, আমি সকলি লিখেপড়ে দিচ্ছি; আমাকে দাদাব কাছে পাঠায়ে দাও।

শশাঙ্ক কহিল, ''তোমার সে টাকা দেবার অধিকার অদ্যাপি হয় নাই, নচেৎ আমার কোন আপত্তি ছিল না।''

স্বর্ণ। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি—আমি দেব।

শশাঙ্ক কহিল, ''শশাঙ্কশেখর শর্মা প্রতিজ্ঞায় ভোলেন না।''

স্বর্ণলতা কহিলেন, ''তবে তোমার কিসে প্রত্যয় হয় বল, আমি তাই করব''

শশাঙ্ক। তোমাকে পাত্রস্থ করতে পারলেই আমাব প্রত্যয় হয়।

স্বর্ণলতা কহিলেন, ''তোমার তো মেয়ে আছে? আমাকেও তোমার মেয়ের মতন মনে কর। তোমার মেয়ের কি জোব করে বে দেবে?''

''আমার মেয়ে তোমার মতন নির্লজ্জ নয় যে, বের কথা নিয়ে এত গোল কববে। আমি যেখানে তাব বিয়ে দেব, তার সেইখানেই বিবাহ হবে। তাব এ বিষয়ে তোমাব মতন মতামত নাই। সে পড়াশুনা কবে নি, তার ভাইও ইংরাজি জানে না।''

স্বর্ণলতা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চুপ করিলেন।

শ্রীরামপুর দিয়া রেলওয়ে গাড়ী আসিতেছে যাইতেছে, নিয়মিত কাল পর্যন্ত তথায় থামিতেছে। এক এক বার গাড়ীর শব্দ হয় আর স্বর্ণলতা মনে করেন, ''এইবাব আমাকে নেবার জন্য লোক আসছে।'' আহা! কয়টা আশা সুফলবতী হয়? সমস্ত আশাই সুফলবতী হইলে পৃথিবী স্বর্গসম হইত। স্বর্ণলতা একবার নৈবাশ হন, আব মনে করেন—এ গাড়ী কলিকাতায় যাচ্ছে, এ[illegible]না কলিকাতা হতে আসছে না। ইচ্ছা হইলে কল্পনানুরূপ অনুভব করা যায়, স্বর্ণলতাব কানে এমনি শব্দ হইতে লাগিল যেন আজি সমুদয় গাড়ী কলিকাতায় যাইতেছে। কলিকাতা হইতে একখানিও আসিতেছে না।

ক্রমে দিবা অবসান হইতে লাগিল। সূর্যদেবের দয়া মমতা নাই। কত শত রোগী শয্যায় শয়ন করিয়া রজনীর সমাগম দেখিয়া কম্পিত-কলেবর হইতেছে। সমুদ্রে কত শত তরী বিপথগমনের ভয়ে সূর্যদেবের পশ্চিম গতি দেখিয়া ব্যাকুল হইতেছে। রজনী আসিলে স্বর্ণলতা চিরজীবনের জন্য শোকসাগরে নিমজ্জিতা হইবেন ভাবিয়া কতই রোদন করিতেছেন। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কি দিনকরের হৃদয়ে একবারও করুণার সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কি পিতা-পুত্র উভয়েই সমান? হায়! যে সময় তোমার পুত্র অন্তর্জলে, সেই সময়ে কত শত লোকের পুত্রেব বিবাহ হইতেছে। কত শত লোকের রাজ্যলাভ, ধনলাভ হইতেছে। সূর্যদেবেব কি পক্ষপাত করিলে চলে? জয়দ্রতের জন্য তিনি এক দণ্ড আগেও অস্তাচলে যান নাই। সূর্যদেবের বংশে পক্ষপাতিত্ব নাই, তাঁহাবা পিতাপুত্র উভয়েই সমান!

যতই সন্ধ্যা হইতে লাগিল, ততই স্বর্ণলতার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক্ষণে আবার আর এক ভাবনা উপস্থিত হইল। স্বর্ণলতা মনে করিলেন, হয়ত তাঁহার দাদার পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, কিংবা—ভাবিতে হৃদয় কম্পিত হয়—তদপেক্ষা গুরুতর অশুভ ঘটনা হইযাছে। শশাঙ্ক অদ্য দুই দিবস আর কলিকাতায় যায নাই। স্বর্ণ আপনার দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। হেমের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য জানিবার জন্য তাঁহার চিত্ত যার-পর-নাই ব্যগ্র হইল। কেহই নিকটে আসিতেছে না, যাহার কাছে খবর লইতে পারে। শশাঙ্ক এক্ষণে অত্যন্ত ব্যস্ত; তাহাব আর স্বর্ণের নিকট আসিবার অবকাশ নাই। শশাঙ্কের স্ত্রী ও কন্যাকে প্রাতঃকাল অবধি অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া বাখিয়াছে।

সন্ধ্যা সমগত হইল। আকাশে স্থানে স্থানে একটু একটু মেঘ দেখা দিল। বসন্তেব সমীরণ বহিতে লাগিল। মালা, চন্দন ও পট্টবস্ত্রে বিকট মূর্তি ধাবণ করিয়া বর আসিল, ইংবাজি বাদ্য বাজিল। শঙ্খধ্বনি হইল। বর সভায বসিল। বালকেরা বরকে লইযা ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। পুবোহিত আসিলেন। শশাঙ্ক এ সকলেব একটু দূরে বসিয়া হরিদাসের নিকট হইতে টাকা গণিযা লইতে লাগিল।

স্বর্ণলতা আপন কাবাগারে বসিয়া বোদন কবিতে লাগিলেন। যে কিছু পবিত্রাণের আশাভবসা ছিল, সন্ধ্যা হইলে দূবীভূত হইল। ''হা ঈশ্বব! আমাব অদৃষ্টে এই ছিল'' বলিযা স্বর্ণলতা আর্তনাদ কবিতেছেন। কে তাঁব কান্না শোনে। সকলেই আমোদ-প্রমোদে মত্ত। শশাঙ্ক এখনও হবিদাসের নিকট হইতে টাকা গণিয়া লইতেছে।

টাকা গণিয়া লইয়া শশাঙ্ক ও হরিদাস উভয়ে সভায গেল। দেখিল, সমুদয় প্রস্তুত: কন্যা আনিলেই হয়। শশাঙ্ক কন্যা আনিতে আসিল।

দ্বারোদ্ঘাটন করিবামাত্র স্বর্ণলতা দৌড়িয়া শশাঙ্কের চরণে পড়িলেন। বোদন কবিতে কবিতে কহিলেন, ''আগে আমাকে বল, দাদা কেমন আছেন, তা না হলে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।''

শশাঙ্ক কহিল, ''তোমাব দাদা ভাল আছেন।''

স্বর্ণ কহিলেন, ''আমাব মাথা খাও, তোমার ছেলেব মাথা খাও, সত্যি কথা বল।''

স্বর্ণের তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছে। কি বলেন, তাহার ঠিকানা নাই।

শশাঙ্ক কহিল, ''আমি যথার্থ বলছি, তোমাব দাদা ভাল আছেন। তিনি ভাল আছেন বলেই তো তোমার এত শীঘ্র বিবাহ দিচ্ছি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হলে কি আব এ বিবাহ দিতে দেবেন? তাঁর যদি কোন অশুভ হতো, তাহলে তো তুমি আমাদের হাতেই থাকতে, এত ব্যস্ত কখনই হতেম না।''

স্বর্ণলতা দেখিলেন, শশাঙ্কের কথা সঙ্গতই বটে। তখন তিনি কহিলেন, ''আমার অসম্মতিতে বিবাহ দিও না, দিও না, দিলে তোমার ভাল হবে না। আমি নিশ্চয়ই গলায় ফাঁসি দিয়ে মরব।''

পাষণ্ড শশাঙ্ক কহিল, ''একবার সাতপাক দিয়ে দিলে তারপর তুমি বিষই খাও, আব গলায়ই ছুবি দাও, আমার তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সাত পাক পর্যন্ত।'' এই বলিয়া শশাঙ্ক পূর্বেব ন্যায হাসিল।

স্বর্ণলতা শশাঙ্কের পা ধরিয়াছিলেন। শশাঙ্ক হেঁট হইয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত ধরেন, এমন সময় স্বর্ণ উঠিয়া দৌড়িয়া গৃহের কোণে গিয়া আপনার অঞ্চল দ্বারা গলদেশ বন্ধনপূর্বক কহিলেন, "তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, ওখান থেকে যদি এক পা আগে এস, তা হলে আমি ফাঁসি টেনে মরব।"

শশাঙ্ক কহিল, "স্বর্ণ, তুমি ছেলেমানুষ, তাতেই এত জোর করছ। তোমার আর কি সাধ্য আছে, আমার হাত থেকে উদ্ধার হও। এইবেলা সহজে এস। লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তোমার বিবাহ এই রাত্রে দেবই দেব, লগ্ন বহির্ভূত হলে ভবিষ্যতে তোমারই অমঙ্গল।" এই বলিয়া শশাঙ্ক এক পদ অগ্রসর হইল।

স্বর্ণলতা কহিলেন, "এই টানলাম ফাঁসি। আমার মৃত্যুও যে, এমন বিবাহও সেই।" এই বলিয়া ফাঁসি টানিবেন, এমন সময় বর্হির্বাটী হইতে এক প্রকাণ্ড আলোক দেখা গেল। উভয়ে চমকিয়া সেইদিকে দৃষ্টি করিলেন। আলোক মুহূর্তমধ্যে দশদিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শশাঙ্ক টের পাইল, তাহার বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিয়াছে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শশীর চক্ষু ফুটিল

শশিভূষণ রামসুন্দরবাবুর বাটী হইতে নিজবাটী আগমন করিয়া প্রমদার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। প্রমদা শুনিয়া দুই চারি বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। ক্ষণকাল নীরবে পতির নিকট বসিয়া থাকিয়া তথা হইতে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। শশিভূষণ জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় যাও? আমার কথা শুনে চুপ করলে যে?" প্রমদা উত্তর করিলেন, "আমি আসি।" এই বলিয়া নীচে মায়ের নিকট আসিলেন।

শশিভূষণের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সকলই প্রমদার নামে। প্রমদার নামে কাগজ, প্রমদার নামে বাটী, প্রমদার নামে জমিজমা। নগদ টাকাও প্রমদার কাছে। প্রমদা শশিভূষণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, স্ত্রীর নামে ধন রাখিলে সে ধনে কোন সরিকের অংশ থাকে না, দায়-বিবাদের সময় সে বিষয় কেহ নিলাম করিয়া লইতে পাবে না; পুরুষের নামে থাকিলে কোন একটা দাবিতে লোকে বিষয় বেচিয়া লইতে পারে; স্ত্রীর নামে থাকিলে তাহার কোনই ভয় থাকে না। শশিভূষণ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কায়মনোবাক্যে এতকাল ইহারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। বিধুভূষণের জমিজমার খাজনা দিবার উপায় ছিল না, এজন্য প্রথমতঃ শশিভূষণ সমুদয় খাজনা দিতেন। না দিলে যদি বিক্রয় হইয়া যায়, তাহা হইলে উভয়েরই ক্ষতি। প্রমদার পরামর্শে ক্রমে তিনি খাজনা দেওয়া বন্ধ করিলেন; পরে নিলাম হইবার সময় সেগুলি সমুদয় প্রমদার নামে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। নগদ টাকা যখন যাহা হাতে থাকিত, প্রমদার উপদেশক্রমে তদ্দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেন। প্রমদা কহিতেন, 'হাতের টাকা একবার গেলে আর পাওয়া

যায় না। একখান গয়না গড়ে রাখলে সে টাকা মজুত থাকে। দবকার হলেই বন্ধক দেওয়া যায়, বিক্রি করা যায। আবাব টাকা হাতে আসিলে ছাড়াইয়া লওযা যায়।' শশিভূষণের ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণা।

আজি শশিভূষণেব চারিহাজার টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। শশিভূষণ নিঃশঙ্কচিত্তে বাটী আসিলেন। প্রমদাকে বলিলেই টাকা পাইবেন। এমন কি, চাহিতেও হইবে না। তাঁহার মুখে সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়াই প্রমদা টাকা দিবেন। কিন্তু প্রমদা যখন কথা না কহিয়া উঠিয়া গেলেন, তখন শশিভূষণেব কিঞ্চিৎ চিত্তচাঞ্চল্য হইল। চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি? প্রমদা কি টাকা দেবেন না? শশিভূষণের মনে যখন এই প্রশ্ন উদিত হইল, তখন মাথা নাড়িযা ভাবিলেন, "তাও কি কখনও হইতে পাবে?"

প্রমদা নীচে গিয়া মাতাকে ডাকিলেন। মাতা অবিলম্বে প্রমদার নিকট আসিলেন। প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, "মা, ওদিকে কেও আছে কি?" তাঁহার জননী উত্তর করিলেন, "না।" প্রমদা কহিলেন, "তবে এই তক্তাপোশে বসে শোন।"

প্রমদার মাতা অস্ফুটস্বরে "কি কি" বলিয়া প্রমদার পার্শ্বে বসিলেন। তাঁহাব শবীব প্রমদাব শরীরে স্পর্শ হইল। প্রমদা কহিলেন, "একেবারে গায়ের উপর চেপে পড়লে যে?"

প্রমদার জননী সকাতরে কহিলেন, "না মা, না মা, আমি দেখতে পাই নাই।"

প্রমদা। তোমার চোখ নাই বুঝি? এর মধ্যে কানা হলে? কান থাকে শোন; না থাকে তো বল, আমি চুপ কবি।

জননী। বল মা বল, আমি শুনছি।

প্রমদা জননীকে ক্ষমা দানে বাধিত হইয়া কহিলেন, "শুনেছ, কি হয়েছে?"

জননী। না।

প্রমদা। তুমি কি সমস্ত দিন কানে ছিপি দিয়ে বসে থাক?

জননী কাতর স্বরে কহিলেন, "আমাকে তোমরা না বল্লে আমি কার কাছে শুনব? তুমি তো আমাকে কোন কথাই কও নাই।"

প্রমদা উত্তর করিলেন, "তবে আর ভূমিকায় কাজ নাই, এখন শোন। সেদিন সাহেব এসেছিল; সে হুকুম দিয়ে গিয়েছিল, 'যদি ওরা (অর্থাৎ তাঁর স্বামী) কাগজ না বুঝে দিতে পারে তবে কর্ম থাকবে না'।"

জননী আশ্চর্য হইয়াছেন ভান করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কি সর্বনাশ! এখন কি হবে?"

প্রমদা। তুমি যদি অমন করে চ্যাঁচাও, তা হলে এখান থেকে উঠে যাও।

জননী। না মা, আর চ্যাঁচাব না।

প্রমদা আবার ক্ষমা করিয়া কহিলেন, "কাগজ তো বুঝবার জো নাই। বাবুকে মাতাল পেয়ে যে যা পেয়েছে তাই চুরি করেছে, আমাদের এরা চুরি করেন নি, কিন্তু পরে যা নিয়েছে তার তো ভাগ পেয়েছেন; এখন হয় জেলে যেতে হবে, নয় পুলিপোলাও

যেতে হবে।'' পিলোপিনাংকে লোকে প্রায়ই পুলি ও পোলাওকে দ্বন্দ্ব সমাস করিলে যে রূপ হয়, তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকে।

জননী আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, ''এর আব কি উপায নাই?''

প্রমদা উত্তব করিলেন, ''আছে এক উপায়, কিন্তু সেও না থাকার মধ্যে। এখন যদি চার হাজার টাকা অন্য অন্য আমলাদের ঘুষ দেওযা যায়, তবে রক্ষা হয়। এঁরা বলছেন রক্ষা হয়, কিন্তু আমার মনে তো ভরসা হয় না।''

জননী দবিদ্রের কন্যা, দরিদ্রের বধূ, ৫০টি টাকা একত্র কখনও দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। চারি হাজাব টাকার নাম শুনিয়া তিনি ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিযা রহিলেন। চাবি হাজার কি ঢেঁকি, না কুলো, তা জানেন না। কিন্তু কথা কহিলে পাছে প্রমদা বাগ করেন, এজন্য চুপ করিয়া বহিলেন।

প্রমদা জিজ্ঞাসিলেন, ''কথা কও না যে?''

জননী একটু ভাবিয়া বলিলেন, ''কত টাকা বল্লে?''

প্রমদা। চার হাজাব।

জননী একটু ভাবিয়া বলিলেন, ''সে ক' কুড়ি?''

প্রমদা সক্রোধে কহিলেন, ''মবণ আব কি? তুমি কচি মেয়ে নাকি?''

জননী নীবব।

প্রমদা পুনবায় কহিলেন, ''চার হাজাব টাকা দিতে হলে আর প্রায় কিছু বাকি থাকে না। কোম্পানিব কাগজগুলি আব গহনাগুলি সব যায়, এখন উপায় কি?''

জননী বিষম বিপদে পড়িলেন! লোকে বলে বোবার শত্রু নাই, কিন্তু কার্যতঃ সে কথা প্রলাপবাক্য মাত্র। তিনি কথা কহিলেও প্রমদা তিরস্কাব করেন, না কহিলেও তিরস্কাব করেন। আকাশপাতাল ভাবিয়া স্থির কবিতে পাবিলেন না—কি বলিবেন। এমন সময় প্রমদা কহিলেন, ''আমার বিবেচনায় এ টাকা দিলেও নিস্তার নাই। লাভের মধ্যে টাকাও যাবে, প্রাণও যাবে। তাই আমি বলি, কোম্পানির কাগজ, নগদ ও গয়না যা কিছু আছে একদিন নিয়ে চলে যাই। এখানে থাকলে চক্ষুলজ্জাব খাতিরে দিতে হবে, তফাতে থাকলে আর চক্ষুলজ্জা থাকবে না। আজ যদি টাকাগুলি দি, আর কাল উনি পুলিপোলাও যান, তবে আমরা ভিক্ষে করে বেড়াই আব কি? তা হবে না। মা, কি বল তুমি?''

মাতার এক্ষণে দিঙনির্ণয় হইল; এখন যতই চাবুক মার ততই দৌড়াইবেন। কহিলেন, ''তার কি ভুল আছে? আপনার পাঁজি-পুঁথি পরের দিযে দৈবজ্ঞি বেড়ায় হাবাতে হয়ে। সে কাজে যেন আমার বংশের কেউ না যায়।''

পরামর্শ স্থির করিয়া প্রমদা শশিভূষণের নিকট আসিলেন। শশী জিজ্ঞাসিলেন, ''কোথায় গিয়েছিলে?''

প্রমদা। ঐ একবার মার কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর ব্যাম হয়েছে, তাই দেখে এলাম।

শশী। এই টাকাগুলি দিতে হবে, তার কি?—শশী অত্যন্ত কাতর স্বরে কথাটি কহিলেন।

প্রমদা উত্তর করিলেন, ‘‘যখন দিতে হয়, তখন দেওয়া যাবে।’’ শশিভূষণের আব অধিক কথা কহিতে সাহস হইল না।

পবদিন প্রাতে রামসুন্দরবাবু দুইজন পেয়াদা সমভিব্যাহারে শশীবাবুর বাটী আসিয়া শশীবাবুকে ডাকিলেন। শশী নীচে আসিয়া রামসুন্দরবাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। রামসুন্দর কহিলেন, ‘‘যদি কারুকে কিছু দেবার ইচ্ছা থাকে, এইবেলা আমার কাছে দাও। নচেৎ আর সময় পাবে না। হিসাব বুঝে নিতে সরকার থেকে একজন ম্যানেজার এসেছে। ঐ পেয়াদা তোমাব তলবে এসেছে। এখন না দিলে কাছারিতে সকলই প্রকাশ হবে।’’

শশিভূষণ এই কথা শুনিয়া উপরে স্ত্রীর নিকট আসিয়া প্রমদাকে কহিলেন, ‘‘তবে দাও, সেই ক’খানা কাগজ দাও। আব যাতে হাজার টাকা হয়, এমন খানকতক গয়না দাও।’’

প্রমদা কহিলেন, ‘‘এখনই না দিলে নয়?’’

শশী। না।

প্রমদা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, ‘‘দিলে কিছু লাভ হবে?’’

শশী। আমি তা হলে বেঁচে যাব, নচেৎ আমাকে পুলিপোলাও যেতে হবে।

প্রমদা আবার খানিক নীরবে থাকিয়া কহিলেন, ‘‘টাকা দিলে কেমন কবে বেঁচে যাবে, আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে হচ্চে, টাকা দিলে টাকাও যাবে, তুমিও যাবে।’’

শশিভূষণের তখন হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অতি কাতর স্বরে কহিলেন, ‘‘আমিই যদি যাই, তবে আর আমার টাকা থেকে কি হবে?’’

প্রমদা মুখখানি আঁধার করিয়া কহিলেন, ‘‘তা হলে আমাদেব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খেতে হবে; সে কি তোমার পক্ষে ভাল হবে?’’

শশিভূষণের বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্বাপেক্ষা বিনীত ভাবে প্রমদার কাছে বসিয়া কহিলেন, ‘‘তোমরা ভিক্ষা করবে কেন? আমার জমিজমা আছে, বাটী থাকলে, তোমাদের স্বচ্ছন্দে চলবে। আর এই টাকা দিলে আমিও নিস্কৃতি পাব।’’

প্রমদা অবনত-বদন হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে শশিভূষণ কহিলেন, ‘‘শীঘ্র দাও—লোক এসে বসে আছে। দেরি হলে পর দেওয়া না-দেওয়া সমান হবে।’’

প্রমদা তথাপি কথা কহিলেন না। তখন শশিভূষণ একটু রাগত হইয়া কহিলেন, ‘‘দেবে কি না বল?’’

শশিভূষণকে রাগত দেখিয়া প্রমদার কথা কহিবার অবকাশ হইল। কহিলেন, ‘‘অমন জোর কব যদি, তবে দেব না!’’

শশিভূষণ পুনরায় কাতর স্বরে কহিলেন, ‘‘আমার অপরাধ হয়েছে, এখন দাও।’’

প্রমদা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, ''তোমাদেব মতন কঠিন লোক আব নাই। কতক দিন তোমার ভায়া জ্বালাতন করলেন, এখন তিনি গেলেন, তুমি লাগলে, আমাব কপালে আব সুখ হলো না। বাবা কেনই বা আমাকে এমন জাযগায বিয়ে দিলেন?'' প্রমদা আর কথা কহিতে পারিলেন না। অনতি-উচ্চৈঃস্বরে রোদন কবিতে লাগিলেন।

শশিভূষণের শিবে বজ্রাঘাত হইল। চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। একটু পবে প্রমদা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, ''তুমি তো চললে, বাঁড়েব কি কবে গেলে?''

শশিভূষণ কহিলেন, ''আমাকে তুমিই ভাসালে। তুমি টাকা দিলে আব আমাব বিপদ থাকে না।'' প্রমদা ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন।

নীচে থেকে বামসুন্দব বাবু ডাকিতেছেন, ''শশীবাবু আসুন, বেলা হলো।''

শশী উচ্চৈঃস্বরে ''এই যাই'' বলিয়া প্রমদাব পদযুগল ধবিয়া রোদন কবিতে কবিতে কহিলেন, ''প্রমদা, আমাকে রক্ষা কর। তুমি না বক্ষা কবলে আমি আর বক্ষা পাই নে। প্রমদা, তোমাব পায়ে পড়ি, রক্ষা কব।''

প্রমদাকে যেন কে কতই প্রহার করিতেছে, এইরূপ কবিয়া রোদন কবিযা উঠিলেন,—''বাবা আমাব স্বপ্নেও জানতেন না, আমার এমন দুবাদেষ্ট হবে। আমাব জীবনটা দুঃখে দুঃখেই গেল। আমাকে কেন এখানে বিয়ে দিলেন?''

প্রমদার কান্না শুনিয়া প্রমদার জননী দৌড়িয়া আসিলেন এবং প্রমদাব শেষ কথাটা শুনিতে পাইয়া তাহারই উপর দ্বিতীয় মল্লিনাথের ন্যায় টীকা কবিতে আবম্ভ কবিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, ''আমি তখনই তোমার বাপকে বলেছিলাম, এ কাজে সুখ হবে না। তোমার বাপ আমার কথা না শুনে বাছা তোমাকে এখানে বিয়ে দিলেন। আমাকে গালি দিও না বাছা। ও রে গদাধরচন্দ্র, তুই এখন কোথায?'' প্রমদা ও প্রমদাব মা ঝড় আর আগুন একত্র হইয়া শশিভূষণেব সর্বনাশ কবিতে বসিলেন।

রামসুন্দরবাবু বৈঠকখানা হইতে কহিলেন, ''শশীবাবু সত্ত্বব আসুন, নইলে পেয়াদারা বাটীর মধ্যে চল্লো।''

রামসুন্দবের কথা শুনিয়া শশী উন্মত্তেব মতন হইয়া কহিলেন, ''প্রমদা, এতদিন তোমার সব সৎপরামর্শের অর্থ বুঝতে পারলাম। তুমি আমাকে বোকা বলতে, আমি যথার্থই বোকা, তা না হলে তোমার মতন পাপীয়সীর কথায আমার প্রাণেব ভাই বিধুকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেব কেন? আমার ঘরের লক্ষ্মী সবলাকেই বা মেবে ফেলব কেন? সরলা আমার ঘরে আসা পর্যন্ত আমার দুঃখ হয় নাই, ক্লেশ হয় নাই, আমার সংসার রাজাব সংসার ছিল। তোর পরামর্শে আমি এমন সরলাকে পৃথক করে দিলাম। সে যখন অন্নাভাবে মরে তখন তোরই পবামর্শে আমি অন্ন দিলাম না। সরলা যখন অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে, তখনই আমি জানতে পাবলাম, আমাব আর ভদ্রত্ব নাই। তুই সরলাকে মেরেছিস, তুই আমার সোনার ভাইকে পথেব ভিখাবী কবেছিস। অবশেষে আমি ছিলাম, তুই আমাকেও খুন করলি। আমার যেমন কর্ম, তেমনি ফল। তোরই বা দোষ কি? আমার সোনার প্রতিমা সরলাকে বিসর্জন দেবাব ফল এতদিনে ফলল।''

এই কথা বলিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ভীষণ নেত্রে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শশিভূষণ গৃহের অভ্যন্তর হইতে চলিয়া গেলেন এবং অবিলম্বে বহির্দ্বারে গিয়া রামসুন্দরবাবুর সহিত একত্র হইলেন। কাছারিতে সকলে শশিভূষণের মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হইল। কেহ কোন কথা না বলিতে তিনি নিজেই সমুদয় আত্মদোষের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমি এই অপরাধ করেছি, আমার উচিত দণ্ড বিধান করুন।" সকলে দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

ম্যানেজার একজন ডেপুটি কলেক্টর, শশিভূষণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল। কিন্তু ন্যায়মত কার্য না করিলেও নয়, সুতরাং শশিভূষণ যাহা যাহা বলিলেন, তিনি সকলই লিখিয়া লইলেন, শশিভূষণের কথায় অল্প অধিক পরিমাণে সকলে দোষী হইলেন। মহুরি, খাতাঞ্জি, হিসাবনবিস ও রামসুন্দরবাবু, এঁরা সকলেই শশিভূষণের সহিত হাজতে চলিলেন।

সকলকে গারদে দিয়া ডেপুটি কলেক্টর মনে করিলেন, শশিভূষণের অপরাধ সর্বাপেক্ষা গুরুতর, তাহার বিষয়-আশয় বিক্রি করিয়া জমিদারের ক্ষতিপূরণ হওয়া উচিত, কিন্তু পাছে অস্থাবর বস্তু সমুদয় স্থানান্তর হয়, এই ভয়ে শশীর বাটীতে পুলিস-পাহারা রাখিয়া দিলেন।

সন্ধ্যাবেলা। আকাশমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া বেগে বায়ু বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অল্প একটু বৃষ্টি হইয়া গেল। বৃষ্টি হইয়া কিঞ্চিৎ শীত বাড়িল। দারোগা দীনবন্ধুবাবু ও কনস্টেবল রমেশ, শশিভূষণের বাটী পাহারা দিতেছেন। দারোগা আজি নিজে আসিয়াছেন, অপরকে পাহারা রাখিয়া তাঁহার প্রত্যয় হইল না। শীতে পাহারা দেওয়া বড় আমোদ জনক কাজ নহে! বিশেষ অনভ্যাসপ্রযুক্ত অল্পক্ষণের মধ্যেই দীনবন্ধুবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "রমেশ, তুমি তো জান ভাই, আমি কোন সরকারী লোক দিয়া নিজের কাজ করিয়ে লই না! কিন্তু তোমাকে যে দুই একটা কথা বলি, সে কেবল তোমাকে স্নেহ করি বলে। তুমি ভাই, আজ রামধনার দোকান তেকে আদ পোয়া এনে দিতে পার? বড় শীত-শীত করছে।" 'রামধনের' নাম উল্লেখ করিয়া পরে ওজন বলিয়া দিলে আর জিনিসের নাম বলিতে হয় না।

রমেশ কহিল, "আজ্ঞা, আপনার একটা কাজ করব, তার জন্যে এত কথা বলছেন কেন? আপনার অনুগ্রহ থাকলেই হলো।"

ক্ষণকাল বিলম্বে আদ পোয়া আসিল। দারোগাবাবু বোতলের গলায় তর্জনী প্রবেশপূর্বক বোতলটি উপুড় করিলেন, পরে সেটিকে আবার স্বাভাবিক ভাবে রাখিয়া নিজের অঙ্গুলিটি দীপ-শিখায় ধরিলেন। ভাল জ্বলিল না। ঈষৎ মুখ বক্র করিয়া দারোগা বাবু কহিলেন, "রমেশ, তোমাকে নূতন লোক পেয়ে ব্যাটা ঠকিয়ে দিয়েছে।" কিন্তু দারোগাবাবু সেজন্য আদ পোয়া ফেরত দিলেন না। অল্প অল্প করিয়া সেটুকু সেবন করিলেন।

দারোগাবাবু একটু পান করিতেছেন, এমন সময় রমেশকে কে ডাকিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রমেশ শুনিয়া আসিলেন।

দারোগাবাবুর আদ পোয়ায় কিছু হইল না, এজন্য রমেশকে পুনরায় কহিলেন, ''তুমি তো জান ভাই, আমি সরকারী লোক দিয়ে নিজের কাজ ইত্যাদি।'' অর্থাৎ আর আদ পোয়া আন।

রমেশের এবার মদ আনিতে দেরি হইল।

দারোগাবাবু আবার সেটুকু সেবন করিলেন, এবার আর অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করেন নাই, কেমন জিনিস, সেবন করিয়া এক মিনিটের মধ্যেই দারোগাবাবুর মনে হইতে লাগিল যেন তিনি দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায় বসিয়া আছেন। যাই এই কথা মনে হইল, অমনি দারোগাবাবু তথায় শয়ন করিলেন। যাই শয়ন করিলেন, অমনি নাসিকাধ্বনি হইল, যাই নাসিকাধ্বনি হইল, অমনি রমেশবাবু কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বারে শব্দ করিলেন। যাই শব্দ করিলেন, অমনি দ্বার খুলিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গ্রন্থকর্তারা সর্বস্থানেই যাইতে পারেন। যাই রমেশবাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকর্তাও প্রবেশ করিলেন। করিয়া কি দেখিতে পাইলেন? প্রমদা ও তাঁহার জননী সমুদয় গয়নাপত্র, টাকাকড়ি, কাপড়-চোপড় একত্র করিয়া মোট বাঁধিয়া প্রস্তুত! রমেশবাবুকে প্রমদার মাতা ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ''কোন্ দরজা দিয়ে যাব? খিড়কি, না সদর?''

রমেশ। সদর।

তখন প্রমদার জননী প্রমদাকে কহিলেন, ''তবে আর বিলম্ব করো না মা।''

প্রমদা রমেশবাবুর হাতে টাকা গণিয়া দিলেন। রমেশবাবু গণিয়া লইলেন।

অনন্তর প্রমদার মাতা কাপড়ের মোট লইলেন, এবং প্রমদা একটি বড় হাত-বাক্স লইয়া বাটীর বাহির হইলেন। রমেশবাবু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহাদিগকে বাটীর বাহিরে রাখিয়া গেলেন।

বিপিন, কামিনী, দাসদাসী, সকলেই বাটীতে রহিল।

প্রমদা নিজে পিত্রালয়ে গিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া আসিবেন মানসে, দিন থাকিতেই নৌকা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘাটে গিয়া দেখিলেন, নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছে; নিঃশব্দে দু-জনে নৌকায় উঠিলেন। নাবিকেরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়দ্দুর গমন করিয়া সন্ধ্যাবধি যে ঝড় হইতেছিল, তাহার বেগ পূর্বাপেক্ষা শতগুণ প্রবল হইল। গগনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে ঘোরতর ঘনঘটায় আবৃত হইল, দশ দিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। তড় তড় শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলো চক্ষুকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদয় উৎপাটিত হইতে লাগিল। ভীষণ বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। শীতে শরীর জড়সড় হইয়া আসিল। পবনের গর্জনে কর্ণে তালা লাগিল। বৃক্ষ হইতে রাশি রাশি বিহঙ্গম মরিয়া নদীতে পড়িল। বাটী-ঘর সমুদয় দেখিতে দেখিতে সমভূম হইয়া গেল। প্রমদার নৌকা জলমগ্ন হইল। মুহূর্তমধ্যে হাহাকার উঠিয়া গেল। কেহই কাহাকে দেখিতে পায় না, কাহারও কথা কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। নাবিকেরা সাঁতার দিয়া কূলে উঠিল। প্রমদার মাতা কাপড়ের মোটে ভর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

প্রমদাব বাক্স অত্যন্ত ভারী ছিল। ত্যাগ করিয়া যাইতে পাবেন না। জলে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহাব সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল; এবং তাঁহাব হস্ত হইতে বাক্স খসিয়া জলমগ্ন হইল। পবক্ষণেই একটি প্রবল তবঙ্গ কর্তৃক তিনি কূলে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"অসৎ কার্যের বিপরীত ফল"

শশাঙ্ক চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিয়াছে দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে অগ্নি ও আলোকের বৃদ্ধি দেখিয়া দৌড়িয়া সেদিকে গেল। স্বর্ণলতাব গৃহে প্রবেশ কবিবাব সময় দ্বার খুলিয়া চাবি সহ তালাটি চৌকাটের মাথায় আংটায় রাখিয়াছিল; যাইবাব সময় লইয়া যাইতে বিস্মৃত হইল। স্বর্ণলতাও জানালা দিয়া দেখিলেন, শশাঙ্কের চণ্ডীমণ্ডপ পুড়িতেছে এবং তাহার পরক্ষণেই তাহাব নিকটবর্তী আব একখানি ঘর জ্বলিয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া স্বর্ণেব অন্তব কাঁপিতে লাগিল। হু হু কবিযা ঘব জ্বলিতেছে, লোকজন কোলাহল করিয়া পলাইতেছে; কেহ কাহাবও অন্বেষণ কবিবাব অবকাশ নাই; নিজ নিজ প্রাণ লইয়াই সকলে শশব্যস্ত। স্বর্ণ গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া পরে কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। একবাব সদরেব দিকে গমন কবিলেন, কিন্তু সম্মুখে লোকের সমারোহ দেখিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক খিড়কির দিকে গমন কবিলেন। খিড়কির দিকে ভাল আলো আসিতেছে না। স্বর্ণ ত্রস্ত হইয়া চলিয়া যাইতে দুই তিন বাব পড়িয়া গেলেন। কিন্তু জীবনেব ভযে পলায়ন করিতেছেন, একটু আঘাতে তাঁহার কি হইবে? খিড়কির দরজার কাছে গিয়া দেখিলেন, দবজা খোলা। হরষিতচিত্তে শশাঙ্কর কারাগার হইতে বহির্গত হইলেন। বাস্তার বায়ু সেবন করিয়া তাঁহার দেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল। সেখানেও অত্যন্ত লোকসমাবোহ দেখিযা সম্মুখে দৌডিযা গেলেন। স্বর্ণলতা কোন্ দিকে যাইতেছেন তাহা টের পাইতেছেন না, অথচ চলিতেও ক্ষান্ত হইতেছেন না। বিবেচনা করিলেন, শশাঙ্কের বাটী হইতে যে-কোন স্থানে যাইবেন, সেইখানেই আশ্রয় পাইবেন। এমন সময় এক দ্বিশাখা রাস্তায় আসিলেন। কোনটিতে যাইবেন, স্থির করিবার জন্য ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বাম দিকে চলিলেন। অনুমান অর্ধরশি গমন করিয়াছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার অঞ্চলাকর্ষণ করিয়া কহিল, "কোথায় যাও?" স্বর্ণলতা আতঙ্কে চিৎকার করিয়া পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক। দেখিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ সাহস হইল। স্ত্রীলোকটিও আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। স্বর্ণলতা দেখিলেন, শশাঙ্কের বাটীর দাসী। সে তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে ভাবিয়া স্বর্ণলতা পুনর্বার আতঙ্কে চিৎকার করিয়া কহিলেন, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব না। না ছাড় তো আমি চ্যাঁচাব।" দাসী কহিল, "ভয় কি? আমি তোমাকে ধরিতে

আসি নাই। আমিও তোমার মতন পালাচ্ছি। এই দেখ, বামুনের সর্বনাশ করে এসেছি।'' এই বলিয়া একটি বাক্স দেখাইল। স্বর্ণলতা বাক্স দেখিয়া মনে স্থির করিলেন, দাসী যাহা বলিতেছে যথার্থ। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি কোন্ দিকে যাবে?''

দাসী কহিল, ''রেলের রাস্তায় যাওয়া হবে না, তা হলে ধরা পড়ব। চল আমরা বাঁ দিকে যাই। নদী পার হয়ে ওপারে আমার এক মাসীর বাড়ী আছে, আজ সেখানেই গিয়া থাকি। পরে কাল যেখানে হয় যাব।''

দাসীর কথা সঙ্গত মনে করিয়া স্বর্ণলতা দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এ-গলি ও-গলি করিয়া উভয়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু স্বর্ণলতা যেখানে যান, নৈরাশ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। গঙ্গার ঘাটে প্রথমতঃ নৌকা পাইলেন না। অনেক্ষণ কূলে প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে পার হইলেন।

গঙ্গা পার হইয়া স্বর্ণলতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, ''এতক্ষণে রক্ষা পেলাম।'' দাসী কহিল, ''তোমার ভয় কি? কিন্তু আমার এখন বিপদ্ আছে।''

স্বর্ণ জিজ্ঞাসিলেন, ''তুমি এ কর্ম করলে কেন? চুরি করলে কেন?''

দাসী কহিল, ''চুরি করব না? খুব করেছি। ওর মতন পাষণ্ড কি আর আছে? রাজ্যের লোকের টাকা চুরি করে করে বড়মানুষ হচ্ছে। আমি ওর কী ই বা নিয়েছি।'' স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসিলেন, ''তুমি এ কেমন করে নিলে?''

দাসী কহিল, ''বামুন যে সিন্দুকে টাকা রাখত, তা আমি জানতেম। অনেক বার নিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনও সুবিধা পাই নাই। আজ যখন তোমার ঘরে এল, তখন বাইরে তালার গায়ে চাবি রেখে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম তখনই নি। কিন্তু নিতে গিয়েও ভরসা হলো না। তারপর যখন ঘরে আগুন লাগল, তখন ও দৌড়ে গেল; চাবি পড়ে রইল। আমি ভাবলাম, এই সময়; এখন যদি না নি, তবে আর কখনও নিতে পারব না। বামুন যাই চলিয়া গেল, আমিও অমনি চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে এই বাক্সটা নিয়ে বেরুলাম। তুমি আমার আগে আগে বেরিয়েছিলে। তার পর তুমি যখন সদর-দরজার দিকে গেলে, তখন আমি খিড়কির চাবি খুলে বেরুয়ে এলাম। তাইতেই তুমি দুয়ার খোলা পেলে। আমিই বেরুয়ে দেখলাম, জনকতক লোক যাচ্ছে, অমনি আবার খিড়কির পিছু এলাম। তোমাকে এত ডাকলাম, তুমি শুনতে পেলে না। তারপর তুমি যখন উত্তরের দিকে যাও, তখন দেখলাম তোমাকে না ফিরালে হয় না, তাই তোমার আঁচল ধরে টানলাম, তুমি মনে করলে, আমি তোমাকে ধরতে এসেছিলাম।'' এই বলিয়া দাসী হাসিয়া উঠিল।

স্বর্ণলতা কহিলেন, ''আমার যথার্থই মনে হয়েছিল, তুমি আমাকে ধরতে এসেছিলেন।''

দাসী স্বর্ণলতাকে কহিল, ''চল ঐ আমার মাসীর বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐখানে গিয়ে আজ রাত্রে থাকি।''

স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আমি কলিকাতায় যাব কেমন করে? আবার তো কাল পার হতে হবে, নইলে গাড়ী পাব না। আমার সঙ্গে কে যাবে?''

দাসী কহিল, ''কালকার কথা কাল হবে, আজ তো এখন চল।'' এই বলিতে বলিতে উভয়ে দাসীর মাসীর বাটী পৌঁছিলেন।''

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে-গৃহে স্বর্ণলতা ছিলেন, শশাঙ্ক সেই গৃহ হইতে প্রথমে অগ্নি দেখিতে পায়। শশাঙ্ক তাহাব পূর্বক্ষণেই চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বস্থ ঘরে তত্তাপোশেব দেরাজের মধ্যে হরিদাস-দত্ত টাকাগুলি রাখিয়া আসিয়াছে। শশাঙ্ক অব্যবস্থিতচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে দ্রুতগতিতে গমন করিল। ফাল্গুন মাস; সমুদয় জিনিস শুষ্ক হইয়া আছে, অগ্নিস্পর্শ মাত্রেই জ্বলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্ববর্তী ঘরে আগুন লাগিল। লাগিবামাত্রেই হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দুই পার্শ্বে দুই ভয়ানক অগ্নিস্তম্ভ হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই বায়ু পূর্বাপেক্ষা প্রবল হওয়ায় নিকটস্থ অন্যান্য লোকের ঘর জ্বলিয়া উঠিল। সকলে কোলাহল করিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হরিদাস এক হাতে পুত্রের হস্ত ও অপর হাতে পুরোহিতের হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অগ্নি নির্বাণ হইলে পুত্রের বিবাহ দিবেন।

শশাঙ্ক বহির্বাটী আসিয়া দেখিল, যে-ঘরে টাকা বাখিয়াছে, সে ঘর হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। কিন্তু তথাপি সেই ঘরে প্রবেশপূর্বক তক্তাপোশেব উপর হইতে বিছানা দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে দেরাজ খুলিবাব জন্যে আপনার ঘুন্‌সিতে চাবির অনুসন্ধান কবিতে লাগিল; কোমরে চাবি পাইল না। কি মনস্তাপ! দৌড়িয়া যে-ঘবে স্বর্ণলতা ছিলেন, পুনরায় সেই ঘরের দ্বারে গেল। গিয়া দেখিল, তালাটি পডিয়া আছে, কিন্তু চাবি নাই। তদ্দর্শনে কপালে করঘাত কবিয়া শশাঙ্ক কাঁদিয়া উঠিল, ''হায়! আমার সর্বনাশ হলো!'' একখানি কুঠারের জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রযোজনের সময় কোন দ্রব্যই হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এদিক্ ওদিক্ অনুসন্ধান করিয়া কুঠাব মিলিল। তখন সেই কুঠার স্কন্ধে চণ্ডীমণ্ডপেব দিকে ছুটিল। গিয়া দেখিল, তখনও ঘবে প্রবেশ করা যাইতে পারে। প্রবেশ করিবে, এমন সময় হরিদাস পশ্চাৎ হইতে তাহার বস্ত্রাকর্ষণপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, ''পাত্রী কোথায়?'' চল, অন্য এক বড়ী গিয়ে বিবাহ দি।''

শশাঙ্ক বাক্য দ্বারা তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া তাহার মস্তকোপরি কুঠার উত্তোলন করিল। হরিদাস 'বাবা রে' বলিয়া দূরে পলাইল। শালকাষ্ঠের তক্তাপোশ সহজে ভাঙ্গিতেছে না। এদিকে শশাঙ্কের মস্তকোপবি অগ্নি প্রবল বায়ুভবে নৃত্য করিয়া জ্বলিতেছে। শশাঙ্ক শরীরের সমস্ত পরক্রমে তক্তাপোশের উপর এক ভীষণ প্রহার করিল। প্রহারে ঘর কাঁপিয়া উঠিল ও তৎক্ষণাৎ চাল হইতে এক জ্বলন্ত আড়কাঠা ভাঙ্গিয়া শশাঙ্কের পৃষ্ঠাদেশে পড়িল; শশাঙ্কও অমনি তক্তাপোশের উপর নিপতিত হইল। হস্তস্থিত কুঠারে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। ক্ষতস্থান হইতে প্রবল বেগে শোণিত বহিতে লাগিল। এদিকে জ্বলন্ত আড়কাঠাব আগুনে শশাঙ্কেব বস্ত্র জ্বলিয়া উঠিল। শশাঙ্ক ভীষণ রবে আর্তনাদ করিয়া কহিল, ''আমার প্রাণ বক্ষা কর, আমাকে টেনে বার কর।'' বাহিরেব লোকেরা পরস্পর পস্পরেব মুখপানে নিবীক্ষণ করিতে লাগিল। শশাঙ্ক

পুনর্বার আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ''আমাকে রক্ষা কর, আমার যথাসর্বস্ব তোমাদিগকে দেব।'' ঘর পড়ে পড়ে হইয়াছে। বাহির হইতে কেহই তাহার মধ্যে যাইতে সাহস করিল না। দেখিতে দেখিতে মহাশব্দে অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় জ্বলন্ত চাল শশাঙ্কের উপর নিপতিত হইল। শশঙ্কের জীবনের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

হরিদাস শেষ পর্যন্ত আশা করিয়াছিলেন, অগ্নি নির্বাপিত হইলে তনয়ের বিবাহ দিবেন। এক্ষণে সে ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। হরিদাসের পুত্র ক্ষুন্নমনে সহপাঠী বয়স্যদিগের সহিত ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় বেড়াইয়া পরিশেষে তিনিও পিতার অনুসবণ করিলেন। তাঁহার উপবাস মাত্র লাভ।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ হবো হবো

যে বাত্রে প্রমদার নৌকা জলমগ্ন হইল, তাহার পবদিন প্রাতে তিনি উক্ত সংবাদ থানায় পাঠাইয়া দিলেন। হেড্ কনস্টেবল সেই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করণার্থে দারোগাবাবুর নিকট আসিলেন। দারোগাবাবু তখন বেহুঁস। বড় বড় নিশ্বাস বহিতেছে, চক্ষু মুদ্রিত, ডাকিলে কথা নাই, হস্ত পদ অবশ। রমেশবাবুকে প্রশ্ন করিলে, রমেশ উত্তর দিলেন, তিনি কিছুই জানেন না। তিনি খিড়কির দুয়ারে পাহারায় ছিলেন, সকালবেলা পাহারা বদ্‌লি হইয়া আসিয়া দেখিলেন বাবু অজ্ঞান ও শুনিলেন যে বাড়ীব মধ্য হইতে লোক বাহির হইয়া গিয়াছে। পরে জানিতে পারিলেন, বাহিব হইয়া যাইবাব সময় তাহাদের নৌকা ডুবিয়াছে। হেড্ কনস্টেবল ও বমেশ, উভয়ে একত্র হইয়া দারোগাবাবুর পদদ্বয় পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কি জানি, সর্পাঘাতই বা হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। শরীরে কান আঘাতের দাগও নেই। কপালে একটা পুরাতন দাগ মাত্র আছে। হঠাৎ রমেশ দারোগাবাবুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলে তাঁহার বোধ হইল তিনি হেড্ কনস্টেবলকে ডাকিয়া কহিলেন, ''জমাদারসাহেব, আমার বোধ হচ্ছে যেন দারোগাবাবুর নিশ্বাসে মদের গন্ধ নির্গত হইতেছে। যেন বাবুর নিশ্বাসে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে! আপনি একবার দেখুন দেখি?''

হেড্ কনস্টেবল দারোগাবাবুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন, ''বমেশ ঠিক ধরেছ।''

রমেশ কহিলেন, ''মহাশয়, আমারা পুলিশের লোক কি না। কত ফন্দি করে মকর্দমা আস্কারা করতে পারি।''

হেড্ কনস্টেবল কহিল, ''তবে এখন উপায়? এস, কেউ না টের পেতে পেতে বাবুর মাথায় জল ঢেলে দেখি, তাতে আরাম হন কি না!''

রমেশ কহিলেন "মহাশয়, এটা কি ভাল কথা বল্লেন? শেষে যদি ভদ্রাভদ্র হয়, তা হলে আমাদের ঘাড়ে ঝুঁকি পড়বে। আমার মতে ডেপুটি কলেক্টববাবুর নিকট গিয়া এৎলা দেওয়া উচিত।"

হেড্ কনস্টেবল কহিল, "তা হলে বাবুর চাকরির উপর দোষ পড়বে।"

রমেশ উত্তর করিলেন, "যিনি যে কর্ম্ম করবেন, তিনিই তার ফলভোগ করবেন। আমার ঘাড়ে ঝুঁকি রাখব কেন?"

রমেশের মুখ কালির মত। কথা কহিতে ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে, কিন্তু হেড্ কনস্টেবল সেরূপ হইতেছে না। উভয়ে ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ডেপুটিবাবুর কাছে খবর দেওয়াই উচিত। লোকজন আনিয়া দারোগাবাবুকে তুলিয়া লইয়া যাইবার সময় তিনি যেখানে শুইয়াছিলেন, তাহার নিকট একটা বোতল দেখা গেল। ঘ্রাণ লইয়া রমেশ কহিলেন, "বোধ হয় এই বোতলেই মদ ছিল। বোতলটা আর কি হবে, ফেলি দি।"

হেড্ কনস্টেবল কহিল, "এমন কর্ম্মও করতে আছে? ও বোতলটা চালানের সঙ্গেই পাঠাতে হবে। দেখি, ওর মধ্যে কিছু আছে কি না?"

হেড্ কনস্টেবলের কথা শুনিয়া রমেশ কম্পিত হস্তে বোতলটি উপুড় করিলেন।

ক্ষুদ্র ধারে একটু কাল জলের মতন জিনিস বোতল হইতে পড়িল। রমেশ কহিলেন, "কিছুই নাই।"

হেড্ কনস্টেবল কহিলেন, "ঐ যে কি একটু পড়ল, ওটুকু ফেল্লে কেন? তুমি পুলিশের লোক হয়ে এমন কাঁচা কাজ করলে! দাও, বোতল আমার কাছে দাও।"

বোতলটি দেবার সময় রমেশের হাত ঠকঠক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হেড্ কনস্টেবল বিস্মিত নেত্রে রমেশের মুখপানে নিরীক্ষণ করিলেন। জিহ্বা দ্বারা ঠোঁট ভিজাইয়া রমেশ কহিলেন, "কাল সমস্ত রাত জেগে যেন গা কাঁপছে। স্নান করে একটু ঘুমাতে পারলে বাঁচি।" তৎকালে হেড্ কনস্টেবলের মুখ দেখিলে বোধ হইতে পারিত যে, রমেশের কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। বরঞ্চ তাঁহার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ উদয় হইল।

রমেশ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

হেড্ কনস্টেবল দারোগাকে লইয়া ডেপুটি কলেক্টরবাবুর নিকটে শোয়াইয়া বোতলটি তাহার নিকট রাখিলেন। ডেপুটি কলেক্টর উভয়কেই কৃষ্ণনগর চালান করিয়া দিয়া জমাদারকে নৌকা ডোবার তদারকের ভার দিলেন।

জমাদার, রমেশ ও অন্যান্য কনস্টেবল সকলে একত্র হইয়া যে স্থানে নৌকা ডুবিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া মাঝিদিগকে জলে ডুব দিয়া জিনিসপত্র তুলিতে কহিলেন। তাহারা বস্ত্রাদি ভিন্ন আর কিছুই পাইল না। তখন জমাদার আরও অন্যান্য লোকজন আনাইয়া নৌকা জল হইতে তুলিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রমদার বাক্স পাইলেন না। অনন্তর হেড্ কনস্টেবল, কি প্রকারে প্রমদাও প্রমাদার মাতা বাটী হইতে বাহির হইলেন, তাহার অনুসন্ধানার্থ শশিভূষণের বাটীতে গমন করিলেন। গমন করিয়া প্রথমতঃ রমেশকে বৃত্তান্ত

জিজ্ঞাসা করিলেন। রমেশ কিছুই জানেন না। তিনি খিড়কিতে পাহারায় ছিলেন। সেদিক্ হইতে কেহই বাহির হয় নাই। পরে হেড্ কনস্টেবল গদাধরের জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কাল রাত্রে কে ছেড়ে দিয়েছিল?"

গদাধরের জননী উত্তর করিলেন, "যে আমার জামাইদের বাড়ী-কাল চৌকি দিচ্ছিল।"

"তার নাম কি?"

গদাধরের জননী উত্তর করিলেন, "তাব নামটি বেশ, ঐ যে আমাদের বাটী আসত, আমার গদাধরচন্দ্রের সঙ্গে যার বড় প্রণয় ছিল। তারপর যে গদাধবচন্দ্রেব সর্বনাশ করে টাকাও নিলে, মেয়াদও দিলে।"

হেড্ কনস্টেবল কহিলেন, "আপনি তাকে দেখলে চিনতে পারবেন?"

গদাধরের জননী কহিলেন, "তা কেন পারব না?"

পুনরায় হেড্ কনস্টেবল জিজ্ঞাসিলেন, "গদাধবেব কাছ থেকে কে সর্বনাশ করে টাকা নিলে?"

গদাধরের জননী কহিলেন, "গদাধর আর সে, দুজনে কার চিঠি খুলে টাকা নিত। আমার ছেলের কোন দোষ ছিল না। সেই পাহারাওয়ালাই আমার ছেলেকে শিখিয়ে দেয়। তারপর যখন এর অনুসন্ধান হলো, তখন একদিন এসে বল্লে, আমাকে ১০০ টাকা দাও না দিলে আমি সব বলে দেব; কি করি বাবু, আমি গবীব মানুষ, টাকা কোথায় পাব। আমার জামাই বড় মানুষ, কিন্তু তা বলে তো আমি বড়মানুষের মাগ নই। আমার যে দু-একখানা গয়না ছিল, আমার মেয়ের কাছে বন্দক রেখে টাকা দিলাম, কিন্তু আবার তার পরদিন সেই পাহারাওয়ালা দারোগাকে ডেকে এনে গদাধরকে ধবিয়ে দিলে।" প্রমদার মাতা এতদূর বলিয়াছেন এমন সময়ে রমেশ কার্যান্তিব হইতে তথায় উপস্থিত হইলেন। গদাধবের জননী তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "পাহারাওযালা, তোমাকে বৃথা টাকা দিলাম। দেখ, আমার প্রমদার তাও গেল, বাকি যা ছিল তাও গেল।" হেড্ কনস্টেবল পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "কাকে টাকা দিয়েছিলেন?"

গদাধরের জননী রমেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

রমেশ বিস্ময় ভান করিয়া কহিল, "তুমি কি আমাকে টাকা দিয়েছিলে?"

গদা জননী। তোমাকেই তো।

রমেশ। না তুমি ভুলেছ।

গদাধরের জননী কহিলেন, "কেন বাপু মিথ্যা কথা কও? আমি কি তোমাকে চিনি নে? তুমি একবার গদাধরের কাছ থেকে এক-শ টাকা নিলে, কাল আবার আমার মেয়ে তোমাকে ২৫ টাকা দেয়। আমি তোমাকে বেশ চিনি। আর চিনবই বা না কেন? একবার দুবার তো দেখা না। গদাধরের সঙ্গে তোমার কতই ভাব ছিল। তুমি রোজই আমাদের বাড়ী আসতে।"

এই কথা শুনিয়া রমেশ আর কথা কহিতে পারিল না। হেড্ কনস্টেবলের মনেও আর সন্দেহ রইল না। অবিলম্বে তিনি রমেশকে বন্ধন করিয়া চালান দিলেন।

রমেশ তথাপি একবার কহিল, "দেখবেন মহাশয়, আমার কিন্তু কোন দোষ নাই। আপনাকে এর ফল ভুগতে হবে। আমাকে চাষা মনে করবেন না। আমি পুলিশের লোক।"

হেড্ কনস্টেবল কহিলেন, "তুমি পুলিশের লোক, আর আমি কি পুলিশের কেউ নই?" এই বলিয়া একখানি কাগজে চালান লিখিয়া আর দুইজন কনস্টেবলের হাতে রমেশকে সমর্পণ করিলেন।

দীনবন্ধুবাবু তিন দিবস নিদ্রার পর গাত্রোত্থান করিলেন। ডাক্তারসাহেব বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই দারোগাবাবুর সে নিদ্রা মহানিদ্রা হয় নাই। জাগ্রত হইয়া তিনি মেজিস্টর সাহেবের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এদিকে ডাক্তারসাহেব বোতল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বোতলে সুরা ও অহিফেন ছিল।"

বামধনের হাজত হইল। কিন্তু রামধন নির্দোষিতার প্রমাণ দিয়া খালাস হইয়া আসিল। সে মদের সহিত কিছুই মিশ্রিত করে নাই। তবে কে করিল?

এই গোলযোগের সময় শশিভূষণে বাটীব নিকট একটি লোক ডাক্তারি কবিত। সে কহিল, "বমেশবাবু একদিন রাত্রে পেটের পীড়া হয়েছে বলে লডেনম্ (অহিফেনের আরক) লইয়া গিয়াছিলেন। রমেশবাবু নগদ মূল্য দেন নাই, এজন্য তাঁহার খাতায় তাঁহার নামে চারি আনার লডেনমের খরচ লেখা বহিযাছে।" এই কথা প্রকাশ হইবামাত্র থানায় খবর হইল। তিন দিবস পরে তাঁহার নামে কৃষ্ণনগরে গিয়া সাক্ষ্য দিবার হুকুম আসিল। ডাক্তার কৃষ্ণনগরে গিয়া সাক্ষ্য দিল যে, অমুক দিবস বাত্রে বমেশ পেটেব পীড়া হইয়াছে বলিয়া চারি আনাব লডেনম্ লইয়াছিল। তারিখ ঐক্য করায় প্রকাশ হইল যে, সেই রাত্রেই দীনবন্ধুবাবু অজ্ঞান হন। রমেশের ভবা সম্পূর্ণ বোঝাই হইল। রমেশের নানাবিধ দোষ বাহির হইতে লাগিল। প্রথমতঃ গদাধরের সহিত নোট চুবি, পবে উৎকোচ গ্রহণ, তদনন্তর উৎকোচ লইয়া প্রমদা ও তাঁহার জননীকে ছাড়িয়া দেওয়া, দীনবন্ধুবাবুকে সুরার সহিত আফিং সেবন করানো হয়, ইহাতে দীনবন্ধুবাবুর মৃত্যু হইতে পারিত। এই সমস্ত দোষ একত্র হওযায় রমেশ পুলিশের লোক হইয়াও আর কথা কহিতে পাবিল না। জজ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার কোন ছল আছে?" রমেশ অধোবদনে নীরব হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে জুরীবা তাহাকে সমুদয় অপরাধেই দোষী করিলেন। অনন্তর জজ সাহেব তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তবের হুকুম দিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এই হলো

দুঃসহ মনঃকষ্টে গোপাল বজনী অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার নিকট সে বাত্রি অবসান হয় না। এক এক দণ্ড যেন এক এক প্রহরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রজনীকে শান্তিদায়িনী বলিয়া লোকে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তিনি কাহাকে শান্তি প্রদান. করেন?

যাহাবা মনাগুনে দগ্ধ হইতেছে, তাহাদিগকে না; যাহারা শয্যাগত রোগী, তাহাদিগকে না; যাহাবা দীন-দুঃখী, তাহাদিগকে না; এ সমস্ত লোকের চিন্তাক্লেশ যামিনীযোগেই বৃদ্ধি হয়! রজনী সমাগত হইলেই ইহারা আপন আপন মনেব হুতাশনে দগ্ধ হইতে থাকে। যাহারা দুগ্ধফেনসন্নিভ পর্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া থাকে, অনববত দাস-দাসী যাহাদিগকে ব্যজন করে, রতি হইতে রূপবতী কামিনী যাহাদিগের তুষ্টি বর্ধন করে, বজনী তাহাদিগকে শান্তি দান কবেন। করিবেন না কেন? সকলেই যাহাদিগেব পদলেহন করে, যামিনী কোন্ মুখে তাহাদিগকে পবিত্যাগ করিবেন?

রজনী প্রভাত হইলে পূর্বদিক হইতে দিবাকর দর্শন দিলেন। সাহেববাহাদুর জানালা খুলিয়া দ্বিতীয় দিবাকরেব ন্যায় বাহিবে দৃষ্টিপাত করিলেন। রেলওযেব বাবুরা পিরান ও লালবঁধকরা জুতা পায়ে যে যাহাব কার্যে নিযুক্ত হইলেন। তারেব খবব চলিতে লাগিল, ঘোর বোলে ঘন্টা বাজিয়া টিকিটগ্রাহীদিগকে আহ্বান করিল। হুস্ হুস্ শব্দ করিয়া ট্রেন আসিল। আবাব ঘন্টা বাজিল, পতাকা উড়িল, স্টেশনমাস্টার ''অল রাইট্'' বলিল। সদম্ভে ধরণী কাঁপাইয়া লৌহ-অশ্ব পুনরায় ধাববান হইল।

দু-বার তিনবার গাড়ী এল গেল। গোপালের চিন্তায় শরীর শুকাইয়া যাইতেছে। এক রাত্রের মধ্যে তাঁহাব এরূপ চেহারা হইয়াছে, যেন তিনি কতদিন উপবাস করিয়া আছেন। ক্রমে ক্রমে দশটা বাজিল। তখন সাহেববাহাদুর গোপালের নিকট হইতে মূল্য লইয়া ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন।

গোপাল একটার সময় শ্রীরামপুর আসিবার জন্য পুনরায় বাষ্পীয় শকটারোহণ করিলেন।

গাড়ীতে আসিতে আসিতে গোপালের মনে কত ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল। কখন ভাবিতে লাগিলেন, ''স্বর্ণলতা চিরদুঃখ-হ্রদে নিমজ্জিত হইয়াছেন। কখন ভাবিতে লাগিলেন, স্বর্ণ তেমন নয়! হয়ত আত্মহত্যা করিয়াছেন। ভাবিতে কি ভয়ানক? যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তবে আমার দোষেই করিয়াছেন। কেনই বা আমি ঘুমাইয়াছিলাম? স্বর্ণলতার যদি বিবাহ হইয়া থাকে, কিংবা স্বর্ণ যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।'' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন। লৌহ-অশ্ব যথাকালে শ্রীরামপুর পৌঁছিল। ব্যগ্র হইয়া গোপাল গাড়ী হইতে নামিয়া টিকিট দিয়া স্টেশনের বাহিরে গেলেন। শশাঙ্কের বাটী জিজ্ঞাসা করিয়া অনেকক্ষণের পর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাড়ীঘর কিছুই নাই, কেবল কয়েকটি ভস্মরাশি রহিয়াছে, আর পুলিশের লোক তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। দেখিয়া গোপালেব হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, পদদ্বয় বলহীন হইয়া পড়িল, এবং মস্তক ঘুরিতে লাগিল। গোপাল ভাবিলেন স্বর্ণলতা যথার্থই আত্মহত্যা কবিয়াছেন। এই চিন্তা মনে হওয়াতে গোপাল আর চলিতে পাবিলেন না। রাস্তায় শিরে কর সংলগ্ন করিয়া উপবেশন করিলেন। একটি কনস্টেবল তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। গোপালের এমন সাহস হইল না যে, কনস্টেবলকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন।

ক্ষণকাল তথায় বসিয়া গোপাল সাহসে ভর করিয়া ভস্মরাশির নিকট গমন করিয়া বিনীতভাবে দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এখানে কি হয়েছে? আপনারা কিসের তদারক করছেন?"

দারোগা গোপালের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল যে, গোপাল কোন দুঃসহ মনঃপীড়া পাইয়াছেন। তখন উত্তর করিলেন, "ঘরে আগুন লেগে এ বাটীর কর্তা শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরির মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাহারই অনুসন্ধান করছি। শশাঙ্কশেখর কি আপনার কেউ ছিলেন?"

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন, "না মহাশয়, শশাঙ্কশেখর আমার কেউ ছিলেন না। কিন্তু আর কোন ঘটনা হয় নি? কেউ কি আত্মহত্যা করেছে?"

দারোগাবাবু হাসিয়া কহিলেন, "না না। কেন, সে কথা তোমার মনে হলো কেন?"

গোপাল কহিলেন, "আমার ভগিনী এইখানে ছিলেন। শশাঙ্ক জোর করে তার বিবাহ দেবার উদ্যোগ করেছিলেন। আমি সন্ধ্যাবেলা ভগিনীকে নিয়ে যেতে আসছিলাম। কিন্তু গাড়ীতে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় আমার চৈতন্য রহিত হয়। বর্ধমানে গিয়ে আমার চেতনা হলো। আমার ভগিনী লিখেছিলেন, যদি কেউ তাঁকে না নিতে আসে, তা হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে গোপালের চক্ষু হইতে সহস্রধারে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল।

দারোগাবাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, আপনার ভগিনী নিরাপদে আছেন। এখানে একমাত্র শশাঙ্কেরই কাল হয়েছে। সাক্ষী পাওয়া গিয়েছে, আপনার ভগিনী আগুন লাগতে লাগতেই পালিয়েছিলেন।"

গোপাল দারোগাবাবুর কথা শুনিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। মুহূর্তমধ্যে তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল ও চক্ষু রক্তবিহীন হইল এবং হস্ত-পদ কম্পিত হইতে লাগিল। দারোগাবাবু তাঁহাকে সাদরে বিছানায় বসাইয়া, তাঁহার মুখে ও মস্তকে জল দিতে লাগিলেন। একটু পরে গোপাল সুস্থ হইলে দারোগাবাবু জিজ্ঞাসিলেন "আপনার কি কোন পীড়া আছে?"

গোপাল কহিলেন "না।"

দারোগাবাবু, জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার আহার হয়েছে?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "কাল রাত অবধি কিছু আহার করি নাই।"

দারোগাবাবু অবিলম্বে গোপালের জন্য খাবার আনাইলেন। গোপাল কোন মতেই আহার করিবেন না। কহিলেন, "ভগিনীর অনুসন্ধান না করে জলগ্রহণ করব না।"

দারোগাবাবু কহিলেন, "আপনার গায়ে শক্তি না থাকলে কি প্রকারে অনুসন্ধান করবেন? আপনি আগে আহার করুন, পরে আমার একজন লোক আপনার সঙ্গে পাঠায়ে দেব।"

দারোগাবাবুর কথায় গোপাল কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। আহার করিয়া দারোগাবাবুকে কহিলেন, "আপনি তবে অনুগ্রহ করে একজন লোক আমার সহিত দিন।"

দারোগাবাবু একজন কনস্টেবল দিলেন। গোপাল কনস্টেবলের সহিত প্রতি গৃহে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোনখানেই স্বর্ণের দেখা পাইলেন না। কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, ''স্বর্ণলতা হয় আত্মহত্যা করিযাছে, নচেৎ পুড়িয়া মরিয়াছে।'' গোপাল আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না। একটু পরে কনস্টেবলকে বিদায় দিয়া গোপাল গঙ্গাতীরে ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলেন।

গোপাল যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে জনকতক নৌকার মাঝি তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। একজন কহিল, ''তুই তো এর কিছু চিনিস্ নে? এর দাম কত জানিস্? আর এক জন কহিল, ''এর দাম কি? তুইই আমার সঙ্গে যাস্, তোর যত খুশি, আমি তোকে এমনি পাথর দেব।''

তৃতীয় এক ব্যক্তি কহিল, ''ওর দাম থাকুক আর না-থাকুক, সোনার দাম তো আছে?''

দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনর্বার কহিল, ''এ তো সোনার না। বড়মানুষে কি আজকাল সোনা পরে?''

প্রথম ব্যক্তি কহিল, ''বড়মানুষে পিতলের গয়না পরে, আর তোর ঘরে সব সোনার গয়না, না?''

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, ''আমার বাড়ী সোনার গয়নাই তো? তার আর মিথ্যা কথা কি? বড়মানুষে পেতল পরলে লোকে বলে সোনা, কিন্তু আমরা যদি মোহর গলায় গেঁথে দি, তবু লোকে বলে পেতলের মোহর।''

যাহার সেই সোনা ও পাথরটি, সে কহিল, ''আচ্ছা তোমাদের গোলযোগে কাজ নাই। আমার জিনিস, আমাকে দাও। সোনা হয় আমার থাকবে, পেতল হয় তাও আমার থাকবে।''

প্রথম ব্যক্তি কহিল, ''আমি বললাম ঠিক। এর দাম ঢের টাকা। বিশ্বাস না হয়, চল—ঐ একটি ভদ্রলোক শুয়ে আছে। ওর কাছে জিজ্ঞাসা করি।''

সকলেই তাহার কথায় সায় দিয়া গোপালের নিকট আসিয়া তাঁহার হস্তে একটি আংটি দিয়া কহিল, ''মহাশয়, এ আংটিটির কি দাম আপনার পছন্দ হয়?''

গোপাল আংটিটি হাতে পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, পরে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এ আংটি তোমারা কোথায় পেলে?''

গোপালের চক্ষু হইতে যেন জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। পূর্বে মৃতের মতন ছিলেন হঠাৎ যেন তাঁহার উৎসাহ বর্ধন হইল। আংটিটি স্বর্ণলতার, গোপাল দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন।

নাবিকেরা তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। যাহার আংটি, সে কহিল, ''মশাই; কাল সন্ধ্যার পর আমি দুটি স্ত্রীলোককে পার করে দিয়েছিলাম। তাদের পয়সা ছিল না। পয়সার বদলে আমারে এই আংটি দিয়েছে।''

নাবিকের কথা শুনিয়া গোপাল উঠিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, ''তবে এখনও জীবিত আছে।'' পরে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, ''সে স্ত্রীলোক দুটি কোথায় গিয়েছে?'' নাবিক কহিল, ''শশাঙ্কশেখর ঠাকুরের চাকরাণীর মাসীর বাড়ী গিয়েছে।''

গোপাল কহিল, ''এ আংটিটির দাম অতি কম হলেও ত্রিশ টাকা হবে। তোমরা কেউ যদি আমাকে সেই বাড়ী রেখে আসতে পার, তবে আমি আর পাঁচ টাকা দি।''

চারিজন নাবিক সকলেই কহিল, ''আমি যাব, আমি যাব।'' যে স্বর্ণলতাকে পার করিয়াছিলেন, সে কহিল, ''তোরা কেউ যেতে পাবি নে। আমি সে বউটিকে পার করিছি, তার সোয়ামিকেও পার করব।'' নাবিক কেন স্বর্ণকে বউ মনে করিল, আর গোপালকেই বা কেন স্বর্ণের স্বামী ভাবিল, তাহা সেই নাবিকই জানে। গোপাল তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পার হইয়া নাবিক তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করাইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া নাবিক কহিল, ''ঐ সে বাড়ী। আমার বকশিস দাও।''

গোপাল নাবিককে যে পাঁচ টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা তদ্দণ্ডে প্রদান করিলেন। পরে দুই চারি পা সম্মুখে গিয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার কাছে আর একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। গোপাল দ্রুতপদে তথায় গিয়া, 'স্বর্ণ' বলিয়া ডাকিলেন; এবং স্বর্ণ তাঁহার নিকটে না আসিতে আসিতে অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এই হইয়াছে

চেতনা পাইয়া গোপাল দেখিলেন, তিনি স্বর্ণলতার জানুর উপর শির স্থাপন করে শয়ন করিয়া আছেন। স্বর্ণলতা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছেন এবং শশাঙ্কের দাসী নিকটে ঘটিতে জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলে স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এখন কেমন আছ? একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?''

গোপাল কহিলেন, ''আমি কোথায় আছি?''

স্বর্ণ উত্তর করিলেন, ''তুমি আমার কাছে আছ, আমি স্বর্ণ; এখন কি একটু ভাল বোধ হচ্ছে?''

গোপাল যেন সমুদয় স্মরণ করিয়া লইবার জন্য একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, ''আমি ভাল হইছি।''

গোপাল স্বর্ণলতার জানু হইতে শির উত্তোলন করিলেন। গোপালের মনে হইতে লাগিল, ''এমন উপাধান পাইলে যাবজ্জীবন মূর্ছিত হইয়া কাটাইতে পারি।''

আবার ক্ষণকাল পরে গোপল চক্ষু মেলিলেন। স্বর্ণলতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এখন কেমন আছ?'' গোপাল অতি অনিচ্ছাপূর্বক আস্তে আস্তে মস্তক উঠাইয়া কহিলেন, ''আমি ভাল হইছি। কিন্তু তুমি এখানে কেমন করে এলে?''

স্বর্ণলতা কহিলেন, ''এখনি তুমি সে কথা শুনতে পাববে না ; একটু পরে বলব।'' এই বলিয়া স্বর্ণলতা তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। একটু পরেই পুনরায় গোপালের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহাবে লইয়া গমন কবিলেন। স্বর্ণ বহু দিবস গোপালকে দাদা বলিয়া ডাকা ছাড়িয়াছেন। গোপাল মনে কবিতেন, তিনি দরিদ্র বলিয়া স্বর্ণ তাঁহাকে আর দাদা বলিয়া সম্বোধন করেন না, কিন্তু স্বর্ণলতার জানুর উপব শয়ন করা অবধি তাঁহার সে চিন্তা দূব হইয়া আর এক প্রকার চিন্তা উপস্থি হইল। তিনি এক্ষণে আদ্যোপান্ত দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন। গোপালের আহ্লাদেব আর সীমা রহিল না।

স্বর্ণলতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দেখিলেন, ঘরের মধ্যে স্বর্ণলতা তাঁহাব জন্য জলখাবার সাজাইয়া রাখিয়াছেন। গোপালকে স্বর্ণলতা সেই জলখাবার খাইতে কহিলেন।

গোপাল যৎকিঞ্চিৎ আহাব করিয়া বসিলেন। স্বর্ণলতা আদ্যোপান্ত আপনাব ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। স্বর্ণলতা কখন গোপালকে রাগ কবিতে দেখেন নাই, কিন্তু অদ্য যখন তিনি শশাঙ্কের শঠতার কথা শ্রবণ কবিলেন, তখন স্বর্ণলতা সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তাঁহার নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ হইল। দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, এবং দক্ষিণ হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। স্বর্ণলতার কথা শেষ হইলে গোপাল কহিলেন, ''তবে আর আমার শশাঙ্কেব মৃত্যুতে এক বিন্দুও দুঃখ নাই।''

স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসিলেন, ''শশাঙ্কের ঘরে কি রকমে আগুন লেগেছিল?'' গোপাল আরক্তিম মুখ অবনত করিয়া কহিলেন, ''শুনলাম, লুচি ভাজতে ভাজতে সেই ঘৃত জ্বলে উঠে আগুন লেগেছিল।''

এই কথা বলিয়া গোপাল আপনার ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্ণলতা যেই শুনিলেন যে, পাছে হেমের পীড়া বৃদ্ধি হয় বলিয়া গোপাল স্বর্ণের আসন্ন বিপদের কথা তাহাকে না জানাইয়া স্বর্ণের উদ্ধারার্থে বাহির হইযা গেলেন, অমনি তাঁহার চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। গোপালের বর্ধমানে গমন ও কারাবাসের কথা শুনিয়া স্বর্ণলতা পূর্বাপেক্ষা প্রবলবেগে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সে রাত্রে গোপালের ও স্বর্ণের কাহারও নিদ্রা হইল না।

পরদিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিযা শশাঙ্কের পূর্ব দাসী ও স্বর্ণলতাকে সমভিব্যাহাবে লইয়া গোপাল বারাকপুর স্টেশনে গিয়া রেলওয়ে উঠিলেন। অবিলম্বে শিয়ালদহ পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে গাড়ী করিয়া বকুলতলা স্ট্রীটে হেমের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

হেম এক্ষণে চলিয়া বেড়াইতে পাবেন। সকালে গাত্রোত্থান করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময় গাড়ী গিয়া দ্বাবে উপনীত হইল। গোপাল অগ্রে বাহিব হইলেন, হেম হস্ত প্রসারণপূর্বক গোপালের হস্ত ধবিযা কহিলেন, ''তোমার ভবানীপুরে কি এমন কর্ম ছিল যে, আজ তুমি তিন দিন সেইখানেই বসে আছ?''

গোপাল কথা কহিবেন, এমন সময় গাড়ীর অভ্যন্তর হইতে শশাঙ্কেব দাসী ভূমে অবতরণ করিল। হেম জিজ্ঞাসিলেন, ''এ আবার কে?'' হেমেব প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে স্বর্ণলতা নামিলেন। হেম পূর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, ''স্বর্ণ কোথা

হতে এলে? এস দিদি এস।" এই বলিয়া হেম স্বর্ণের কাছে গেলেন। স্বর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে হেমের হস্ত ধারণপূর্বক গৃহের মধ্যে আসিলেন।

এক দিবস গোপাল ও হেম একত্র বসিয়া আছেন। হেম এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। গোপালের চেহারা কিন্তু আর পূর্বের মত নাই। হেম এত দিনের পর ইহার কারণ জানিতে পারিলেন, জানিতে পারিয়া হেমের যারপর-নাই আহ্লাদ হইল। তিনি দেখিলেন যে, উভয়ের অনুরাগ উভয়ের প্রতি সমান, ইহাদিগের বিবাহ হইলে পরমসুখে কাল যাপন করিবে।

হেম ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "গোপাল, তোমাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

গোপাল জিজ্ঞাসিলেন, "কি কথা?"

হেম কহিলেন, "তোমার সেই—বৎসরকার পূজার সময়ের কথা মনে পড়ে?"

গোপাল কহিলেন, "হাঁ পড়ে।"

হেম কহিলেন, "আচ্ছা, একদিন তুমি আর আমি দালানের রোয়াকে বসেছিলাম, এমন সময়ে বাবা এসে তথায় বসলেন এবং একটু পরেই স্বর্ণলতার বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। সে কথা তোমার মনে আছে?"

গোপাল কহিলেন, "হাঁ আছে।"

হেম। "স্বর্ণলতার বিবাহের কথা উত্থাপন হলে তুমি তথা হতে চলে যাচ্ছিলে। বাবা বললেন, তোমার উঠিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি বল্লাম, তোমার শরীর অসুস্থ আছে। উঠে যাওয়াই ভাল। তাই শুনে তুমি মুখ বাঁকিয়ে উঠে গেলে। সে কথা মনে পড়ে?"

গোপাল লজ্জাবনতমুখে উত্তর করিলেন, "পড়ে।"

হেম কহিলেন, "আচ্ছা, এখন বল দেখি, আমি উঠে যাওয়ার পোষকতা করেছিলাম কেন?"

গোপাল। "আমি বলতে পারলাম না।"

হেম কহিলেন, "পারলেও তুমি বলবে না। আমি বলি শোন। তোমার সহিত স্বর্ণের বিবাহ দেবার প্রস্তাব করব বলেই তোমাকে আমি সরায়ে দিলাম। তুমি মুখ বক্র করলে, তা আমি দেখেছিলাম। কিন্তু কিছু বললাম না।"

গোপালের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার সহিত স্বর্ণের বিবাহ দিতে বাবার একমাত্র আপত্তি এই ছিল যে, তোমার ধন নাই। গোপাল, রাগ করো না। আমি আমার কথা বলছি না। বাবা যা মনে করতেন, তাই বলছি। তাঁহার একমাত্র আপত্তি ছিল যে, তোমার ধন নাই। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে এতদিন আমি তোমার সহিত স্বর্ণের বিবাহ দেওয়াতাম। তাঁর কাল হয়েছে বলেই তোমাদের বিবাহের দেরি হয়ে পড়েছে। এখন আমার কথা এই, যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তোমার পিতাকে চিঠি লিখে আনিয়ে তুমি স্বর্ণের পাণিগ্রহণ কর।"

হেমের কথা শুনিয়া গোপালের চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। গোপাল কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। হেম কহিলেন, ''আর তোমার কথায় কাজ নাই, আমি সব বুঝেছি। এখন তোমার বাপকে পত্র লেখ।''

গোপাল ও স্বর্ণলতার বিবাহ হইয়াছে।

শশিভূষণের মোকর্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সত্য কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া শশিভূষণ অব্যাহতি পাইয়াছেন। মন্থরি, হিসাবনবিস ও খাতাঞ্জি, প্রত্যেকের কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। শশিভূষণের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিপিন, কামিনী ও তিনি গোপালের বাটীতে থাকেন।

প্রমদা পিত্রালয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁহার ভরণপোষণের ব্যয় গোপালকে দিতে হয়। এজন্য গোপাল তাঁহাকে নিজ বাটী আনিবার জন্য যত্ন পাইয়াছিলেন। কিন্তু শশিভূষণ তাঁহাকে সে যত্ন হইতে নিরস্ত করিলেন। পিত্রালয়ে প্রমদার কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। সকলেরই সহিত কলহ করিয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার মাতার সহিত মাঝে মাঝে কথা কহেন।

বিধুভূষণ ডেপুটি কলেক্টরবাবুর নিকট হইতে আসিয়া বাটী বাস করিতেছেন। তাঁহার অল্প বয়েসেই সমুদায় কেশ শুক্ল হইয়াছে। তাহাকে এক্ষণে শশিভূষণ অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ দেখায়। স্বর্ণলতার একটি পুত্র হইয়াছে। বিধু সমস্ত দিবস সেই পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া খেলা দেন। স্বর্ণলতা আদর করিয়া পুত্রটির নাম ন্যাপাল রাখিয়াছেন।

হেমচন্দ্র বৎসরের মধ্যে ছয় মাস স্বর্ণলতার বাটিতে আসিয়া থাকেন। তিনি যখন আসেন, তখন গোপালের ও স্বর্ণলতার আনন্দের সীমা থাকে না। একবার আসিলে হেমচন্দ্র সহজে আর নিজ বাটী গমন করিতে পারেন নাই। যদি তিনি কোন কারণবশতঃ নিয়মিত মাসে না আসিতে পারেন, তাহা হইলে স্বর্ণলতা ও গোপাল উভয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হন ও রাগ করেন।

শ্যামা বাটীর গৃহিণীস্বরূপ থাকেন। স্বর্ণলতা তাহাকে নিজের শাশুড়ির ন্যায় ভক্তি ও যত্ন করেন।

নীলকমলের উপর বিধুভূষণের অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল। উভয়েই বড় দুঃখে প্রথমেই বাটী হইতে অর্থোপার্জনে নিষ্ক্রান্ত হন। বিধুভূষণ এক্ষণে সুখী হইয়া নীলকমলকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার বড় ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথাও নীলকমলের দেখা পাইলেন না।

পশুপতি সম্বাদ

চন্দ্রনাথ বসু

প্রথম ভাগ

১

সকলেই জানেন যে কলিকাতার অনতিদূরে গোধনপুব নামে একটি গ্রামে আছে। গ্রাম খানি খুব ছোটও নয়, খুব বড়ও নয়—অধীবাসীব সংখ্যা ৮ শতের অধিক নয়, কিন্তু সেন্সস্ রিপোর্টে ২৫০০ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহাবা ঐ রিপোর্টের লিখিত সংখ্যা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাবা করুন, আমরা করিব না। আমরা এক বৎসর গোধনপুরের মাঠে চড়ক দেখিতে গিযাছিলাম। তখন গ্রামেব আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই চড়কডাঙ্গায় উপস্থিত ছিল। আমাদেব বোধ হইল যে, গ্রামেব কুলবধূ, যাঁহাবা প্রকাশ্যভাবে বাহির হন না, তাঁহাদেব শুদ্ধ ধরিলে অধীবাসীব সংখ্যা আমরা যা বলিয়াছি, তাহার বেশী হইবে না। অতএব, কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি সমুচিত সন্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা ৮ শতকে ২৫ শত বলিতে অস্বীকৃত হইলাম।

গোধনপুরের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী এবং গোয়ালা। ব্রাহ্মণ বিশ পঁচিশ ঘরের বেশী নয়; কায়স্থ প্রায় চল্লিশ ঘর। কৃষিজীবীরা চাষ করে, ধান বেচিয়া জমিদারেব খাজনা দেয়, খাজনা দিয়া যাহা থাকে, তাহাতে কোন রকমে দিনপাত কবে, বড় একটা হাহাকার করে না। কলিকাতার কল্যাণে গোযালাদেব আজকাল জোর পড়তা। গোধনপুরের গোয়ালারা কলিকাতার বাবুমহলে জলকে দুধ বলিয়া বিক্রয় করিয়া বেশ টাকা লাভ করে, বাবুদেব ছেলে মেয়েদের কফ কাশী সাবে না, কিন্তু গোয়ালাদেব গৃহিণীবা ভাল ভাল সোণাব গহনা পবিয়া দশমহাবিদ্যার ন্যায় দশ দিকে দশ রকম মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গোকুল গোধনপুরের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে দেয় না।

গোধনপুরের ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের মধ্যে কেহই ধনশালী নয়, সকলেই সামান্য গৃহস্থ। সাবেক প্রথামত সকলেরই কিছু কিছু চাষ আছে, চাষের ধানই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। কেবল ব্রাহ্মণঠাকুরদের মধ্যে কাহারো দুই এক ঘর যজমান, কাহারো দুই এক ঘর শিষ্য আছে। কিন্তু আজকাল গোধনপুবের ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের আর পূর্ব্বের মত সুখ শান্তি নাই। গ্রামের গোয়ালিনীদের গায় সোণাদানা দেখিয়া তাঁহাদের আর খাইয়া পরিযা সুখ হয় না। তাঁহাবা চোক বুজিযা সন্ধ্যাহ্নিক কবেন বটে, কিন্তু সাবিত্রীব পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি না দেখিয়া কেবল সাবিত্রী, গায়ত্রী, দামিনী, যামিনী প্রভৃতি গোপ—বালাদিগের মোটা মোটা কালোকালো হাতের মোটা মোটা সোণার তাগা, বড় বড় স্ক্রুপাকের বাঘমুখ বালা দেখিয়া থাকেন। বাত্রে শয়ন করেন বটে, কিন্তু ঘুমের সহিত আর বড় একটা সম্পর্ক নাই, গৃহিণীদের বক্তৃতা শুনিতেই বাত্রি কাবাব হইয়া যায়! কাহারো গৃহিণী বলেন—"দেখ, কাল অবধি আমি খোকার জন্য দুধ লইব না।" কর্ত্তা যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?'—অমনি গৃহিণী ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায় মাথা তুলিয়া চোক্ ঘুরাইয়া বলেন—"কেন, কিছু জান না? দেখলে না, আজ সকালে তরঙ্গিণী ছুঁড়ী দুধ দিতে এসে আমার হাতে পিতলের বালা দেখে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা কল্লে, "হ্যাঁগা

মাঠাক্রুণ, তোমার ও কয় গণ্ডা টাকার বালা গা?'' তা এ'ত দুধ দিতে আসা নয়, আমাদিগকে অপমান করতে আসা। আমি কাল থেকে আর দুধ লব না, তা তোমার ছেলে বাঁচুক আর মরুক, তুমি যা জান করিও।'' কাহারও সুন্দরীর কাঁচা বয়স, সন্তানাদি হয় নাই. তিনি স্বামীকে শাসাইয়া বলেন—''দেখ, তোমাদের বাগ্দী গোয়োলার দেশ, এখানে বাগ্দিনী গোয়ালিনীদের অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না. ইচ্ছা হয় একটা বাগ্দীর মেয়ে কী একটা গোয়ালার মেয়ে লইয়া থেকো, আমি কাল কলিকাতায় আমার ভগ্নীপতির বাসায় চলে যাব।'' এইরূপ এখন গোধনপুরের ভদ্রপল্লীতে প্রতি ঘরেই হইয়া থাকে। অতএব এত কালের পর, গোধনপুরের ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের সুখশান্তি ঘুচিয়া গেল। এত কালের পর, ইংরাজের ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার মহাকেন্দ্র কলিকাতার প্রসাদে যেমন অন্যান্য অসংখ্য গ্রাম-উপগ্রামের, তেমনি এই ক্ষুদ্র গোধনপুরের ভদ্রসন্তান আজ সোণারূপার জন্য অস্থির। সোণারূপাকে দেবতা ভাবিয়া সেই দেবতার বিদ্যুৎপ্রভ হাসিমুখখানি দেখিবার জন্য জমিজমা, যজমানশিষ্য, পাঁজিপুথি ছাড়িয়া কলিকাতারূপ মহাতীর্থাভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল। এমন তীর্থযাত্রা ভারতবাসী আর কখন করে নাই! তীর্থপ্রধান কলিকাতার কাছে কাশী, গয়া, প্রয়াগ, পুষ্কর, হরিদ্বার, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, পুরুষোত্তম প্রভৃতি সেকেলে তীর্থ অতি তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর। আজ সে সব তীর্থ ভুলিয়া ভারতবাসী কলিকাতারূপ মহাতীর্থাভিমুখে প্রধাবিত। বল দেখি, আজ ভারত জগতে ধন্য কি না? যদি বল—না, আমি বলিব—তুমি Civilization এর অর্থ এখনও বুঝ নাই—প্রকৃত religion কাহাকে বলে তাহা তোমার শিখিতে এখনও বাকি আছে। প্রকৃত religion-এর পুরুষোত্তম London, Paris তাহার বৃন্দাবন, কলিকাতা তাহারা গয়া। এই নূতন গয়াধামে হিন্দুমাত্রেই আজ পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেছেন।

২

গোধনপুরে উমাপতি ভট্টাচার্য্যের বাস। ব্যাকরণানুসারে উমাপতির স্ত্রীর নাম উমা হওয়া উচিত। কিন্তু বোধ হয় যে, ব্যাকরণের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বড় একটা সদ্ভাব ছিল না। তাই শত্রুকে জ্বালাতন করিয়া গোধনপুর হইতে তাড়াইবার অভিপ্রায়ে উমাপতি ঠাকুর আপনার ব্রাহ্মণীকে উমা বলিয়া না ডাকিয়া দুর্গামণি বলিয়া ডাকিতেন। পৌরাণিক ইতিহাসানুসারে পশুপতি সম্বাদ।

দুর্গাও যে, উমাও সে। অতএব স্ত্রীকে দুর্গামণি না বলিয়া উমা বলিয়া ডাকিলে ইতিহাস উমাপতির কাছে সম্মানিত বই অপমানিত হইত না। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন যে, যেখানে শত্রুতা, সেখানে ইতিহাসের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে,—যেমন মিলের হাতে ভারতের ইতিহাসের শ্রাদ্ধ, আর মার্শমানের হাতে বাঙ্গালার ইতিহাসের শ্রাদ্ধ। অতএব শত্রুতা বশত উমাপতিও ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করিলেন, দুর্গামণিকে কোন ক্রমেই

উমা বলিতে স্বীকৃত হইলেন না। নাই হউন—দুর্গামণি সাধ্বী—তিনি মনের দুঃখ মনে রাখিয়া দুর্গামণি নামেই উমাপতি ভট্টাচার্য্যের ঘর আলো করিয়া পাতিব্রতাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং সে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল কর্ত্তব্য পালনে তিনি যে বিশেষ যত্নবতী ছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ অতি শীঘ্র শুভ দিনে শুভ ক্ষণে আপনার গর্ভরূপ বাগীচা হইতে পুত্ররূপ একটী ফল পাড়িয়া পতির হস্তে দিলেন। ফল পাইয়া পতি আহ্লাদগদগদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আহা! ভগবান এত দিনে আমাকে ফলবতী করিলেন।" সূতিকাঘর হইতে 'ক্ষীণাবলবৎ' স্বরে দুর্গামণি বলিলেন—"তা শুধু আমোদ কল্লে হবে না, আপনি যেমন পণ্ডিত, ছেলেটিকেও তেমনি পণ্ডিত করিতে হইবে।" উমাপতি কিছু বেশী গদগদ স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ তা কর্‌বো বই কি, তা করবো বই কি, আমরা পুরুষানুকম্প পণ্ডিত।"

৩

গোধনপুরে অনেক গোয়ালার বাস, অতএব গোধনপুরের মাঠে অনেক চতুষ্পদ বিচরণ করিয়া থাকে। বোধহয়, সেই কারণ বশত, পুত্র বংশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন এইরূপ ভাবিয়া, উমাপতি পুত্রের নাম রাখিলেন—পশুপতি ভট্টাচার্য্য। বংশধর সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিবার কারণও ছিল। পশুপতি ভট্টাচার্য্যের কোষ্ঠীতে আচার্য্য লিখিলেন যে, কালে পশুপতি একজন মহা পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী মহা পুরুষ হইবে। উমাপতি এবং তাঁহার ব্রাহ্মণীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা যথাকালে পশুপতিকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পশুপতির পড়াশুনায় অত্যন্ত মনোযোগ। সে প্রত্যহ লিখিবার তালপাতা ছিঁড়িয়া ফেলে; ফেলিয়া লিখিবার সময় না লিখিয়া তালগাছে তালগাছে তালপাতা কাটিয়া বেড়ায়। প্রত্যহ চারি পাঁচটা করিয়া কলম ভাঙ্গিয়া ফেলে, বাপ মাকে বলে, "লিখে লিখে কলম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে," তার পর পাঠশালায় যাইবার নাম করিয়া বাঁশবনে গিয়া কঞ্চি কাটিয়া বেড়ায়, আর কঞ্চিতে আমের আটা মাখাইয়া আটাকাটি করিয়া টীয়াপাখী ধরে। প্রত্যহ এক এক দোযাত কালি কাপড়ে ঢালিয়া বাড়ীতে আসিয়া বলে যে, "লিখিয়া লিখিয়া কালি ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ কালি তৈয়ার না করিলে কাল পাঠশালায় যাওয়া হবে না।" মা আহ্লাদে আটখানা হইয়া মুঠা মুঠা চাল বাহির করিয়া দেন, ছেলে এক বেলা ধরিয়া তাই সিদ্ধ করে, আর কাল হাঁড়ির ভূষা লইয়া কালি প্রস্তুত করে। গুরুমহাশয় সব ছেলের কাছে চাল, দাল, তামাক, আলু, বেগুন, বড়ি প্রভৃতি আদায় করেন, কেবল পশুপতির কাছে পারেন না। অতএব পশুপতিকে জব্দ করিবার জন্য তিনি এক দিন উমাপতিকে বলিয়া দিলেন যে, "পশু প্রায়ই পাঠশালায় আসে না, যে দিন আসে, সে দিন আপনিও ভাল লেখাপড়া করে না, অপর ছেলেকেও লেখাপড়া করিতে দেয় না।" কথাটা উমাপতির বড় বিশ্বাস হইল না। পণ্ডিতের বংশে জন্মিয়া ছেলে পড়াশুনা করে না, এ কি কথা! তথাপি সোণার চাঁদকে ডাকিয়া একবার

বলিলেন—"পশুবাবা, তোমার গুরুমহাশয় বলেন, তুমি ভাল করিয়া লেখাপড়া কর না... লেখাপড়া করিও, দেখ, বাবা যেন আমাদের বংশের অপকলঙ্ক না হয়।" পশুপতি ভাবিল যে গুরুমহাশয়কে জব্দ করিতে হইবে। অতএব সেই দিন হইতে প্রত্যহ বাড়ীতে দুই ছিলিম করিয়া তামাক চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে দিতে আরম্ভ করিল। তখন গুরুমহাশয়ের মুখে পশুপতির বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা আব ধরে না। পশুপতিও দিন পাইয়া গুরুমহাশয়ের মাথায় চড়িতে আরম্ভ করিল। সে এক দিন সন্ধ্যার সময় দেখিল যে, গুরুমহাশয় গ্রামের প্রান্তে একখান ভাঙ্গা ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ একটী অল্পবয়স্কা স্ত্রীও সেই ঘরে প্রবেশ করিল। উভয়ে প্রবেশ করিলে পর স্ত্রীলোকটার গায়ে একটি ঢিল পড়িল। স্ত্রীলোকটা হন্ হন্ করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। দূরে পশুপতি চেঁচাইয়া উঠিল..."সাবিত্রী দিদি কোথায় যাচ্ছিস্?" আর এক দিন গুরুমহাশয় ধৌত বস্ত্র পবিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে ছিলেন, পথের ধারে গাছেব উপর থাকিয়া পশুপতি তাঁহার গায় একরাশি ধূলা এবং এক প্রকার সুগন্ধি জল ঢালিয়া দিয়া গাছের পাতার ভিতর লুকাইয়া রহিল। অন্ধকার হইলে সে প্রায়ই গুরুমহাশয়ের কাছা ধরিয়া টানে, গুরুমহাশয় ধূলায় পড়িয়া দেশের ছেলের পিতামাতার সম্বন্ধে নানা প্রকার মিষ্ট কথা কহিতে থাকেন, সেই অবসরে পশুপতি উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে চেঁচাইতে পলায়ন করে...

আয়রে সব দেখ্‌বি আয়
বুড় গরু ধূলা খায়।

পাঠশালা গুরুমহাশয়ের রাজ্য। পাঠশালার ছেলে সে রাজ্যের প্রজা। রাজাব কৃপায় সে সকল প্রজার মধ্যে কাহাবো কখন চাকুরির অভাব হয় না। কেহ রাজাব পা টিপিয়া দেয়, কেহ বাজার পাকা চুল তুলিয়া দেয়, কেহ রাজার রন্ধনের নিমিত্ত কাঠ কুড়াইয়া দেয়, কেহ রাজাকে বাতাস কবে, কেহ রাজার বাসন মাজে, কেহ রাজার হুঁকাবরদার, কেহ রাজার গামছাবরদার, কেহ রাজাব জুভাবরদার, কেহ রাজার গোয়েন্দা। গোধনপুরের গুরুমহাশয়ের দুই এক জন গোয়েন্দা ছিল। তাহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিল যে, সে দিন পশুপতি শ্রীমতী সাবিত্রী গোয়ালিনীর গায়ে ঢিল ফেলিয়া মারিয়া ছিল। শুনিয়া গুরুমহাশয়ের ভয় হইল, পাছে পশুপতি সাবিত্রী-সম্বাদটা বেশী প্রচার করিয়া দেয়। তিনি সেই দিন অবধি পশুপতিকে কিছু বেশী আদর করিতে লাগিলেন। অতএব পশুপতি যা লেখাপড়া করিত, তাও আর এখন করে না। সমস্ত দিন খেলাইয়া ও গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে ঠেঙ্গাইয়া বেড়ায়, এক আধবার যখন পাঠশালায় যায়, তখন গুরুমহাশয়ের কোলে বসিয়া গুরুমহাশয়ের প্রদত্ত মুড়কীর মোয়া খায়। আবার মধ্যে মধ্যে, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না, সাবিত্রী গোয়ালিনী তাহাকে ধরিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া, মোটা মোটা দুধের সর আর বড় বড় ক্ষীরের লাড়ু খাওয়ায়। মনের আনন্দে এবং খাওয়ার সুখে পশুপতি যথার্থই দিব্য কান্তিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল।, আর সাবিত্রী গোয়ালিনীর আহ্লাদ বাড়িতে লাগিল, কেন—তাহা সেই পাপিষ্ঠাই

জানে। তা সাবিত্রীকে নরকে পাঠাইয়া একবার আমাদিগকে গোধনপুরের পাঠশালায় যাইতে হইতেছে। সেখানে আজ একটী ঘটনা ঘটিতেছে, যাহার ফল, পশুপতির অদৃষ্টচক্র ছাড়াইয়া উঠিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে অনুভূত হইবে। পশুপতি গুরুমহাশয়েব মোয়া খাইবাব জন্য পাঠশালয় আসিয়াছে। গুরুমহাশযেব কোলে বসিযা মোয়া খাওযা শেষ হইলে পর, গুরুমহাশয় পশুপতির দাড়ি ধবিয়া আদর করিযা বলিলেন:...''পশুবাবা, তুমি আমার সোণার চাঁদ, তোমার মতন ছেলে কখন জন্মায় নাই। তা, বাবা, আর একবাব তোমার বাপের এক ছিলিম তামাক আনিয়া আমাকে খাওয়াও দেখি।'' পশুপতি গুরুমহাশয়ের কলিকাটি লইয়া বাড়ী গেল। বাপের তামাক এক ছিলিম চুরি করিয়া সাবিত্রী গোয়ালিনীর ঘরে বসিয়া দিব্য করিয়া তাহা খাইল। পরে খালি কলিকা লইয়া পাঠশালার পিছনে বসিয়া খানিক ক্ষণ কি কবিল কেহ দেখে নাই, কেবল একটী গোয়েন্দা ছেলে আড়ালে থাকিয়া দেখিল। তারপর কলিকায় একটু আগুন দিয়া পাঠশলায় গিয়া গুরুমহাশয়কে কলিকাটি দিল। কলিকাটি হুঁকায় বসাইয়া তদ্গত চিত্তে গুরুমহাশয় হুঁকায় টান দিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক টান দিলেন, কিন্তু ধুমোদ্গম হইল না। দশ বাবটা দম দিলেন, তবুও ধুমোদ্গম নাই। তখন ভট্টাচার্য্য পাডার পঞ্চানন ন্যায়বাগীশেব কাছে এক দিন যে ধূম-বহ্নি সম্বন্ধীয় ন্যাযশাস্ত্রের শ্লোক শুনিয়াছিলেন, তাহা স্মবণ কবিয়া ভাবিলেন, যে, যখন ধূম নাই, তখন বহ্নিও নাই। কিন্তু কলিকা নামাইয়া দেখিলেন যে আগুন গণ্ গণ্ করিতেছে। তখন মনে মনে বুঝিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রটা সমস্তই মিথ্যা। তা ন্যায়শাস্ত্র মিথ্যা হইলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু তামাক ছিলিমটা যে বৃথা হইল, এ বড় দুঃখের কথা। সে দুঃখ চাপিয়া রাখিতে নিতান্তই অক্ষম হইয়া গুরুজী ভয়ে ভয়ে পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—''বাবা পশু, কেমন তামাক সাজিয়াছিলে বাবা?'' পশুপতি সজোরে বলিল—'কেন মহাশয়, খুব এক ছিলিম তামাক সাজিয়াছি।'' তখন সেই গোয়েন্দা বালকটী উঠিয়া বলিল, ''না মহাশয়, ও ত তামাক সাজে নাই, ও শুকনা পেঁপে পাতা সাজিয়াছে।'' এই কথা শুনিয়া পাঠশালাব সমস্ত ছেলে একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক আর সৌভাগ্যক্রমেই হউক, সাবিত্রী গোয়ালিনী সেই সময় গুরুমহাশয়কে দুধ দিতে আসিয়াছিল, সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সাবিত্রীকে হাসিতে দেখিয়া গুরুমহাশয়ের কিছু রাগ হইল। তিনি চোক্ রাঙ্গাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—''পশুপতি, তুই বড়ই দুষ্ট হইয়াছিস্, এইখানে চারি হাত জমি মাপিয়া নাকে খত দে।'' পশুপতি কোন কথাটী না কহিয়া দশ হাত জমি মাপিল। মাপিয়া পরিধেয় বস্ত্রখানি খুলিয়া রাখিল। যেন নাকে খত দিতেছে, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া নাকে খত না দিয়া, এ ছেলে ও ছেলেব পানে চাহিয়া দিব্য করিয়া হাসিয়া লইল। তারপর সাত আট হাত জমি বাকি থাকিতে একটা প্রকাণ্ড ডিগ্‌বাজী খাইয়া একেবারে গুরুমহাশয়ের মাথা ডিঙ্গাইয়া, তাঁহার পিছনে দশ হাত তফাতে গিয়া দাঁড়াইল। পাঠশালার সমস্ত ছেলে আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সাবিত্রী ঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে দেখিলেন যে, গুরুমহাশয়

ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। ডিগ্‌বাজী খাইবাব সময় পশুপতি তাঁহার মস্তকোপরি যে অমৃতধারা ঢালিযা দিযা গিয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্যই নাই। সাবিত্রী দেখিয়া বলিল—"যাও, আর একবাব নেয়ে এস গে।" যেন চট্‌কাভাঙ্গা হইয়া গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, আবাব নাইব কেন?" সাবিত্রী বলিল—"দেখ, মুখে হাত দিয়া দেখ।" তখন 'রাম, বাম' বলিযা গামছা লইযা কাঁপিতে কাঁপিতে গুরুমহাশয় স্নানে গমন করিলেন। পাঠশালার সমস্ত ছেলে হৈ হৈ করিতে করিতে তাঁহার পিছে পিছে চলিল। এদিকে সাবিত্রী ঠাকুরাণী আহ্লাদে আটখানা হইয়া পশুপতিকে কোলে তুলিয় লইয়া তাহার কচি ঠোঁটে চুমো খাইতে খাইতে আপন বাড়িতে চলিয়া গেল।

৪

এক ঘন্টাব মধ্যেই অপূর্ব্ব ডিগ্‌বাজী বার্ত্তা সমস্ত গোধনপুব গ্রামে প্রচারিত হইল। অতএব উমাপতি ভট্টাচার্য্য এবং দুর্গামণি দেবীও যথাসময়ে সে সম্বাদ পাইলেন। সম্বাদ পাইয়া উমাপতিব প্রথমে স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ জন্মিল এবং ডিগ্‌বাজীব ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া গুরুমহাশয়ের যেরূপ ভয় হইয়াছিল, তাঁহাবো মনে কিয়ৎপরিমাণে সেইরূপ ভযেব সঞ্চাব হইল। তিনি আস্তে আস্তে দুর্গামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি, ও ব্রাহ্মণি, ছেলেটা কিছু খাবাপ হয়েছে বোধ হইতেচে না?" ব্রাহ্মণী, ভট্টাচার্য্যমহাশয়েব দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী, ভাতেব হাঁড়ির কাটিটা আস্ফালন কবিয়া সদর্পে উত্তব করিলেন—"কেন, খারাপ আবার কিসে দেখলে? একটা ডিগ্‌বাজী খেয়েছে বৈ ত নয়। তা ওব ঠিকুজীতে ত লেখাই আছে যে, ও খুব বীর হবে। এ'ত আহ্লাদেব কথা।" ঠিকুজীকোষ্ঠী সত্ত্বেও তত বড় ডিগ্‌বাজীতে উমাপতি বড় একটা আহ্লাদের কারণ দেখিতে পাইলেন না। অতএব ডিগ্‌বাজীর ভয়ের উপব আবার ব্রাহ্মণীর ভাতেব কাটিব ভয় উপস্থিত হইল। পাছে গৃহিণীব হস্তগত ভাতের কাটিটাও ডিগ্‌বাজী খাইয়া ফেলে, সেই ভয়ে একটু Official রকম হাসি হাসিয়া, উমাপতি উত্তর কবিলেন—"হাঁ, তুমি যা বলিতেছ, তাই বটে, তাই বটে।" সেই দিন বৈকালে গ্রামের বিজ্ঞ এবং প্রাচীনেরাও দুর্গামণির মত সমর্থন করিলেন। ভবদেব ঘোষ মহাশয়ের শিবের মন্দিরের রোযাকে বসিয়া ন্যায়বাগীশ মহাশয় ডিগ্‌বাজী-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন যে—"সত্যযুগে পবননন্দন হনুমান লম্ফ দিয়া সাগর পার হইয়া স্বর্ণময় লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমাদেব গুরুমহাশয় জলের সাগর না হউন, বিদ্যার সাগর বটে"—শ্রোতারা বলিয়া উঠিলেন, "তা বটেই ত, তা বটেই ত, এই সে দিন তিনি, সাবিত্রী গোয়ালিনীর কয়টা গরু, না দেখিয়াই বলিয়া দিলেন"—ন্যায়বাগীশ মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"তা, এই যুগশ্রেষ্ঠ কলিযুগে উমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র পবননন্দনের অবতার। সে অক্লেশে গুরুমহাশয়রূপ বিদ্যাব সাগর লম্ফ দিয়া পার হইয়াছে। অতএব সে স্বর্ণময় কলিকাতায় গিয়া প্রচুর ধনরত্ন উপার্জ্জন করিবে।" উপরে দেখা গিয়াছে যে, আজকাল

গোধনপুবে যুগবিপ্লব ঘটিয়াছে; আজকাল গোধনপুরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই সোণা রূপার জন্য লালায়িত। অতএব পণ্ডিতপ্রধান ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের ডিগ্‌বাজীতত্ত্বের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা সকলেরই মনে লাগিল। সকলেই বলিলেন—''ন্যায়বাগীশ মহাশয় যাহা বলিতেছেন তাহা কি কখন মিথ্যা হয়? মুড়াগাছার জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পর ওঁর মতন পণ্ডিত আর ভারতে জন্মায় নাই। উনি ঠিকই বলিয়াছেন। বলি, ও উমাপতি, ছেলেটীকে কলিকাতায় রাখিয়া কিছু ইংরাজী লেখাপড়া শেখাও। ও হতে তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে, তোমাব বংশ উদ্ধার হবে।'' উমাপতি বাড়ীতে গিয়া গৃহিণীকে এই সকল কথা জানাইলেন। গৃহিণী বলিলেন—''তা, আমিও ত তাই বলিতেছিলাম। এখন এক কাজ কর, আর দেরি করিও না, শীঘ্র পশুপতিকে কলিকাতাব একটা ইস্কুলে পড়িতে দেও।'' তখন শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য্য এবং শ্রমতী দুর্গামণি দেবী উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, পটলডাঙ্গায় কাঙ্গালিচবণ চক্রবর্ত্তী নামক তাঁহাদেব যে একজন যজমান আছেন, তাহাকেই পশুপতিকে লেখাপড়া শেখাইবার ভার অর্পণ করিবেন।

৫

পর দিবসেই উমাপতি ভট্টাচার্য্য কাঙ্গালিচরণের বাসায় আবিভূর্ত হইয়া কাঙ্গালিচরণের পিতা, পিতামহ প্রভৃতিকে তেত্রিশ কোটী দেবতার উপরে আসন প্রদান করিয়া নিজ বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। এবং কাঙ্গালিচরণকে ইহাও বলিলেন,—''আমার পশুপতির পণ্ডিতের বংশে জন্ম, তাহার মেধা অসাধারণ, তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে অধিক ব্যয়ও হইবে না, অধিক সময়ও লাগিবে না। অতএব, বাপু, তুমি যদি কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া আমার ছেলেটীকে মানুষ করিয়া দেও, তাহা হইলে আমি তোমাকে চিরকাল আশীর্ব্বাদ করিব এবং তুমিও সেই পুণ্যবলে তুচ্ছ দেবলোক ত্যাগ করিয়া দেবদুর্ল্লভ দৈত্যলোক প্রাপ্ত হইবে।'' কাঙ্গালিচরণ উমাপতির ন্যায় পণ্ডিত নন, অতএব দৈত্যলোকের মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ কাল হাঁ করিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিলেন ;—''দেখুন, আমার সময় এখন বড় ভাল নয়, বিশেষ আপনি জানেন যে, সম্প্রতি যে মেয়েটীর বিবাহ দিয়াছিলাম, সেটি বিধবা হইয়াছে। সে জন্য আমরা সকলেই অত্যন্ত কাতর আছি। আবার দুই চারি মাসের মধ্যে ছোট মেয়েটীর বিবাহ দিতে হইবে। তাহাতেও সমূহ ব্যয়। তা, আমি আপনাব ছেলেটীকে আমাব বাসায় রাখিব এবং তাহাব খোরাক পোষাক দিব, আপনি কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া তাহার ইস্কুলের বেতন এবং পুস্তক ইত্যাদির ব্যয় কোন রকমে সংগ্রহ করুন।'' উমাপতি ভট্টচার্য্য মূর্খ ও সঙ্গতিহীন বটে, কিন্তু সচরাচর তাঁহার ন্যায় মূর্খ ও সঙ্গতিহীন ব্রাহ্মণঠাকুরেরা দাতার দুঃখের কথায় আপন আপন কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া নিজের দুঃখের কথা দাতার কর্ণে যেমন গুঁজিয়া গুঁজিয়া দেন, তিনি তেমন করিলেন না। তিনি কিছু ভাল মানুষ। অতএব কাঙ্গালি বাবু যতটুকু সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন, তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণকুলতিলক

শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঙ্গালি বাবুর বাটী হইতে বাহির হইয়া অনতিদূরে একটা অতি অপকৃষ্ট এবং অপযশদুষিত পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। কাহার নিকট গেলেন, তাহা আমার বলিতে ইচ্ছা করি না। এই পর্যন্ত বলিব যে, দুই ঘন্টা কাল পরে পেট্‌টী বেশ উচ্চ করিয়া এবং মোটা ঠোঁট দুইটা লাল টক্ টকে করিয়া শ্রীযুক্ত উমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় কাঙ্গালি বাবুর বাসায় আবির্ভূত হইয়া কাঙ্গালি বাবুকে জানাইলেন যে—"আমার একটী প্রাচীনা এবং সঙ্গতিপন্না ব্রাহ্মণী শিষ্যা ইস্কুলের মাহিয়ানা এবং পুস্তক ইত্যাদি ক্রয় করিবার খরচ দিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন।" শুনিয়া কাঙ্গালি বাবু বলিলেন—"তবে আপনার যে দিন ইচ্ছা হয়, সেই দিন পশুপতিকে এখানে পাঠাইয়া দিবেন।"

দ্বিতীয় ভাগ

১

পশুপতি কাঙ্গালি বাবুর বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু লেখাপড়ায় তাহার পূর্ব্বেও যেমন মন ছিল, এখনও তেমনি মন। সে প্রাতে নয়টাব পূর্ব্বে ইস্কুল গিয়া কপাটি খেলে, ইস্কুলে বসিলে পর এক আধ বাব কেলাশে যায়, বাকি সময় মালীর ঘরে বসিয়া মিঠাই ও তামাক খাইয়া কাটাইয়া দেয়। মধ্যে মধ্যে গোধনপুরে যায়, আর সাবিত্রী গোয়ালিনীর নিকট হইতে টাকা আনিয়া মনের সাধে খায় আর থিয়েটার দেখিয়া বেড়ায়। এইরূপে আট বৎসর কাটিয়া গেল। তাব পর পশুপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিল। পরীক্ষাগৃহে তাহাব পাশে একটী ক্ষীণকায় ও ভীরুস্বভাব বালক বসিয়া লিখিতেছিল। তাহাকে মারপিটের ভয় দেখাইয়া, তাহাব নিকট যত পারিল তত জানিয়া লইয়া এবং বাকি লুক্কায়িত পুস্তক দেখিয়া লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। শুধু উত্তীর্ণ হইল তা নয়, একটী ছাত্রবৃত্তিও পাইল। তখন কাঙ্গালী বাবুর পরামর্শে উমাপতি ভট্টাচার্য্য পুত্রের একটী বিবাহ দিলেন। কন্যাটী পরম রূপবতী এবং গুণবতী। কন্যার পিতাব অবস্থা বড় ভাল নয়। তথাপি 'পাস' করা জামাতা পাইলেন বলিয়া ঋণ করিয়া কন্যাকে কতকগুলি সোণারূপার অলঙ্কার এবং কন্যাব শ্বশুরকে কিছু নগদ টাকাও দিলেন। উমাপতি ভট্টাচার্য্যের এবং তাঁহার ভার্য্যা শ্রীমতী দুর্গামণি দেবীর জন্ম সার্থক হইল। এখন বীরপ্রধান বাঙ্গালীর জীবন এইরকম করিয়াই সার্থক হইয়া থাকে।

২

এদিকে শ্রীমান্ পশুপতি ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে এবং তিনি একটা 'পাস'ও করিয়াছেন। অতএর আর পড়াশুনা অনাবশ্যক, বৃথা valuable সময় নষ্ট করা বই নয। বাবু যে কখনও পডাশুনা কবিয়াছিলেন, তা নয়। তবে আগে

কাঙ্গালি বাবুর ভয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে একটুকু আধটুকু বিড় বিড় করিতেন, এখন তাও বন্ধ করিলেন। এখন তিনি ছাত্রবৃত্তি পান, মনে করিলেই স্বয়ং বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে পারেন, এতএব আর কাঙ্গালি বাবুকে ভয় করেন না। তবে যে এখনও কাঙ্গালি বাবুর বাসায় থাকেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি এখন সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া, পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। পরোপকার করিতে হইলে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া পরকে দিতে হয়, ইহা তিনি পুরাণ ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া বুঝিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে রামচন্দ্র বালি রাজার রাজ্য আপনি না লইয়া সুগ্রীবকে দিয়াছিলেন; ক্ষুধার্ত্ত অল্‌ফ্রেদ আপনি রুটীখানি না খাইয়া পরকে খাইতে দিয়াছিলেন; এবং তৃষ্ণাতুর সর্ ফিলিপ সিদ্‌নি আপনি জলটুকু না খাইয়া পরকে খাইতে দিয়াছিলেন। অতএব ঐতিহাসিক প্রথামত পরোপকার ব্রত পালনার্থ, তিনি আজকাল আপনাকে লেখাপড়ায় বঞ্চিত করিয়া, কাঙ্গালি বাবুর হিতার্থ তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীভ্রষ্টা (কেন না পতিহীনা) কৃষ্ণকামিনী দেবীকে অধিক রাত্রে গোপনে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গোপনে লেখাপড়া শিখাইবার কারণ এই যে, সকলকে জানাইয়া পরোপকার করিলে ধর্ম্ম নিষ্কাম না হইয়া স্বার্থদূষিত হয়। এ রকম দুই চারিটা বড় বড় নীতিসূত্র পশুপতি বাবুর সংগ্রহ করা ছিল, কেননা তিনি যে শ্রেণীর patriot, তাহাদিগের মধ্যে ঐরূপ সংগ্রহ করা আজকাল একটা পাকা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘরের বাহিরেও পশুপতিবাবু এখন সেই পরোপকার ব্রতে ব্রতী। অতএব স্বয়ং পড়াশুনা ঘোর selfishness মনে করিয়া তিনি সাধারণের উপকারার্থ বক্তৃতা আদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেশের যাহাতে উন্নতি হয়, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ পাড়ার কতকগুলি ছেলে লইয়া একটা Debating Club করিলেন। সেখানে প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্মবিষয়ক, নীতিবিষয়ক, ইংরাজ রাজার দৌরাত্ম্য বিষয়ক, এবং আরো অনেক বিষয় বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হইতে লাগিল, এবং প্রবন্ধ পাঠ হইলে পর ভূমিতে পদাঘাত, টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত এবং কপালে করাঘাত সহকারে মহা তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। এক একটা বক্তৃতা দীর্ঘই বা কত! বক্তৃতায় এক একটা শব্দ দীর্ঘই বা কত! বক্তৃতা করিতে করিতে এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস দীর্ঘই বা কত! আবার সকলের অপেক্ষা পশুপতি বাবুর দৈর্ঘ্যের দিকে বেশী দৃষ্টি। তিনি এক দিন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস খুব বড় করিতে গিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া মুখ রাঙ্গা করিয়া চোখ কপালে তুলিয়া ধড়াস্ করিয়া টেবিলের উপর সুদীর্ঘ হইয়া পড়িলেন। তিনি যেমন পড়িলেন, অমনি ক্লাবের অপর সমস্ত সভ্য সজোরে টেবিলে হাত চাপড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল :—"Capital! Capital! we have at last got the man we were wanted for. We anonymously make Babu Pasupati Bhattacharya, President of the Pataldanga Debating Club"। একজন চিন্তাশীল দর্শক একাকী ঘরের এক কোণে বসিয়াছিলেন। তিনি এই সময় এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন—'encore, পশুপতি বাবু, encore!'

এইরূপে দুই এক মাস তর্কের পরেই সকল সভ্যগণ প্রায় সকল বিষয়েই স্থিরসিদ্ধান্ত হইলেন। প্রায় সকল বিষয়েই সে সিদ্ধান্তের অর্থ—উদ্ধার। ধর্ম্মের উদ্ধার, নীতির উদ্ধার, জাতির উদ্ধার, দেশের উদ্ধাব, বালবধূর উদ্ধার, বালবিধবার উদ্ধার, সমস্ত ভারতমহিলার উদ্ধার, বিদ্যার উদ্ধার, অবিদ্যার উদ্ধার, উদ্ধার, উদ্ধার, উদ্ধাব। এখন হইতে সেই মহাবল-মহাকায় পশু পরিচালিত, অসীম-মহিমাময় Pataldanga Debating club-এ উদ্ধার শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না—এখন হইতে সেখানে উদ্ধার ভিন্ন আর কিছু কলিকা পায় না। এক দিন পশুপতি বাবুর ক্লাবে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে পর, পশুপতি বাবুর আমন্ত্রণে সভ্যেরা নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক জন বলিলেন—"আমাব মতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত।"

আব একজন অমনি বলিলেন—"আমারও সেই মত!"

তখন এক এক জন কবিয়া সমস্ত সভ্য বলিলেন—"আমাদেব সকলেরই সেই মত।"

শুনিয়া পশুপতি বাবু উঠিয়া বলিলেন :—

"সভ্য মহাশয়গণ, আপনারা আপনাদের দেশপ্রসিদ্ধ বিচক্ষণতা এবং বাগ্মিতাপুরঃস্বর যে মত প্রকটন করিলেন, আমিও সেই মতের মতানুযায়ী। দেখুন, বঙ্কিম বাবুব লেখা কত খারাপ। তাঁহার চন্দ্রশেখর নামক নবন্যাসখানি এক রকমে অতি উত্তম, কেননা উহা সুদৈর্ঘ্যসম্পন্ন। কিন্তু উহার বহির্দ্দেশ মনলোভা হইলে কি হইবে, উহার অন্তঃপুর অতি শোচনীয়রূপে জঘন্য (Hear, hear)। আপনাবা একবার বিগলিতচিত্তে কায়মনোবাক্যে ভাবিয়া দেখুন, বঙ্কিম বাবু ঐ নবন্যাসে কি ভয়ঙ্কর ধর্ম্মের এবং নীতিব এবং মনুষ্যত্বের বিপ্লব এবং বিধ্বস্ত কবিয়া ফেলিয়াছেন! তিনি সেই সুশীলা, শোকাতুরা, জগজ্জনতাড়িতা, কুসুমিতা, কাতরতা শৈবলিনীকে একবার করাল হিন্দু zenana-র কবলিতা কণ্ঠ হইতে মহামতি, পরহিতৈষী Foster সাহেবের দ্বারা নিষ্কাষিত করিয়া পুনরায় তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন।" (Hear, hear, এবং উচ্চৈঃস্বরে Shame! shame! এই সময়ে অনেকের চক্ষু বড় হইয়া ঘুরিতে লাগিল, অনেকে দাঁতখামাটি মারিয়া ঘুসি ওঁচাইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল—কোথা সে, কোথা সে—উঁ :—উঁ :—কাঁটালপাড়া! কাঁঠালপাড়া! Shame এবং alas! alas!) বিক্ষুব্ধ সিন্ধু কিঞ্চিৎ প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলে পর, সভাপতি মহাশয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"আবাব দেখুন, বিষবৃক্ষে বঙ্কিম বাবু কি বুদ্ধিব ধ্বজা উড়াইয়াছেন। চিত্তশালিনী, দুঃখিনী, পতিবিয়োগিনী জননী সূর্য্যমুখীকে সেই নরক যন্ত্রণাময়, নিদারুণ, নিষ্পীড়ন, নির্বিঘ্ন, অবরোধময় zenana হইতে নিষ্ক্রান্ত দিয়া আবার তাহাকে তাহারই হৃদয়াভ্যন্তরে পুরিয়া রাখিলেন। (Hear, hear)। সভ্য মহাশয়গণ, বঙ্কিম বাবুর আরো কিছু পরিচয়

দিব। তিনি হীরা দাসীকে কতই না যন্ত্রণা দিয়াছেন! সে বালিকা-বিধবা। তাহার Physiological want কত! তা সে করিয়াছিলই বা কি? তথাপি সেই নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নিশানবাহী, নিষ্কলঙ্ক বঙ্কিম পরিচারিকাপ্রধান, পতিব্রতাচূড়ামণি হীরা মন্মোহিনীকে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছেন! হায়! হায়! উঃ আর সহ্য হয় না! বুক ফাটিয়া যায়! (Hear, hear, এবং উচ্চৈঃস্বরে, বুক ফাটিয়া যায়! এবং সজোরে বুকে করাঘাত)। আবার সেই রমণীকুলরত্ন, চিরদুঃখিনী, বিধবা-গর্ব্বিণী সুন্দরীকে চিত্তপটে আনয়ন কর। বঙ্কিম বাবু কিনা সেই অতুলজ্যোতি, পতিতপাবনী, পুণ্যবতীকে সুখী করিয়া আবার গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন! তাহাকে উদ্ধার করিয়া আবার বধ করিলেন! সভ্য মহাশয়গণ, বঙ্কিম বাবুর দ্বারা দেশের উদ্ধার হইবে না। তিনি হিন্দুরমণীর শত্রু,—হিন্দু বিধবার শত্রু! তিনি আমার শত্রু, তোমার শত্রু, আমার স্ত্রীর শত্রু, তোমার স্ত্রীর শত্রু, তিনি শত্রুময়! তিনি দেশের শত্রু, ভারতের শত্রু, ভারতমাতার শত্রু! তাঁহার গ্রন্থাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যের কলঙ্ক। তাঁহার গ্রন্থাবলী পোড়াইয়া ফেল।" (সকলেই চেঁচাইয়া উঠিল—'পোড়াইয়া ফেল, পোড়াইয়া ফেল'—ঘরে একটা তাকে বঙ্কিম বাবুর কতকগুলো পুস্তক ছিল, তৎক্ষণাৎ সভ্যেরা সেইগুলো পোড়াইয়া ফেলিল। পোড়াইয়া বুক বাজাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—We are practical men-- আমরা যা বলি, তাই করি।) পশুপতি বাবু আবার বলিতে লাগিলে:—"বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠই বা কি? তাহাতে দুই একটা উদ্ধারের কথা আছে বটে। কিন্তু সে গ্রন্থখানা ভীষণ কুসংস্কারময়। তাহাতে কেবল দুর্গা কালীর কথা, আর ন্যাঙটা বৈরাগীর হরেকৃষ্ণ আছে। ভারতোদ্ধার ন্যাঙটা বৈরাগীর কাজ নয়! নিরামিষ ভাত আর নিরামিষ জল খেয়ে লড়াই করা যায় না। ভারতোদ্ধার আমাদের কাজ।"

তখন সমস্ত সভ্য দাঁড়াইয়া, টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল "আমাদের কাজ, আমাদের কাজ।" এমন সময়ে এক জন সভ্য দ্রুতপদে আসিয়া বলিল—"মামা, মামা, ভুলিয়া গিয়াছ।" অমনি সেই ক্রোধাগ্নিপ্রজ্জ্বলিত যুবকবৃন্দ বুক চাপড়াইয়া "আমাদের কাজ, আমাদের কাজ" বলিয়া আরো চীৎকার করিতে করিতে মহাবেগে ক্লবগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। আমরা তখন সেখানে ছিলাম। কিছু ভয় পাইয়া সেই চিন্তাশীল দর্শকটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইহারা এইমাত্র বঙ্কিম বাবুর বই গুলি পোড়াইল, এখন কি স্বয়ং বঙ্কিম বাবুকে পোড়াইতে গেল নাকি?" দর্শক একটুকু মুচ্‌কি হাসিয়া ঘরে একটা ঘড়ি ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"দেখিতেছেন না, রাত্রি নয়টা বাজে?" আমরা বলিলাম—"তাতে হ'ল কি?" দর্শক বলিলেন—"ওদিকে যে দোকান বন্ধ হয়!"

৪

কি দুর্ভেদ্য এবং রহস্যময় নির্দ্দিষ্টবলে দিনের পর দিন আইসে বলিতে পারি না, কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া গিয়া আবার কলিকাতায় শনিবার আসিল, আবার সেই কলিকাতা নগরস্থ Pataldanga Debating Club-এর অধিবেশন হইল, আবার পশুপতি

বাবু প্রভৃতি সেই সকল সভ্য ক্ষত এবং অক্ষত শরীরে সমবেত হইলেন, আবার সেই হতভাগ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা উত্থাপিত হইল। পশুপতি বাবু বলিতে লাগিলেন ;—

"দেখুন সভ্য মহাশয়গণ, আগত শনিবার আমরা বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ সম্বন্ধে একমতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, সেই সকল গ্রন্থ অতি অপকৃষ্ট এবং অপদার্থ, যেহেতু তাহাতে উদ্ধাবের কথা নাই এবং উদ্ধারেব প্রতিকূলে অনেক উজ্জ্বলময় উদাহরণ উদ্‌গাথিত হইযাছে। আজ আমি বলিতে চাই যে বঙ্গে, মূর্খ, মেধাবতী মেষপালকগণ যে হেমচন্দ্রকে কবিবর বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন, সে হেমচন্দ্র কবিবর নন, তিনি কপিবর (করতালি এবং হাস্য)। দেখবেন, মহাশূরগণ, আপনারা গূঢ় বিচক্ষণ করিয়া দেখবেন যে, হেম বাবুব পুস্তকেও উদ্ধারের কথা নাই। বঙ্কিম বাবুর ন্যায় হেম বাবুও উদ্ধারবিনাশী। শুধু তাই নয়, হেম বাবুর ন্যায় ভয়ানক, ভীষণ, ভীরু, ভূষণ্ডি ভূভারতে ভ্রমেও ভ্রূণহত্যা করিতে ভয় করে নাই। বলিতে লজ্জা হয়, যাঁহাকে আমরা বঙ্গের কপিবর বলিয়া আস্ফালন কবি, তিনি কি ভীরু, কাপুরুষ! (Shame! Shame! এবং মুষ্ট্যাস্ফালন) তিনি তাঁহার প্রথমভাগ কবিতাবলীতে একটি অতি সঙ্গতময়, সাহসময়, সম্ভ্রমসমুত্থান কবিতা ছাপাইয়া ছিলেন। আহা! সেই ভারতসঙ্গীত নামক সমুন্নত কবিতায় তিনি ভাবতমাতাব উদ্ধারের জন্য কত কান্নাই কাঁদিয়া ছিলেন। (সকলের ক্রন্দন!) কিন্তু হায়! সে কবিতা এখন কোথায়? বলি, স্বয়ং হেম বাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন, সে কবিতা এখন কোথায়? তিনি কি দুষ্ট, দুর্দ্দান্ত, দুর্ম্মতি, দুরভিসন্ধি, দুর্ব্বল সাহেবের ভযে তাহা চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখেন নাই। চুরি করিয়া না রাখিলে হেম বাবুর দ্বিতীয় সংস্কারে তাহা দেখিতে পাই না কেন? আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, হেম বাবু চোর (Hear, hear)। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, হেম বাবু চোব! (সকলে সমস্বরে—হেম বাবু চোর, হেম বাবু চোর)। তার পরে হেম বাবু আব উদ্ধারের কথা মুখেও আনেন নাই। ববং বঙ্কিম বাবুর ন্যায় একবাব উদ্ধার করিয়া আবার অবরুদ্ধ করিয়াছেন। সভ্যমহিষগণ, হেম বাবুর সেই বৃত্রসংহার স্মরণ করুন। ইন্দ্রের অন্তঃপুবে অবরুদ্ধা, সন্তাপিতা, শোচনীয়া শচী যদি বা সেই ভীষণ অন্তঃপুররূপ কারাগার হইতে পলাইয়া অরুচির মুখে একটুকু আধটুকু চাটনি দিবার উপায় করিলেন, অমনি উদ্ধারবিনাশী হেম বাবু আসিয়া তাঁহাকে আবার সেই imprisonment করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টাই করিলেন। কেন, সে শোচনীয় সতী হেম বাবুর কি করিয়াছিল যে, তাহাব উপর তাঁহার এত বাগ! আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, সে হেম বাবুর কুৎসিত, কদর্য্য করুণাময় অনুবোধ রক্ষা করে নাই বলিয়া সেই বালবিধবা শচীর উপব তাঁহার এত বাগ! এখনকার বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তারা Lord Byron —এর ন্যায় আপনাদের গ্রন্থে কেবল আপনাদেরই শ্রাদ্ধ কবিয়া থাকেন। (এক জন সভ্যকে কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চিত কবিতে দেখিয়া)—কেন, আপনি কি এ কথা স্বীকার করেন না? তবে আরো অকাট্য প্রমাণ দিতেছি, শুনুন। হেম বাবু সম্প্রতি দশমহাবিদ্যা নামক যে এক খানি কাব্য ছাপাইয়াছেন তাহা কি? আপনারা কি জানেন না যে, সেই কাব্যে তিনি দশজন বারবিলাসিনীব কথা লিখিয়াছেন?

লিখিয়া পাঠকের চোকে ধূলা দিবার জন্য বেদান্তসংহিতাব অবিদ্যা শব্দটা ব্যবহাব কবিয়াছেন, তাহা কি আমরা বুঝিতে পাবি না। কিন্তু তিনি কি আমাদিগকে এমনি বোকা মনে কবিয়াছেন যে, অবিদ্যা শব্দের যে একটা বারবিলাসিনী অর্থ আছে তাহা আমবা জানি না? হায়! কি কুসংস্কার! কি স্পর্ধা! তা, সভ্যমনুষ্যগণ বিবেচনা করুন, হেম বাবু এত বারবিলাসিনীর কথা কেমন করিয়া জানিলেন? অবশ্যই তাঁহার বারবিলাসিনীর সহিত কুৎসিত, কদর্য্য—আর না, সভ্যমহাশয়গণ, আব না, আর বলিতে পাবি না, কে যেন পেটের ভিতর হইতে আমাব জিব টানিয়া ধবিতেছে, O it is the আঁকুশি of my pure virtuousness! অতএব আর না! তবে এইমাত্র বলিব যে, বারবিলাসিনীব সহিত আমবাও আলাপ কবিয়া থাকি; শুধু আলাপ কেন, প্রণয়ও কবিয়া থাকি, এবং সুবিধা দেখিলে তাহাদেব সহিত ঘবকন্নাও কবি। কিন্তু আমাদেব কথা এক, হেম বাবুব কথা আব। আমবা বারবিলাসিনীদিগকে উদ্ধাব কবিব বলিয়া তাহাদেব সহিত প্রণয় করি। হেম বাবু কি জন্য তাহাদেব সহিত প্রণয় কবেন? তিনি উদ্ধারের কত প্রয়াসী, তাহা ত দেখাই গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে, এখনকার বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা আপন আপন গ্রন্থে কেবল আপনাদেবই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। সভ্যমহাশয়গণ এখন অবশ্যই বোধগম্য করিযাছেন যে, হেম বাবু একজন উদ্ধারবিনাশী, গণিকাবিলাসী, গর্হিত, গর্দ্দভ, গোবেচারা মানুষ (Hear, hear, এবং বাবম্বাব করতালি)।

তাব পব পশুপতি বাবু, নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষযচন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গ্রন্থকার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সকল কথা লিখিবাব আমাদের স্থান নাই—সে জন্য আমবা বড় দুঃখিত। কারণ, পশুমহাশযের ন্যায় সুবিজ্ঞ, সুপণ্ডিত, সুরুচিসম্পন্ন সমালোচকেব সমস্ত কথা লিখিয়া রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে কাজ দেখিত। অতএব তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, যত সংক্ষেপে পারি, তাঁহারই কথায় তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম:—

"নবীন বাবুর নবীন বয়সে কিছু তেজ ছিল; এখন তিনি প্রাচীনের দলে পড়িয়াছেন। অতএব তাঁহার দ্বাবা আর কাহারও বা আর কিছুরই উদ্ধার হইবার প্রত্যাশা নাই। তাঁহার রঙ্গমতী পড়িলে বুঝা যায় যে, তিনি এখন কেবল পূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত করিতে সক্ষম।"

কালীপ্রসন্ন বাবু এ জন্মটা চিন্তা করিয়াই কাটাইলেন—প্রমাণ "প্রভাতচিন্তা" এবং "নিভৃতচিন্তা"। কিন্তু আমাদের moral courage আছে, চিন্তার বিষয় আমরা ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমরা কাজ খুঁজি। কালীপ্রসন্ন বাবু কোন কাজই করিলেন না। আমরা Practical men, কাজ চাই।

দ্বিজেন্দ্র বাবু ঠিক্ একটি সেকেলে দ্বিজবর—কূটচালে দর্শন লইযাই ব্যস্ত। তাঁহাব নিকট উদ্ধারের কোন আশা নাই। তাঁহাকে যদি উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত করিতে হয়, তবে আগে তাঁহাকে দর্শনের পথ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। সে ভয়ানক উদ্ধাবকার্য্যে

সফলতা লাভ করিতে যত প্রয়াস আবশ্যক তাহার এক শতাংশ প্রয়াসে সহস্র হতভাগিনী বারবিলাসিনীকে উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমরা Practical men, অতএব, আমরা শেষোক্ত উদ্ধারকার্য্যেই নিযুক্ত হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি।

অক্ষয় বাবু খুব চোটচাট্ বলিতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি অতি নির্ব্বোধ। তিনি এদেশ হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর তাড়াইয়া দিতে চান—তাঁহার সাধারণী কেবল সেই কথা লইয়াই ব্যস্ত। তিনি বুঝেন না যে, যে দেশে লোকের উদ্ধারের দিকে মন নাই, সে দেশ ম্যালেরিয়া জ্বরে উৎসন্ন হওয়াই উচিত। অক্ষয় বাবু প্রকৃত দেশহিতৈষী নন। প্রকৃত দেশহিতৈষী হইলে তিনি সাধারণী ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অমন অনিষ্টকর আর্টিকেল না লিখিয়া বঙ্গদর্শনে দাবা, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, প্রভৃতি যথার্থ হিতকর বিষয়ে ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিতেন।

রবীন্দ্র বাবুকে কেহ কেহ কবি বলে। যে বলে সে বলুক, আমরা বলিব না। তিনি এই অল্প বয়সে ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু বলিতে গেলে তাঁহার কোন কবিতাতেই 'স্বদেশ', 'ভারত', ''ভারতমাতা'', ''উদ্ধার'', প্রভৃতি কোন শব্দই দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গে যত দিন Patriot আছে, তত দিন কেহই রবীন্দ্র বাবুর কবিতাকে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিবে না। তবে বঙ্গের যে রকম অবনতি চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে বিশ পঞ্চাশ বৎসর পরে সঙ্গে আর patriot দেখা যাইবে না। বোধ হয় তখন রবীন্দ্র বাবু কবি নাম লাভ করিতে পাবেন। রবীন্দ্র বাবু ছেলে মানুষ—ভরসা করা যাইতে পাবে যে প্রকৃত মানুষ শূন্য বঙ্গে তিনি বৃদ্ধ বয়সে কপীন্দ্ররূপে শোভা পাইবেন।

রামদাস বাবু এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর কথা বেশী বলিতে ইচ্ছা হয় না। কেন না তাঁহারা প্রায় চিরকালটা গয়াতে পিণ্ডদান করিয়াই কাটাইলেন। তাঁহাদের পোড়া প্রত্নতত্ত্বে কেবল প্রেত উদ্ধার হয়, কখনও মানুষ উদ্ধার হইতে দেখা যায় না।

চন্দ্রশেখর বাবু একজন অতি unpractical অকর্ম্মণ্য লোক—প্রমাণ, তাঁহার ''উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম''। মরা মানুষকে আবার ভালবাসা কি? আমরা যাহাকে ভাল বাসি, সে মরিয়া গেলে আর তাহাকে ভাল বাসি না। ভালবাসা যত প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, বিশ্বের মঙ্গল। সেই জন্য আমরা বিবাহ করিয়া একটি রমণীতে ভালবাসা গুটাইয়া রাখিতে চাই না, অসংখ্য রমণীতে ভালবাসা ছড়াইয়া দি। চন্দ্রশেখর বাবুকে এবার দেখিতে পাইলে, তাঁহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব।''

এইরূপে আরও অনেকগুলি গ্রন্থকর্ত্তার গুণকীর্ত্তন করিয়া পশুপতি বাবু শেষে বলিলেন:—''সভ্যমহাশয়গণ, দেখিলেন যে বঙ্গসাহিত্যরূপ বিস্তীর্ণ ময়দানে কেবল গরু চরিয়া বেড়ায়, মানুষ প্রায়ই দেখা যায় না! কিন্তু দুঃখিত হইবেন না, ক্ষুব্ধ হইবেন না, আমাদের দেশের সাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া লজ্জাবনতমুখী হইবেন না—''

এই সময় একজন সভ্য একটী পাশের ঘর হইতে মুখ মুছিতে মুছিতে সভাগৃহে আসিয়া গান ধরিলেন:—লাজে অবনতমুখী, তনুখানি আবরি—

শুনিযা পশুপতি বাবু কাতবস্বরে বলিলেন, "I say Hem, তোমাব পায়ে পড়ি ভাই একটু থাম, আমার হ'ল বলে!" হেম বাবু চুপ করিলেন, পশু বলিতে লাগিলেন:—"আমাদের সাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আপনারা লজ্জিত হইবেন না"—

এবার হেম বাবু একটু গুণ গুণ স্বরে গাইলেন: —লাজে অবনতমুখী—

পশুপতি বাবু তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন:—

"অকুল সমুদ্রে যেমন ধ্রুবতারা, গঙ্গায় যেমন Hooghly Bridge, গড়ের মাঠে যেমন মনুমেন্ট, গবর্ণমেন্ট হাউসে যেমন গম্বুজ, যুবতীর পায় যেমন মল, গরুর ডাবায় যেমন জাব, বাহান্ন খানা তাসের মধ্যে যেমন ইস্কাপনের টেক্কা, বঙ্গীয় গ্রন্থাবাশির মধ্যে তেমনি ইন্দ্রনাথ বাবুর "ভারতোদ্ধার" —বঙ্গের patriot—দিগের একমাত্র Bible "ভারতোদ্ধারে" যেমন লেখা আছে, সেই অনুসারে কার্য্য কর, মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিবে ভারতমাতা উদ্ধার হইয়াছেন, ভারত উদ্ধার হইয়াছে, বিদ্যা উদ্ধার হইয়াছে, অবিদ্যা উদ্ধার হইয়াছে, সব উদ্ধার হইয়াছে। "ভারতোদ্ধার" বাঙ্গালা সাহিত্যের মুকুট—এমন গ্রন্থ এদেশে এখনও লিখিত হয় নাই।" (Hear, hear এবং সমস্বরে—"ভারতোদ্ধার বাঙ্গালার একমাত্র গ্রন্থ— it is our Bible)"।

এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে এক জন ছাড়া সমস্ত সভ্য একটা পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। রাত্রি তখন ১১ ঘন্টা। পশুপতি বাবু কাহাকে কিছু না বলিয়া যেন পাশ কাটাইয়া বাহিরে আসিলেন। কিন্তু কাঙ্গালি বাবুর বাড়ীর দিকে না গিয়া, আর এক দিকে গেলেন। কোথায় গেলেন তাহা এখন বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার দ্রুত পাদবিক্ষেপ দেখিয়া বোধ হইল যেন একটা খুব জাঁকাল রকম কাজে যাইতেছেন।

তৃতীয় ভাগ

১

যে দিবস ইন্দ্রনাথ বাবুর "ভারতোদ্ধার" বাঙ্গালা সাহিত্যের একমাত্র রত্ন বলিয়া Pataldanga Debating Club-এর সুবিজ্ঞ সভ্যগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়, তাহার পর দিবস প্রত্যূষে পশুপতি বাবু একহাতে একটা কার্পেট বেগ, আর এক হাতে দুইটা বেদানা লইয়া প্রমদাচরণ নামক সভার একজন সভ্যের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। প্রমদাচরণ পূর্ব্ব রাত্রের বীরাচারে এবং পত্নীকে প্রহাররূপ শক্তিপূজায় অনেকটা সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব যখন পশুপতি বাবু তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন, তখনও তিনি নিদ্রিত। পশুপতি বাবু অনেক হাঁকাহাকি ডাকাডাকি করিলেন, তবুও তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল না। তখন প্রমদাচরণের পত্নী শ্রীমতী গুঞ্জনবতী ওরফে শ্রীমতী গঞ্জনাময়ী শতমুখী

হস্তে গৃহকার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার পতির 'ধাত', মনে পড়িল। তিনি অমনি তাঁহার পরমারাধ্য পূজ্যপাদ আর্য্যপুত্রের ধূলিধূসরিত গাত্রে বিলক্ষণ করিয়া এক ঘা বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রমদা বাবু 'মওতাৎ' প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং পশুপতি বাবুর ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই পশুপতি বাবু হ্রস্ব, দীর্ঘ, ওষ্ঠ, দন্তৌষ্ঠ, আনুনাসিক প্রভৃতি নানা ছাঁদে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন,—"ভাই প্রমদা, আমার বড় বিপদ। কাল ক্লব থেকে গিয়া শুনিলাম যে বাবার বড় ব্যামহ! বোধ হয় তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। আহা! বাপের তুল্য বহুমানাস্পদ বুদ্ধিমান বন্ধু মহীতলে আর কে আছে! তা ভাই আমি চলিলাম—এই দেখ তাঁহার জন্য বেদানা কিনিয়া লইয়াছি। যদি তিনি ভাল হন, তাহা হইলে শনিবার আসিয়া আবার ক্লাব করিব। যদি শনিবার না আসিতে পারি তবে তুমি আমার হইয়া president হইও আর হেম, নবীন, তারা, বলাই প্রভৃতি সকলকে আমার bosom compliment দিও।" প্রমদা বাবু অনেকবার Alas! Alas! এবং I am very sorry, I am very sorry, এইরূপ বলিয়া পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা অবশ্য তোমার যাওয়া চাই, কিন্তু ইস্কুল ছুটী না লইয়া কেমন করিয়া যাবে?"

পশুপতি। Can't help, বাপের মৃত্যু ভাল না ইস্কুলে ভাল?

প্রমদা। ইস্কুলে না বলিয়া গেলে যদি Scholarship lose কর?

পশু। Damn your scholarship, যায় তা কি করব, don't care।

প্রমদা। আচ্ছা, ভাই, তবে যাও। But write an envelope as soon as the old fool plucks পটল।

এখনকার শিক্ষিত বাবুদের একটা রোগ হইয়াছে—তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে যাহাই নির্গত হয়, তাহাই রসিকতা। তাই তাঁহারা দিবা রাত্রি রসিকতা করিবার নিমিত্ত শরীরের বত্রিশটা নাড়ী ধরিয়া টানাটানি করেন, এবং রসিকতা করিতে পারুন আর নাই পারুন, প্রতি কথায় জোর করিয়া বেযাড়া হাসি হাসিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন যে তাঁহারা বড় রসিক। পশুপতি বাবুও প্রমদাচরণের রসিকতা শুনিয়া জাতীয়, ব্যবসাপালনার্থ তাঁহার দিকে ফিরিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কাঙ্গালি বাবুর বাসায় পূর্ব্ব দিবস বৈকালে যথার্থই সম্বাদ আসিয়াছিল যে, উমাপতি ভট্টাচার্য্য অতিশয় পীড়িত এবং পশুপতি বাবুও তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু আজ প্রমদাচরণের কাছে বাড়ী যাইব বলিয়া পুত্র-কুল-তিলক পশুপতি ভট্টাচার্য্য গোধনপুরে না গিয়া কলিকাতার একটা অতি অধম পল্লীতে একটা ক্ষুদ্র বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিল। এদিকে যত বেলা হইতে লাগিল, কাঙ্গালি বাবুর পল্লীতে লোকে চোখ টেপাটেপি করিয়া বলিতে লাগিল যে, কাল রাত্রি হইতে কাঙ্গালি বাবুর বড় মেয়েটী ঘরে নাই। দুই দিবস পরে গোধনপুর হইতে এক ব্যক্তি কাঙ্গালি বাবুর বাসায় আসিয়া বলিল যে "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর বড় বিলম্ব নাই, তাই তিনি একবার পশুপতি বাবুকে দেখিবার জন্য কাতর হইয়াছেন।" কাঙ্গালি বাবু কি তাঁহার

বাড়ীর অপর কেহ কোন কথা বলিলেন না, কেবল কাঙ্গালি বাবুর এক জন অতি পুরাতন, অতি প্রিয়, এবং অতি বিশ্বাসী ভৃত্য মুখটা হাঁড়িপানা করিয়া এবং গলাটাও হাঁড়িপানা করিয়া বলিল—"সে এখন আর এখানে থাকে না।" ভৃত্য যখন এই কথা বলিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহার বড় বড় চোক দুটা লাল হইয়া উঠিয়াছে, আর জলে ড্যাব ড্যাব্ করিতেছে। গোধনপুরের লোক গোধনপুরে গিয়া বলিল যে, "পশুপতি বাবুর দেখা পাইলাম না, তিনি এখন কাঙ্গালি বাবুর বাসায় থাকেন না।" শুনিয়া পশুপতির মুমূর্ষু পিতার দুইটী স্থির নিষ্প্রভ চক্ষু হইতে দুইটী অতি সূক্ষ্ম জলধারা গড়াইয়া পড়িল, তিনি অতি ক্ষীণ, অতি কাতর, কিন্তু অতি আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"তবে সে আমার কোথায় গেল—!" বলিয়া হাঁপাইয়া উঠিলেন। তাঁহার একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। সেই তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস। উমাপতি ভট্টাচার্য্যের সব ফুরাইয়া গেল।

পশুপতি বাবু গোধনপুরে যান নাই, সে সম্বাদ তাঁহার Debating Club-এর বন্ধুগণ শীঘ্রই প্রাপ্ত হইলেন; এবং অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিলেন যে, শ্রীভ্রষ্টা কুঞ্জকামিনী দেবীর তিরোভাবের সহিত তাঁহাদের সুযোগ্য এবং সুদক্ষ সভাপতি মহাশয়ের তিরোভাবের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অতএব তাঁহাদের সভার একটি বিশেষ (special) অর্থাৎ গোপনীয় অধিবেশনে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, লালমোহন বাবু যে প্রণালীতে 'সম্বন্ধ নির্ণয়' করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই প্রনালীতে কুঞ্জকামিনীর এবং পশুপতি বাবুর তিরোভাবের মধ্যে 'সম্বন্ধ নির্ণয' করিবেন। তাঁহারা সকলেই practical men', অতএব সে সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বড় একটা দেরি হইল না। এখন প্রমদা বাবুর সভাপতিত্বে ক্লাবের আর একটা গোপনীয় অধিবেশনে সভ্যগণ এইরূপ স্থির করিলেন যে, ক্লবের নিযমানুসারে উদ্ধারকার্য্য একজন সভ্যের নয, সমস্ত সভ্যের, অতএব তাঁহারা সকলেই কুঞ্জকামিনীর উদ্ধাকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা প্রতিজ্ঞামত কার্য্য করিলেন—সকলেই কুঞ্জকামিনীকে উদ্ধার করিতে গেলেন। হতভাগিনী কুঁজি কালামুখী বটে, কিন্তু সেও Pataldanga Debating Club—এর সুশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন দেশহিতৈষী সভ্যমহাশয়গণের উদ্ধার প্রণালী দেখিয়া ঘৃণায় আফিঙ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

তখন শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু পশুপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় চোকের জলে ভাসিতে ভাসিতে বড় সাধের ফিন্‌ফিনে গোঁফ যোড়াটি চাঁচিয়া ফেলিলেন। তার পর গোধনপুরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন—"মা, আমি সব শুনিয়াছি। শুনিয়া বাবার উদ্ধারের জন্য গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া তবে বাড়ীতে আসিতেছি। কিন্তু বাবাকে যে শেষ একবার দেখিতে পাইলাম না, এ দুস্তর দয়াময় দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য দরিদ্ররঞ্জন দুঃখ জন্মেও ভুলিতে পারিব না।" জননী কাঁদিয়া বলিলেন—"নাই বা দেখা হল বাবা, তুমি তার যে কাজ করে এসেছ, সে কাজ কলিকালে কার ছেলে করে, বাবা?" পশুপতি বাবু একেবারে গয়াধামে পিতার পিণ্ডদান করিযা বাড়ীতে আসিয়াছেন শুনিয়া, গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং প্রাচীনেরা তাঁহাকে ধন্য ধন্য

করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন—"এমন ছেলেকেও আবার নিন্দা করে! উমাপতি ঠাকুরের সহস্র জন্মের সুকৃতি ছিল, তাই এমন ছেলে পাইয়াছিলেন।"

অতুল প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পশুপতি বাবু গোধনপুরে আড্ডা করিলেন। সেখানে আড্ডা কবিবাব একটু বিশেষ কারণও ছিল। বিনা অনুমতিতে এত দিন কামাই করায়, তাঁহার ছাত্রবৃত্তিটী বন্ধ হইল। অতএব স্বয়ং বাসা ভাড়া করিতে অক্ষম। ওদিকে কাঙ্গালি বাবুর দ্বারে আপনিই কাঁটা দিয়া আসিয়াছেন। শ্বশুরবাড়ীতে থাকিবার নিষেধ নাই, কিন্তু শ্বশুরের উপর তাঁহার বড় রাগ, কেন না শ্বশুর তাঁহার পত্নীর পিতা। যে পত্নী দশজনকে প্রেম ভাগ করিয়া দিতে সম্মত হয় না, তাহার পিতা কখনই প্রেমিক লোক হইতে পারে না। পশুপতি বাবু heredity তত্ত্বটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একদিন কোথায় heredity সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। এক খানা বাঙ্গালা খববেব কাগজে সেই প্রবন্ধের একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িয়া পটলডাঙ্গার একটা Dispensary-তে দুই চারি জন খুচ্‌রা ডাক্তার বাবু কি তর্কাবিতর্ক করিয়াছিলেন। তাই শুনিয়া Dispensary-র Compounder মহাশয় একদিন পশুপতি বাবুর কাছে heredity তত্ত্বটা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পশুপতি বাবু জানিতেন যে, পিতা প্রেমিক হইলে heredity অনুসাবে কন্যাও প্রেমিকা হইবেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ পশুপতি বাবুর পত্নী বত্নমঞ্জরী পশুপতি বাবুব ন্যায় প্রেমিকা নন, তিনি পতি বই আব কাহাকেও ভাল বাসিতে পাবেন না। পশুপতি বাবু তাঁহাকে অনেকবাব কলিকাতার ক্লবের সভ্যগণেব সহিত আলাপ প্রণয় এবং পান ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা কবিতে পাবেন নাই। তাই বিশ্বপ্রেমিক পশুপতি বাবুব পত্নীব উপর এবং পত্নীর পিতাব উপর এত রাগ। গোধনপুরে আড্ডা কবিবাব ইহা অপেক্ষাও একটা গরুতর কারণ ছিল। সে কারণ—দেশেব উদ্ধার, গোধনপুরকে সভ্য এবং উন্নত কবিতে হইবে। কিন্তু এত বড় কাজ একলা করা যায় না, সহযোগীব সাহায্য ভিন্ন হয় না। অতএব পশুপতি বাবু সহযোগী অন্বেষণ কবিতে লাগিলেন। এমনি যুগমাহাত্ম্য যে তাঁহাকে বেশী অন্বেষণ করিতে হইল না। গ্রামের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বংশীয় যুবকগণ, যাঁহারা, কলিকাতায় চাকুরি কবেন, তাঁহারা শনিবাব অপরাহ্নে বাড়ী আসিলে পর পশুপতি বাবু যেমন তাঁহাদের নিকট কথাটা উত্থাপন করিলেন অমনি সকলে বুক ঠুকিয়া এবং মুষ্ট্যাস্ফালন কবিয়া মহা আগ্রহেব সহিত উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা কবিলেন—'এ কাজ আমবা অবশ্য কবিব, প্রাণপণে কবিব, যে কোন উপায়ে কবিব।' ইংবেজ রাজাব কল্যাণে বঙ্গের প্রতি গৃহে আজ patriot এবং পরহিতান্বেষী বিবাজমান। তাই এখন দেশেব উদ্ধার বা সমাজের সংস্কারের কথা পাড়িলেই যেন কলের পুতুলেব মত লোক দলে দলে কোমব বান্ধিয়া, জামার আস্তিন্ গুটাইয়া, গোঁফ দাড়ি চোমরাইয়া সিংহনাদ করিতে থাকে! তাই আজ মুহূর্ত্ত মধ্যে পশুপতি বাবু এত স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং আগ্রহপূর্ণ সহযোগী প্রাপ্ত হইলেন। কাল পূর্ণ না হইলে কি কার্য্যসিদ্ধ হয়? আজ ভাবতে কাল পূর্ণ হইয়াছে। তবুও তোমরা বল কি না, আজ ভারতেব বড়ই দুর্দ্দশা! এ কথার অর্থ কি কেহই বুঝাইবে না! আহা! কি যন্ত্রণা!

৩

পর দিবস বৈকালে গোধনপুরেব যুবকবৃন্দের উদ্যোগে তথায় একটী অপূর্ব্ব সভা হইল। সে সভায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই উপস্থিত, কেবল ভদ্র ঘরের মেয়েবা চিকেব আড়ালে। গোধনপুবে এই প্রথম সভা, গ্রামের বাগ্দী গোয়ালা কেহ কখন সভার কথা শুনে নাই। অতএব সকলেই যাহার যেমন ভাল কাপড় ছিল পরিয়া নিরূপিত সময়ের এক প্রহর কাল পূর্ব্ব হইতে সভাস্থলে আসিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। এক অশীতিবর্ষীয়া বুড়ী লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে আসিযা এদিক ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“হ্যাঁ গা, সরা গড়চে কোথা?” বুড়ীর পবনে একখানি মলিন এবং ছিন্ন বস্ত্র, কিন্তু এত বযসেও এমনি শ্রী যে দেখিলেই মনে হয় বুড়ী বুঝি খুব বড় ঘরের মেয়ে। বুড়ীকে কেহ চিনিতে পারিল না, কিন্তু সকলেই চুপ কর্ চুপ কব্ বলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। বুড়ী বুঝি মনে কবিল যে, সরা গড়ার সময় কথা কহিলে সরা গড়া হয় না। তাই সে লাঠিটি এক পাশে বাখিয়া একটা দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া অতি অল্পক্ষণেব মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে কায়স্থ ব্রাহ্মণ সকলেই উপস্থিত হইলেন। নিরূপিত সময়ও উপস্থিত। তখন গোধনপুবের যুবকবৃন্দ উত্তম উত্তম বস্ত্র পবিধান কবিয়া, বিবিধ প্রণালীতে তেড়ী কাটিয়া, দেশী বিলাতী সুগন্ধে দশ দিক মাতাইয়া মস্ মস্ করিতে করিতে এক একটা নিশান হাতে করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র যেন মহা ত্রাসযুক্ত হইয়া সভাস্থ সমস্ত লোক আপনা হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহারা বসিলে পব সকলে বসিল। একজন যুবক দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“মহাশয়দিগের যদি মত হয়, তাহা হইলে সুযোগ্য সুসভ্য পশুপতি বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন।” আর একজন যুবক দাঁড়াইয়া বলিল—“সভ্য মহাশয়গণ, আমি এই সুযোগ্য, সুবিজ্ঞ, সুরম্য প্রস্তাব ডবল্ কবি।” যুবকগণ ছাড়া এসকল কথার অর্থ কেহ কিছু বুঝিল না। অতএব সকলেই হাঁ করিয়া রহিল। তখন ‘Silence is consent’, এই কথা বলিয়া পশুপতি বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। যুবকবৃন্দ সজোরে করতালি দিল, কিন্তু আর কেহ করতালি দিতে পারিল না। করতালির শব্দ শুনিয়া সেই বুড়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে জিজ্ঞাসা করিল,—“হ্যাঁ গা, সরাগুলো কি ভেঙ্গে গেল গা?” কেহ কোন উত্তর করিল না, কারণ সকলেই তখন পশুপতি বাবুকে দেখিতেছিল। বুড়ী আবার ঘুমাইয়া পড়িল। তখন পশুপতি বাবু উঠিয়া হাত মুখ নাড়িয়া বুক চাপড়াইয়া ও টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া অনেক কথা বলিলেন। তিনি এমনি জলদ্ বলিয়াছিলেন যে, আমবা তাঁহাব সকল কথা লিখিয়া লইতে পাবি নাই। অতএব কিছু সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিতেছি। তিনি বলিলেন:—

"মহাশয়গণ, গোপগণ, লাঙ্গুলধারিগণ, কুঞ্জ কামিনী আহা! না না, কামিনীগণ, বালক বালিকাগণ---তোমরা আজ কি দেখিতেছ? তোমরা আজ যাহা দেখিতেছ, তোমাদের চৌদ্দ পুরুষ তাহা কখন দেখে নাই। দেখ আজ তোমাদের গোধনপুরে
সভ্যতার নিশান উড়িতেছে---দেখ এই নিশানে কি লেখা আছে। ইহাতে লেখা রহিয়াছে---গোধনপুরের উদ্ধার কর, গোধনপুরের আপামর সাধারণের মনের অন্ধকার নিবাইয়া জ্ঞানের আলোক জ্বালাইয়া দেও, গোধনপুরের রমণীকুল উদ্ধার কর। দেখ, রামচন্দ্র স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পতিব্রতা বলিয়া এত যশ। আবার সে বৎসর কলিকাতায় লর্ড বিশপ সাহেব নবগোপাল বাবুর মেলাতে বঙ্গের অবলা সরলা কাণবালা কুলবালাকে দেখিতে না পাইয়া কত কাঁদিলেন এবং কলিকাতার মহিমাময় মত্তমাতঙ্গ মধুপায়ী মহাশয়গণকে কত তিরস্কার করিলেন। অতএব, হে প্রিয় গোধনপুরবাসী গোপ কৃষক মহাশয়গণ, তোমরা তোমাদের বধূ, কন্যা প্রভৃতি রমণীকে উদ্ধার কর। দেখ, আমরা এই গোধনপুরে কাল একটী বালিকা-বিদ্যালয় খুলিব। সেখানে যত বালিকা দিবাভাগে লেখা পড়া শিখিবে। কিন্তু যে সকল বৈক্লব্য বিমোহিনী বিবাহিতা বা বিধবা স্ত্রী আছেন, তাঁহারা দিবাভাগে সংসারের কার্য্য করেন। সে কার্য্য তাঁহাদের অবশ্য পোষ্য প্রতিপাল্য শ্রীপতিতপাবন পাঁটা, অতএব তাঁহাদের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একটী ইস্কুল বসিবে। সে ইস্কুলে কলিকাতা হইতে বিবি শিক্ষিকা আসিয়া পড়াইবে। হে গুণবতী গোমেধকারী গোপমহাশয়গণ, সে বিবিরা তোমাদের মনোমোহিনী মহিলা মেয়েদের এমনি পনির তৈয়ার করিতে শেখাইবে যে, তোমরা পনির বিক্রয় কেরিয়া প্রত্যেকে অনায়াসে এক মাসে এক হাজার টাকা লাভ করিতে পারিবে। এবং হে গোধনপুরবাসী লাঙ্গুলধারিগণ! তোমাদিগকেও বলিতেছি যে আমরা যে বিবি শিক্ষিকা আনিব, তাহারা তোমাদের মন্থরা মনোহরা মহিষমর্দ্দিনী মেঠো মেয়েদের এমনি কৌশলে ধানসিদ্ধ করিতে শেখাইবে যে এক হাঁড়ি ধান সাত হাঁড়ি হইয়া পড়িবে। তখন তোমাদের এক টাকায় সাত শত টাকা লাভ হইবে। আর কি চাও? বলি, ওহে গুপ্‌গাপ্ গোপ সকল এবং cheese-chop চাচা সকল, আর কি চাও? অতএব দেরি করিও না। কাল সন্ধ্যার পর তোমাদের মেয়েদের ইস্কুলে পাঠাইয়া দিও। তোমাদিগকে ইস্কুলের মাহিয়ানা দিতে হইবে না। ইস্কুলের সমস্ত খরচ আমরা দিব। কেমন হে গয়ারাম কি বল?"

গয়ারাম গোধনপুরের গোপসমাজের কর্ত্তা---গয়ারামের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। সে উঠিয়া চাদরখানি গলায় জড়াইয়া যোড়হাত করিয়া বলিল---"তা, মশায় ও সব ত আমরা কিছু কইতে পারি না। ভট্‌চায্যি মহাশয় যা নিবেদন করিবেন আমরা তাই করিব।" পাঠক জানেন যে গোধনপুরে অনেকগুলি ভট্টাচার্য্যের বাস। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মশায় বলিলে সেখানে কেবল ন্যায়বাগীশ মহাশয় বুঝায়, কেন না ন্যায়বাগীশ মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত এবং তাঁহার একখানি টোলও আছে। গোপবৃদ্ধ গয়ারাম ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের দোহাই দিলে পর পশুপতি বাবু ন্যায়বাগীশ মহাশয়কে কিছু ভেকাচেকা রকম দেখিয়া বলিলেন---"বলি, ও ন্যায়বাগীশ মহাশয়, ভাবিতেছেন কি? বাবা যে আপনার

জমি বেদখল করিয়া লইয়াছিলেন, তাই ভাবিতেছেন না কি? তা সে জন্য ভাবনা কি? সে জমি আমি আপনাকে ফিরাইয়া দিব। এখন গয়ারাম যা বলিতেছেন, তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিন।'' তখন পণ্ডিতপ্রধান ন্যায়বাগীশ মহাশয় বড় রকম এক টিপ নস্য লইয়া গা ঝাড়া দিয়া বলিলেন—''হ্যা হ্যা, তা মীমাংসা করিব বৈ কি। কি জান, পশুপতি বাবু আপনারা আমাদের অপেক্ষা বয়সে ছোট বটে। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে আপনারা আমাদের অপেক্ষা ঢের বড়। ভগবান আপনাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন। আহা! কেমন বংশে জন্ম! যেমন রূপ তেমনি গুণ! বলি ওহে গোপগণ, বাবুরা যেমন বলিতেছেন তেমনি করিও, তোমাদের ভাল হবে।'' এই কথা শুনিয়া গয়ারাম আবার গলায় কাপড় দিয়া উঠিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল—'যে আজ্ঞে, মশায়।'' আহ্লাদে যুবকবৃন্দ চেঁচাইল—''Victory, পশুপতি বাবু, Victory!'' পশুপতি বাবু আবার উঠিয়া বলিলেন:—''We are practical men, আমরা কাজের লোক। অতএব আর বেশী কথা কহিব না। কাল হইতে এই সৌভাগ্যময় গোধনপুরে একটী Girls' School অর্থাৎ বালিকা বিদ্যালয় এবং একটী Feminine Night School অর্থাৎ মেয়েলি তামসিক বিদ্যালয় খোলা হইবে; গোধনপুরের সমস্ত সমাজ উল্টাইয়া সুসভ্য, সমুন্নত ও সুজ্ঞানিত করিবার জন্য ইংরেজ গুরুর উপদেশ মতে কতকগুলি Society প্রভৃতি সংস্থাপিত হইবে। ভরসা করি আমাদের আশানুরূপ ফল ফলিবে। ভরসা করি আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের জন্মভূমি ''জননী জন্মভূমিশ্চ সংগোপাদি গরুবাসী'' গোধনপুর দুই দিনের মধ্যে London অপেক্ষাও সভ্যতার সমুচ্চ, সম্পূর্ণ সঙ্কটাপন্ন চূড়ায় আরোহণ করিবে।''

পশুপতি বাবু বসিলেন। যুবকবৃন্দ বারম্বার করতালি দিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা করতালি দিলেন না— কেবল বলিলেন ''বেঁচে থাক বাপ্ সকল—গোধনপুরের এমন দিন হবে তা কে জানিত?'' গোপ এবং কৃষকগণ দুই একবার করতালি দিবার চেষ্টা করিল, ভাল হইল না। তখন তাহারা লাঙ্গলবাহী বা ভারবহনাক্ষম গরুকে চালাইবার জন্য গরুর লেজ মলিয়া আপন আপন জিভ পাকাইয়া যেরূপ টক্ টক্ শব্দ করে, সেইরূপ টক্ টক্ শব্দ করিতে লাগিল। সে শব্দ শুনিয়া যুবকবৃন্দ যেন আরো উত্তেজিত হইয়া মহাবেগে সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিল। আর সে শব্দ শুনিয়া সেই বুড়ীর আবার ঘুম ভাঙ্গিল, সে বলিল ''হ্যাঁ, রে, বাপ সকল, এ ত সব গরু, গরুতে আবার মরা গড়িবে কেমন করে, বাপ?'' এই কতা বলিয়া বুড়ী লাঠি হাতে করিয়া উঠিল। বুড়ীকে দেখিয়া অবধি তাহার উপর আমাদের কিছু মায়া জন্মিয়াছিল। অতএব, পাছে কোথাও পড়িয়া যায়, কি কিছু হয়, দেখিবার জন্য আমরা বুড়ীর পিছে পিছে গেলাম। দেখিলাম বুড়ী গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া গম্ভীর ও দৃঢ় পদ বিক্ষেপে মাঠের উপর দিয়া চলিল। দেখিতে সেই বুড়ী, কিন্তু বুড়ীর এমন যেন অসীম বল। তখন প্রায় সন্ধ্যা—চারিদিক ঘোর হইয়া আসিতেছে। মাঠের পশ্চিম প্রান্তে একটা বৃহৎ পুষ্করিণীর পাহাড়ে [পাড়ে] বড় বড় তাল গাছ যেন জটাজুটধারী শীর্ণকায় ঋষি তপস্বীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গাছগুলার তমসামিশ্রিত শিরোপরি অস্তমিতে সূর্য্যের মলিন সিন্দুররাগ

মিলাইয়া যাইতেছে। বুড়ী সেই বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোথায় গেল দেখিতে পাইলাম না। অবাক হইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম যেন জটাজুটধারী জীর্ণকায় তাল বৃক্ষের উপরে সেই মলিন সন্ধ্যার মলিন সিন্দুর বর্ণে পাতার গায় পাতা পাড়িয়া কেমন করিয়া তিনটি অতি মলিন অক্ষর ফুটিয়াছে:—জ-ন-নী।

৪

সন্ধ্যার পর পশুপতি বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে গোধনপুরের যুবকবৃন্দ প্রস্তাবিত বিদ্যালয় প্রভৃতি সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। স্থির হইল যে আগামী কল্যই কলিকাতা হইতে দুই জন শিক্ষয়িত্রী আনা হইবে। বিদ্যালয়ের জন্য কলিকাতায় চাঁদা সংগ্রহ করা হইবে, কিন্তু Feminine Night School-র কথা এখন প্রকাশ করা হইবে না, কেননা কলিকাতার লোক এত উন্নত হয় নাই যে Female Night School-এর মর্ম্ম বা আবশ্যকতা বুঝিতে পারে। অতএব তাহাতে যে ব্যয় হয় তাঁহারা নিজেই তাহা দিবেন। তাঁহারা পনর জন, প্রতি মাসে আট টাকা করিয়া দিলে প্রায় এক শত টাকা উঠিবে। তাহাতেই আপাতত চলিবে। আরো স্থির হইল যে সমস্ত গোধনপুরের উন্নতি সাধনার্থ এবং সমাজসংস্কারণার্থ তথায় একটি Public Library এবং একটী Social Improvement Society স্থাপন করা যাইবে।

পর দিবস রজনী বাবু কলিকাতা হইতে মিস্ আলিজেবেথ জালিয়ানী এবং মিস্ কাথারাইন মুচিরানী নাম্নী দুইজন শিক্ষয়িত্রি গোধনপুরে লইয়া গেলেন। প্রত্যেকের মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। মিস্ দুইটী কতদূর শিক্ষিতা, রজনী বাবু তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তাহারা দুই জনেই অল্পবয়স্ক, অতএব দুই জনেই কর্ম্মক্ষম হইবে এই ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। পশুপতি বাবু প্রভৃতি তাঁহাকে বারম্বার ধন্যবাদ দিলেন। Feminine Night School চলিতে লাগিল। ইস্কুলের উন্নতি দেখিয়া দুই এক মাসের মধ্যে যুবকবৃন্দের উৎসাহ এত বাড়িয়া উঠিল যে তাহাদের আর গোধনপুর ছাড়িয়া তুচ্ছ টাকার জন্য কলিকাতায় চাকুরি করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ক্রমে তাহারা চাকুরি ছাড়িয়া গোধনপুরে বসিয়া Feminine Night School-এর উন্নতি সাধনে ব্যতিব্যস্ত হইল। টাকা না হইলে Patriot দিগের সংসার চলিতে পারে, কিন্তু Female School চলিতে পারে না। অতএব গোধনপুরের Patriot মহাশয়রা ক্রমে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের খোরাক কমাইতে লাগিলেন, এবং তাহাদের গার গহনা বেচিয়া Female School-এর খরচ যোগাইতে লাগিলেন কিন্তু গহনা কাহারো বেশী ছিল না, অতএব তিন চারি মাসের মধ্যেই গোধনপুরের ভদ্রমহিলাদিগের যেমন পেট খালি হইয়াছিল, তেমনি গাও খালি হইয়া গেল। তখন তাহাদের সুখের অবস্থা দেখিয়া রোগ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। পশুপতি বাবুর বাড়ীর সকলেও পীড়িত। একদিন

তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিলেন- -"বাবা, তুমি আমার পণ্ডিত ছেলে, তোমাকে আমি আবার জ্ঞানের কথা কহিব কি, কিন্তু বাবা এমন করে হৈ হৈ করে বেড়ালে দিন যাবে কেমন করে বাবা?" পুত্র উত্তর করিলেন:-- 'সে কি মা? হৈ হৈ করে বেড়ান কি? আমরা যা করিতেছি তাহাই ত মানুষের কাজ। আপনি পেটে খাওয়া ত শোর গরুর কাজ। পরের ভাল করা, এই ত মানুষের কাজ। মা আমরা patriot, আমরা খাওয়া দাওয়া বুঝি না। সব ত্যাগ করিয়া আমরা দেশের উদ্ধার করিব। তোমরা কম খাইতেছ বলিয়া দুঃখ করিও না। কম খাইয়া দেশের কাজ করিলে, কত পুণ্য হবে তা জান? অত খাই খাই করিও না।" পশুপতি বাবুর মা হিন্দুর মেয়ে। পুত্রের কথা শুনিয়া যেন লজ্জায় ও ঘৃণায় মরিয়া গেলেন। কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন:--"অদৃষ্টে যাই থাক্, এ জন্মে আর খাওয়ার কথা মুখে আনিব না। হায়! আমি কি আপনিই খেতে চাই।" পশুপতি বাবু মস্ মস্ করিয়া নিজের শয়ন গৃহে গেলেন। সেখানে তাঁহার কগ্না পত্নী রত্নমঞ্জরী ছয় মাসের কগ্না কন্যাটিকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন। কন্যাটির অনাহারে উদরাময় হইয়াছে। আজ চারি পাঁচ দিন তাহার উপর জ্বর হইতেছে। মেয়েটী যায় যায়। পশুপতি বাবু পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই বুঝি মাকে খাওয়ার কথা বলেছিস?" রত্নমঞ্জরী কাঁদিতেছিল। চোকের জল মুছিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিল---"কেন, খাওয়ার কথা বলিব কেন, আমরা কি খাইতে পাই না?"

পশুপতি। তবে মা আমাকে এত কথা বলিলেন কেন?

রত্ন। তা ত আমি ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় উনি তোমাকে মনের মতন খাওয়াইতে পান না বলিয়া বলিয়াছেন।

পশুপতি। আমি মন্দ খাইতেছি কি?

রত্ন। মার ছেলেকে খাওয়াইয়া কি সাধ মিটে? এই কথা বলিতে রত্নমঞ্জরীর চক্ষের এক ফোঁটা জল মেয়েটীর ঠোঁটের উপর পড়িল। মেয়েটী হাঁ করিল। রত্নমঞ্জরী এক ঝিনুক জল তাহার মুখে দিল। সে আধ ঝিনুক খাইয়া আর খাইতে পারিল না, হাঁপাইয়া উঠিল। পশুপতি বাবু বলিলেন:—"আচ্ছা যদি খাওয়া দাওয়া সব হচ্চে, ভাল তবে কেন খুকীর হার ছড়াটা আমাকে দে না?"

রত্নমঞ্জরী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল:-—"একটু বাদে নিও না।"

পশু। একটু বাদে কেন? এখনি দে না?

রত্নমঞ্জরী দুইটী অশ্রুপূর্ণ যাচ্ঞামর চক্ষু পতির মুখের দিকে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ আবার নামাইয়া অতি ক্ষীণ এবং অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"ও ত একটু বাদেই চলে যাবে!"

"না, না, তা হবে না, আমার এখনি চাই, Kate কে আজ মাহিয়ানা দিতে হবে"—এই বলিয়া পশুপতি বাবু জোরে মেয়েটীর গলার হার ধরিয়া টানিলেন। তখন রত্নমঞ্জরী অতি কাতর এবং আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল—"তোমার পায় পড়ি, দাঁড়াও আমিই খুলিয়া দিতেছি!" এই বলিয়া নিজে হার খুলিতে উদ্যত হইল। সে কথা

না শুনিয়া পশুপতি বাবু সজোরে হাব ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। মেয়েটী ভাঙ্গা গলায় ক্ষীণ তীব্র স্বরে চীৎকার কবিয়া উঠিল। রত্নমঞ্জরী চোখের জল মুছিয়া মেয়েটীকে বুকে তুলিয়া লইলেন। সেই রাত্রে মেয়েটীর জ্বব বৃদ্ধি হইল। তাহার গলা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিল। সে আব একটি ফোঁটা জলও গিলিতে পাবিল না। পরদিন বেলা আড়াই প্রহরেব সময় রত্নমঞ্জবীর রত্নটুকু মাটী হইয়া মাটীতে মিশিয়া গেল।

চতুর্থ ভাগ

১

পশুপতি বাবু প্রভৃতি গোধনপুরে একটা Public Library স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তক নহিলে পুস্তকালয় হয় না। গ্রন্থ লিখিতে না জানিলে গ্রন্থকার হওয়া যায়, আইন না জানিয়া উকিল হওয়া যায় এবং হাকিম হওয়া যায়, চিকিৎসাবিদ্যা না জানিয়া চিকিৎসক হওয়া যায়, বাজ্য না থাকিলে রাজা হওয়া যায়, জমি না থাকিলে জমিদার হওয়া যায়, ঔষধ ব্যতীত ঔষধালয় হয়, দান না করিয়া দাতাকর্ণ হওয়া যায়, ধর্ম্ম না থাকিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায়, বিবাহ না হইলেও বহু পবিবার হয়, বিদ্যা না থাকিলে বিদ্বান হওয়া যায়, কিন্তু পুস্তক না থাকিলে পুস্তকালয় হয় না। অতএব গোধনপুরের যুবকবৃন্দ পুস্তক সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহারা গহনা বেচিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। Public Library ত স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত নয়। অতএব Public Library-ব জন্য গহনা বা লাখরাজ বা ব্রহ্মোত্তর বিক্রয় করা অকর্ত্তব্য। অতএব আধুনিক Patriot দিগের মধ্যে যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সেই প্রথানুসারে গোধনপুরের patriot মহাশয়রা বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগকে তাঁহাদের প্রতি গ্রন্থের এক এক খণ্ড পাইবার প্রার্থনা জানাইয়া পত্র লিখিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার তাঁহাদের পুস্তক দিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কেহ বা নিজ ব্যয়ে ডাক মাশুল দিয়া গ্রন্থ পাঠাইয়া দিলেন। আমরা জানি কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহাব 'প্রভাতচিন্তাব' 'ভ্রান্তিবিনোদের' এবং 'নিভৃতচিন্তার' এক এক খণ্ড, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার 'শকুন্তলাতত্ত্বের' এক খণ্ড এবং হরপ্রসাদ বাবু তাঁহার 'বাল্মীকির জয়ের' এক খণ্ড ডাক মাশুল দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা এই রকমে ডাক মাশুল দিয়া বই বিলাইয়া লোকের কাছে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের বই খুব কাটিতেছে; কিন্তু আমরা জানি যে তাঁহাদের বই যোগেশ বাবুর দোকানেই থাকুক আর গোধনপুরের Public Library-তেই থাকুক, পোকায় ভিন্ন আর কিছুতেই তাহাদিগকে কাটে না। বঙ্কিম বাবু সকল বিষয়েই সৃষ্টিছাড়া—তিনি যে শুধু তাঁহার গ্রন্থ দিতে অস্বীকার করিলেন তা নয়, গোধনপুরের যুবকবৃন্দকে একটু তিরস্কার করিয়াও লিখিলেন। তাঁহার চিঠি পাইয়া পশুপতি বাবু গোধনপুরের Social Improvement Society-র সভ্যগণকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগকে সেই চিঠি শুনাইলেন। চিঠি এইরূপ :—

"আপনারা আপনাদের গ্রামের উন্নতির নিমিত্ত একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু আমি দুঃখিত হইলাম যে, আমি আপনাদিগের বিশেষ সাহায্য করিতে অক্ষম। যাঁহারা সাধারণ পুস্তকালয়ের নিমিত্ত আমার পুস্তক চাহিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলকে পুস্তক দিতে হইলে, আমার বিস্তর ক্ষতি হয়। আর এক কথা। যদি যথার্থই আপনাদের উন্নতি করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কেন পুস্তক ক্রয় করিয়া পুস্তকালয় স্থাপন করেন না? তাহা করিলে আপনাদের পুস্তক পাঠে বেশী যত্নও হইতে পারে। ইতি।"

চিঠি শুনিয়া সমস্ত সভ্য একেবারে রাগিয়া আগুন। সকলেই বলিলেন যে, এ চিঠির একটা ভাল রকম উত্তর দেওয়া আবশ্যক। পশুপতি বাবু তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর প্রস্তুত করিয়া পাঠ করিলেন। উত্তর এই :—

"আপনার ভ্রমরময় পত্র পাঠ করিলাম। আপনার এত যশ কেমন কবিয়া হইল, আমরা বুঝিতে পারি না। আপনি অতি অপ্রসভ্য। আপনার নিকট আমরা বই চাহিয়াছিলাম। সে কি আমাদের উপকৃতকারের জন্য? না আপনার উপকৃতকারের জন্য? আপনি যদি যথার্থ বুদ্ধিমতী হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে, আমরা কেবল আপনার হিতকারিতা ভাবিয়া আপনার বই চাহিয়াছিলাম। আমরা এই সুসভ্য, সমুন্নত, গোধনপুর গ্রামে যে Public Library করিয়াছি, সে কাহার জন্য? আপনার যে রকম বুদ্ধিমত্তা, তাহাতে আপনি কখনই বুঝিবেন না যে সে কেবল বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগকে প্রোৎসাহ করিবার জন্য। বাঙ্গালা বই কেনে কে? পড়ে কে? আমরা দেশের উদ্ধারে গাঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি বলিয়া Public Library করিয়া দেশের লোককে বঙ্গীয় গ্রন্থাকারদিগের অসার, অপদার্থ, অকৃত্রিম, অনুনাসিক গ্রন্থ সকল পড়াইতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের চেষ্টা কৃতসফল হইলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের কত লাভ হইবে, বুঝিতে পারেন? তাঁহাদের বই কত বিক্রয় হইবে, বুঝিতে পারেন? বাঙ্গালা সাহিত্যের কত সমাদর, সম্মান, সুসঙ্গতি বৃদ্ধি হইবে, বুঝিতে পারেন? না, আপনি কেমন করিয়া বুঝিবেন? আপনার সে বুদ্ধিমত্তা নাই। আপনি ভবিষ্যৎ দেখিতে জানেন না এবং পারেন না। আমরা practical men, কেবল ভবিষ্যৎ দেখি। সার কথা এই—আমরা Patriot, দেশের লোকের উপকারার্থ এবং আপনাদিগের ন্যায় ন্যায্য, অন্যায্য নয়নচকোর গ্রন্থকারদিগের উপকৃতকারার্থ Public Library স্থাপন করিয়াছি। আপনারা গ্রন্থ না দিলে আমাদের মহৎ কার্য্য কেমন কবিয়া সম্পন্ন হয়, বলুন দেখি? কিন্তু হায়! আপনার সে বিচক্ষণপরতা নাই, আপনি প্রকৃত, প্রসিদ্ধ, প্রণয়কুশলী দানের পত্র চেনেন না। আমরা আপনার তোয়াক্কা রাখি না।

আপনি লিখিয়াছেন যে পুস্তক ক্রয় করিলে পুস্তক পাঠে আমাদের বেশী যত্ন হইতে পারে। ক্রয় করিয়া পড়িব, এমন পুস্তক কি বাঙ্গালা ভাষায় আছে? আপনি কি মনে করেন যে আপনার পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িবার যোগ্য? হা ভ্রম! হা কুসংস্কার! হা দাম্ভিকতা! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে আপনার পুস্তক কিছু মাত্র গুণবতী নয়।

শিক্ষিত লোকে আপনার পুস্তক পাঠ করে না। যাহারা রমণীকুলবিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারসম্পন্ন, কেবল তাহারাই আপনার পুস্তক পড়ে। আপনি অতি মুখনাড়া দিবেন না। আপনার দিন ফুরাইযাছে। আমি শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ভারতমাতাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তিন মাসের মধ্যে আপনার সমস্ত গ্রন্থ উড়াইয়া দিব। নিজে গ্রন্থ লিখিয়া দেশের সমস্ত Library পুরাইয়া ফেলিব। আপনি সাবধান হউন। Hip, Hip, Hip, Hurrah! ইতি।"

পত্রখানি বঙ্কিম বাবুর নিকট ডাকে পাঠান হইল। শুনিয়াছি যে, পত্র পড়িয়া বঙ্কিম বাবু তাঁহার পুস্তকাবিক্রেতাদিগকে অর্দ্ধেক দরে তাঁহার পুস্তক ছাড়িয়া দিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তকবিক্রেতারা আপত্তি করায় তিনি বলিয়াছিলেন— "তোমরা জান না, তিন মাস পরে আমার বই আর বিক্রয় হইবে না।"

২

বঙ্কিম বাবুকে চিঠি লিখিয়াই পশুপতি বাবু পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত দিনে একখানি উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলেন। উপন্যাসের নাম— "আশ্চর্য্য কাশীবাসী।" এক মাসের মধ্যে পুস্তক ছাপা হইল। কিন্তু পুস্তক ছাপাইয়া পশুপতি বাবু গোলে পড়িলেন। পুস্তক কেহ কেনে না এবং পুস্তকবিক্রেতারা অল্প কমিশনে পুস্তক লইতে চায় না। কাজেই পশুপতি বাবু তাঁহার ন্যায় গুণবান গ্রন্থকারদিগের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সমালোচকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুই এক খানা মফঃস্বলের বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সম্পাদককে বিপদের কথা জানাইয়া বেশ ভাল রকম সমালোচনা লেখাইয়া লইলেন। একটী সমালোচনা এই রূপ :—"বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে পশুপতি নামে একজন নূতন গ্রন্থকর্ত্তা বিচরণ করিতে আসিয়াছেন। পশুপতি বাবু নবীন লেখক হইলে কি হয়, তিনি বঙ্গের প্রবীন লেখকদিগকে আজ লজ্জা দিলেন! তাঁহার রচিত উপন্যাসটী এমনি সুকৌশলে গ্রথিত যে, তাহা একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে আদ্যোপান্ত শেষ না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার পুস্তকখানিতে বিলক্ষণ শব্দলালিত্য আছে। তিনি সকল প্রকার রসের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি মানবপ্রকৃতি বেশ বুঝেন। তাঁহার পুস্তকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। আমরা এই পুস্তকখানি সকলকে এক এক বার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকর্ত্তা যথার্থই উৎসাহের যোগ্য।" আর একটী সমালোচনাও প্রায় এই রকম, কেবল একটী বেশী কথা ছিল। সে কথা এই—"আমাদের মতে পুস্তকখানি সমস্ত বিদ্যালয়ে বিশেষত বালিকাবিদ্যালয়ে পঠিত হওয়া উচিত।" এত লেখা হইল বটে, কিন্তু ভাল কাগজে কেহ ভাল বলিল না। সাধারণীতে একটু ভাল করিয়া লেখাইবার জন্য পশুপতি বাবু একদিন অক্ষয়বাবুর কাছে গিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বাবু অতি অসভ্য এবং অশিষ্ট। তিনি সাধারণীতে 'আশ্চর্য্য কাশীবাসীকে' অবক্তব্য কলঙ্করাশি বলিয়া নিন্দা করিলেন। 'কলিকাতা রিবিউ' একটু

ভাল বলিলে কিছু কাজ হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া পশুপতি বাবু একদিন চন্দ্র বাবুর নিকট গিয়া তাঁহার একরকম হাতে পায় ধরিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় চন্দ্র বাবু কিছু কুটিলস্বভাব। তিনি তখন প্রশংসা করিয়া লিখিব, এইরূপ আশ্বাস দিয়া পরে বিলক্ষণ নিন্দা করিয়াছিলেন। সমালোচনা দ্বারা কোন কাজ হইল না দেখিয়া পশুপতি বাবু আর একটা অতি সদুপায় অবলম্বন করিলেন। বইখানি খুব আদরণীয় হইয়াছে, অতএব খুব কাটিতেছে, লোকে এসকল বুঝিলে ক্রয় করিবে ভাবিয়া, সমস্ত পুস্তকের title page ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ফেলিয়া ভাবিয়া, পশুপতি বাবু সমস্ত পুস্তকের title page আঁটিয়া দিলেন। নূতন title page-এর মধ্যে কতকগুলিতে প্রথম সংস্করণের পরিবর্তে দ্বিতীয়, কতকগুলিতে তৃতীয়, কতকগুলিতে চতুর্থ সংস্করণ লেখা হইল। এক মাসের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে চারি সংস্করণ বিজ্ঞাপিত হইল। তথাপি গবর্ণমেণ্ট চারি সংস্করণের যে তিন-চেরে বার খানি লইয়াছিলেন, তাহার বেশী বিক্রয় হইল না। এদিকে ছাপাখানার বিল লইয়া পীড়াপীড়ি পড়িয়া গেল। একশো পঞ্চান্ন টাকা তের আনা দুই পয়সার বিল। যাহার বিল সে উকিলের চিঠি দিল। পশুপতি বাবু তাঁহার শেষ সম্বল ৪বিঘা ব্রহ্মোত্তরের মধ্যে সাড়ে তিন বিঘা বিক্রয় করিয়া ছাপাখানার দেনা পরিশোধ করিলেন।

৩

পশুপতি বাবু দেনা পরিশোধ করিলেন বটে, কিন্তু পেটের অন্ন আর বড় যুটে না। দেশের উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শুধু যে তাঁহারই এই দশা তা নয়, গোপালপুরের সমস্ত বাবুদিগের আজ এই দশা। কেহই আর পেট ভরিয়া খাইতে পান না, কেবল সন্ধ্যার পর তামসিক বিদ্যালয়ে কি জানি কোথা হইতে দুধ আসে, বাবুরা তাহাই একটুকু আধটুকু খাইয়া থাকেন। কিন্তু এত কষ্ট সহিয়াও কেহ উদ্ধারকার্য্য ছাড়িতে চান না। ওদিকে গোপকৃষক মহলে বড়ই কান্নাকাটী পড়িয়া গেল। তাহাদের মেয়েরা খুব বাবু হইয়া পড়িয়াছে, কেবল বেশবিন্যাসে মন, কেহ আর গৃহকর্ম্ম করে না। তাও সওয়া যায়। কিন্তু একঘরে হওয়া তো কম অপমান নয়। অন্যান্য গ্রামে গোপ-কৃষকদের যে সব জ্ঞাতি কুটুম্ব আছে তাহারা আর তাহাদের বাড়ীতে খাইতে চায় না, নিমন্ত্রণ করিলেও আসে না। তাহারা তখন ন্যায়বাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"মশায় তখন মেয়ে ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাইতে অনুকল্প করিলেন, এখন যে আমাদের জাতি যায়।" ন্যায়বাগীশ মহাশয় কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া উত্তর করিলেন—"না হে না, ও সব যুগধর্ম্মে হইতেছে, উহাতে দোষ কি?" কিন্তু গোপকৃষকেরা আর ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিল না। তাহারা তাহাদের মেয়েছেলেদিগকে ইস্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইল। তখন উদ্ধার এবং পরোপকার করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া পশুপতি বাবু বই লিখিয়া সেই কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তিনি আর এক খানি বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন. এবার আর উপন্যাস লিখিলেন না, একখানা

গীতিকাব্য লিখিলেন। প্রথম কবিতা হইতে দুই চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :-

''গাও মাতা বঙ্গাননন্!
গাও তাঁর জয়,
যাঁর তবে
কবি বলে
'জয়, জয়, জয়।'
উদ্ধারিবে কবি
তাঁর
জাতি কুল মান।
আর
কবি উদ্ধারিবে
অবলার প্রাণ।
বাবা! অবলার প্রাণ!
ফেলে দাও
উপন্যাস,
ফেলে দাও গান,
বাজাও দামামা
এবে
ঝন্
ঝন্
ঝন্।
তাড়াও শ্বেতেবে
সবে
ছুঁড়ি
ফাঁকা গন্,
তাড়ায়ে
মায়েরে
কর
খান্!
খান্!!
খান্!!!''

কবিতাগুলি লিখিয়া পশুপতি বাবু মনে করিলেন যে এবার আর বঙ্কিম বাবু হেম বাবু প্রভৃতি মহারথীগণের নিস্তার নাই। আহ্লাদে ডগমগ হইয়া বাবু কাব্যখানি ছাপাইবেন বলিয়া কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তখন রত্নমঞ্জুরী অতি কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি চলিলে, ঠাক্‌রুণের জন্য কি করিব? সেই দিন থেকে (এই কথা বলিতে দুঃখিনীর চক্ষে জল আসিল) সেই দিন থেকে তাহার ব্যারাম বাড়িয়াছে। ডাক্তারও দেখান হয় নাই, আর এমন পয়সা কড়ি নাই যে রোগীর খাবারের মতন কিছু কিনে দেওয়া যায়। তা এখন কি করিব যদি বলে যাও ত ভাল হয়।"

পশুপতি বাবু উত্তর করিলেন—"কেন, সে জন্য ভাবনা কি? আমি এই নতুন বই ছাপাইতে যাইতেছি এবার ঢের টাকা পাব।"

রত্ন। আমরা মেয়ে মানুষ ও সব ত বুঝ্‌তে পারি না, আমাদের ওতে কথা কওয়াই নয়। তবে তোমাকে বলে জিজ্ঞাসা করি, সেবার বই ছাপাইয়া ত কিছু হয় নাই, এবার কেমন করে হবে?

পশু। তুই কি তত কথা বুঝিবি—এবার ত বই বেচিব না, এবার কপিরাইট্ বেচিব। এবার নিশ্চয় ঢের টাকা পাব।

রত্ন। আচ্ছা, আমি বুঝতে চাই না, তুমি পেলেই হল। এখন তবে ঠাকুরুণের জন্য কি করব?

পশু। কেন, একবার সাবিত্রী গোয়ালিনীর কাছে যাস্ সে দুটা টাকা দেবে। সে আমার ধারে। তাইতে চালাস্। দেখিস্ যেন মার কোন কষ্ট হয় না।

রত্নমঞ্জরী ঘাড় হেঁট করিয়া একটি চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিল—"আচ্ছা।"

পশুপতি বাবু মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। এমনি ব্যস্ত যে একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। এ জগতে তাঁহারই জন্য হাহাকার করিতে করিতে তুচ্ছ গর্ভধারিণী মাতা রোগে, শোকে, অনাহারে তাঁহারই জন্য হাহাকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। মরিবার সময় রত্নমঞ্জরীকে বলিয়া গেলেন—"মা, তুমি একলাটি এখানে কেমন করিয়া থাকিবে, খাবেই বা কি? তা যে, কয়দিন বাবা আমার ঘরে না আসেন, সে কয় দিন তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়া থাকিও।" কিন্তু মঞ্জুরী তাহা করতে পারিল না। সে রোগ, শোক, অনাহার সব তুচ্ছ করিয়া পতির প্রতীক্ষায় পতির ঘরে পড়িয়া রহিল।

৪

পশুপতি বাবুর কাব্য ছাপা হইল। একেবারে ১০০০ কাপি ছাপা হইল। তিনি অগ্রে এক কপি হেম বাবুকে পাঠাইয়া দিলেন। হেম বাবু পড়িয়া মাথা হেঁট করিলেন। সে মাথা আর তুলিতে পারিলেন না। পশুপতি বাবু বঙ্কিম বাবুকে তাঁহার বই দেন নাই, কিন্তু বঙ্গদর্শনে সমালোচনার্থ সঞ্জীব বাবুকে এক কাপি দিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু সেই বইখানি লইয়া পড়িলেন। পড়িয়া তাঁহার ঈর্ষা এত প্রবল হইল যে চক্ষুশূল একেবারে চক্ষুর বাহির করিবার জন্য তিনি বইখান ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া

সঞ্জীব বাবু বলিলেন :-"তবে আর আমার বলবার কি বইল?" তা সে সব কথা যাউক। পশুপতি বাবু এবাব আর বই বিক্রয় না করিয়া Copyright বিক্রয় করিয়া এক হাত মারিবার চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু কোন সম্ভ্রান্ত পুস্তক-বিক্রেতা Copyright ক্রয় করিতে সম্মত হইল না। শেষে একজন ক্ষুদ্র দোকানদার সম্মত হইল। সে দেখিল যে বই গুলি ওজনে ২ মণ ১৫।। সের। প্রতি সের এক আনার হিসাবে ক্রয় করিয়া দুই আনার হিসাবে বিক্রয় করিলে তাহাব পাঁচ ছয় টাকা লাভ থাকিতে পারে। অতএব সে পাঁচ টাকা পনেব আনা দুই পয়সা মূল্যে Copyright ক্রয় কবিতে স্বীকার করিল। পশুপতি বাবু তাহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া ৬ টাকা দাম ধার্য্য করিয়া Copyright বিক্রয় করিলেন। ক্রেতা প্রতি সেব দুই আনার হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তখন বইগুলি মসলার দোকানে, জুতাব দোকানে, এবং কাপড়েব দোকানে গিয়া পৌঁছিল। সেই সব দোকান হইতে সেই অপূর্ব্ব অগ্নিময় উত্তেজক কবিতা গুলি হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। পশুপতি বাবুর কীর্ত্তি, পশুপতি বাবুব অদৃষ্টচক্র ছাড়াইয়া উঠিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ আলোড়িত করিয়া তুলিল। পশুপতি বাবু যা বলিয়াছিলেন তাই করিলেন। বঙ্কিম বাবুর বইয়ের sale বন্ধ হইয়া গেল। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি কি জুতাব দোকানে, কি মসলার দোকানে, কি গাঁজার দোকানে, তাঁহাব বই কোথাও পাওয়া যায় না।

৫

পশুপতি বাবু ৬ টাকা লইয়া গোধনপুরে গেলেন। তখন রত্নমঞ্জরী শয্যাগত, আর বড় একটা উঠিতে পারেন না। তথাপি যখন শুনিলেন যে স্বামী অনেক টাকা আনিয়াছেন, তখন মনেব সাধে স্বামী সেবা করিবেন বলিয়া কোন রকমে শয্যা হইতে উঠিয়া রন্ধনাদি করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাও বিধি তাঁহাকে বেশী দিন করিতে দিলেন না। পাঁচ সাত দিবসেব মধ্যে শেয়ালদহের ছোট আদালত হইতে এক খানি শমন পশুপতি বাবুব নিকট পৌঁছিল। ছাপাখানাব দেনার জন্য তাঁহাব নামে নালিশ হইয়াছে। দেনাব পরিমাণ ১৮৩ টাকা সাত আনা তিন পয়সা। যে লোক শমন লইয়া গিয়াছিল, তাহার পোশাক এবং রকম দেখিয়া রত্নমঞ্জরীব ভয় হইল। তাহাতে আবার পেযাদা টাকা কড়িব কথা কহিল। দেখিয়া শুনিযা রত্নমঞ্জরী ভয়ে ভযে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল:-"ও আবাব কিসেব টাকা গা? কেহ কি নালিশ করেছে?" পশুপতি বাবু বলিলেন---"না না, ও টাকা তাহাবা আমাব কাছে পাইতে পারে না। ও তাহাদেব ভুল। তা সে যাহাই হউক, তোর ও কথায় কাজ কি?" রত্নমঞ্জরী বুঝিল যে তবে কোন ভয় নাই, অথচ তাহার মনে কেমন একটু ভয় রহিয়াও গেল। তিন দিন পরে পশুপতি বাবু শেয়ালদহেব ছোট আদালতে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে তাঁহাব মোকদ্দমা ডাক হইল। তিনি হাকিমের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। হাকিম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন---"তোমাব নাম পশুপতি ভট্টাচার্য্য?"

পশু। Yes.

হা। তুমি এই নকুড়চন্দ্র ঘোষের ছাপাখানায় "জাগো জাগো লতিকা" নামে এক খানা বই ছাপাইয়াছ?

প। Yes.

হা। ছাপার খরচ কত হইয়াছে?

প। আমি জানি না।

হা। উনি বলেন ছাপার খরচ ১৮৩ টাকা সাত আনা তিন পয়সা হইয়াছে। ইহা তুমি স্বীকার কর?

প। Yes.।

হা। এ টাকা কি ইহার কোন অংশ তুমি নকুড়চন্দ্রকে দিয়াছ?

প। আমি ও টাকা কেন দিব?

হা। তোমার কাজ হইয়াছে, তুমি দিবে না ত কে দিবে?

প। ঐটি মহাশয়ের ভুল। শুধু মহাশয়ের কেন, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতিও ঐ রকম ভুল করিয়া থাকেন। তা সে কেবল আপনারা উদ্ধার এবং উপকৃতকারিতা বুঝেন না বলিয়া ভ্রমবভূয়সী ভ্রান্ত করিয়া থাকেন। মহাশয়, আমি যে বই ছাপাইয়াছি সে কি আমার নিজের জন্য ছাপাইয়াছি? আমরা Patriot, যাহারা patriot, তাহারা কি নিজের জন্য খায়, নিজের জন্য পরে, নিজের জন্য বিবাহ করে, নিজের জন্য বই লেখে, নিজের জন্য বই ছাপায়? কখনই নয়। তাহারা সব পরের জন্য করে। অতএব দেশের লোকের কর্ত্তব্য যে তাহারা patriot দিগকে খাওয়ায়, বিবাহ দিয়া দেয়, বই লিখিতে কাগজ কলম দেয়, বই ছাপাইবার খরচ দেয়। সকলের নিতান্ত, নিরুপম, নির্বীর্য্য, নির্ব্বন্ধাতিশয় কর্ত্তব্য যে তাহারা patriot-দিগকে যথাথাসর্ব্বস্ব দেয়, নইলে patriot গণ কেমন করিয়া দেশকে তাহাদের হৃদয়-সর্ব্বস্ব দিবে? মহাশয় দিব্য চক্ষে দেখিবেন patriot এর দেশের লোকের উপর ষোল আনা দাবি। তা আমি এই যে দেশের, ভারতের, ভারতমাতার উদ্ধারের জন্য কাব্য লিখিলাম, সে কাব্য ছাপাইবার খরচ কি আমাকে দিতে হইবে, না দেশের লোককে দিতে হইবে, ভারতকে দিতে হইবে, ভারতমাতাকে দিতে হইবে? মহাশয় প্রবীণ, প্রাচীন, প্রাঞ্জল, প্রণিধান করিয়া দেখিবেন যে সে খরচ দেশের লোকের দেওয়া উচিত, ভারতের দেওয়া উচিত, ভারতমাতার দেওয়া উচিত। মহাশয়ও তো একজন দেশের লোক। মহাশয়েরও সে খরচ দেওয়া উচিত।

তবে মহাশয় patriot কাহাকে বলে এবং patriot-কে কি রকম করিয়া পালন করিতে হয়, জানেন না বলিয়া মৎপ্রণীত গ্রন্থ ছাপাইবার খরচের জন্য আমাকে ধরিয়া বিধ্বস্ত করিতেছেন। কেন, নকুড় বাবুও ত দেশের লোক—ওঁরও ত ছাপার খরচ দেওয়া উচিত? উনি দেন না কেন? বাবা! patriot পুষিতে ব্যয় কত, তা ত জানেন না! patriot-পোষা আর গরু পোষা একই কথা। কত খোল খড় খাওয়াইলে তবে গরু দুধ দেয়। patriot-কে কি আপনারা গরু হইতে খাটো মনে করেন? হা কুসংস্কার! হা ভারতমাতা!

হাকিম অবাক হইয়া শুনিতেছিলেন। কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আসামীকে বলিলেন—"তোমার নামে ১৮৩ টাকা পনের আনা তিন পয়সার ডিক্রী দিলাম। টাকা আনিয়াছ কি?"

প। আমি কি জন্য টাকা আনিব? দেনা আপনাদের সকলের। এত বুঝাইলাম তবুও আপনি বুঝিলেন না। অহো। ভারতে সকল লোকই কি গর্দ্দভ?

হা। কনিষ্টবল, আসামীকে গ্রেপ্তার কর। উহাকে জেলে লইয়া যাও।

তখন দুই জন কনিষ্টবল পশুপতি বাবুকে ধরিল। পশুপতি বাবু হাকিমকে বলিলেন—"আমি জেলে যাব কেন, আপনি জেলে যাবেন।" হাকিম একটু হাঁকিয়া কনিষ্টবলকে বলিলেন—"লে যাও।" কনিষ্টবলদ্বয় পশুপতি বাবুকে টানিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় পশুপতি বাবু চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন:—"আহা! patriot কাহাকে বলে ভারতবাসী এখনও বুঝিল না! patriot-কে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া পুষিতে হয়, দেশের লোক এখন বুঝিল না। দেশ অধঃপাতে যাউক।"

পশুপতি বাবুর জেলে যাওয়ার সম্বাদ শীঘ্রই গোধনপুরে প্রচার হইল। রত্নমঞ্জরী যে দিন সে সম্বাদ পাইল, সেই দিনেই তাহার দুঃখের জীবন ফুরাইয়া গেল। তাহার মৃত দেহের সৎকার করে গোধনপুবে মনুষ্য মধ্যে এমন কেহ ছিল না, কেননা সমস্ত গোধনপুর আজ তাহার পতির শত্রু। যাহারা তাহার অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন করিল, তাহাবা বনবাসী।

ওদিকে সাবিত্রী ঠাকুবাণী পশুপতি বাবুর মেয়াদেব কথা শুনিয়া, নিজের দুই এক খানা গহনা বেচিয়া, কিছু টাকা লইয়া শেয়ালদহে গিয়া পশুপতি বাবুকে খালাস করিলেন। খালাস পাইয়া পশুপতি বাবু সাবিত্রী ঠাকুবাণীকে লইয়া হাবড়াব ইষ্টেশনে গাড়িভাড়া করিয়া দেশ ছাড়িয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। তখন দেশ যথার্থই উদ্ধাব হইল।

সম্পূর্ণ

চন্দ্রা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রথম বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিসর্জ্জিত

"Dear is the helpless creature we defend against the world."

পৌষ মাসের রাত্রি। খুব প্রখর শীত, খুব কোয়াসা, সেই দিনেই চন্দ্রগ্রহণ। খুব পূর্ব্ববঙ্গের কিলিকিলি ও খুব হরিধ্বনি উঠিয়াছে। রামচাঁদ খুড়োর নিদ্রা হইল না। খুড়ো আমার জবরদস্ত। গুণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, মদের প্যাগম্বর, গাঁজার দিগম্বর। "দেখি না, বড় দেখি না" বলিতে বলিতে, সোঁটা হাতে, রামচাঁদ খুড়ো বাহিরে আসিলেন।

খুড়োর বিশেষ রোজগার ছিল না। কিন্তু যেরূপ চেহারার চটক আর যেরূপ সোঁটাটীর ঢং, তাহাতে অনুগ্রহপূর্ব্বক মাঠে দাঁড়াইলে সহজেই রোজগার করিতে পারিতেন। তবে এটা সেটা পাঁচ রকমে মদটা ভাঙটা চলিতেছে, সে দিকে বড় মন দেন নাই। খুড়ো যখন বাহিরে আসিলেন, সে মূর্ত্তিই এক চমৎকার! খুব লম্বা, খুব চওড়া, খুব বুকের পাটা, খুব গোঁপ, খুব বাউরিকাটা চুল, খুব বাঁকা সিঁথা, পৈতার গোছাটীও মানানসই। খুড়োর চওড়া কালাপেড়ে সাড়ী পরণে, কোঁচা খুলে কোমরে বাঁধা। বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে খুড়ো গঙ্গামুখো হইলেন।

রাস্তায় গাটছড়া বাঁধিয়া মঙ্গলা, ধ্রুব, বিমলা, দ্রৌপদী, কসাইয়ের গরুর মত একবার দৌড়াইতেছেন, একবার থামিয়া যাইতেছেন। পিছনে বঙ্গচন্দ্র যষ্ঠি হাতে "চল চল" করিতে করিতে চলিতেছেন। তরবেতর লোক চলিতেছে। খুড়ো গলাখাঁকারি দিলেন, হাততালি দিলেন, কিন্তু সে মনোহর মূর্ত্তি যে একবার দেখিল, সে আর বড় দেখিবার চেষ্টা করিল না।

উঃ! যেন প্রলয়ের হরিধ্বনি পড়িয়া গিয়াছে! পিছনের হরিবোল কিছু জবর,—'বল হরি—হরিবোল!' খুড়ো ফিরিয়া দেখেন, কে ভাগ্যবান্ ছ' আনার খাটে শুইয়া স্বর্গে যাইতেছে। স্বর্গীয় যান নিকটবর্ত্তী হইল; বাহক সকলেই পরিচিত, 'হরিধ্বনি' ছাড়িয়া খুড়োধ্বনি আরম্ভ করিল। খুড়ো দেখিলেন, সাত আটজন চেনা গাঁজাখোর। কেহ কাঁদিয়া, কেহ হাসিয়া শুনাইল, আড্ডাধারী—যে বিশ ছিলিমে টলিত না—ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে!

"বাবা! শীতকালের দাস্যি ওলাউঠা! খুড়ো, ব'ল্‌ব কি, শেষ আর গাঁজার ছিলিম টান্‌তে পারলে না!"

"দূর আবাগের বেটা, ছুঁলি?"

আর কি হইবে? খুড়ো খবর পাইলেন, চার পাঁচ বোতল খাঁটি সঙ্গে আর দু'তাড়া গাঁজাও রহিয়াছে; ভাবিলেন, 'দেখ্‌ছি বেগারে মুক্তিস্নানটা হ'ল।' সেথায় দুই এক ছিলিম গাঁজা চলিল বই কি! মনোহর চারিপায়ে খুড়োও কাঁধ দিলেন—বিপরীত হরিবোল!

কিন্তু যেথায় স্বর্গাভিমুখী যান চলিতে লাগিল, পথের লোকে সত্রাসে পথ দিতে লাগিল। মহা ভিড় হইলই বা, মড়া লইয়া ছুঁইবে? কেহ কোন কালে ত মড়া হইবেন না—আর কাহারও চৌদ্দ পুরুষ হন নাই!

খট্টাঙ্গ ক্যাঁচ্ কোঁচ্ রঙ্গভঙ্গ করিতে করিতে শ্মশানস্থলে উপনীত হইল। আড্ডাধারী ক্ষণেক বিশ্রাম করুন, বাহকেরা খাঁটির বোতল লইয়া বিশ্রামে বসিলেন। একজন বলিল, "খুড়ো, আজ বোলচাল নাই কেন?"

সত্যই বোলচাল নাই। খুড়োর কিছু প্যাঁচ জন্মিয়াছে। জানা ছিল, গাঁজা টানিলে আর ওলাউঠা হয় না, কিন্তু বিপরীত প্রমাণ—খাটে লম্বমান!

মুদ্দাফরাস চিতা প্রস্তুত করিয়াছে সংবাদ দিল, শুভকার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিয়াছে, তাই কান্নাসুরে বখসিস্ চাহিতেছে,—"এত বড় বাবু, বখসিস্ না দেবে—কে দেবে? গ্রহণকা ছুটি হইয়াছে, বাবু লোক সব বাড়ী গিয়াছে, আর কোই মরে না—আজ আট আনা বখসিস্ লেবে!" শব চিতায় চড়িল। বাহকবৃন্দ মায় খুড়ো, আর এক বোতল লইয়া বসিল। মুদ্দাফরাসেরা রস খাইতে খাইতে খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতে লাগিল,—

"সেঁইয়া বেচে লঙ্ সুপারি হামে ধনিয়া।"

খুড়ো কিছু অধিক বিষণ্ণ। শরীরটা কেমন কেমন করিতেছে, অন্যদিন হইলে কসিয়া গাঁজায় দম দিতেন, আজ সেই মহৌষধে তাদৃশ প্রত্যয় নাই। আবার দূরে কে গান করিতেছে,—

"ভাবিয়া দেখ না রে মন নিত্য নিত্য,
মরণ জানিহ জীবের সত্য সত্য,
জলবিম্ব জলপ্রায় কখন্ মিশায়ে যায়—"

খুড়ো মুগ্ধ-প্রায় হইয়া শুনিতে লাগিলেন। মজলিসের লোক নেসায় একটু অন্যমন, খুড়ো ধীরে ধীরে উঠিলেন; গঙ্গার ধারে ধারে চলিলেন; বড়ই ভিড়, ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ক্রমে অতি নির্জ্জন স্থান।

হেথায় লোক নাই, শব্দ নাই, কেবল গঙ্গাদেবী কূলে প্রতিঘাত করিতেছেন। এ দিকে রাহুর উদরগত চন্দ্রের আর আলো নাই।

"ও কি ও? একটা শকুনি আসিয়া বসিল। বাবা, সাদা কাপড় পরা কে ও? সাব্‌লে বাবা, এগোয়! ভয় নেই, জলে উলিতেছে।"

মৃদু বামা-কণ্ঠধ্বনি উঠিল,—"বাছা, তোরে কেমন ক'রে ভাসিয়ে দিয়ে যাব রে!"

"ভাসাবে কি? জীয়ন্ত আছি, সবে পেট কলকল করিয়াছিল।" আবার মৃদু বামা-কণ্ঠধ্বনি—"মা গো, আমার কোলের ছেলে তোর কোলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ব।" খুড়ো ভাবিলেন, "এ আবার কোন্ ছোট আড্ডাধারীর গঙ্গা লাভ? না—না, ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, দেখিতে হইল।"

ঝপাং করিয়া শব্দ হইল। শ্বেতবসনা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। খুড়োও দৌড়াইলেন।

"একি! কোন মাগী ছেলে মাবিল নকি? ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়াছে!" ছেলেব কান্না অনুসারে দৌড়াইলেন। খুড়ো তথায় গিয়া দেখেন, একটী বালক কাদায় পড়িয়া আছে—কাঁদিতেছে, মুখে ঢেউ লাগিতেছে, হাঁফাইয়া উঠিতেছে! বুঝিলেন, জলভ্রমে কূলে নিক্ষেপ করিয়া রমণী পলাইযাছে। ছেলেটী জীবিত, তুলিয়া লইলেন। কিন্তু কি করেন? "কাল পুলিসে দিব" ভাবিয়া শিশুটিকে কুড়াইয়া লইলেন; শিশু কাঁদিতেছিল, কোলে উঠিয়া শান্ত হইল, বালাপোষের গরম পাইয়া 'হাঁগ্‌গো বলিয়া আদব কবিল। খুড়োর আজ বিষম বিভ্রাট্। মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"ব্রাহ্মণী কি বলিবে? ছেলেপুলে নাই, ছেলেটী পালন করিলে হয়; কিন্তু কোন্ বেটীব ছেলে, তা ত বুঝিতে পাবিতেছি না।"

শিশু এইবার খুড়োর মস্ত গোঁফ দেখিয়া ধবিবার চেষ্টা পাইল।

"কপালে যা থাকে, বাড়ী লইয়া যাই।"

শীতকাল, খুড়ো স্নান করিলেন না,—গঙ্গা জল স্পর্শ করিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন,—"আজ একি বঙ্গ? যদি ব্রাহ্মণী ছেলেটী পোষে, তাহা হইলে আব পুলিসে দিই না। আমাদেরও চলিতেছে, ইহারও চলিবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"অদ্য ভক্ষ ধনুর্গুণঃ!"

পাড়ায় একটা মহা বাজনাব ধূম পড়িয়াছে। কাউরে ঢোলেব মধুর আওয়াজে কাণ ফাটাইতেছে! দুই তিনটা সানইয়ে শত শত রথের ভেঁপুর কার্য্য করিতেছে—একটা হুলুস্থুল! দত্তদের সেজ কর্ত্তা, বোসেদের ন' কর্ত্তা, বীর ভদ্র দাদা, সনাতন বাঁড়ুজ্যে রাস্তায় সভা করিয়াছেন, আর বলিতেছেন,—"আহা, হ'ক, লোকের ভালই হ'ক! মিন্‌সে যেমন না খেয়ে না দেয়ে অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছে, একটা ভোগ করিবার হইল; বেঁচে থাক, তবু একটা ভোগ করিবার হইল!"

কথাটা এই, নীলবতন বাবুর একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। নীলরতন বাবুব স্বোপার্জ্জিত রোজগার, কৃপণ খ্যাতি, পাড়ার লোকের সহিত বড় মিশ নাই। এতদিন সন্তান-সন্ততি কিছুই হয় নাই, কে এক সন্ন্যাসী আসিয়া হোম করাতে একটী পুত্র-সন্তান হইয়াচে। এই কথা লইয়াই আন্দোলন হইতেছিল; কিন্তু তথায় তাদৃশ মজা নাই—কাহারও কুৎসা নাই।

মজা লাগিবে ত লাগ, একেবারে খুব বেশী! কাঙ্গালীচরণ ঘোষ আসিয়া সংবাদ দিল, রামচাঁদ খুড়ো শ্মশান থেকে কার একটা দানো পাওয়া ছেলে লইয়া আসিয়াছে।

"ও সব পারে, ওটা ডাকাত, ওর জন্যে চারচাল বেঁধে থাকা ভার।"

"কি সর্ব্বনাশ! শ্মশান থেকে ছেলে এনেছে! ওকে এক-ঘবে কর।"

সনাতন বাঁড়ুজ্যে মহাশয় অর্জ্জুনের জয়দ্রথবধের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিলেন, "রামচাঁদেব সোমেদের বাটীর বৃত্তি উঠাইয়া দিবেন; আর বোসেদেব বাড়ীর বৃত্তি যদি উঠাইতে

পারেন, তবে মেজদত্ত মহাশয়ের পিতৃঋণ শোধ যাইবে না।'' রামচাঁদের যাহাতে সর্ব্বনাশ হয়, সমাগত সকলেই এক একটা ভার লইলেন। তখন কথায় কথায় সাব্যস্ত হইল, সে বৎসর যে বোসেদের ছোট গিন্নীর গাড়ু চুরী যায়, সে রামচাঁদের কাজ; কলুপাড়ায় আগুন লাগে সে রামচাঁদ কর্ত্তৃক; ক্রমে বিশ বৎসরের ভিতর পাড়ায় যে সকল দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে, সব রামচাঁদের উপরই অর্পিত হইল।

কিন্তু খুড়ো আমার ভোঁ! এক পাতে উঠা অভ্যাস নাই, তাহাতে আবার রজনীতে একটা হাঙ্গামা গিয়াছে। তা যেমন রোগ, তেমনি ঔষধ, পাড়ায় ঢাক উপস্থিত—জোর কাটীতে দুপরে মাতন হইতে লাগিল! খুড়ো রক্তবর্ণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,- ''কি রে, ব্যাপারটা কি রে?''

ক্রমে রাত্রের কথা স্মরণে আসিল—''ছেলেটা কোথা রে?'' পাড়ার লোকে দানো-পাওয়া ছেলে বলিয়াছে, অবশ্যই দানো পাওয়া ছেলে; কিন্তু দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। ছেলেটী দিব্য গোলগাল, হাস্য বদন, যেন মোমের পুতুল পড়িয়া রাখিয়াছে। গৃহিণীরও বড় মন পড়িয়াছে; ছেলেটী পালন করাই স্থির হইল। কিন্তু পাড়ায় খবর দেওয়া উচিত; কি বলিবেন? ভাল কথা মনে পড়িল—''আমার ভায়রা ভাইয়ের পুত্র-সন্তান, শালীটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে! আমি ছেলেটীকে মানুষ করিতে আনিয়াছি। সেই ভাল।'' আস্তে আস্তে সোমদের বাড়ী চলিলেন। আজ সেখানে মহা সমারোহ! ভাবিলেন, বুঝি কি কার্য্য উপস্থিত। কার্য্য বটে। তবে লুচি খাওয়া নয়, তাঁর মাথা খাওয়া।

রামচাঁদ খুড়ো চিরদিন সপ্রতিভ! কিন্তু ছেলে লইয়া আজ কিছু অপ্রতিভ হইতে হইল। মৃত শালীর কথা লইয়া বড়ই বিভ্রাট্ ঘটিল। জেরায় সকলই উল্টাপাল্টা হইল। বড় বড় মহোপাধ্যায়েরা হয়কে নয় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বিবাহিত রমণী, তাঁহার রমণী নয়, স্থির হইল। কর্ত্তা সোম বলিলেন,—''আমাদের বাড়ীতে আর আসিস্ না।'' সংক্ষেপ বিবরণ এই—যাঁহারা রামচাঁদের সর্ব্বনাশে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে কৃতকার্য্যও হইলেন।

নিরাশ হইয়া রামচাঁদ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গৃহে কিছুই সংস্থান নাই, কি উপায়ে দিনপাত হয়? একবার ক্রোধ, একবার ক্ষোভ, একবার ধিক্কার মনে উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু অন্নচিন্তা চমৎকার, সকলকেই পরাভূত করিল! ''কি খাই, আজকের উপায় নাই; ছেলেটাকে পুলিসে দিই, আপদ যা'ক; না—না, ছেলেটা মুখ পানে চাহিলেই হাসে—সর্ব্বনেশে ছেলে হাত তোলে। যাহা হউক, ছেলেটী ছাড়িব না—যিনি জীব দিয়াছেন, আহার দিবেন।'' একটা সামাজিকের ঘড়া ছিল, তাই লইয়া অন্নের সংস্থান করিতে চলিলেন।

রাত্রে বসিয়া ব্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—''কি করি, কোথায় যাই? কিরূপে দিনপাত হয়?'' খুড়ো এরূপ চিন্তায় আর কখনও পড়েন নাই।

ব্রাহ্মণী নিদ্রা গেল, খুড়োর চক্ষে নিদ্রা নাই। উঠিলেন, ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারে চলিলেন। বরহীন পুলিনে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। স্নিগ্ধ বায়ু মধুর রবে বহিতেছে,

বজতকৌমুদী নীবে খেলিতেছে, তরঙ্গ দুলিতেছে; দেখিতে দেখিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, একজন পূর্ব্ব-বঙ্গদেশীয় ধনাঢ্য গঙ্গাস্নানে আসিযাছেন, দান-ধ্যান করিতেছেন—ব্রাহ্মণ, উদরেব জ্বালায় হাত বাড়াইলেন, যৎকিঞ্চিৎ পাইলেন; ভাবিলেন, "ব্রাহ্মণেব সন্তান, ভিক্ষায দিনপাত করিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সার্জ্জন। হ্যাল্লো, চৌকিডাব, এক আড্‌মি উটার দৌড়কে গিযা নেই?

চৌকিদার। নেই সাব্‌, হাম্‌ তো কুছ্‌ নেই দেখা।

সার্জ্জন। আল্‌বট্‌ গিয়া, হাম ডেখা।

কলুটোলায় একজন নবাব আছেন; নামটি বড় দিগ্‌গজ, স্মবণ নাই। তিনি কোন বড় নবাবের মেয়ের মেয়েব পোষ্যপুত্রেব নাতি। দৈবাৎ তাঁর বেগম-মহলে চুরি। ইন্‌স্পেক্টর, জমাদার, চৌকিদারে বাড়ি ঘেরাও কবিয়া ফেলিয়াছে, নর্দ্দমায় আর মযলা রহিল না। কিন্তু তথাপি ইন্‌স্পেক্টব সাহেবের সন্দেহ ঘুচে না—চোবাই মাল বাড়ীর আনাচে কানাচে থাকিবাবই সম্ভাবনা; ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের চোর ধরা দৈব-বিদ্যা। নিকটে একটা এঁদো পুকুর ছিল। কলমিদাম, হিঞ্চেলতা, পুরাণ শোল, কই, লেঠা প্রভৃতি সশঙ্কিত। পাঁচ সাত জন পাহারাওয়ালা পানকৌটীব ন্যায় ডুব দিতে লাগিল। কিন্তু চোরাই মালেব কোন সন্ধান হইল না।

এবার চুরি না ধরিলেই নয়। কলুটোলায় সাত আটটা চুরি হইয়াছে, তাহাব কিনারা হয নাই। কি উপায়? একটা চোর না ধরিলেই ত নয়। ঐ না চোরের মত কে একজন দাঁড়াইয়া আছে? হাঁ, ঐ চোর না হইয়া যায় না! মস্ত ভিক্ষার ঝুলি, নাকে তিলক, গলায় মালা, চোরের কি আর হাত পা আছে? ইন্‌স্পেক্টর সাহেব যার প্রতি সন্দেহ করেন, তাহাকে চোর সাব্যস্ত না করিয়া কোন মতে নিশ্চিন্ত হন না। নিশ্চয় চোর, নহিলে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছে? আর যদি চোব না হয়, ধরিয়া ঘা দুই দিতেই বা হানি কি?

চোর দেখিল—এখনও ধরা পড়িল না, আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। কিন্তু টিক্‌টিকি পুলিস পশ্চাৎ চলিল। টিক্‌টিকি পুলিসের জমাদাব অতি সর্তক লোক, নানা বেশে নগর পরিভ্রমণ কবেন; ধর্ম্মভীরুও বটেন, দেশে দোল-দুর্গোৎসব হয়। এবাব তাহার নিতান্ত ইচ্ছা, "বাহবা লব।" চোরের স্পর্দ্ধা দেখ, তাঁহার কাছেই ভিক্ষা চাহিল। তিনি বলিলেন,—"বাপু, আমার কাছে ত কিছুই নাই, এই সোণার বালাগাছাটি লও।"

সোণার বালা দেখিয়া ভিক্ষুকের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। বলিল, "বাবা তোমার জয়-জয়কার হোক্‌!" ঝুলির মধ্যে বালাটি রাখিল। চোর বা ভিক্ষুক ভাবিতে ভাবিতে চলিল—"আজ কমলার কৃপা, ছেলেটাকে একছড়া হেঁসো গড়াইয়া দিব।"

বেলা অধিক হইয়াছে, ভিক্ষুক বাসায় ফিরিল। বাসায় প্রবেশ করিবার সময়ে দেখে, দাতা এখনও তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। পাঠক বুঝিয়াছেন ভিক্ষুক আমাদেব খুড়ো।

ভোজনান্তে খুড়ো শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে মহা গণ্ডগোল! নবাব-বাড়ীরও যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছেন, আপনার বাড়ীরও সেই অবস্থা দেখেন—কিঞ্চিৎ বেশী। তাঁহাকে দুইজন ষণ্ডা আসিয়া ধরিল, মহা ধুমে কিল পড়িতে লাগিল, একজন ঝুলি হইতে সোণার বালাটি বাহির করিল। যেমন কিলের ধমক, তেমনি লাঠির গুঁতা, আর তেমনি ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের গর্জ্জন,—"আউর মাল কাঁহা হ্যায়, নিকালো!" ক্রমে হস্তে বন্ধন পড়িল। খুড়ো গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শান্ত! শান্ত! আমায় টানিয়া লইয়া যায়, বাবুদের বাড়ী খবর দাও।".

আহা! দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কি করিবে? জগতে কে তার বন্ধু আছে? দানো-পাওয়া ছেলে মানুষ করিতেছে, কেহ তার মুখ দেখে না; কেবল নীলরতন বাবুর স্ত্রী তাহাকে একটু যত্ন করেন, আর দানো-পাওয়া ছেলে বলিয়াও প্রত্যয় করেন না।

ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারই নিকট আসিল; সকল কথা বলিল। নীলরতন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! যাই কর্ত্তাকে গিয়ে বলি।"

কর্ত্তা যৎকিঞ্চিৎ ভবিষ্যদ্বক্তা। অর্দ্ধেক শুনিয়াই বলিলেন,—"আমি জানি, ও সব লোকের ঐ দশা হবে না ত আর কি?"

"অ্যাঁ এ পোড়া রাজ্যে ভিক্ষা করিবারও যো নাই?"

"ভিক্ষা ত নয়, ও চুরির ভাণ।"

কিন্তু গৃহিণী কোন মতেই বুঝিলেন না, কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন; অগত্যা নীলরতন বাবু ব্যাপারটা কি, জানিতে সম্মত হইলেন। গৃহিণী আহ্লাদিতা হইলেন; দৌড়িয়া গিয়া শান্তকে বলিলেন,—"ওলো ভয় নেই। কর্ত্তা যা হয় একটা করিবে এখন।"

শান্ত ভাবিল, "বড় ভয়ও নাই, ভরসাও নাই!" কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল। গৃহ শূন্য, সংসার শূন্য, প্রাণ শূন্য জ্ঞান হইতে লাগিল। প্রহার চক্ষের উপব দেখিয়াছে। নিশ্চয় জ্ঞান ছিল, স্বামী চোর নয়; মনের কথা কাহাকে জানাইবে? সকলেই "রাক্ষসী" "ডাইনি" জ্ঞান করে; সে সময়ও পোড়া ছেলে—ছেলেটার উপায় কি হইবে?

দিন যায়, থাকে না। নিদ্রাদেবীও দুঃখী বলিয়া ঘৃণা করেন না। সে রাত্রি কতক নিদ্রা, কতক রোদন, কতক আশায় কাটিল। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে নীলরতন বাবুর আলয়ে গেল। কিন্তু আজ নীলরতনের পরিবারের সে ভাব নাই। বলিলেন, "বাছা, আর কাঁদিলে কি হবে? বামাল শুদ্ধ ধরা পড়িয়াছে আর উপায় নাই।"

"হা ভগবান! উপায় যথার্থই কি নাই? নিরপরাধীব কোন উপায় নাই! কি হবে? কোথায় যাব?"

নীলরতন বাবুর স্ত্রী সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন, "ভাবিস্ নি, দুই তিন মাস বই মেয়াদ হইবে না।" আহা, কি সান্ত্বনা!—মেয়াদ! শান্তর মস্তক ঘুরিয়া গেল, সূর্য্যালোক হরিদ্বর্ণ জ্ঞান হইতে লাগিল, পুতুলের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি কোলে তুলিয়া লইতে যায়, কর্ণে ঝিম ঝিম শব্দ হইতে লাগিল, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয়,
কে আমারে আর পাবে, আর কারে ভয়?"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব নিতান্ত স্থির করিয়াছিলেন, চোর পুরাতন বদমায়েস, এত প্রহারেও কবুল করিল না। খাঁ সাহেব নামে, মুখে বসন্ত কাট্, বেঁটে গোছের একজন জমাদার ছিলেন, তিনি কবুল করাইতে অদ্বিতীয়। তাঁহার হস্তে চোর সমর্পিত হইল। তাঁর মন্ত্রগুলি অতি সোজা। লঙ্কার ধোঁয়া, নখের ভিতর আলপিন, নাই-কুণ্ডলে ঘুবঘুরে, আর বুকে বাঁশ;—এ মন্ত্রে বলি বলি বলে না, এমন চোর নাই। রামচাঁদও বলি বলি করিয়াছেন; কিন্তু যে বায়নাক্কা বলেন, তাঁহা খাঁ সাহেবের মনোনীত হয় না। এইবার বুকে বাঁশ দিয়া কিছু তাড়না বেশী হইতে লাগিল। রামচাঁদ বলিলেন, "কি বলিতে হইবে বল?"

"বেশী কিছু নয়, তুমি গত রাত্রে কলুটোলায় গিয়েছিলে?"

"না"।

খাঁ সাহেব বলিলেন, "আবি দুরস্ত হুয়া নেই।"

খুড়ো দেখিলেন, হাঁ বলিলেই নিশ্চিন্ত, সুতরাং "হাঁ"। কলুটোলায় গিয়া, পূর্ব্বদিকের জানালা ভাঙ্গিয়া কোণের ঘরে প্রবেশ করেন; তাঁর সঙ্গে যাহারা ছিল, তাহাদের হস্তে বাক্স দেন; তাহারা কোথায়, এখন বলিতে পারে না। বালাগাছটা আর পঞ্চাশ টাকা তাহার নিকট থাকে, মদ-ভাঙ্গ-বেশ্যায় পঞ্চাশ টাকা রাত্রেই খরচ করিয়াছেন, বালাগাছটী স্যাকরার দোকানে গলাইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ধরা পড়িয়াছেন।

কবুলে সই পাইয়া খাঁ সাহেব প্রস্থান করিলেন। রামচাঁদের জলপিপাসার অবসর হইল। জল চাহিলেন। চড় পাইলেন। আর সহে না, একজন পাহারাওয়ালা মাত্র বসিয়া আছে, রামচাঁদ ভাবিলেন, "পলাইলে হয় না?" যা থাকে অদৃষ্টে—পাহারাওয়ালাকে এক লাথি। "হেঃ যুড়ীদার! আসামী ভাগৎ!"

যথার্থই ভাগৎ বটে, দৌড়! রামচাঁদ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন, একপাল পাহারাওয়ালা পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিল। প্রাণ ভয়ে দৌড়ের বেগ কিছু বেশী; পাহারা ওয়ালারা "ওই! ওই!" করিতে করিতে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু সাহেবেরা বড় কষ্ট পাইয়াছেন, কাহাকেও মারা হয় নাই; একজন ব্রাহ্মণ রাস্তার ধারে রোয়াকে শুইয়া ছিল, তাহাকেই প্রহার। সে রাত্রের পুলিসকাণ্ড—প্রহরী পাহারাওয়ালার হাতে হাতকড়ি পড়িয়া সমাপ্ত হইল।

এদিকে রামচাঁদ দৌড়াইতে লাগিলেন। বন বাদাড় ভাঙ্গিয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া বেলগেছিয়ার একটী বাগানের পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত। জল পান করিলেন, হাতে মুখে জল দিলেন। কিন্তু খুড়োর কিছু দস্যি ঘুম, সেই চাতালেই একটু তন্দ্রা আসিল।

প্রাতঃকালে মালীকে ফুল তুলিতে হয়, নিত্য বাবুর বাড়ী ডালি যায়! মালার পো মুখ ধুইতে ঘাটে গিয়া দেখে, লম্বা চওড়া মূর্ত্তি সটান।

"ই-এ কঁড়,মতাড় পবা ?"

খুড়োব যদি তখনও ঘুম ভাঙ্গে, উপায় হয। কিন্তু যতক্ষণ পাহরাওয়ালা না আসিল, ততক্ষণ আব নিদ্রা ভাঙ্গিল না।

এবার আব ঘুম ভাঙ্গিতে বেশী দেরি হইল না। "কোন্ হ্যাযবে ?" বলাতেই গাত্রোত্থান কবিলেন। কোন হ্যায় বলা বেশীর ভাগ—পাহাবাওযালা সাহেব সাব্যস্তই করিয়াছিলেন। বাগান হইতে দুইটা লাউ ছিঁড়িয়া লইযা চালান দিলেন। চালান দিবার কিছু বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বাবুর বাগানেব ফসলটা এখন তখন যায়। মালীর পো গজন্নাথের দিব্য করিয়াছেন তিনি লয়েন না। সুতরাং গত রবিবার যখন বড়বাবু আসিয়াছিলেন, পাহারাওযালা সাহেব সেলাম করিয়া পূজার বক্সিস চাওয়াতে বাবু বলেন—"কই, তুমি খববদারি কব কই ?" চোরকে চালান দিতে পারিলে তাঁর কিছু প্রাপ্যের সম্ভব।

এ দিকে "বাগা চোর পলাইয়াছে" থানায় থানায় রিপোর্ট হইয়াছিল, লাউ-চোব থানায় পৌঁছিবামাত্র অনেকেই চিনিল, এই সেই। পাহাবাওযালা জমাদারি পাইবাব খুবই সম্ভাবনা বহিল। চোর চালান হইল।

নূতন ম্যাজিস্ট্রেটেব ভাবি দব্‌দবা, বেবেওয়া হাকিম! তাঁহার নিতান্ত দুঃখ যে, তাঁহার উপব ফাঁসি দিবাব ভাব নাই। তিনি ক্ষোভ কবিয়া বন্ধুদিগের নিকট বলিতেন, এক দিনেব নিমিত্ত ফাঁসিব ভার পাইলে বেশ অর্দ্ধেক কলিকাতা সাবাব কবিতে পারেন। সকলেই যে খুন কবিবে, তাহা নহে। তাঁহার চোরের উপব ভারি রাগ। তাঁহাব দৃঢজ্ঞান, চুরি অপরাধে ফাঁসি হওযা উচিত; রাস্তায় মাতলামীতে ফাঁসি দিলেও দোষ নাই; আর কেহ যদি সেলাম না করে, তাহাকে ফাঁসি দিলেও রাগ যায় না।

পুলিস্ গম্ গম্ করিতেছে। টক্‌টক্ করিয়া জমাদার সাব্‌জন পায়চারি করিতেছে। মাঝে মাঝে মধুর ধ্বনি উঠিতেছে—"এই, চোপ রাও, চোপ!" যার অদৃষ্টে গলাধাক্কা ঘটে না, তাঁর পুলিসে যাওয়াই বৃথা।

একে একে আসামীব ডাক হইতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেট অতি দক্ষ, আধ ঘন্টার মধ্যে সাত আটটা মোকর্দ্দমা হাসিল কবিলেন—মেয়াদ ছয় মাসের ন্যূন কাহারও নহে। খুড়ার পালা উপস্থিত। উহাব আর বেশী বিচাব কি? দায়বাসোপরদ্দ হইলেন। মস্ত জুড়ী আসিয়া লাগিল। রামচাঁদ খুড়ো লৌহনূপুর পায়ে আর কয়েক জন সমবেশীর সহিত সওয়ার হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"The chained us each to a column stone,
And we were there, yet each alone."

রামচাঁদ শয়ন করিবার নিমিত্ত দুইখানি কম্বল পাইয়াছিলেন। কম্বল দুইখানি বহুপোষী, অগণন ছারপোকা আনন্দে বিহার করেন। তথাপি সমস্ত দিন কষ্টে গিয়াছে, শীঘ্রই

নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। খুড়োর ঘুমই শত্রু। কতক্ষণ নিদ্রাগত ছিলেন, বলিতে পারে না, দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়াছেন। স্বপ্নে দেখেন যে, যে বালকটীকে পালন করিতে লইয়াছেন, দশ পনর জন পাহারাওয়ালা মিলিয়া তাহাকে কিরীচ দিয়া বিঁধিতেছে—"কি কর!" বলিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়।

সেই অন্ধকার ঘরে কে উত্তর করিল—"কি করি! ছারপোকার জ্বালায় মার! তামুক না খাইয়া পেট দম্‌সম! গোবিন্দ! গোবিন্দ!"

ক্রমে অন্ধকারেই উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। রামচাঁদের পরিচয় পাঠক অবগত। রামচাঁদ অপরের পরিচয় অবগত হইলেন এইরূপে:-

"গ্রহণের গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আমি শিষ্যের সহিত কলিকাতায় আসি। গ্রহণের রাত্রে বাটী হইতে একখানি পত্র পাই, যে আমার গৃহিণী মরাণাপন্ন; সুতরাং মুক্তি স্নান করিয়াই বাটী রওনা হইতে হইল। আজ তিন দিন হইল, পুলিস আমার বাটী গিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের কারণ এই—উক্ত গ্রহণের রাত্রে আমার শিষ্যের পুত্র সন্তানটি খোয়া যায়। তাহার গলায় যেরূপ রামপদক ছিল, আমার পুত্রের গলায় সেইরূপ একখানি ছিল; অতএব পুলিস সাব্যস্ত করিল যে, শিষ্যের পুত্রকে বধ করিয়া আমি সেই পদক লইয়া পলায়ন করিয়াছি।"

"আপনার শিষ্য কিছু বলিলেন না?"

"শিষ্যের কোন ত্রুটি নাই। তিনি এজেহার দিয়াছেন—সে রামপদকখানি তিনিই আমার পুত্রের নিমিত্ত দেন; এবং তাঁহার নিজের সন্তানের যেরূপ অলঙ্কার দিয়াছেন, সেইরূপ অলঙ্কার আমার পুত্রকে দিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিস প্রত্যয় করিল না।"

"তার পর?"

"তার পর আর কি? এই অন্ধকার ঘর, আর কম্বল। গোবিন্দ! গোবিন্দ!"

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

খুড়ো সোণার বালা-দান হইতে আদ্যোপান্ত পরিচয় দিলেন। গুরু শুনিয়া বলিলেন—"বড় সুবিধার নয়।" সুবিধার নয়, প্রথম রদ্দা খাইয়াই রামচাঁদ বুঝিয়াছিলেন।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় প্রহরী বলিল, "চোপ, কি বক্‌তেছে?" রামচাঁদ চুপ করিল। গুরু উত্তর করিলেন, "সুবিধার শয্যা পাতিয়া দিয়াছ, তাহারই গুণ ব্যাখ্যা হইতেছে।"

"কে তুম্‌কো বিকালে মুড়ি দিয়াছে?"

"মুড়ি যে কাটিয়া লও নাই, এই যথেষ্ট। তা দুই এক কথা কহিতেছি, তার আপত্তি কি?"

"হুকুম নেই।"

"নেই ত নেই, বাপু, চুপ্ ক'ল্লেম।"

কিন্তু গুরু চুপ করিবার পাত্র নহেন। তিনি রামচাঁদকে ঘাগি চোর ঠাওরাইয়াছিলেন। তাঁহার জানা ছিল, চোরেরা গারদে আসিবার সময় সঙ্গে তামাক, অহিফেন প্রভৃতি

লইয়া আইসে। বড়ই তামাকের প্রয়াস হইয়াছে; চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলি কি ঘুমালে? তামাক-টামাক আছে?"

এবার খুড়োর ঘুম আইসে নাই। খুড়ো উত্তর করিলেন,—"তামাক কোথা পাইব?"

"বলি দাওই না, আমি ত আর কাহাকে বলিতেছি না।"

বাহিরের প্রহরী শুনিল যে, তামাক সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে, তার আর রোষের সীমা রহিল না। আর এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া গারদের দ্বার খুলিল এবং আলো দ্বারায় গুরু ও রামচাঁদের কাপড়, কম্বল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সন্ধান করিল, কিন্তু তামাক পাইল না। তামাক পাইলে বরং ছিল ভাল; বৃথা পরিশ্রম হইল—প্রহরী অগ্নি-অবতার! বার পাঁচ সাত 'রিপোর্ট' ক'র্‌বে—রিপোর্ট ক'র্‌বে' বলিতে লাগিল। একবার রামচাঁদকে তর্জ্জন করে, একবার গুরুকে তর্জ্জন করে, বিশেষ তাড়না গুরুকেই করিতে লাগিল। প্রহরীর জানা ছিল, তিলক নাকে, নেড়া মাথা, চৈতনচুট্‌কি ও গলায় মালা থাকিলে, চোরের ধাড়ি হয়; তাহার উপর খর্ব্ব স্থূল কলেবর, তাহাকেই প্রধান বদ্‌মায়েস ঠাওরাইল। সন্দেহ আর কোন মতেই দূর হয় না; আবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এবার তত্ত্ব বিফল নয়, একটু অহিফেন গুরুর কাপড়ে লেপা পাইল; প্রহরীর উল্লাসের একশেষ! তাহার বিশেষ কাবণ এই—যদি যে দোষে গারদে আসিয়াছে সাব্যস্ত না হয়, অন্ততঃ অহিফেন আনা দোষে যে সাজা পাইবে, সন্দেহ নাই। যদি কেহ বে-কসুর খালাস হয়, সে বড় ক্ষোভের বিষয়! আমরা শুনিয়াছি যে, মৃত্যুর পর বিষ্ণুদূতের দৌরাত্ম্যে যাহাকে যমদূত না লইতে পারে, দুঃখে যমদূতের বুকে ঢেঁকি পড়ে, তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া যমেব কাছে যায়; এবং উপর্য্যুপরি এমন দুই চারিটী ঘটনা হইলেই, যমরাজ কাঁদিতে থাকেন। আমাদের ধর্ম্মাবিতারেরা কি করেন বলিতে পারি না। স্নেহময় বিচারপতিরা দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি ফেলিলেও ফেলিতে পারেন।

খানা-তল্লাসীর সময় রামচাঁদ গুরুকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন, যেন চেনা চেনা বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু কোথায় বা কিরূপ অবস্থায় দেখিয়াছেন, স্মরণ হইল না।

বজনী প্রভাত হইল। কাক কোকিল যাহা ডাকিবার ডাকিল। সেখানে বড় ফুলের ঘটা নাই, সুতরাং ফুটিল না। হাওয়ার অবারিত দ্বার, বহিতে ত্রুটি করিল না। ঊষা নয়নগোচব হইল না, এক্কেবারে রৌদ্র দেখা দিল। জেলের প্রভাত নিতান্ত সুন্দর নয়; মলের ধ্বনি জিনিয়া চাবিদিকে ঝম্‌ঝম্ ধ্বনি হইতে লাগিল; বেতের শব্দ, পাথর ভাঙ্গার ঠন্‌ঠনি, এইরূপে সুপ্রভাত! আজই খুড়োর বিচার। দুই হাতা বোগ্‌ড়া চালের ভাত, এক হাতা কলাইয়ের দালের খোসা দিয়া খুড়োকে উৎসর্গ করিল। খুড়ো জুড়ি করিয়া বিচারস্থলে চলিলেন।

দ্বিতীয় বিভাগ
প্রথম পরিচ্ছেদ
অনাথা

"O suffering, sad humanity!
O ye afflicted ones, who lie
Steeped to the lips in misery—
Longing, and yet afraid to die.
Patient, though sorely tired!"
"She murmurs near the running brooks,
A music sweeter than their own."

কালের বিচিত্র গতি সকলেই বলে, কিন্তু আমরা বলি একরূপই গতি। কাল সত্যযুগে যাহা করিতেন, তাহা অপেক্ষা এখন যে কিঞ্চিৎ বেশী বা কম করেন, আমরা দেখিতে পাই না। সত্যযুগেও শিলাকে সাগর গড়িতেন আর সাগবকে শিলা গড়িতেন, এখনও তাই সত্যযুগেও দিনের পর রাত্রি আনিতেন, শুক্লপক্ষের পব কৃষ্ণপক্ষ আনিতেন, এখনও তাহাতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ করেন না। সত্যযুগেও দরিদ্রের বুকে বাঁশ দিতেন, ধনীকে কুসুমশয্যায় রাখিতেন, এখনও তাহার কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই। কাল যাহা কবিতেন, তাহাই কবেন, তবে বিড়ম্বনায় পড়িয়া আমরা কি করি, এই একটা কথা।

শান্ত স্বামীহাবা হইয়াছিলেন, নীলরতন বাবুব স্ত্রী তাহাকে আশ্রয় দেন। দিন কতক খুব ভাব, কিন্তু একটা অভাবের কারণ জন্মিল। শান্তর কুড়ান ছেলের কোন অসুখ নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের এমন দিন নাই যে, ডাক্তার আসিয়া হাত না দেখে। তাহার পর আবাগের বেটা কুড়ুনে ছেলে বড় একটা কাঁদিতে জানে না, তাঁহার ছেলেব ঘ্যান্ ঘ্যানানি যায় না। এ সকলে শান্ত অপরাধিনী হইল। যে দিন রেবতীর (নীলরতন বাবুর স্ত্রীর নাম রেবতী) পুত্রসন্তানটীর সর্দ্দি করিত, সে দিন যদি শান্তর ছেলেটীর বিকার হইত, তাহা হইলে একবার আসিয়া 'আহা' করিয়া যাইতেন। ছেলেটার সবই বিপরীত! তাঁহার পুত্রের বিকার হইলেও কুড়ুনে ছেলেটার সর্দ্দি পর্য্যন্ত নাই। এত অপরাধেও শান্তর সে স্থানে বারবৎসর কাটিল।

শান্ত যখন নির্জ্জনে বসিত, গুণ্ গুণ্ শব্দে কাঁদিত। ছেলেটা সে কান্না শুনিয়া একটা সুর শিখিয়া ফেলিল। সেও কৃত্রিম রোদন করিত, তাহা শুনিতে অতি মধুর। বাটীতে ভিখারী আসিয়া যদি গান করিত, তাহা তৎক্ষণাৎ শিখিত। বারবৎসর অভ্যাসে হারাণ শিখিয়াছিল, কেহ মারিলে ফিরিয়া মারিতে হয় না, তথা হইতে চলিয়া আসিতে হয়; কোন বালকের পরণে নূতন কাপড় দেখিলে মার কাছে আসিয়া কাঁদিতে হয়

না, গাঁট দেওয়া কাপড় পরিতে হয়; কেহ সন্দেশ খাইলে পাতের কুড়ান পান্তাভাত খাইতে হয়; যে যা বলে তাহাই শুনিতে হয়। কিন্তু কান্নাই পা'ক আর আনন্দই হউক, সকল সময়েই গান গাইতে হয়। গান অতি মধুর! পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ডাকিয়া সেই সকল গান শুনিত, বালকও গাহিত।

আজ নীলরতন বাবুর বৈঠকখানায় মহাসমারোহ, রমানাথের জন্মতিথি-পূজা। রমানাথের আর দুইটী ভাই হইয়াছিল, দীননাথ ও যদুনাথ। নীলরতন বাবু ধনী, সুতরাং তিন ভাইয়ে সভা আলো করিয়া বসিয়াছেন। আর হারাণ কুড়ুনে বা দানো, এদিক্ ওদিক্ ফাই-ফরমাইস খাটিতেছিল। বিড়ম্বনা দেখ, রামচাঁদের গঠনে যে বলের পরিচয় ছিল, হারাণের গঠনেও তাহা প্রকাশ পাইত। পরান্নপালিত ব্যক্তির রূপ থাকিলেও রূপ থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং পাড়ার লোকে "ষণ্ডা" 'চোয়াড়' প্রভৃতি নানা প্রকার সুভাষে তাহাকে সম্বোধন করিতেন। রমানাথ সোণারচাঁদ ছেলে, বারবৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতে, স্পেলিং বুক সার করিয়াছে, কিন্তু হেরোর অপরাধের সীমা নাই কেন কিছু শিক্ষা হয় নাই, এই দোষ সকলেই ধরিত। পাঠক বুঝিয়াছেন, দীক্ষা পায় নাই, পাড়ার লোক বুঝিবেন কেন? হারাণকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "এও একজন হবে; এর অদৃষ্টে ফাঁসী আছে সন্দেহ নাই।" এই কথায় রামচাঁদের কথা উঠিল, তখন নীলবতন বাবু বলিলেন—"শুনিযাছেন কি, বামচাঁদ জেল হইতে আবাব পলায়ন করিয়াছে? দেখুন, যে দুর্জ্জন, তাব দুর্ম্মতিই জন্মে। দায়রায় তিন বৎসর মেয়াদ হয়, পলাইবার চেষ্টা করিয়া আর ইন্‌স্পেক্টরকে মাবিয়া চৌদ্দ বৎসর করিয়াছে! কোম্পানীর রাজ্য, কোথায় যাইবে? আবার ধবা পড়িবে। এবার কালাপাণি!"

হারাণ কথাটী শুনিল, একটী নিশ্বাস পড়িল, কিন্তু চুপি চুপি গান ধবিল,—

"চরণতবণী দে মা পার হ'ব এ ভবে—"

দ্বারে দ্বারবানেরা মহাগোল করিতে লাগিল। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া লম্বা-চৌড়া ঝাড়িতেছে, দ্বারবানের মানা শুনিতেছে না, বাবুর কাছে যাইবেই যাইবে। চোবে, দোবে, পাঁড়ে প্রভৃতি বাবুর ভয়ে বারণ করিতেছে বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী দন্ত কিড়্‌মিড়্ করিয়া 'হর হর হব' করাতে ভস্ম হইবার আশঙ্কায় সেরূপ তাড়না করিতে পারিতেছেন না। শেষ দোবে বাহাদুরেবা সার বুঝিলেন বৃত্তি গেলে বৃত্তি পাবার সম্ভাবনা, কিন্তু ভস্ম হইলে দেহ পাওয়া তত সম্ভব নয়; দ্বার ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসী গভীরস্বরে 'হর্ হর্' করিতে করিতে উপরে উঠিলেন।

সন্ন্যাসী দীর্ঘকাব, জটা ও দাড়ীগোঁফেব বড়ই ঘটা। বাঁশীর মত নাসিকা, নয়নে অতি তীব্র দৃষ্টি, আপাদমস্তক ভস্মমাখায় কিম্ভূত কিমাকার! একেবারে অসম্ভ্রমে বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

"কে তুমি?"

"দেখিতেছেন, সন্ন্যাসী।"

"প্রয়োজন কি?"

"বিশেষ প্রয়োজন, গোপনে বলিব। আজ চিনিতে পারিতেছেন না, গত কথা মনে করুন, তের বৎসর আগে আপনি পুত্রহীন ছিলেন।"

নীলরতন বাবু সভয়ে স্মরণ করিলেন, সত্য সে সময়ে এক সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, তিনটী পুত্র সন্তান জন্মিবে, একটী তাহাকে দিতে হবে। আজ সেই সন্ন্যাসী উপস্থিত। ভগবান্! সন্তান বিলাইয়া কিরূপে দিব?" মনে মনে ইচ্ছা হইল, সন্ন্যাসীব মস্তকচ্ছেদন করেন, কিন্তু সাহস হইতেছিল না। তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী, বিদায় করাও সঙ্কট, যদি সপুরী একগাড় করে। সংবাদ বাটীর ভিতরে গেল, একটা হুলস্থূল পড়িল। এ বিপদে একজনকে গালাগালি দেওয়া চাই। লোকেরও অভাব নাই, শান্ত বহিয়াছে, কিছু বেশীমাত্রায় তিরস্কার হইল।

এ দিকে বাবুর খোষ্ খানসামা স্বরূপ চাঁদ, হারাণের গালে একটী চড় মারিল; হারাণ নাকি বাগানে একটি ফুল তুলিয়াছিল। চড় খাইয়া হাবাণ বলিল, "কেন মারিলি?" স্বরূপচাঁদের রোষের আর সীমা রহিল না। বিলক্ষণ প্রহার দিবেন বাসনা, তাড়া করিলেন। নির্ব্বোধ হারাণ ভাবিল, "মার কাছে গেলেই নিষ্কৃতি পাব।" শান্ত কাঁদিতেছিল, আঁচল ধরিল। কিন্তু স্বরূপ কি তাহা শুনে? চুলেব মুটি ধবিয়া বেদম প্রহার। "মা, মেরে ফেল্লো গো!" শান্ত কত মিনতি করিল, কিন্তু স্বরূপ আপনি নির্দ্দয় না হইয়া ক্ষমা দিল না। হারাণের আজ দিব্য চক্ষু ফুটিল, মারিলে কেহ রাখিবার নাই।

একে কর্ম্মের গোল, তাহাতে সন্ন্যাসীর হিড়িক, সেই দিনে একটী রূপার গেলাস পাওয়া যাইতেছে না। কে আর চুরি করিবে?—'হাবাণ'। স্বরূপচাঁদ সাপোট করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি এখনই বাহির করিতে পাবি। কে আব লইবে? ঐ হারাণই লইয়াছে। দুই চড়ে আদায় করিতে পারি।" স্বরূপের প্রস্তাবে কর্ত্তা গিন্নীও সম্মত। "যদি আদায় হয় হোক্।" স্বরূপ আরও ঝঙ্কার করিতে লাগিল। হারাণ ভাবিল, আর পলায়ন ব্যতীত উপায় নাই। হারাণ দৌড় দিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বাদশবর্ষীয় বালক ছুটিল। কোথায় যাইবে স্থির নাই। মা রক্ষা করিতে পারিবে না, জানিয়াছে। বালক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া দৌড়াইতে লাগিল। প্রতিপদে আশঙ্কা, স্বরূপ আসিতেছে। আর কত পারে? নির্জ্জীব হইয়া গঙ্গাব কূলে বসিল। ভাবিতে লাগিল, "কোথায় যাব? কে আশ্রয় দিবে?" মাব কথা মনে উঠায় দরদরবেগে নয়নধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু আর ফিরিব না; কতক্ষণ এইরূপ অবস্থায় রহিল। সন্ধ্যা হইল, অন্যমনে তারা গুণিতে লাগিল। সে সময়েও গুণ গুণ করিয়া একটী গান গাহিতেছিল।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। "কে তুমি?" হারাণ চাহিয়া দেখে, একজন সন্ন্যাসী। ভয় হইল। সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বালক দুর্দ্দশাপন্ন, বলিলেন, "ভয় নাই, কি হইয়াছে বল?" হারাণ কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। সন্ন্যাসী তাহার একজন চেলাকে ইঙ্গিত করিলেন,—"ইহাকে লইয়া ওপারে যাও" ও হাবাণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিলেন, "তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমায় লালন-পালন কবিব, আমাকে

তুমি পিতার ন্যায় জ্ঞান করিবে।" দয়া করিলে পশুপক্ষী বুঝিতে পারে, হারাণও বুঝিল। সন্ন্যাসী আমাদের পরিচিত, নীলরতন বাবুর বাটীতে দেখিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"There glides a step through the foliage thick,
And her cheek grows pale, and her heart beats quick,
There whispers a voice through the rustling leaves."

"শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে,
শূন্য দেখে শোভিত সংসার।"

রাত্রি বাড়িতে লাগিল, শান্তর প্রাণ আর স্থিব হয় না। গিন্নীকে এক রকম বুঝাইয়াছে, হারাণ চুরি করে নাই। পান্তাভাত চাপা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল, "কই, এখনও ত আসিল না, ভয়ে কোথা লুকাইয়া আছে!" এখানে সেখানে, এ বাড়ী ও বাড়ী, এ বাগান ও বাগান খুঁজিতে লাগিল। আ অভাগি! স্বরূপো কি খুঁজিতে বাকী করিয়াছে? ঘরে আসে—আবার যায়, আবার ঘরে আসিয়া দেখে, আবাব খুঁজিতে বাহিরে গেল।

আম্রবন, নিবিড় অন্ধকার, সেখানে পদশব্দ শুনিল। "আহা! বাছা এতক্ষণে ফিরিয়াছে। হাঁ, কে দাঁড়াইয়া আছে! হারাণই বটে!—হারাণ! হারাণ!" উত্তর নাই। বনের ভিতর প্রবেশ কবিল। "হারাণ! হারাণ! হারাণ আসিয়াছ?" "না—না", অন্ধকার বনের ভিতর কে "না" বলে? ভাবিল—ভ্রম হইয়াছে। অকস্মাৎ দীর্ঘাকার একজন পুরুষ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। শান্তর আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। পুরুষ বলিল, "ভয় নাই, আমি রামচাঁদ।" শান্তর মস্তক ঘুরিয়া গেল। পড়িতে যায়, রামচাঁদ ধরিল। পরস্পর দুঃখের কথা বলিতে বলিতে—শুনিতে শুনিতে উভয়ে কাঁদিতে লাগিল।

মানব-হৃদয় অতি আশ্চর্য্য পদার্থ। যে কুড়ুনে ছেলে ঘরে আনিয়া রামচাঁদের এত দুর্দ্দশা, যাহাকে কিছুদিন মাত্র দেখিয়াছিল, জেলে বসিয়া তাহার উপর প্রগাঢ় মায়া জন্মিয়াছে। তাহার মুখ একদিনের জন্যও ভুলে নাই। আজ সেই নিরাশ্রয় বালকের উপর তাড়না শুনিয়া, রামচাঁদ ক্রোধে কম্পিত কলেবব হইল।

ফল পাকিলে স্বরূপ বাত্রে প্রায়ই বাগানে যাইত। মালীর সর্ব্বনাশ হইত, তাহার পেট ভরিত। ধীরে ধীরে স্বরূপ আমাবাগানে উপস্থিত। একটী আম পাড়িয়া খাইতেছে, এমন সময় ভীষণ এক কীল তাহাব পিঠে পড়িল। কীলেব উপর কীল, চীৎকার না করিলে তাহার প্রাণ বাঁচে না। পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিল। বিষম চীৎকারে চারিদিক্ হইতে লোক আলো জ্বালিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, স্বরূপের গোটালাল ভাঙ্গিতেছে, আর শান্ত কাছে পুতুলের ন্যায় দণ্ডায়মান।

স্বরূপ কি বলিবে, ভাবিয়া পায় না। শান্তকে দেখিয়া একটা উপায় স্থির করিল। উপায় এই, দুশ্চারিণী শান্ত কাহার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতে যায় দেখিতে আসিয়া

এই দুর্গতি! শান্ত বলিল, ‘‘হারাণকে খুঁজিতে আসিয়াছি।’’ কিন্তু কে তবে মারিল? রামচাঁদের মুখে শুনিয়াছে, পুলিস তাহার অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, সুতরাং স্বামীর নাম করিতে সাহস করিল না। স্বরূপের কথা বলবৎ হইল।

শান্ত ভাবিয়া দেখিল, নীলরতনবাবুর বাটীতে আর তাহার স্থান নাই। হারাণের নিমিত্ত এত সহিয়াছে, সে হারাণ নাই! প্রভাতে কলঙ্কিনী অপবাদ সহিতে হইবে, অতএব রাতারাতি প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। সম্বল কিছুই ছিল না, একবসনে বাহির হইল। কেবল হারাণের গলায় একটী রামপদক ছিল, চিহ্ন স্বরূপ রহিল। চেনা লোক কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হয়, রাতারাতি অনেক দূর যাইতে পারে, এ নিমিত্ত দ্রুতপদে চলিল! ‘‘কিন্তু হারাণ যদি আসে? ভগবান্ দেখিবেন!’’

যখন প্রভাত হইল, তখন পলতার ঘাটে উপস্থিত। ঘাটে বসিয়া ভাবিতেছে, কোথায় যাই, কিরূপেই বা পার হই, দেখে—ঘাটে একখানি বোট রহিয়াছে।

একটী স্ত্রীলোক বোট হইতে দৌড়িয়া আসিয়া কূলে পড়িল। ‘‘এইখানে, এই বালির উপর বাছাকে ফেলিয়া গিয়াছি, বাছা এইখানে আছে’’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। একজন পুরুষ আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, ‘‘তাহাকে আমি বাড়ী লইয়া গিয়াছি, বাড়ী চল, বাড়ী গেলেই দেখিতে পাইবে।’’ কিন্তু স্ত্রীলোক শান্ত হইল না। ছেলে কোলে লইয়া যেরূপ দুধ খাওয়ায়, সেইরূপ ভঙ্গি করিতে লাগিল। ছেলে যেন কাঁদিতেছে, ‘‘ও আয়! আয়!’’ করিয়া শান্ত করিতে লাগিল। হতভাগিনী আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। শান্তকে দেখিয়া উন্মাদিনী তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, ‘‘মা জগদ্ধাত্রি, আমার ছেলে দাও! দাও, ছেলে দাও! নহিলে এ প্রাণ রাখিব না!’’ পুরুষ অনেক যত্ন করিতে লাগিল, রমণী কোন ক্রমেই বুঝিল না; শেষ বলিল, ‘‘নাও, আমার জগদ্ধাত্রী মাকে সঙ্গে নাও! মা আমার ছেলে দিবে!’’ কোন ক্রমে বুঝিল না: শান্তর আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল,—‘‘মা! তোমায় ছাড়িব না!’’ পুরুষটী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। পাগলিনী তিন দিন জলস্পর্শ করে নাই, কেবল চীৎকার করিতেছে। শান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ‘‘মা! এ অভাগিনী আমার স্ত্রী, ইহাকে কিছু খাওয়াইতে পার? তিন দিন অনাহারী। এই দুধ নাও; দেখ, যদি তোমার কথায় খায়।’’ দুধ লইয়া শান্ত বলিল, ‘‘খাও।’’

‘‘তোমার প্রসাদ ত?’’

‘‘হাঁ।’’

অভাগিনী দুগ্ধ পান করিল। শান্ত বলিল, ‘‘মা, তোমার স্বামী ডাকিতেছেন, নৌকায় যাও।’’

‘‘তুমি না আসিলে যাইব না।’’

তখন সে পুরুষ শান্তকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া বলিল, ‘‘মা, আমি ঢাকানিবাসী একজন গৃহস্থ, নাম রমেশচন্দ্র ঘোষাল। আমার স্ত্রীর এই দশা! ডাক্তারের উপদেশে স্থান ও দৃশ্য পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ইহাকে লইয়া জলে ভ্রমণ করিতেছি। তুমি কে মা?’’

"আমি ব্রাহ্মণকন্যা।"

"তোমার কে আছে?"

"কেহই নাই।"

"আমার সঙ্গে যাইতে কোন আপত্তি আছে? এ হতভাগিনীকে যত্ন করে, এমন আর কেহই নাই। তোমায় মা'র ন্যায় আদরে রাখিব, যাইবে কি?"

"আমায় সঙ্গে লইবে কি?"

"কেন?"

শান্ত কি নিমিত্ত নীলরতন বাবুর বাটী পরিত্যাগ করিয়াছে, পরিচয় দিল। কিন্তু রমেশ বাবু দ্বিচারিণীর লক্ষণ তাহাতে কিছুই পাইলেন না। বলিলেন, "মা, তোমায় মা বলিয়াছি। আইস, কুণ্ঠিত হইও না।"

শান্ত বলিবামাত্র পাগলী আস্তে আস্তে নৌকায় উঠল। শান্তও উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"But pale as marble o'er the tomb,
Whose ghastly whiteness aids its gloom.
His brow was bent, his eye was glazed;
He raised his ween and fiercely raised,
And sternly shook his hand on high."
"A sail! A sail!—a promised prize to hope!"

পরদিন রামচাঁদের শান্তর সহিত সাক্ষাৎ কবিবার কথা ছিল। মধ্যে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তাহা কিছু জানে না। রামচাঁদ রাত্রে নির্দ্ধারিত সময়ে আম্রবনে উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; শান্ত আসিল না। মালীর সন্দেহ হইয়াছিল, বাগানে কে চোর আসে, ধীরে ধীরে আমতলায় উপস্থিত! রামচাঁদ ভাবিল শান্ত, ধীরে ধীরে বলিল, "শান্ত আসিয়াছ?" মালী বলিল, "শড়া, আম খাইবি আউ শান্ত কাঁই বুলুচি? তুতে মু দিখিমু।"

নিকটে যাইতে রামচাঁদ বজ্রহস্তে ধরিয়া বসিল, মৃদু-কঠোর স্বরে কহিল, "চীৎকার করিলে প্রাণবধ করিব।"

হাত ধরাতেই মালী বুঝিয়াছিল, বধ করা বড় বিচিত্র নহে; সুতরাং রামচাঁদ যে যে প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহার স্বরূপ উত্তর দিল। সমস্ত ঘটনা শ্রবণে, রামচাঁদ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। একখানি খোলা লইয়া আম গাছের গায়ে লিখিল,—

"শান্ত সতী। তার স্বামী রামচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল।"

চোর বিদায় হইলে, মালী ক্যাঁচ ম্যাচ করিয়া লোক জড় করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যাহাকে পুলিস খুঁজিয়া পায় না, মালী কোথায় পাইবে?

রামচাঁদের ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিতেছিল, নাসিকা হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল, হৃদয়বেগে অতি দ্রুতপদে চলিল। কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—"আমি কাহারও নিকট দোষী নই; কিন্তু দোষী অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি পাইয়াছি। এবার দোষী হইয়া দেখিব, ইহা অপেক্ষা অধিক শাস্তি কি পাই। সমাজ বিনা অপরাধে আমাকে ঘৃণা করিয়াছে—দণ্ড দিয়াছে। কেবল আমাকে নয়, অনাথিনী পতিপরায়ণা শান্তকে কলঙ্কিনী বলিয়া বিদায় দিয়াছে। যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে, প্রতিশোধের চেষ্টা করিব। দেহে বল আছে; দোষী নাই, নির্দ্দোষী নাই, যাহাকে পাইব—তাহাকেই শাস্তি দিব। কেন? আমাকে দণ্ড দিবার সময় কে বিচার করিয়াছিল? —অনাথ হারাধনকে দণ্ড দিবার সময় কে বিচার করিয়াছিল? শান্তকে কলঙ্কিনী বলিবার সময় কে বিচার করিয়াছিল?

বিচারশূন্য বলবান্ মনুষ্য নির্জ্জনে এই সঙ্কল্প করিল।

সঙ্কল্প স্থির। ঝড়ের পূর্ব্বে সমুদ্রের ন্যায় স্থির। সুযোগ সহায়তা করিল। হঠাৎ রামচাঁদ শুনিল, কে শীষ্ দিতেছে। স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে বোধ হইল, কে কাহার সহিত চুপি চুপি কথা কহিতেছে! কথার ভাব এই, —"এত দেরী কর্‌লি, ডাকাতি ক'রাতে যাইবি কখন্?" রামচাঁদ ভাবিল, "ভাল হইল, ডাকাতের দলে মিলিব।"

এমন সময় নিকটে আসিয়া একজন শীষ্ দিল। রামচাঁদ বুঝিল, এই ইহাদের সঙ্কেত; রামচাঁদও শীষ্ দিল। শীষের উত্তরে একজন্ জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" রামচাঁদ উত্তর করিল—"রামচাঁদ।" স্বর প্রত্যুত্তব দিল, "রামচাঁদ কে?"

"একজন দস্যু।"

"কোন দলস্থ।"

"তোমাদের দলস্থ।"

"কৈ, রামচাঁদ তো কেউ নাই।"

"আজ একজন হইল।"

তখন সে ব্যক্তি আলো জ্বালিয়া রামচাঁদকে দেখিল। দেখিবামাত্র বিশ্বাস জন্মিল, এবং কহিল, "ভাল ভাই, তুমি আজ হইতে আমার দলভুক্ত।" রামচাঁদ দেখিল, অপরিচিত একজন খর্ব্বাকার মনুষ্য, দেহে বলের লক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হয় না, অস্ত্রশস্ত্রও হাতে নাই। বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিল। ডাকাত রামচাঁদের মনোভাব বুঝিয়াছিল, বলিল, "আমার কার্য্যের পরিচয় কার্য্যে, অঙ্গে কিছুই দেখিতে পাইবে না। তোমার পরিচয় আজ বুঝিব। চল।" রামচাঁদ পশ্চাদ্‌গামী হইল। কিছু দূর গিয়া দেখে, আর দশ বার জন বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। খর্ব্বাকারকে দেখিবামাত্র সম্মানে অভ্যর্থনা করিল ও রামচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করিল। দস্যু-প্রধান উত্তর করিল, "আমার সঙ্গী।"

দস্যু-সম্প্রাদায়ের সেদিনকার সঙ্কল্প এই যে, একজন বর্দ্ধিষ্ঠ জমীদারের খাজানার টাকা রাত্রে রওনা হইবে, পথে লুঠ করিয়া লইবে। লুঠ করিবার বিশেষ সরঞ্জাম,—কারণ,

খাজানা বলশালী পাইক রক্ষিত হইয়া যাইবে। বলিতে বলিতে দূরে একটা শব্দ শুনিল। দস্যুরা বুঝিল, খাজানা আসিতেছে—কুড়ি পঁচিশ জন অস্ত্রধারী-পরিবেষ্টিত ভারীর স্কন্ধে টাকা তোড়াবন্দী চলিযাছে।

যেমন ঝড় উঠে, অকস্মাৎ দস্যুদল খর্ব্বাকারের ইঙ্গিতানুসারে আক্রমণ করিল। বামচাঁদের হস্তে একখানি তরবারী দিয়াছিল, রামচাঁদও আক্রমণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই রক্ষী-দল ছিন্নভিন্ন হইল। তোড়া ফেলিয়া ভারী পলাইল; ডাকাতেরা কুড়াইয়া লইতে লাগিল। অকস্মাৎ দসুপ্রধান চীৎকার করিয়া বলিল, ''ওরে পালা, তীর চলিতেছে। আমায় লইয়া পালা, আঘাত পাইয়াছি, আর পালাইবার শক্তি নাই।'' এই কথা শুনিবামাত্র দস্যুদল যে যেথায় পাইল, পলাইল। কিন্তু রামচাঁদ দস্যু-সর্দ্দারকে ছাড়িল না, পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। ''ধর! ধর!'' শব্দ; রামচাঁদ পবনবেগে ছুটিল।

কতক্ষণ পরে শ্বাস রাখিয়া শুনিতে লাগিল। ''কে ও? না, কিছুই না।'' যামিনী সন্ সন্ করিতেছে, বৃক্ষাচ্ছাদনে অন্ধকার বিরাজ করিতেছে, এমন এক নিভৃত নিশ্চিন্ত-স্থানে আহতকে নামাইল। দেখিল, আহত মূর্চ্ছিত। দূবে তটিনীর মর্ মর্ ধ্বনি—রামচাঁদ শব্দ অনুসারে গিয়া বসন সিক্ত করিয়া ফিরিল। মুখে জল দেওয়াতে ও ধীরে ধীরে ডাকাতের সর্দ্দার সংজ্ঞা লাভ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, ''কোথায় আমি?''

''ভয় নাই, আমি বন্ধু।''

''আমার দলবল কোথায়?''

''পলাইয়াছে, —জানি না।''

''তুমি কে?''

''আমার সহিত নূতন পরিচয়। ভুলিয়া গিয়াছ?''

নিশ্বাস ফেলিয়া সর্দ্দার বলিল, ''বুঝিলাম তুমি বন্ধু। আমার মরণ সময় নিকট। আমার বাড়ী ইঁদেশ; নাম গয়া সর্দ্দার, জাতিতে ডোম, ত্রিসংসারে কেহই নাই। মরিলে সৎকার করিও। আমার ঘরের দক্ষিণ কোণে পোতা বিস্তর ধন আছে, লইও।'' বলিতে বলিতে দস্যুর শ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল, চক্ষু কপালে উঠিল; পরক্ষণে আর শ্বাস পড়ে না। রামচাঁদ বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক দস্যুর দেহ দাহ করিয়া, ছদ্মবেশে ইদেশ-অভিমুখে চলিল। পথে ভিক্ষা করিয়া খায়, রাত্রে চলে। এইরূপে কয়েক দিনে ইঁদেশে পৌঁছিল।

গভীর রাত্রে গয়াসর্দ্দারের ঘরে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিল। দেখে, আশাতীত ধন, কলসী কলসী স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে একটী শ্মশানভূমি দেখিয়াছিল। সেথা বড় ভূতের ভয়; সম্প্রতি তথায় কেহ আর শব লইয়া যায় না। ভাবিল, সমস্ত ধন লইয়া সেইখানে পুঁতিয়া রাখিব। যত পারে কাপড়ে স্বর্ণমুদ্রা বাঁধিয়া শ্মশানাভিমুখে চলিল। শ্মশানভূমির নিকট গিয়া বৃহৎ বটবৃক্ষের তলায় একটী আলোক দৃষ্ট হইল। ''কি, দেখিতে হইবে।'' আত্মরক্ষার নিমিত্ত একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইল।

ধীরপদে কাছে গিয়া দেখে, কযজন মনুষ্য বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। দেখিল, তাঁহাদেব হস্তে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নাই। যেন চেন চেন কবিল। "হ্যাঁ এ গয়া সর্দ্দাবের দল।" সহসা দলমধ্যে উপস্থিত হইল। সকলে চমকিয়া উঠিল। একজন বলিল, "কে তুমি?" খোনাস্বরে উত্তর হইল, "আমি ব্রহ্মদৈত্য, খাজনা লুঠিতে গিযা মাবা পড়িয়াছি।" দস্যুদল পুনরায় সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "হেথা কেন?"

"তোদের ঘাড় ভাঙ্গিব; আমায় ফেলিয়া, পালাইয়া আসিয়াছিলি?"

প্রচণ্ডশাখা হস্তে দীর্ঘাকারকে দেখিযা সকলেই অনুমান কবিল, এক এক ঘায়েই ঘাড় ভাঙ্গিবে। পলায়নের উদ্‌যোগ করে—বজ্রনাদে বামচাঁদ বলিল, "পলাইলে কাহাবও প্রাণ থাকিবে না। শোন্, তোদের সর্দ্দার মরিয়াছে, আমি মবি নাই। আজ হইতে আমি তোদের সর্দ্দার।" সকলে মৃত দেহে প্রাণ পাইল, সর্দ্দার! সর্দ্দার! বলিয়া সম্বোধন কবিল। দলপতি হইয়া রামচাঁদ ভাবিতে লাগিল, দস্যুবৃত্তি একরূপে উত্তম হয় না। জেলে শিখিয়াছিল, সাঁজোয়া পরিলে তীর লাগে না। অশ্বপৃষ্ঠে বন্দুক লইয়া উত্তম তরবারি দ্বারা অধিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পাবে। ভাবিল, "ধন আছে, নববিধানে সম্প্রদায় স্থাপন করিব।" পুলিসের ভয়ে পলাইয়া বেড়াইতে হয; জেলে দেখিয়াছে, প্রায়ই ডাকাইত-দল ধরা পড়ে; অতএব কোন' নিভৃত স্থানে আড্ডা করিতে পারিলে—যেমন পর্ব্বতগুহা বা মেদিনীগর্ভ—পুলিশের বেশী আশঙ্কা থাকে না। এইরূপ আবাস যদি কামানে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে পুলিসেব ভয় একরূপ এড়ান যায়। পুলিসের নিকট শুনিয়াছিল, ছদ্মবেশে বড় সন্ধান পাওয়া যায় না; নানা বেশে সন্ধান করিবে ভাবিল। একস্থানে থাকিলে শীঘ্র ধরা পড়ে, স্থানে স্থানে আড্ডা বাখিবে স্থির কবিল। নূতন অধিকারী নূতন প্রথা অবধাবিত কবিল।

তৃতীয় বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

''নাচে অত্যাচার—কবে করাল কৃপাণ!
সোণাব ভাবতবর্ষ হ'য়েছে শ্মশান!''

সকলে বলে, একটু হাঁকডাক থাকা ভাল। গল্পে দেখি, লাফ-ঝাঁপ থাকা ভাল সুতবাং আমাদেব গল্প পাঁচ বৎসর লম্ফ প্রদান কবিল।

গ্রীষ্মকাল, বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত। গড়ের মাঠে সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে, সিপাহিরা রন্ধনাদি করিতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তি গৈরিকবস্ত্র আচ্ছাদনে ধীরে ধীরে তাম্বু—অভিমুখে চলিলেন। গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছিলেন। বোধ হয়, ইনি কবি। নচেৎ তাঁহার গান কিরূপে আসিল, বুঝিতে পারি না। কেন না, দিনকর পরামানন্দে গগনে বসিয়া অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিলেন,—যাঁহারা পৌষেব শীতে গ্রীষ্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহাবা সামাল সামাল ডাকিতেছেন। উপরে সূর্য্যদেবের যেরূপ আনন্দ, নিম্নে ধূলারও তদ্রূপ। ধূলা কখন নাচেন, কখন ঘুরেন, কখন ছুটেন, মানুষ দেখিলে আগে চ'খে প্রবেশ করেন। বাস্তায় বড় লোকজন চলিতেছে না, কেবল কোমলাঙ্গী বিবিরা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে পাখা নাড়িতে নাড়িতে ইতস্ততঃ যাতায়াত কবিতেছেন। সকলে বলে, পাখীরা গাহক বড়। এ সময়ে তাহার বড় প্রমাণ নাই।—কাকের বারমেসে আওয়াজ কেবল এক একবার শোনা যাইতেছে। আমরা এত কথা বলিতেছি, কারণ, এমনি কতগুলো বলিতে হয়। উল্লিখিত পথিকের বর্ণনা করা হয় নাই, —বেশী বর্ণনারও সুযোগ নাই। বলিয়াছি, বিশেষ করিয়া অঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদান করিয়াছেন। তবে পায়ের খড়ম যোড়াটী বর্ণনা কবিতে বলেন, করা যায়। যদি বলেন, আকার দীর্ঘ বটে।

পথিক ধীরে ধীরে তাম্বুর নিকট উপস্থিত হইল। এইবার তাম্বুর ছায়ায় বসিয়া অঙ্গের বসন খুলিল। দেখিলাম সন্ন্যাসী—কিন্তু জটা নাই, কিশোরকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, দীর্ঘ নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ-পল্লব ভূষণে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে; উষ্ণ ওষ্ঠে রক্তচ্ছটা, ললাটে শ্রমজল মুক্তার ন্যায় ফুটিয়াছে, সুন্দর নাসিকা, কিন্তু টিয়া পাখীর মত নয়, মুখমণ্ডল গম্ভীর, দেহ বলব্যঞ্জক, এক কথায় বলি—সুন্দর!—না, গণ্ডস্থল পুষ্টিহীন, বর্ণ মলিন।

গান আরম্ভ করিল—গান হিন্দী, কিন্তু পাঠকের সুবিধার জন্যও বটে ও আমাদের সুবিধার জন্যও বটে, গান বাঙ্গালা করিয়া দিই,—

গীত

বিষমোজ্জ্বল চিতানল
ঘোর পবন সাজে—

হীন জ্যোতি, রবিশশধর
ধূমনিবিড় রাজে।
গৃধিনীদল, ভৈরব অল
ফেরুপাল, অস্থিমাল
স্তূপে স্তূপে সাজে—
নীরব ভব ভীমোৎসব!
শূন্য পূর্ণ হাহারব!
প্রেতাশক্ত, স্রোতরক্ত
খর মশান-মাঝে।

স্বর অতি মধুর, গভীর ও উচ্চ—সময়ে যেন গগনপ্রান্ত স্পর্শ করিতে লাগিল, আহা, ইহাকে সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করি নাই! অতি সুন্দর! ভাবভঙ্গীর সহিত যুবা গাহিতে লাগিল; গাহিতে গাহিতে দেহ জ্যোতিঃ পূর্ণ হইল,—কঠোর হৃদয় চোবে দোবে চারি পাশে ঘেরিয়া বসিল। ধনী সিং হিন্দিতে বলিতে লাগিল, আমরা বাঙ্গালায় বলি—

"তুমি কে?"

"যুবা উত্তর করিল, "উদাসীন।"

"হেথায় কেন?"

"যেথা ইচ্ছা হয় বসি।"

"আহা—! তোমার অতি মধুর সঙ্গীত!"

"হইলেও হইতে পারে।"

যুবা আবার আরম্ভ করিল,—

উঠ, উঠ, উঠ—কি কর কি কর,
ধর ধর ধর, ধর অসি ধর,
মাতৃভূমি জর জর জর,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ প্রাণে!
ঘুচিল ঘুচিল ধর্ম্মকর্ম্ম
তাপশুষ্ক নিহত মর্ম্ম,
মজিল মজিল মান—
হা! হা! বক্ষে বাজে!

এবার যুদ্ধবিৎ শ্রোতাগণের শোণিত খরতর বেগে বহিতে লাগিল। ড্রামের ঝঙ্কারের ন্যায় মধ্যে মধ্যে উচ্চ তান উঠিতে লাগিল; যুবা মুগ্ধ, সকলেই মুগ্ধ! সুখ-স্বপ্নের ন্যায় সহসা সঙ্গীত থামিল। তখন সকলেই একবচনে বলিল,—

"তুমি কে মহাত্মা?"

"আমি মহাত্মা নই। যদি মহাত্মা হইতাম, দিন দিন দেশে ধর্ম্মলোপ হইত না, অত্যাচার দিন দিন প্রবল হইত না, দিন দিন জাতিনাশের আশঙ্কা বাড়িত না; হায়! আমি মহাত্মা ত অধমাত্মা কে?" বলিতে বলিতে যুবার দীর্ঘ নয়নে অগ্নিকণা ঠিকরিতে লাগিল, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, যুবা দৃঢ়বাক্যে বলিল, "আমায় মহাত্মা কে বলে? হায়, হিন্দুব কেহই নাই! ধর্ম্ম, জাতি, দেহ, বল বীর্য্য ম্লেচ্ছপদে বিক্রীত—কি বলিব প্রাণ কাঁদে! কিন্তু কাঁদিব, তাহাও সাহস হয় না।"

"কাঁদিতে সাহস হয় না" সিপাহীরা একথা বুঝিতে পারিল না। যুবা বলিতে লগিল, "আপ্‌পা সাহেবেব মৃত্যুর পর যখন ম্লেচ্ছ পোষ্যপুত্র রহিত করিয়া মৃত রাজার স্বর্গপথ রোধ কবিল, যখন সেতারারাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকাব করিল, অট্টালিকা লুণ্ঠন করিয়া নিলামে ধরিল, অনাথিনী রাণীগণের রোদন যখন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কে কাঁদিতে সাহস করিয়াছিল? সর্ব্বগ্রাসী শ্বেত রাক্ষস যখন নাগপুর গ্রাস কবিল, হিন্দুর চিরপ্রচলিত প্রথা ধ্বংস হইল, রাজপুত্রদিগকে ভিখারী করিল, কেহ কি কাঁদিতে সাহস করিয়াছিল? কেরোলি যখন শ্রীভ্রষ্ট করিল, ঝাঁসী যখন পদতলে দলিল, প্রজার হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইল—সম্বলপুরের কথায় কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কি কাঁদিতে পারিয়াছিল?"

"ম্লেচ্ছ-পীড়নে বাজিরাও পাশা যখন রাজ্যচ্যুত হন, কার প্রাণ না কাঁদিয়াছিল? কিন্তু কাঁদিতে কে সাহস করিয়াছে?"

"কুবেরপুরী অযোধ্যা ভিক্ষুকাগার হইল, ওয়াজাদালী বন্দী, দিঙ্মণ্ডল হাহাকার পূর্ণ—কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? কিন্তু কাঁদিতে কি কেহ সাহস করিয়াছিল?"

"যখন ম্লেচ্ছভাবে ব্রাহ্মণক্ষত্রীয় দন্তে 'কারতুজ' কাটিবে—কাঁদিতে কে সাহস করিবে?"—সকলেই স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিল।

'মনে মনে বুঝিতেছ, অত্যাচার কি বলবান্। কিন্তু কাহারাও কাঁদিতে সাহস হয় নাই; কেন? কখন কি পদবৃদ্ধি হইবে? কখন কি সমাদর পাইবে? না, তা নয়—কেবল পেটের দায়ে, ছার পেটের দায়ে—শূকর, কুক্কুর, শৃগাল, কাক প্রভৃতি যে পেট অনায়াসে চালাইতেছে, সেই পেটের দায়ে ধর্ম্ম দিবে, কর্ম্ম দিবে, দেহেব শোণিত দিবে? কালে আরও কি হয়!" বক্তৃতা শ্রবণে কাহারও নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল, কেহ নতবদনে রহিল, —কেহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। যুবা উঠিল; সকলে বলিল,—"মহাশয়! কোথায় যান?"

"আমার যাইবার নিরূপিত স্থান নাই। আমি সন্ন্যাসি।"

একজন বলিল, "অবস্থা ত বর্ণনা করিলেন, এখন উপায়?"

"উপায় জানিলে করিতাম, প্রাণ দিয়া করিতাম— কিন্তু মনে হয়, ধর্ম্ম রক্ষার উপায় প্রাণ দিয়া করিতে হয়।"

যুবা দ্রুতপদবিক্ষেপে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"And still upon the face I look,
And think 't will smile again,
And still the thought I will not brook,
That I must look in vain."

এখন গড়ের মাঠের অন্য মূর্ত্তি! ফিটন, বেরুচ, বগী দলে দলে ছুটিতেছে। চারিদিকে সাদামুখ পদ্মফুলের মত ফুটিয়াছে। রাস্তায় ধূলা নাই, সূর্য্যের তাপ নাই। লোহিত মেঘ-মালায় পশ্চিমগগন হাসিতেছে। কাঞ্চনহারে জাহ্নবীতরঙ্গ নাচিতেছে। যুবা ধীরে ধীরে আসিয়া, গঙ্গাপুলিনে, এক বিজন স্থানে বসিল। আরক্ত পশ্চিমগগনে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—"রক্তস্রোত! রক্তস্রোত বিনা ভারত—কলঙ্ক ধৌত হইবে না।" যুবা অন্যমনে ভাবিতে লাগিল। সহসা একটা মেঘ উঠিল। অতি নিবিড় মেঘ, ঝিকি ঝিকি বিদ্যুৎ খেলিতেছে। গঙ্গার জল স্থির। বৃক্ষ-পল্লব নড়ে না। শীঘ্র কালমেঘ গগন বেড়িল—দেখিতে দেখিতে ঘোর অন্ধকার! মহাবেগে, বায়ু ছুটিতে লাগিল, জাহ্নবী রণমুখী হইয়া নাচিতে লাগিলেন। হঠাৎ শব্দ হইল—"গেল! গেল! গেল!" যুবার চিন্তাভঙ্গ হইল। দেখিল, কূলের নিকট একখানি নৌকা জলমগ্ন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নৌকা ডুবিল, একটা শাদা কি? যুবা ভাবিল, কোন অভাগা সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গের মধ্যে জীবনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে— "হাঁ, তাই বটে—গেল, আর রক্ষা পায় না!" যুবা জলে ঝম্প দিল, পীনবাহু আন্দোলন করিয়া তরঙ্গমালায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল—'কই, কেহ নাই!' 'এই যে!' —'কোথায় গেল!' —'এই!' —যুবা অনেক ক্লেশে তাহাকে লইয়া তীরে উঠিল।

হায়! শ্রম বিফল হইল; কই, এ ত নড়ে না! বিদ্যুতালোকে দেখিল, গৌরাঙ্গী রমণী। এখন আর ঝড় নাই, কেবল মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে।

যুবা এইরূপ ভাবে বসিল, যেন জলধারা মুমূর্ষুর মুখে না পড়ে। বার বার নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিতে লাগিল, নিশ্বাস পড়িতেছে কি না।

একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। নৌকা হইতে একজন ডাকিল, —সোমনাথ!' 'আমি এদিকে'। 'কোথায় কি করিতেছ?' "একটি স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইয়াছিল, তাহাকে তুলিয়াছি। বোধ হয়, শ্বাস বহিতেছে,—তুমি ত চিকিৎসা-বিদ্যা জান, দেখ দেখি, জীবিতা কি না?" এ কথায় একজন সন্ন্যাসী নৌকা হইতে নামিয়া সোমনাথের নিকট আসিল। সন্ন্যাসী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, 'জীবিতা বটে।' সোমনাথ উত্তর করিলেন, "যাহাতে ইহার প্রাণরক্ষা হয়, কর!"

"এখানে কি উপায় করিব?"

"চল, তবে আড্ডায় লইয়া যাই।"

''গোঁসাইজী কি বলিবেন?''

''ভয় নাই, সমস্ত অপারধ আমি লইব।''

জলমগ্না রমণীকে লইয়া দুই জনে নৌকারোহণে প্রস্থান করিলেন। জাহ্নবীর অপর পারে আড্ডা, সারি সারি ক্ষুদ্র কুটীর, অনেকগুলি সন্ন্যাসী রহিয়াছে। সোমনাথের একটী স্বতন্ত্র কুটীব ছিল, সেই কুটীরেই স্ত্রীলোকটীকে রাখিলেন। সোমনাথের সঙ্গী যেমন যেমন বলিতে লাগিল, সোমনাথ সেইরূপ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এখন শ্বাস বহিতেছে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ শীতল। চিকিৎসক বলিল; 'আগুনে সেক দিতে হইবে।' অগ্নি জ্বালিয়া দুইজনে তাপ দিতে লাগিলেন,—প্রজ্জ্বলিত আগ্নিশিখায় অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি। নয়ন মুদিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছে—মুখে রক্ত নাই, শিশিরধৌত শ্বেতপদ্মের ন্যায়। শ্বেতপদ্ম পল্লবের ন্যায় ওষ্ঠ, যেন আঁকা ভ্রূ, নাসিকার শোভা সেই মুখে দেখিলেই বুঝা যায়—দীর্ঘ নয়ন-পল্লবগুলি পাছে নেত্র উন্মীলিত না হয়, ঈষৎ কাঁপিতেছে—সোমনাথ নয়ন ফিরাইয়া নিল। তাপ দিতেছিলেন, কার্য্য ভুলিয়া যান, আবার দেখেন; মনকে তিরস্কার করেন—আবার দেখেন এমন সময় একজন আসিয়া বলিল, ''গোঁসাইজী ডাকিতেছেন।''

''যাই।''

যাইতে বিলম্ব হইল। গোঁসাই আপনি আসিলেন।

দীর্ঘাকার জটাজুটধাবী আমাদের পরিচিত সন্ন্যাসী।

''প্রভু! একটী স্ত্রীলোক মৃতপ্রায়, তার শুশ্রূষা করিতেছি।''

''সোমনাথ, কার্য্যের সময়, মমতার সময় নয়। স্ত্রীলোক মরে, —মরুক; শত শত মরিতেছে, শত শত মরিবে।''

''প্রভু! অভাগিনী জলমগ্না হইয়াছিল, বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।''

''বাঁচাইবে তোমার নিতান্ত ইচ্ছা; আমার ঔষধের থলি আন।''

সোমনাথ বাহিরে গেলেন। তখন সন্ন্যাসী সোমনাথের সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ''একটা স্ত্রীলোকের নিকট দুইজন থাকিলে চলিবে না। তুমি দেখ, দেবদাসেব কি নিমিত্ত বিলম্ব হইতেছে।'' আজ্ঞামাত্র সন্ন্যাসী বাহিরে গেল। গোঁসাই যুবতীকে দেখিতে বসিল। জটাধারীর আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল—''কি! আজও জীবিত! এখনও তোর মাংস কুক্কুরে ভক্ষণ করে নাই? —আর বিলম্ব নাই।'' বক্ষ হইতে সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিষ্কাষিত করিয়া মারিতে হস্ত তুলিয়াছে—হঠাৎ বিকট শব্দে মূর্চ্ছাগত হইল। সোমনাথ ফিরিয়া আসিয়া, সবিস্ময়ে সন্ন্যাসীব দশা দেখিলেন।

''প্রভু! উঠুন, এ কি?'' উত্তর নাই। ''প্রভু! এ কি?'' মুখে জল দিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসী উঠিয়া বসিল, ''নাও! সোমনাথ, ছুরি অন্তরে ফেল! তোমার সহিত কি কিছু শক্রতা ছিল? —তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে কেন? ছুরি আপন বক্ষেই মারিব—তোমায় মমতাহীন হইতে বলিতেছিলাম, এখনও আমি মমতাহীন হই নাই! তুমি বালক, তোমার ক্ষমা আছে—আমাব ক্ষমা নাই। ছুরি দূরে নিক্ষেপ কর, নচেৎ এ জঘন্য মমতাপূর্ণ বক্ষ এখনি বিদীর্ণ করিব।''

"প্রভু! এ কি! শান্ত হন।"

"শান্ত হইতে বল? আমি অতি শান্ত, নচেৎ এখনও কেন পাপীয়সীকে বধ করি নাই, তোমায় বধ করি নাই, আমি আত্মহত্যা করি নাই- ? আমি শান্ত—অতি শান্ত!" বলিতে বলিতে উন্মাদের ন্যায় সন্ন্যাসী কুটীর হইতে নির্গত হইলেন। সোমনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বজ্রনাদে সন্ন্যাসী বলিল, 'যাও!' সোমনাথ স্তম্ভিত হইয়া ফিরিলেন। কুটিরে আসিয়া দেখেন, যুবতী চক্ষু খুলিয়াছে—দৃষ্টি শূন্য, ইতস্ততঃ চাহিতেছে! সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু খাবে?" যুবতী মধুস্বরে উত্তর করিল, "আপনি জানেন, আমি হিন্দু।"

"আমিও হিন্দু।"

"যুবতী বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় আমি?'

"এটী সন্ন্যাসীর কুটীর। আপনি জলমগ্না হন, স্মরণ হয়?"

"হাঁ, হাঁ, আমি যমপুরে গিয়াছিলাম, আমার পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমায় আবার কে আনিল?"

বলিতে বলিতে সুন্দরী অবসন্ন হইল, আবার নিদ্রা গেল। সোমনাথ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার অলৌকিক রূপ দেখিতে লাগিলেন। নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, নানা স্থানে নানা সুন্দরী দেখিয়াছেন, এরূপ মাধুরী কখনও দেখেন নাই। তাঁহার প্রভুভক্তি অতিশয় ছিল, কিন্তু প্রভুর দশা মনে হয় নাই, কেবল সেই যুবতীকে দেখিতেছেন। একজন আসিয়া বলিল, "প্রভু আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

সোমনাথের যাইতে ইচ্ছা নাই, গেলেন। দেখেন, সন্ন্যাসীর আর সে ভাব নাই। পূর্ব্বভাব হইয়াছে। সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস বইস —আমি আজই স্থানান্তরে যাইব, তোমার কার্য্যের পরিচয় দাও।"

সোমনাথ উত্তর করিলেন, "সমস্ত মুসলমান আমার বশীভূত, আমাকে প্যাগম্বর-প্রেরিত বোধ করে। ভবিষ্যৎবাণীতে তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। বারাকপুর, দমদমা ও হুগলীর সিপাহী সম্প্রদায় সকলেই আমার বশ। কলিকাতায় বীজ বপন করিয়াছি, কিরূপ অঙ্কুর হয়, কাল বলিতে পারিব।"

"তুমি বৎসরের কার্য্য এক সপ্তাহে সম্পন্ন কর। কিন্তু তোমা হইতে আরও প্রত্যাশা করি, মিরাটে কে আমায় চিনিবে?"

"ঊনবিংশতি সম্প্রদায়ের শম্ভু পাঁড়ে। নানাসাহেব মহাশয়কে গুরুর ন্যায় আদর করিবেন, কিন্তু এখন তাঁর মতের স্থিরতা নাই।"

"ভাল, সে কার্য্যে আমি অদ্যই যাইব। তোমার সহিত এক কথা, তুমি প্রাণপণে আমার কার্য্য করিবে সন্দেহ নাই,—কিন্তু ঐ পাপীয়সী!"

"পাপীয়সী কে?"

"যে পিশাচীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছ, যাহাকে কুটীরে স্থান দিয়াছ, যাহাকে অনিমেষ নেত্রে সমস্ত রাত্রি দেখিয়াছ; যাহাকে দেখিবার জন্য আমার তত্ত্ব লও নাই,

বুঝিলে পিশাচী কে? যদি উহার জীবনের নিমিত্ত তুমি এত ব্যাকুল, ঔষধ লও, সেবন মাত্র সবল হইবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, কালই কুটীর হইতে দূর করিবে।''

''সবল হইলেই স্বস্থানে যাইবে।''

''আর প্রতিজ্ঞা কর, কখনও উহার মুখাবলোকন করিবে না।''

সোমনাথ তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেন, এমন কখনও মনে স্থান দেন নাই। তিনি যদি স্থান দিয়া থাকেন, তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। করযোড়ে নিবেদন করিলেন, ''প্রভু, আমার প্রতি গুরুতর ভার অর্পিত, স্ত্রী-লোকের সহিত শিষ্টাচার করিবার সাবকাশ পাইব কখন্?''

''আমার নিকট বল, কখন যাইবে না?''

''না।''

''ঔষধ লও, আমি অদ্যই রওনা হইব।''

সোমনাথ একবার ভাবিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করেন যে, যুবতীর প্রতি সন্ন্যাসীর এত বিদ্বেষ কেন? কিন্তু সন্ন্যাসীর স্বভাব জানিতেন, প্রশ্নে তিনি বড়ই বিরক্ত। সুতরাং কৌতূহল দমন করিলেন। কুটীরে ফিরিয়া দেখেন, রমণী স্বর্ণলতার ন্যায় পড়িয়া আছে। অনিমেষ-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—''অভাগিনী কে? কি নিমিত্তই বা গুরু আমাকে সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিলেন?'' মনকে আঁখি ঠারিয়া বলিতে লাগিলেন, ''আমি সন্ন্যাসী, আমার স্ত্রীলোকের সহিত আলাপের প্রয়োজন কি?'' কিন্তু মন বুঝে না, পুনঃ পুনঃ চায়।

যুবতী আবার জাগিল; সোমনাথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; স্থির শান্ত নয়নে চাহিয়া রহিল—কৃষ্ণ লক্ষ্যহীন নেত্রে দেখিতে লাগিল, নয়ন মুদিয়া ভাবিতে লাগিল; আবার দেখিল---বলিল, 'আমি কোথায়?''

'তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি সন্ন্যাসী, কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ? তুমি অসুস্থ, ঔষধ খাও।''

''না--—না, আমায় বাড়ীতে লইয়া চল। আমি হেথায় থাকিতে পারিব না। দেখিতেছ না, চিতা জ্বলিতেছে—তুমি আমায় গৃহে লইয়া চল। আমি অতি দুঃখিনী, আমার কেহই নাই।''

সকরুণ স্বরে রমণী কথাটি বলিল, সোমনাথের অন্তরে বাজিল।

''কেন ভীত হইতেছ? তুমি জলমগ্ন হইয়াছিলে, তাপ দিবার নিমিত্ত অগ্নি জ্বালিয়াছি, কালি প্রাতে তোমায় রাখিয়া আসিব। ঔষধ খাবে না?''

''আমি কি পীড়িত! তুমি কে?''

''বলিয়াছি, সন্ন্যাসী।''

''দাও; ঔষধ খাইয়া মারা যাইব না ত?''

হঠাৎ সোমনাথের মনে সন্দেহ উদয় হইল! —সন্ন্যাসী রমণীবধ করিবার নিমিত্ত ছুরিকা তুলিয়াছে দেখিয়াছিলেন; অবশ্যই কোন ক্রোধের কারণ আছে—যদি বিষ হয়?

ঔষধ দিতে সাহস করিলেন না। ইহার আগে আর সন্ন্যাসীকে কখন অবিশ্বাস করেন নাই। রমণীর আশ্চর্য্য মহিমা!

"কই ঔষধ দিলে না?"

কথার উত্তর না দিয়া সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি কেহ আছে?"

"বলিয়াছি, সংসারে আমি একাকিনী,—আমি অভাগিনী!" বলিতে বলিতে বমণীব নয়ন হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। রোদনে সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইল, গণ্ডস্থলে গোলাপ ফুটিল; ওষ্ঠদ্বয় নবপল্লব-রাগে রঞ্জিত হইল; রমণী অতি কাতবস্বরে বলিল, "আমার কেহই নাই।" স্বর অতি সুন্দর, দুঃখে আরও মনোহব! —যুবা উদাসীনের হৃদয়ে তীক্ষ্ণতর বাজিল। ভাবিল, 'আহা! এ অসীম সংসারে এ সুন্দরী একাকিনী! কে এ? কই, পৈশাচিক লক্ষণ ত কিছুই নাই! এ দেবদুল্লর্ভ মাধুরী কি পিশাচেব সম্ভব? ঐ অশ্রুপূর্ণ নয়ন দুটী কি পৈশাচিক মায়ায় সৃজিত হইতে পারে?—বীণাবিনিন্দিত স্বরলহরী পিশাচিনী কোথায় পাইবে? না—পিশাচিনী নয়।" আবার সন্ন্যাসীব বাক্যে অবিশ্বাস জন্মিল। "তুমি রোদন করিও না, তুমি একাকিনী কেন? দেবতা তোমার সহায়, অনাথের প্রতি তাঁহার কৃপা অধিক; নিদ্রা যাও।"

"ঔষধ দিলে না? বুঝিয়াছি—বিষ দিতে আসিয়াছিলে —দাও।"

যুবার প্রাণে আবও বাজিল, "তুমি স্থির হও। এখন সুস্থ হইয়াছ, আব ঔষধের আবশ্যক নাই।"

রমণী আবার মুখপানে চাহিয়া দেখিল—"তুমি কে? আমার যত্ন করিতেছ কেন? আমি ত কাহার যত্নের পাত্রী নই।"

সোমনাথ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না,—বলিলেন, "তুমি নিদ্রা যাও।"

সোমনাথ কুটীরের বাহিরে আসিলেন।

চতুর্থ বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

Speed—Sir, we are undone: these are they,
That all the travellers fear so much.

রমানাথ এখন যুবা পুরুষ, রমানাথ এখন মানুষের মতন। রং ফরসা, ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা—উনুনের ঝিঁকের মত দুটী গালের হাড় উঁচু। সাম্‌নেটা একটু অর্দ্ধচন্দ্রের ভাব—বাউরী ছিল, নূতন ধরণে চুল ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। সব কাজেই মজবুদ—স্কুলে যাওয়া আসা আছে, পাঁচালীর দলে মন্দিরে দেওয়া আছে, রসিক পুরুষ—যাকে তাকে বেরসিক বলাও আছে; মাথায় ফেট্টা, কালাপেড়ে ধুতি, গরদের চায়না কোট, রঙ্গিন মোজা আর কার্পেটের জুতা। পাছে কেহ না দেখে, এই জন্য তিনি আপনি আজুতা কোট পর্য্যন্ত—মায় কোঁচার ফুলটি বার বার দেখিতেছেন। চার পাঁচ জন পাঁচালীর দোহার সঙ্গে; কেহ হাতের আংটী, কেহ পায়ের জুতা, কেহ গলার শিকলি, কেহ চায়নাকোটের বার বার বাহবা দিতেছেন। রমানাথ বলিলেন, "বুঝলে কি না—লয় দেয়, আমি মোদ্দা সে দিকে ভিড়ি নে।" কথাটা এই—গোলদীঘির রাস্তার ওপারে কে একটী স্ত্রী-লোক আসিয়া বাস করিতেছে; একটা বিবির কাছে পড়ে, তাহার বিশেষ লজ্জা সরম নাই; ছাদে ফুলের তোড়া লইয়া বসে, কখন বা বীণা বাজাইয়া গান করে—সেই স্ত্রীলোকটী রমানাথ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, বড় তাঁহার রূপের অনুরাগিনী, কেন না, তিনি দল সমেত যদি কখন গোলদীঘির ধারে দাঁড়ান—আজ যেমন দাঁড়াইয়াছেন, স্ত্রীলোকটী ছাদে থাকিলে ঘরে চলিয়া যায়। তাঁহার বিশেষ সংস্কার—জুড়ী, টেড়ী, আংটী, কার্পেটের জুতা—ইহাতে বশ হয় না, এমন স্ত্রীলোক নাই। তার উপর তাঁর মা বলেন, "তিনি খুব সুশ্রী"—বাড়ীর পুরুত বলেন, "যোগভ্রষ্ট" —আর তাঁর আর্‌সি বলেন, 'কামদেব!' ঘন ঘন উপর দৃষ্টি করিতেছেন। "ঐ ছাদে আসিতেছে—না—মেথর ঝাঁট দিতেছে; না না নীচে—না, সদর দোর আধখানি ভেজাইয়া হাঁসিতেছে, —আ মলো! ঐ উঁচু দেঁতো মালী বেটা! আরে, দেখ—দেখ—দেখ! ঐ না? সত্যই বটে, সেই স্ত্রীলোক, আ মলো! গাড়ীর সাম্‌নে বসে কে? আরে বাবাজী মজা লুঠ্‌ছে!" দ্বারে গাড়ী লাগিল, স্ত্রীলোকটি নামিয়া গেল—সন্ন্যাসীকে বলিল, "ভাল, যদি না আসেন, আপনার নাম কি বলুন, আমার জীবনদাতার নামটী জানি।"

সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আপনি ক্ষমা করিবেন, উদাসীনের নাম নাই।"

"গাড়ী হইতে নামিবেন না, আপনাকে পৌঁছিয়া আসিবে।"

"ক্ষমা করুন, অদূরে আমার কার্য্যস্থান, গাড়ীর প্রয়োজন নাই।"

উদাসীন আর ফিরিয়া দেখিলেন না; রমানাথ ডাকিতে লাগিলেন—"এই! এই! এই!" কেউ ছিল না, উত্তর দিল না। পারিষদ একজন বলিল,—রসের বাবাজি,

এ দিকে এস না।" তাহাতেও কেউ আসিল না। সুতরাং দলে বলে তাঁহারাই সন্ন্যাসীর নিকট গেলেন। একজন পারিষদ কাপড় ধরিল—বলিল, "বাবাজি, খুব রঙ্গে ছিলে।"

"কি নিমিত্তে আমায় ধর? ছাড়িয়া দাও।"

"বাবা, ইয়ার লোক, বল না—জান কি, মেয়েমানুষটা কে?"

"না, জানি না।"

"জান বই কি বাবা, একত্রে এলে।"

রমানাথ বলিলেন, "দেখ, একশ টাকা দিতে পারি, যদি ওর কাছে লইয়া যাও।"

সন্ন্যাসী ভ্রূকুটি করিয়া চাহিলেন। মুখের ভাবে রমানাথ সদলে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত।—কিন্তু গরীব সন্ন্যাসী কি করিবে? রমানাথের সাহস বাড়িল— "মার শালাকে।" এই কথা বলা আর চতুর্দ্দিকে "মার মার' ধ্বনি! চার পাঁচজন মুসলমান আসিয়া সদল রমানাথকে প্রহার আরম্ভ করিল; সন্ন্যাসী সরিয়া গেল। প্রহারান্তে রমানাথ পারিষদ সমেত ফিরিয়া আসিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ভাবিলেন, যত টাকা ব্যয় হউক, সন্ন্যাসী বেটাকে ধরিতে হইবে। স্বরূপ আছেন—স্বরূপ সন্ধান বলিয়া দিল—"ও পারে কতকগুলা সন্ন্যাসীর আড্ডা আছে।" পরদিন রমানাথের পারিষদ গিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, "হ্যা, হে! সেই বেটা আছে বটে।" অমনি আংটী চুরির দাবী দিয়া রমানাথ পুলিস লইয়া খাড়া হইলেন; কিন্তু পুলিস গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার কারণ এই যে, থানায় যখন নালিশ করেন, একজন মুসলমান জমাদার রিপোর্ট লিখে। সে আগে লোক পাঠাইয়া সন্ন্যাসীদিগকে সরাইয়া দিয়াছে।

কি করেন, সন্ন্যাসী ত ধরা পড়িল না, একটু ইয়ারকি দিয়া আসা যাক। ইয়ারকি দিতে সন্ধ্যা হইল! বাড়ী আসিতেছেন, নৌকা পার হইবেন, এমন সময় একজন রমানাথকে ধরিল, "কে রে শালা?" 'হুঁ', বলিয়া চোখে মুখে কাপড় বাঁধিল। এক খানি গাড়ী ছিল, তাহার ভিতর বসাইয়া দৌড়াইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"It was partly love, and partly fear.
And partly 'twas a beautiful art;
That I might rather feel than see.
The swelling of her heart."

ভারতবর্ষের নানা স্থানে আগুন লাগিতে লাগিল। গবর্ণমেন্টে খবর আসিলে গবর্ণমেন্টের হুকুম হইল, 'তত্ত্ব কর'। সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত হইল, কিন্তু কিছুই সন্ধান হইল না। অগ্নিকাণ্ড বাঙ্গালায়ও চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি। দস্যুদল কোন ক্রমেই ধরা পড়ে না। কোথায় থাকে, কখন্ আসে, কিরূপে সন্ধান করে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। খাজনার টাকা, কোম্পানীর মাল, দস্যুদল কিছুই বাছে না। কিন্তু সরকার

হইতে ডাকাত ধরিবার যত প্রকার যত্ন হইতে লাগিল, অন্তর্য্যামী দল সকলই জানিতে লাগিল। যে সাহসী পুলিসঅধ্যক্ষ তত্ত্ব লইতে যায়, তাহাকে আর কেহ দেখে না। আজ হেথা—সেথা ডাকাতি—সুবর্ণগ্রামের চতুষ্পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে ব্যাপিতে লাগিল। সকলে সতর্ক, কিন্তু সর্তক হইয়া কোন ফল নাই, ধনীর নিস্তার নাই। লোহার পিঞ্জরে লখিন্দরের ন্যায় বাস করিলেও দস্যুর হস্তে ত্রাণ পান না। যেন কোন দৈববলে তাহারা জানিতে পারে, আজ টাকা আসিয়াছে বা আজ টাকা যাইবে,—উৎপাত কিছুতেই থামে না।

এই সকল সংবাদ একজন বিবি, আমাদের পরিচিতা সুন্দরী যুবতীর নিকট পড়িতে ছিলেন। বিবি একজন ডফ সাহেবের লোক। ঐ সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সঞ্চার। আবার নূতন সংবাদ—নীলরতন বাবুর পুত্রকে হঠাৎ দস্যুদলে লইয়া গিয়াছে। পুত্রের হস্তের নীলরতন বাবু একখানি চিঠি পাইয়াছেন—“যদি আমাকে চান, তাহা হইলে ব্যাঙ্কে এ—র নামে (ইংরাজী প্রথম অক্ষর খ) পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিন।” তিন দিনেব মধ্যে জমা না দিলে, তাঁহার কোলে তাঁহাব পুত্রের কাটা মুণ্ড পড়িবে! নীলরতন বাবু টাকা জমা দিয়াছেন। এক ব্যক্তি আসিয়া টাকা লইয়া গিয়াছে। তাহার পাঁচ দিন পরে নীলরতন বাবুব পুত্র ফিরিয়া আসেন।

বিবি কাগজ রাখিয়া বলিলেন,“চন্দ্রা, এই নিমিত্তই বলি, তুমি একা যেথা সেথা যাইও না।”

“আমি ত জলে ডোবার পর আর যাই না।”

“ভাল, সে কথা শুনি নাই। তুমি কিরূপে জলমগ্ন হইলে? তোমাব দাই বলিয়া ছিল, কোম্পানীর বাগানে গিয়াছ।”

“আসিবার সময় পথে নৌকা ডুবি হয়।”

“কে তোমায় রক্ষা করিল?”

চন্দ্রার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, বলিলেন, “একজন সন্ন্যাসী।”

“তোমার সহিত মিস্ কে—ছিলেন না?”

“হাঁ, তিনি অন্য অন্য বিবিদের সহিত বাগানে রহিলেন।”

সন্ন্যাসীর কথায় আবার নানা কথা উঠিল। “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, প্রাণে প্রাণে আসিয়াছ, উহারা একদল ভয়ানক লোক! সম্প্রতি কতকগুলা সন্ন্যাসী গঙ্গার ও পারে বাস করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন কেল্লার কাছে গিয়া সিপাহীদিগকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, রাজদ্রোহী হইতে বলে, হাওলদার গিয়া দুর্গস্বামীকে সংবাদ দেয়। পুলিস তাহার তত্ত্ব করিতেছে।” চন্দ্রা কৌতূহলেব সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “সন্ন্যাসীকে দেখিতে কিরূপ?”

“বয়স অধিক নয়, লম্বা, বলবান্, খুব সুন্দর গান করিতে পারে।” চন্দ্রার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রা সোমনাথের কুটীরে শুইয়া তাহার মধুবকণ্ঠের গান শুনিয়াছিলেন। সোমনাথের অবয়বও বিবি-বিবৃত অবয়বের মত। চন্দ্রা শিহরিয়া উঠিল। বিবি জিজ্ঞাসা করিল, — ‘কি ও?’

'কিছু না, আমার ওরূপ হয়।' কিন্তু চন্দ্রা বড়ই বিমনা হইতে লাগিলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কি অসুখ হইয়াছে?'

''না—হাঁ, শিরঃপীড়া হইয়াছে?''

''তবে আমি যাই।''

বিবি চলিয়া গেল। চন্দ্রা ভাবিতে লাগিল, ''কি হবে? কিরূপে সংবাদ দিই? পুলিস যদি অনুসন্ধান করিয়া ধবে, তাহা হইলে এমন কি প্রাণনাশ হইতে পারে। ও পারে যাব?—না, সন্ন্যাসীরা ত সেথায় নাই।'' সন্ধ্যার ধূসব ছটায় রাগরঞ্জিত পশ্চিম গগন আবরণ করিয়াছে, পথে আলো জ্বলিতেছে। চন্দ্রা সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, দূরে সেই কণ্ঠ, সেই গগনভেদী গান; চন্দ্রা সত্বর বাটী হইতে বহির্গত হইলেন; স্বর অনুসরণে চলিলেন—দেখেন, কতকগুলি মুসলমানের মধ্যে বসিয়া তাঁহার জীবনদাতা যুবা গান করিতেছে। শীঘ্র গিয়া যুবার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, চুপি চুপি বলিলেন, ''শোন—আইস, বিশেষ কথা'', বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিক হইতে পাহারাওয়ালা, সার্জ্জন, জমাদার আসিয়া মুসলমান-মণ্ডলিকে পরিবেষ্টিত করিল। চন্দ্রার অঙ্গে একখানি মোটা চাদর আবরণ ছিল, অর্দ্ধ চাদরে সোমনাথকে ঢাকিলেন। চাদর খুব প্রশস্ত, সোমনাথের মাথা হইতে পাদ পর্য্যন্ত ঢাকা পড়িল। পুলিস আসিয়া, একে ধবে, ওকে ধরে, একজন সার্জ্জন চন্দ্রাকে ধরিতে যায়। চন্দ্রা বলিলেন,—''পিয়ারসন্, আমায জান না?''

পিয়ারসন্ বলিল, ''মাপ করুন, আপনার সঙ্গে কে?''

'আমার পিসী।'

পিয়ারসন্ কিছুই বলিল না। মনে মনে বলিল, "Damn tall aunt!"

যুবতীর অঙ্গে অঙ্গ মিলিত হইয়া সোমনাথ চলিতে লাগিলেন। তাঁহাব কলেবর শিহরিতে লাগিল। তাঁহার বাটী যাওয়া গুরুতর নিষেধ, কিন্তু আর উপায় কি? দুই জনে বাটীব মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাটী প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া চন্দ্রা আপনার শয়নঘরে গেলেন। দাসদাসীকে বলিলেন, ''আজ তোমাদের আর আবশ্যক নাই।''

শয্যাগৃহে গিয়া অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে রহিলেন। উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু সন্ন্যাসী চন্দ্রার মুখপানে চাহিতে সাহস করিতেছেন না। যখন প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ করে, রূপগুণ ত তাহার সহকারী—আলৌকিক রূপলাবণ্য, বেশভূষায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। কেশগুলি মুখ বাহিয়া, বুক বাহিয়া, পৃষ্ঠ বাহিয়া নিতম্ব আচ্ছাদন করিয়াছে; উজ্জ্বল আলোকে বর্ণের ছটা আরও বাড়িয়াছে, পুষ্ট বিম্বাধরের ভাবে বোধ হয়, বামা কি বলি বলি করিতেছেন, ভীতা হরিণীর ন্যায় যুবতী সন্ন্যাসীর মুখপানে একবার চান, একবার মুখ ফিরাইয়া লয়েন। সন্ন্যাসী হেঁট-বদনে বসিয়া আছেন। লজ্জাশীলা রমণীর ন্যায় হেঁট বদনে মনে মনে ভাবিতেছেন, স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিতেছে। ভাবনায় শরীর কণ্টকিত হইতেছে—ভাবেন একবার দেখি; দেখিব মনে হইলেই পাণ্ডুগণ্ড রঞ্জিত হয়, আর চাহিতে সাহস করেন না। কেহই কোন কথা কহেন না। চন্দ্রা উঠিলেন,—সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিলেন। সন্ন্যাসীর বর্ণ লাল হইল, আরও মাথা হেঁট করিলেন। হঠাৎ চন্দ্রা

জানু পাতিয়া বসিলেন, যোড়করে কাতর—নয়নে মুখ তুলিয়া সকরুণ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, —"সন্ন্যাসী, কেন প্রাণ দিবে? ইংরাজ-বিরোধী কি নিমিত্ত হইতেছ? আমায় কৃপা কর, আমায় রক্ষা কর, দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর, এপথে আর চলিও না। সন্ন্যাসি, মুখ তোল—কথা শোন। দেখ, আমার চক্ষে ধারা বহিতেছে—দেখ, আমি কাতর হইয়াছি। আমায় কাতর দেখিলে ত তুমি কথা কও! সন্ন্যাসি, কথা কও, যে পথে চলিতেছ, সে পথে আর চলিও না। আমায় হতভাগিণী শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলে, কেন আরও হতভাগিণী কর? আমায় রক্ষা কর, আমায় প্রাণদান দাও—সন্ন্যাসি, আমার জীবনদাতার প্রাণদান মাগিতেছি, নির্দ্দয় হইও না, অবলা অনাথিনীকে কৃপা কর।"

সন্ন্যাসী কিছুই বলিলেন না, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

"কথা কহিবে না? কি নিমিত্ত নীরব আছ? যদি কথা না কহিবে, যদি কথা না রাখিবে, যদি আপনার প্রাণের প্রতি মমতা না করিবে, যদি অবলার রোদনে দয়ার্দ্র না হইবে, তবে কেন আমায় জল হইতে উদ্ধার করিলে, কেন আমার জীবনদান দিলে? সন্ন্যাসি, ফের—জীবনের অন্যপথ অবলম্বন কর; তুমি পুরুষ, জীবন থাকিলে তোমার সকলি আছে—তোমার পক্ষে সংসার সুখশূন্য নয়।"

এবার সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "কেন আমায় যন্ত্রণা দাও, আমার জীবন সুখশূন্য।"

"না, কখন নয়,—একথা আমি প্রত্যয় করি না। তুমি এ পথ পরিত্যাগ করিবে, পরম সুখী হইবে, সংসারে গণ্যমান্য হইবে। ফের, সন্ন্যাসি, কথা রাখ।"

"ফিরিতে পারিব না।"

"কেন? তুমি কি ভাব, ইংরাজ তোমার যত্নে ভারত হইতে যাইবে? তুমি কি ভাব, স্বাধীনতার সময় আসিয়াছে? ইংরাজের ক্ষমতা অবগত নও। এখনও সে দিন উপস্থিত হয় নাই, এ কথা কি বুঝ না?"

"আমার বুঝিবার অধিকার নাই।"

"তবে এ আত্মহত্যার পথে কেন ফিরিতেছ?"

"শোন, অনুরোধ করিও না, আমি সত্যে বদ্ধ। ইহকালে অন্য আশা-ভরসা নাই। দেশ স্বাধীন করিতে পারি, ভাল; না হয় জানিব, দেশের কার্য্যে প্রাণ দিলাম। আমার প্রাণ যাওয়ায় কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।"

"ক্ষতিবৃদ্ধি নাই? তবে কি জন্য তোমার নিকট নারী হইয়া জানু পাতিয়াছি? কি নিমিত্ত যোড়করে অনুনয় করিতেছি? কি নিমিত্ত নয়ন-ধারা বহিতেছে? কি নিমিত্ত অন্তঃকরণ বক্ষে বার বার আঘাত করিতেছে? সন্ন্যাসি, বোধ হয়, তুমি আজীবন সন্ন্যাসী, নারীর হৃদয় জান না।"

"তুমিও সন্ন্যাসীর হৃদয় জান না। উঠ, তুমি কি জান, কি নিমিত্ত সন্ন্যাসী হয়? তুমি কি জান,—সংসার শূন্য দেখে, তার পর এ পথকে অবলম্বন করে? তুমি কি জান, মর্ম্মবেদনা মর্ম্মে লুকাইতে হয়? তুমি কি জান, জীবন্মৃত হইতে হয়? সন্ন্যাসীর অবস্থা জান না। অধিক অনুনয় করিলে এ স্থানে রহিব না।"

সন্ন্যাসী উন্মাদের ন্যায় বলিতে বলিতে দৃঢ়বচনে কথা সমাপ্ত করিলেন। চন্দ্রা উঠিলেন, আর অনুনয় করিলেন না, নীরবে বসিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীও নীরব। ক্ষণপরে সন্ন্যাসী বলিলেন, ''আমি এই বেলা যাই। বৃষ্টি পড়িতেছে, অনায়াসে যাইতে পারিব, কেহ ধরিবে না।''

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কোথায় যাইবে?''

''তাহার নির্ণয় নাই।'' সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইয়াছে। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে। সন্ন্যাসী চন্দ্রার বাটী হইতে বাহির হইলেন। দ্বারের নিকট কতকগুলি ঘোড়া রহিয়াছে, কিন্তু গাঢ় চিন্তায় মগ্ন থাকায় সোমনাথ তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিছু দূর গিয়া সোমনাথ চমকিয়া উঠিলেন—চন্দ্রার বাটীতে স্ত্রী-কণ্ঠসূচক আর্ত্তনাদ!—আবার!—আর রব নাই। সন্ন্যাসী চন্দ্রার বাটীর দিকে ফিরিলেন। বাটীতে প্রবেশ করিতে যান, দেখিতে পাইলেন, চার পাঁচ জন একটী স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিতেছে, আর চার পাঁচ জন তাহাদের সঙ্গে। সকলের কালা পোষাক, কালা মুখস্। সোমনাথ তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, ''ছাড়।'' বলিবামাত্র একটা অস্ত্র আসিয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। ত্বরিতবেগে সোমনাথ কটি হইতে তরবারি বাহির করিয়া কালোবেশধারীদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কোন মতেই বাহিরে আসিতে দেন না। বিপক্ষেরা স্ত্রীলোকটীকে ত্যাগ করিয়া, সকলে মিলিয়া বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর অসামান্য কৌশলে কেহই বাহিরে আসিতে পারিল না। সোমনাথ চীৎকার করিতেছেন, 'পাহারাওয়ালা'—পাহারাওয়ালা'! দূরে পাহারাওয়ালার আলো দেখা যাইতেছে, এমন সময়ে সোমনাথের বক্ষে একটী ভল্ল আসিয়া লাগিল। দূরে পাহারাওয়ালা দেখিয়া কালোবেশীগণ অশ্বারোহণে পূর্ব্বমুখে পলায়ন করিল। পুলিস দেখিল, অস্ত্র হাতে একজন সন্ন্যাসী পড়িয়া আছে। বাটীর ভিতর দেখে, একজন স্ত্রীলোক মূর্চ্ছাপন্ন। কিছুই বুঝিতে পারিল না, সন্ন্যাসীকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল। চন্দ্রা সংজ্ঞা পাইয়া বলিলেন, ''চোর আমায় ধরিয়াছিল।''

''চোর কোথায়?''

''তাহাদের তাড়নায় অচেতন হইয়াছিলাম, জানি না।''

''দ্বারে একজন সন্ন্যাসী পড়িয়াছিল, সে কে?''

''কোথা?''

''দ্বারে পড়িয়াছিল, হাঁসপাতালে পাঠাইযাছি।''

চন্দ্রার মাথায় বাজ পড়িল। ভাবিলেন, বুঝি, তাঁহার চীৎকারে সোমনাথ ফিরিয়াছেন, এবং আহত হইয়া পুলিসের হস্তে পড়িয়াছেন। পুলিস প্রথম অনুমান করিয়াছিল, আহত বুঝি দ্বারপাল। শুনিল, তা নয়, অমনি মকদ্দমা সাজাইল। ক'জন চৌকীদার চোরের হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া একজনকে আহত করিয়াছে, আর সকলে ভয়ে পলাইয়াছে। কলিকাতার মাঝে, এরূপ চুরি, তদন্ত করা চাই, জনকতক সন্ন্যাসী ধরিলেই তদন্ত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

His heart was broken, crazed his brain,
At once his eye grew wild,—
He struggled fiercely with his chain,
Whispered, wept and smiled.

পুলিস আসাতে কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ ঘোড়-সওয়ারেরা পূর্ব্বমুখে ছুটিল। সহরের বার—নোনা, ভাট, ঘেটুর অরণ্য। চারিদিকে বাব্‌লার বেড়া; একটী ছোট বাগানের মত। সেইখানেই নামিয়া ঘোড়া বাঁধিল। 'কই, কই' একজন আসিয়া বলিল। ইনি আমাদের রমানাথ। এই ডাকাতের দলই রমানাথকে ধরিয়া লইয়া যায়। ডাকাতের দলে এক সপ্তাহ বাস করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া খালাস হন। রমানাথের বোধ হইয়াছিল, ডাকাতেরা সর্ব্বশক্তিমান্—যা মনে করে, তাই করে। তাহার হৃদয়ে চন্দ্রার মূর্ত্তি গাঢ় অঙ্কিত হইয়াছিল। যে দিন খালাস হয়, সে দিন একটা মাতব্বর বদমায়েস ধরিয়া বলে, "তুমি আমার একটু কাজ করিতে পারিবে?"

"পারিব, কি করিতে হইবে?"

"আমায় যেরূপ বপ্তানী করিয়াছিলে, ঐরূপ একটী স্ত্রীলোককে রপ্তানী করিতে হইবে।"

"প্রাপ্য কি?"

"আমি দশহাজার টাকা দিব। ভাল, তোমাদের দেখা কোথায় পাব?"

"বাগবাজারের খালের ধারে কেহ যদি তোমায় 'রামচাঁদ' বলে, তুমি 'বামচাঁদ' বলিবে।"

রমানাথের অভিসন্ধি এই যে, তিনি তরবারি হাতে করিয়া ডাকাত তাড়াইবেন; পূর্ব্বসঙ্কেত মত তাহারা পলাইয়া যাইবে, তাঁর টাকা খায়, মারিবে না। বীরত্ব দেখিয়া স্ত্রীলোক তাঁহার অনুরাগিনী হইবে। তাঁর সব ঠিক, আলতা গুলিয়া রাখিয়াছেন, একখানি তলোয়ার রাখিয়াছেন, কিন্তু গরঠিকের মধ্যে আমরা দেখিলাম, চন্দ্রাকে আনিতে পারিলেন না।

"এ্যাঁ! সর্ব্বনাশ! কি হইল, আনিতে পার নাই?"

"তুমি ত বল নাই, সে বাড়ীতে পুরুষ আছে, তা হ'লে বন্দুক লইয়া যাইতাম।"

"আমায় ধরিবার বেলা যেন চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেলে, আর একটা উড়ে মালীকে মারিতে বন্দুক চাই?"

"দেখ, আমাদের অপরাধ নাই! সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রের দাগ দেখ, উড়ে মালী কখন নয়, সে পুরুষ এক জনে দশজন।"

"সে পুরুষ কোথায় ছিল?"

"প্রথমে তারই ঘরে ছিল, তার পর বাহিরে আসিল। ভাবিলাম, চলিয়া যাইবে, তা নয়, ফিরিয়া আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিল।"

"কে সে?"

"কেমন করিয়া জানিব? একটা সন্ন্যাসী।"

রমানাথ ভাবিল, কত জন্মজন্মান্তর পুণ্য করিলে একটা সন্ন্যাসী হওয়া যায়। "দেখ্ছি, গেরুয়া কালাপেড়ের ঠাকুরদাদা! তবে কি হবে?"

"তোমার দোষ, আমরা কি করিব। টাকা দিতে হবে। আমরা অহেতু পরিশ্রম করি না।"

"রমানাথ ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, ইহাদের সহিত ঝগড়া করা মুস্কিল। টাকা দিতে হইল, কিন্তু একটা অভিসন্ধি লাগিল, "অদৃষ্টে যা থাকে, গেরুয়া প'রে রাত্রে তার বাড়ী ঢুঁকিব।"

বাটী আসিয়া রমানাথ গেরুয়ার হুকুম দিলেন—রমানাথের বড় বৈরাগ্য। বৈকাল বেলা গেরুয়া পরিয়া বাহির হইলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, চন্দ্রার দ্বারে ধাক্কা দিলেন—বাঃ! কেউ নাই, মালী বেটা পর্য্যন্ত নাই।" উপরেও আলো জ্বালে নাই। উপরে উঠিলেন; বাটীতে জনমানব নাই, দুইটা ঘরে তালা বন্ধ, "কোথায় বাহিরে গিয়াছে—আসিবে, লুকাইয়া থাকি! স্ত্রীলোককে সাহস করিয়া ধরিতে পারিলেই হয়, ইয়ারের শিরোমণি বিধুবাবু শিখাইয়া দিয়াছে; এইখানেই থাকি।" একটা ঘরে লুকাইয়া বসিলেন।

দুই জন চৌকীদার আসিয়া চন্দ্রার বাটীতে প্রবেশ করিল। একজন বলিল, "এ বহুত আচ্ছা! রাস্তামে রোঁদ কোন্ দে? বৈঠ্কে পাহারা দেও। তোম পিছাড়ি বাগিচামে যাও, হাম দেউড়ীমে রহে।" রাত দুই প্রহর হইল, রমানাথ একা বসিয়া মশা তাড়ান—"কোথা গেল? কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছে।" একটা বাজিল, দুইটা বাজিল।

"না, আজ আর আসিল না, আর বসিয়া কি করিব, যাই। বেটী যেমন, সোণার ফুলদানটা লইয়া যাই।" ফুলদান লইয়া নীচে নামিতেছেন, এমন সময় একজন পাহারাওয়ালা ধরিল, 'ছুছুরা!' বলা বাহুল্য—গুঁতা আদি চলিল, থানায় যাইতে হইল। পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির। উকীল কৌন্সলী প্রভৃতি তাঁহার পক্ষ হইয়া অনেক লড়িল, কিন্তু তিনি সে বাড়ীতে কেন গিয়াছিলেন বা ফুলদান হাতে কি নিমিত্ত ছিল, তাহার কোন কারণ দর্শাইতে পারিল না। তিন মাস মিয়াদ হইল। অনেক রকম ফন্দী করিয়া, খাটা মকুফ্ হইল। জেলের হাঁসপাতালে রোগী হইয়া রহিলেন।

তিনি আর রোগী নন, হাঁসপাতালের এ ধার ও ধার বেড়ান। একদিন দেখেন—চন্দ্রা! দেখিয়া জেলের কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু কিছু পরেই সহস্র বৃশ্চিকদংশন করিতে লাগিল। চন্দ্রা যাইয়া একজন রোগীর খাটে বসিল, রোগী—আবাগের বেটা সন্ন্যাসী! চন্দ্রা সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

"ভাল, তুমি কি জন্য নিত্য দেখিতে আইস? ইহাতে তোমার নিন্দা হইতে পারে জান?"

"অনেক নিন্দা আছে, একটায় বেশী বাড়িবে না।"

"আমায় লোকে নিন্দা করিবে।"

"তুমি সন্ন্যাসী, সংসারে লোকের নিন্দায় ভয় কি?"

"না—না, তুমি জান না। আমি তোমার সহিত দেখা করিব না প্রতিশ্রুতি আছি, কিন্তু বারম্বাব তোমাব সহিত সাক্ষাৎ হয়।"

"সাক্ষাৎ হয়, তোমার দোষে নয়। কিন্তু কার কাছে প্রতিশ্রুত আছ?"

"বলিবার কথা নয়, তুমি কেন আইস।"

"সংসারী হইলে বুঝিতে, উপকারীকে লোক দেখিতে আইসে। আমার নিমিত্ত তোমার এই দশা, আরো কি হয় জানি না।"

"তুমি তার কি উপায় করিবে?"

"শোন, উপায় আছে; তুমি পাগলের ভাণ কর।"

"ডাক্তারে ধরিবে।"

"না, উপায় আছে, ধরিবে না।"

"সে কিরূপ?"

"আমার অর্থ আছে।" চন্দ্রা আবাব বলিলেন, "কিছু বল না যে?"

"কি বলিব—তোমার অর্থ লইব কেন?"

"তোমায় লইতে হইবে না, কেবল পাগলের ভাণ করিবে।"

'না, তুমি যাও।"

কিন্তু চন্দ্রা গেলেন না, বসিয়া রহিলেন। রমানাথ এ দিক্ ও দিক্ উঁকি মারিতেছে! চন্দ্রা মকদ্দমার সময় দেখিয়াছিলেন, চিনিতে পারিলেন। চন্দ্রা চাহিলেন, দেখিয়া রমানাথ কাছে আসল। বলিল, "জান, তুমি আমায় পুলিসে দিয়াছ? তোমার বাড়িতে চোর বলিয়া ধরা পড়ি?" মুখের ভাব দেখিয়া চন্দ্রা উত্তর দিলেন না। নিস্তব্ধ দেখিয়া চোর বলিল, "আর পনর দিন আমার মেয়াদের বাকি আছে। তাব পর তোমার বাড়ী যাব; কি বল?"

এইবার রোগী মাথা তুলিয়া দেখিলেন। চন্দ্রাও তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর করিলেন, "যদি বিরক্ত কব, তোমার মেয়াদ বাড়িবে।"

ভয়ে রমানাথ সরিয়া গেল। সোমনাথ রমানাথকে জানিতেন। রমানাথ ধনী, চুরি করিতে কখনও যায় নাই। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এ স্ত্রীলোকটা ভ্রষ্টা।" সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল। অশেষ দোষে দোষী আপনার মুখেই স্বীকার করিয়াছে; কি আব দোষ—ভ্রষ্টা। সন্ন্যাসী যথার্থই বলিয়াছেন, যথার্থই এ পিশাচিনী।" এই সকল চিন্তায় সোমনাথের বড়ই যন্ত্রণা হইতে লাগিল। রূঢ় স্ববে বলিলেন, "এ স্থান হইতে যাও, তোমার সহিত কোন কার্য্যই নাই। অপবিত্রের সহবাসে পূর্ব্বধর্ম্ম বিনাশ পায়।"

চন্দ্রার কলেবব কাঁপিতে লাগিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া চিকিৎসালযেব বাহিরে আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"Ghost-like I paced round the haunts of my childhood—
Earth seemed a desert I was bound to traverse,
Seeking to find the old familiar faces."

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! তোমায় কোথায় দেখেছি না হে?" সুবর্ণগ্রামেব মাঠেব মাঝখানে একটা গাছতলায় মজ্‌লিস করিয়া আমাদের গুরুঠাকুর একজন দীর্ঘাকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। দীর্ঘাকার উত্তব করিলেন,—"দেখে থাক্‌বেন।"

"কোথা বল দেখি হ্যাঁ? গোবিন্দ! গোবিন্দ!"

"সে জায়গা বড় ভাল নয়।"

"হাঁ———হাঁ, দেখ, আমার ঠেঁয়ে কিছু নাই। রমেশ ঘোষালের বাড়ী কিছু পাই নাই। তার স্ত্রীটে ছেলে হাবিয়ে যাওয়া অবধি পাগল হইয়াছে। আর নীলবতনেব গঙ্গালাভ হইয়াছে, রমানাথটা কিছু দিলে না; আব বড় কিছু নেইও। ধর না, রমানাথকে সন্ন্যাসী নিতে এল, নীলরতন লাখ টাকা সন্ন্যাসীকে দেয়। সেই এক লাখ গেল, সন্ন্যাসী মজা মেরে গেল। গুরু-পুরুতের সে অদৃষ্ট নয়। কোথায় কে ধ'রে নিয়ে গিযেছিল, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েত খালাস। বেবাক টাকা লোঠোমো করিযাই ওড়ালে, তার আর দেবে কি? বাপু, তুমি পথ দেখ, আমার ঠেঁয়ে বড় কিছুই নাই।"

"মহাশয় ভয় পাচ্ছেন কেন?"

"বাপু, তোমার একটু রীত খারাপ, তাতেই শঙ্কা হইতেছে।"

"আপনার ঠেঁয়ে কত আছে?"

"ঐতো!"

"ঐ কি?"

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! পুঁটুলি খুলে দেখ্‌বে ত দেখ?"

"উটি কে?"

"উটি আমার পুত্র।"

"হাতে রামপদক দেখিতেছি।"

"হাঁ, ভূতের ভয় পায়।"

"এই কি সেই রামপদকখানি।"

"কোন্ খানি?"

"যাহা লইয়া ফেরে পড়িয়াছিলেন?"

"হাঁ—হাঁ, ঘোষালের ছেলেরও ঐরূপ ছিল।"

"ঘোষাল মহাশয় এখন কোথা?"

"পশ্চিমে।"

''পশ্চিমে কোথা মহাশয় ?''

''হাওয়া বদ্‌লে বেড়াবে, এই ত শুনেছি এখন কোথায় বল্‌তে পারিনি ঠিক।''

''কত দিনে জানিতে পাবিবেন ?''

''দু' পাঁচ দিনে।''

এগুলি, গুরুর ছল। গুরু ভাবিলেন, এ চোর, ঘোষালু বড়মানুষ, তার তত্ত্ব লইতেছে; তাই মিথ্যা সংবাদ দিলেন। কিন্তু সত্য সত্যই রমেশ ঘোষাল স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিমে গিয়াছেন। রামচাঁদও ছল বুঝিল। গুরুকে বলিল, ''মিথ্যা বলিবেন না।''

''বাপু, মিথ্যা কথায় কাজ কি ? গোবিন্দ! গোবিন্দ!''

''মহাশয়ের নিবাস ?''

''শান্তিপুর।''

এবারেও গুরুঠাকুর সতর্ক হইতেছেন। নিবাস পাবনা, রামচাঁদ তাহা জানিত। বলিল, ''মহাশয়, আপনার সহিত আর একটা কথা আছে।''

''তা বল না, এইখানেই বল না বাপু! তোমার সঙ্গে আর যাওয়ার দরকার নেই, আমি এই খান্ডাতেই বসি।'

'আজ্ঞে বসুন' বলিয়া রামচাঁদ চলিয়া গেল।

রামচাঁদ ভাবিতে ভাবিতে চলিল, ''কি আশ্চর্য্য! ছেলেটীকে যখন কুড়াইয়া পাই, ঠিক এইরূপ পদক তাহার গলায়ও ছিল! ছেলেটী গ্রহণের রাত্রে হারায়, আমিও গ্রহণের রাত্রে কুড়াইয়া পাই—হারাণ বা ঘোষালের পুত্র ? হয় হ'ক, এখনও হারাণের কোন তত্ত্ব নাই,——হয়ত জীবিতও নাই; আর সে শান্ত অভাগিনীকে কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই, এতদিন কি আছে ? এই ভাবিতে ভাবিতে রামচাঁদ চলিয়া গেল।

গুরুঠাকুর রামচাঁদকে জেলে দেখিয়াছিলেন। নীলরতন বাবুর বাড়ীতেও দেখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল,——এই রামচাঁদ নয় ? ——সেই যে নীলরতন বাবুর বাটীতে আসিত যাইত ?'' তাঁহার পুরাতন ভৃত্য বলিল, ''আজ্ঞে হাঁ।''

''শান্ত ওর স্ত্রী না ?''

''আজ্ঞে তা বলিতে পারি না।''

''হুঁ হুঁ স্মরণ হচ্ছে। শান্তরও স্বামী জেলে গিয়েছিল। হুঁ হুঁ গোবিন্দ! নীলরতন বাবু বলেছিলেন বটে।''

গুরুঠাকুরের মজলিসে একটী লোক বসিয়াছিল, সেও আমাদের পরিচিত। যে দিন চন্দ্রা জলমগ্না হয়, সোমনাথের সহিত তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি। সন্ন্যাসী বিশেষ যত্নের সহিত কথাগুলি শুনিল, কথা সমাপ্তি হইলে উঠিল। ''বাপু, চল্লে ? গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমরা নাগা ভিখারী মানুষ, আমাদের কাছে আবার ভিক্ষা!'' সন্ন্যাসী কিছুদূর যাইয়া এক ডাকঘর পাইল। তথায় একখানি পত্র লিখিল। পত্রের শিরোনামায় লেখা——''নূতন আশ্রম, দেনা মোকাম বিঠুর।''

পঞ্চম বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

Much love he had in men, and states, and things.
And kept his memory mapped in prim preision.
With histories, laws and pedigrees of Kings.
And moral saws which ran through each division.
Are neatly colored with appropriate hue—
The histories black, the morals heavenly blue!"

একদিন দুইজন গুলিখোর একটী মোটা ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া বড়ই চটিয়াছিল; বলে—"কান্তিপুষ্টির মুখে আগুন, পাখী হয়ে উড়ে যাই, বাবা!" পাঠকও আমাদের সহিত উড়ুন। বিঠুরে চলুন। প্রশস্ত অট্টালিকা। অস্ত্রধারী প্রহরী ফিরিতেছে। ভিতরে মহা সমারোহ। বিবির নাচ। জুড়ি ফিটন হড হড আসিতেছে। বিবিরা প্যাঁক প্যাঁক স্বরে কথা কহিতেছে। দম্ দম্ বুটের আওয়াজ। উপরে লম্বা চৌড়া দৌড়দার ঘর, সারি সারি ঝাড় জ্বলিতেছে। অর্দ্ধাবিরিত-পয়োধরা মেম সাহেবেরা নৃত্য করিতেছে। হিপ্-হিপ্-হুরে, —বিলাতি কাণ্ডই এক চমৎকার! নানা সাহেবের বাড়ী, Bath and supper—নানা সাহেব ফোঁটা-কাটা স্থূলকলেবর নাড়িয়া নাড়িয়া অভ্যর্থনা করিতেছেন। একজন দ্বারবান পত্র দিল। পত্রে, লেখা, "পরমানন্দ গোঁসাই।" নানা সাহেব চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাই কোথা?"

"নীল বৈঠকখানায় বসাইয়াছি।"

"একটু অপেক্ষা করিতে বল।"

পট্ পট্ শ্যাম্পেন চলিল। গান যেন নৃসিংহ অবতারে সিংহনাদ, গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়! সভ্যগণও 'হাউ হাউ হাউ 'গানের পর কেহ নানা সাহেবকে বলিলেন, "তুমি পরম দোস্ত।" কেহ বলিলেন, "তাঁহার অন্তরের লোক।"কেহ বলিলেন, 'লম্বা জীবন' (long life)! আর প্রকাশ্যে কত রকম বলিলেন, কিন্তু মনে মনে একটী কথা, 'Damn the niggar!' একজন সাহেব, তিনি কমিশনার, বলিলেন, "নানা, তুমি ভাল আত্মা আছ।" ইনি কানপুরের মুরল্যাণ্ড সাহেব। নানা বলিলেন, "খোদাবন্দ, কাল আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

'না———না, কাল হইতে পারে না।' সাহেব মনে মনে বলিলেন, "বেটা শ্যাম্পেন খাওয়াও, বাড়ী যাইবে কি?"

নানা সাহেব জেদ করিতে লাগিলেন। সাহেব বলিলেন, "আর এক দিন—আর এক দিন। আমি লিখিয়া পাঠাইব।"

সাহেব বিবির ভিড় মিটিল। এখন আর নানা সাহেবের সাথী কেহ নাই, কেবল চোখের কোলে ব্যভিচার-চিহ্নাঙ্কিত খোসপোষাকী একজন দীর্ঘাকার মুসলমান। মুসলমানের নাম আজিমউল্লা। নানা সাহেব বলিলেন, "পরমানন্দ গোঁসাই আসিয়াছেন, চলুন দেখা করি।" "চলুন।" উভয়ে নীল বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, জটাধারী দীর্ঘাকার এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। নানা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কি আজ্ঞা?"

"আমার অভিপ্রায়, আমার চেলা সোমনাথ জ্ঞাত করিয়াছে।" আজিম বলিল, "আপনার মুখে শুনি, কি?"

"ইংরাজকে রাজচ্যুত করা আমার অভিপ্রায়।"

আজিম হাসিয়া বলিল, "আপনি ফকির, সংসারী নন। ইংরাজের পরাক্রম আপনি জানেন না।"

"না জানিলে আপনাদের সাহায্য চাই কেন?"

আজিম উত্তর করিল, "সে কি মহাশয়, আমরা কি সাহায্য করিব?"

"অধিক কিছু না!" নানা সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাজা হইতে পারিবেন না?"

"আশ্চর্য্য কথা! আমি রাজা কিরূপে হইব?"

"উপায় শুনুন। হিন্দু সৈন্যের কর্ত্তা হইতে সাহস হয়?"

"সৈন্য কোথায়?"

"ইংরাজ—দুর্গে।"

"তাহারা সহায়তা করিবে কেন?"

"করিবে। যদি না করে, লক্ষ্ণৌয়ের রাজসৈন্য এখন অন্নাভাবে ঘুরিতেছে। ইংরাজের অযোধ্যায় নূতন বন্দোবস্ত, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আপনাদিগকে সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছে। নূতন খাজনার বন্দোবস্তে তথায় যে সকল কুবেরের ন্যায় ধনাধিকারী জমীদার দরিদ্র হইয়াছে, তাহারা সদলে অস্ত্রধারণ করিবে। আমরা প্রস্তুত থাকিলে পারস্য-সম্রাট্ সেনা প্রেরণ করিবেন। তাঁহার দূত দিল্লীর ঘরে ঘরে ফিরিতেছেন। সেতারা, ঝাঁসী, কেরোলী, প্রভৃতি যে সকল রাজ্যে ইংরাজেরা সন্ধিভঙ্গ করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন,—তথায় সৈন্যের অভাব নাই,——কেবল সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। কেবল একজন সুশিক্ষিত সর্দ্দারের আবশ্যক, আপনাকে সেই সর্দ্দার হইতে বলি। আপনি কি লক্ষণ দেখিতেছেন না? চতুর্দ্দিকে গ্রাম জ্বলিতেছে, কাহারা জ্বালায়? চারিদিকে ডাকাতি হইতেছে,—কাহারা করে? এসময়ে যদি নিরস্ত থাকেন,—বুঝিব, বাজীরাও পাশা বিজ্ঞ হইয়াও একটা বানরকে তাহার ধন—সম্পত্তি দিয়াছেন। বুঝিব,—মহারাষ্ট্র-শোণিত এক বিন্দুও আপনার শরীরে নাই।"

নানা সাহেব উত্তর করিলেন, "ভাল, বানর হই, মহারাষ্ট্র-শোণিত না থাকুক, এ সকল সংবাদ আপনি কিরূপে জানিলেন? সৈন্যই যেন হইল, অর্থ কোথায় পাইব? আর ঝাঁসী প্রভৃতি লোকেরা কেনই বা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে?"

সন্ন্যাসী বলিল, "এ সকলেব উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। হিন্দুর পোষ্যপুত্র লওযা সম্পূর্ণ অধিকার। নাগপুরে রঘুজী ভোঁসলে মবিল—ইংবাজ দুঃখিত, কামান-ধ্বনি করিলেন, পোষাপুত্র লইতে দিলেন না, আপনারা পোষ্যপুত্র হইয়া দাঁড়ালেন। সেতাবা রাজা শিবাজীব বংশ, সন্ধিতে ইংরাজ বলিযাছিলেন যে, সেতারাব বাজবংশ চিবদিন থাকিবে, কিন্তু আপ্পা সাহেবের মৃত্যুর পব, সেতাবা ইংবাজ-বাজ্যগত হইল। পোষ্যপুত্র গ্রহণে শাস্ত্রমত বিধবাব অধিকাব আছে, কিন্তু চোরা—ধর্ম্মেব কাহিনী শুনিল না। পবে ঝাঁসীর রাজ্য সর্ব্বগ্রাসী ইংরাজ কাড়িয়া লইল,——স্মবণ কবিলে বক্ষ বিদীর্ণ হয; বাণী যোড়করে কত অনুনয় বিনয কবিলেন, কিন্তু না, ইংবাজ বুঝিলেন, তাঁহাদেব হস্তার্পণ ব্যতীত রাজ্য চলিবে না। অযোধ্যার কি দোষে ওয়াজীদআলীব রাজ্য গেল। কেনই বা ইংবাজ আসিয়া হস্তক্ষেপ কবিল? সন্ধিতে কি একপ কথা ছিল? না, তা নয়; দয়াময় ইংরাজ প্রজার দুঃখ দেখিতে পাবেন না, তাই ওয়াজীর আলীকে বাজ্যচ্যুত করিলেন, শত শত ধনাঢ্য জমীদাবকে ভিখাবী করিলেন—প্রজা বিশৃঙ্খল, দৈন্যদশা শতগুণে বৃদ্ধি।"

আজিম জিজ্ঞাসা কবিল, "আপনি কে?"

"দেখিতেছেন—সন্ন্যাসী।"

আজিম বলিল, "কিন্তু বাজনৈতিক কার্য্য ত সন্ন্যাসীব নয।"

"যে, যে কার্য্য কবে, তাবই সেই কাজ।"

নানা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কার্য্যে আমি সহায়তা করিব, কিরূপে জানিলেন?"

"আপনার প্রাণে দিবাবাত্রি অগ্নি জ্বলিতেছে, আমি জানি। বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা বিনা কারণে ইংরাজ অপহরণ করিয়াছে। পূর্ব্বে জানিতাম, বুঝি হেথায় নীচ লোক আইসে, হেথায়ই বিচার হয় না। আজিমউল্লা, পূর্ব্বকথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিই—নানা সাহেবের স্বপক্ষে আবেদনে বিলাতে কি উত্তর পাইয়াছেন? ন্যায়বান্ ইংরাজ বলেন, "বাজীরাও অনেক ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মাসহারা দিতে স্বীকৃত ছিলাম বটে, কিন্তু বাজীরাওয়েব উত্তরাধিকারীর তাহা আবশ্যক নাই।" কথা এই—"আমাদের বল আছে, ন্যায়তর্ক কি নিমিত্ত কব?" নানা সাহেব আমি আপনার মনেব কথা জানি, কি নিমিত্ত নাচ ও খানার আড়ম্বর, তাও জানি; লাট সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন, কোন কৌশলে তাহাব প্রাণবধ করিবেন।"

নানা সাহেব চমকিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল, "অতি হীনের ন্যায় কল্পনা! কালই অপর এক লাট আসিবে, যেরূপ ইংরাজ-রাজ্য চলিতেছে—চলিবে, লাভের মধ্যে আপনি প্রাণ খোয়াইবেন। যদি পরাজয় ভাবিতেছেন, যুদ্ধে বীবপুরুষের ন্যায প্রাণ-ত্যাগ করুন, কাপুরুষেব ন্যায বিষপ্রযোগে ফল কি?"

নানা সাহেব বলিলেন, "ভাল, আপনি এ সকল অবস্থা কিরূপে অবগত?"

"আজ পঁচিশ বৎসর এই তত্ত্বে ফিরিতেছি। সন্ন্যাস ব্রত পরিত্যাগ করিয়া এই নিমিত্তই গৃহী হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত আবার সন্ন্যাসী হইয়াছি—এ কার্য্যে প্রাণ দিতে হয় দিব। কি কি কার্য্য করিয়াছি, শুনুন। দেশে দেশে চেলা কবিয়াছি, নানা উপায়ে অর্থসঞ্চয় করিয়াছি। অষ্ট প্রহর এই কার্য্যে ফিবিতেছি।"

নানা বলিলেন, "কত অর্থ সঞ্চয় কবিয়াছেন ?"

"পঁচিশ লক্ষ টাকা।"

"কিরূপে ?"

"নানা উপায়ে। কোথাও চিকিৎসা করিযাছি, কাহাকে সন্তান হইবার ঔষধ দিয়াছি, কোথাও কাড়িয়া লইয়াছি।"

"ইহাতে কত অর্থ উপায় হইতে পারে ?"

"একটা দৃষ্টান্ত দিই।—কলিকাতায় নীলরতন নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। অতুল সম্পত্তি, পুত্র নাই। আমি ঔষধ দিলাম। নিয়ম করিলাম, পুত্র হইলে একটী পুত্র আমি লইব। আমি গৃহী লোকের সন্তানেব মমতা জানিতাম, কেহ পুত্র দিতে পারে না। যখন পুত্র নাই—বলে একটী দিব, কিন্তু পুত্রের মুখ দেখিলে আর তাহা পাবে না। পুত্রের রক্ষাব জন্য নীলবতন আমায় লক্ষ টাকা দেন। বহরমপুরের শেঠেব বাটী দুই লক্ষ টাকা পাই।"

"চেলা কোথায় পাইলেন ?"

"ইংবাজ-রাজ্যে দীন-দরিদ্রের অভাব নাই। অনাথ বালক লইয়া পুষিয়াছি, এক্ষণে তাহারা কর্ম্ম্যাধ্যক্ষ বীবপুরুষ।"

"সিপাহীদের কিরূপে বশ করিলেন ?"

"সে সুবিধা ইংরাজ করিয়া দিয়াছে। চর্ব্বিযুক্ত টোটা দেখিয়া সকলের মনে ধর্ম্মনাশের ভয় উপস্থিত। আমার চেলারাও তাহাদের মনে ধর্ম্মভয় উপস্থিত। করিয়া দিয়াছে।"

"পারস্য রাজদূতের কথা কি ?"

"দৈবজ্ঞ, ফকির, ভিখারী হইয়া তাহাদের চর ফিবিতেছে। দেশে দেশে বলিতেছে, শত বৎসরের পর ইংরাজের রাজ্য যাইবে।"

"আপনি কিরূপে জানিলেন ?"

"সকলকে বলিতেছে, আমাকেও বলিয়াছে।"

নানা সাহেব বলিলেন, "বোধ করুন, আমি সম্মত ; তার পর ?"

"কানপুর, কালপি ও দিল্লী এক একবার যান, সকল স্থানে আপনার দূত বলিয়া আমি পরিচয় দিয়াছি, আপনি যাইলে সকলে উৎসাহ পাইবে। পরে যেরূপ করিতে হয়, বলিব।"

"ভাল।"

সন্ন্যাসী উঠিলেন।

সন্ন্যাসী যাইলে পর নানা সাহেব বলিলেন, "আজিম, মনোরথ কি সিদ্ধ হইবে ?"

''দেখা যাক।''

''সন্ন্যাসীকে চেন?''

''ঠিক বলিতে পারি না। বাঙ্কাবাঈযেব একজন কর্ম্মচারীব মেয়াদ হয়। সেই কর্ম্মচারীর জনার্দ্দন নামে এক পালিত পুত্র থাকে। আমার বোধ হয, এই সেই পালিত পুত্র।''

''কিরূপে জানিলে?''

''আজ কয় বৎসবের কথা বলিতেছি, একজন লোক লক্ষ্ণৌ আসিয়া বাস কবে। হিন্দু-সমাজে মিশিবার চেষ্টা করিল। পরিচয় দিল, বাঙ্কাবাঈযেব কর্ম্মচারীব পালিত পুত্র। কিন্তু লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল, সন্ন্যাসী ছিল, পাঞ্জাব হইতে কাহাব একটা মেয়ে লইয়া আসিয়াছে। সমাজে মিশিতে পাবিল না।''

''পাঞ্জাবী একজন স্ত্রীলোক লইয়া আসিযাছিল?''

''হাঁ, মহারাষ্ট্র বলিয়া পরিচয় দিযাছিল, প্রকাশ পাইল পাঞ্জাবী।''

''যখন লক্ষ্ণৌয়ে আসে, তখন জনার্দ্দনকে দেখিয়াছিলে?''

''হ্যাঁ।''

''তার পর?''

''সমাজে মিশিতে না পারায় মনঃক্ষুন্ন হয়। লক্ষ্ণৌযে আসিয়া একটী ক্ষুদ্র তালুক কিনিয়াছিল। ইংবাজেরা নূতন খাজনা বন্দোবস্তের সময় সেটি কাড়িয়া লইতে চান। জনার্দ্দন ক্রোধনস্বভাব ছিল, একজন কর্ম্মচারীকে খুন করিল। তাহার গ্রেপ্তারের পবোয়ানা বাহির হয়। স্বয়ং কমিশনর সাহেব তাহাকে ধরিতে—তাহার বাটীতে আসিয়া লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করেন। সেই অবধি আর তার কোন সংবাদ নাই।''

''সেই মাগীর কি হইল?''

''কমিশনর সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে তালুকটী ছাড়িযা দেন।''

''সে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক এখন লক্ষ্ণৌয়ে আছে?''

''না, সম্পত্তি বেচিয়া কোথায় গিয়াছে।''

''সেই এ ব্যক্তি, কিরূপে জানিলে?''

''অবয়ব সেই প্রকার। খাজানার গোলমালের সময় জনার্দ্দন পরামর্শের নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছিল।''

নানা সাহেব হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আজিম, বোধ হয, তুমিও সে পাঞ্জাবীকে দেখিতে যাইতে?''

''মহাশয় যাহা বলিতেছেন, সে তা নয়, সে পরম সতী। আপনি জানেন, বিখ্যাত ডিউকের স্ত্রীকে অনায়াসে পাইয়াছি, কিন্তু আমি বিশেষ জানি, সে সতী, এবং জনার্দ্দনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগিনী।''

নানা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,''এখন কি কর্ত্তব্য?''

''আমার মতে সন্ন্যাসী যেরূপ বলিল, তাহা করাই উচিত।''

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

Sweet in her eye the cherished infant rose,
At once the seal and solace of her woes!"

চন্দ্রা জেল হইতে বাহির হইলেন। দ্বারে গাড়ী ছিল, কলের পুতুলের ন্যায় উঠিলেন। অভিপ্রায় শূন্য, গাড়োয়ানকে বলিলেন, 'চল'। একবার ভাবিলেন, ডফ সাহেবের বাড়ী যাই, আবাব ভাবিলেন, না, গড়ের মাঠে বেড়াইয়া যাই। যেরূপ ভাবেন, গাড়োয়ানকে সেইরূপ আজ্ঞা দেন, গাড়ীও সেই দিকে যায়, আবার ফিবে, আবার অন্য দিকে যায়। সন্ধ্যার সময বাড়ী ফিরিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলেন, দ্বারে একটী মলিনবসনা স্ত্রীলোক বসিযা আছে। স্ত্রীলোক সুন্দরী ছিল, বোধ হয় দুববস্থায় মলিন হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার অবয়বে রূপেব পরিচয় লক্ষিত হয়। দীর্ঘাক্ষি, গৌরবর্ণা, দীর্ঘকেশী। পবণে একখানি নূতন লালপেড়ে কাপড়, কিন্তু ধূলামাখা। ভিখারী বিবেচনায় কিছু দিবেন ভাবিলেন, জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি কে?" প্রথমে স্ত্রীলোকটী কিছু উত্তর কবিল না, গালে হাত দিযা কি ভাবিতেছিল। আবার জিজ্ঞাসা কবিলেন, কোন উত্তব নাই; ভাবিলেন, একি, উত্তর দেয় না কেন? একটু জোরে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি কে? হেথায কেন?" স্ত্রীলোক দাঁড়াইল, চন্দ্রার মুখপানে চাহিল। চন্দ্রালোকে চন্দ্রাব গৌববর্ণ ধপ্ ধপ্ করিতেছে, অপরিচিতা করযোড়ে বলিল, "মা গঙ্গা! আমাব ছেলেটী দাও বা না দাও একবার দেখাও, আবাব তোমায দিয়ে যাব। আমাব প্রাণ স্থির হয না, এত দিনে কত বড় হইযাছে দেখিব, দাও—আমাব ছেলেটী দাও।" চন্দ্রা বুঝিলেন, পাগলিনী। উত্তর কবিলেন, "তুমি কে? আমি গঙ্গা নই।" পাগলিনী কাঁদিতে লাগিল, বলিল, "হ্যাঁ মা, তুমি গঙ্গা। ছেলেটী তোমাযই দিয়াছি, সেটী আমায ফিবাইযা দাও। এবাব যেটি হইবে, তোমায় দিব।" চন্দ্রা বুঝিলেন, পুত্রশোকে বিহ্বলা। পাগলিনীব অবস্থা দেখিযা মনে দয়াব উদয হইল। হাতে নোয়া দেখিয়া সধবা জানিলেন। ভাবিলেন, কোন ভদ্রলোকের স্ত্রী সন্দেহ নাই। পাগলিনী কাতরস্ববে আবও বিনয় করিতে লাগিল—"আমায ছেলে দাও, আমি একবাব দেখিয়া মবিব, তাবপব তুমি লইয়া যাইও, আব চাহিব না।" চন্দ্রা মনে মনে স্থিব কবিলেন, ইহাকে ছাড়া নয়। বলিলেন, 'আইস'। উন্মাদিনী আহ্লাদের সহিত তাঁহার পিছন পিছন চলিল। চন্দ্রা বলিলেন, "বোসো। আমি তোমার ছেলেটী কাল দিব।" আহাব কবাইবাব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই আহাব কবিল না। শেষ ভয় দেখাইলেন, "নচেৎ তোমার ছেলে দিব না।" পাগলিনী অমনি আহাবের সামগ্রী গপ্ গপ্ খাইতে লাগিল। দ্রুত আহার কবায় মাথায় শির উঠিতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইযা গেল। খায আব বলে, "ছেলে আন, আমি খাইতেছি।" চন্দ্রা বলেন, "আজ নয়, কাল প্রাতে তোমার ছেলে দিব।" রাত্রি অধিক হইল, চন্দ্রা একটী ঘরে পাগলিনীকে বন্ধ কবিযা বলিলেন, "আজ শয্যায় শয়ন কর, কাল প্রাতে ছেলে পাইবে। পাগ্‌লী অতি ভাল মানুষের মত বলিল, "হাঁ; আমি

শুইতেছি, তুমিও শোও গে।'' পাগ্‌লী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ''গঙ্গা ত একবার ঘুমাইলে হয়, ছেলে এর বাড়ীতেই আছে।'' পাগ্‌লী গিয়া শুইল, রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, পাগ্‌লী উঠিল।—দেখিল, দ্বার বন্ধ। খড়খড়ে খুলিল। খড়খড়ে হইতে লাফাইলে বাগানে পড়া যায়, কিন্তু একতলা উঁচু। ''গঙ্গা মাগী আমার বাছাকে শোবাব ঘবে বাখিয়াছে।'' খড়খড়ের ও পিঠে নামিয়া কোণাকুণি একটু লাফাইলে আব এক ঘরের খড়খড়ে ধরা যায়। পাগ্‌লী ধরিল। এ আব একটী ঘর। পাগ্‌লী দেখিল, ঘবেব ভিতর কত মনুষ্য রহিয়াছে। পাগ্‌লী জিজ্ঞাসা করিল, ''তোমরা কে?'' উত্তর শুনিল, ''গঙ্গা আমাদের বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।'' ''তবে আমার বাছাও এ ঘরে আছে।'' খড়খড়ে গলিয়া ভিতরে গেল। ''ওঃ! গঙ্গা মাগী কি করিয়াছে! কত সাহেব, কত বিবি, সব ধরিয়া রাখিয়াছে! তোমরা পালাও না কেন?'' গঙ্গার ভয়ে আব তাহারা উত্তর করিল না। পরে হেথায় খোঁজে—হোথায় খোঁজে —''কই, গঙ্গা মাগী কোথায় লুকাইয়া বাখিয়াছে'? এ কাপড় চাপা কি? এই যে, এই যে আমার বাছা!'' বাছা পাইয়া পাগলিনী নাচিতে লাগিল, হাসিতে লাগিল, গান করিতে লগিল, কোলে তুলিয়া লইল, এইবার পালাই, বাছাকে লইয়া পালাই! আরে গঙ্গা মাগি, আমার বাছাকে সন্ন্যাসী কবিয়াছিস? বাবা, কথা কও, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমার সেই রাক্ষসী মা! মাগী খেতে দেয় না, তাহা হইলে এই সব গাল পূরন্ত হইত; আয় কোলে আয়!'' কোলে তুলিয়া লইল। 'এইবার পালাই।' দ্বার ঠেলে, দ্বার বন্ধ। 'জানালা গলিয়া পালাই।' ফ্লোরের উপর একতলা উঁচু, একতিল চিন্তা করিল না, লম্ফ দিল। পাছে কেহ ধরে, দ্বার দিয়া যাইল না, প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়! প্রভাতে চন্দ্রা দ্বার খুলিয়া দেখেন, পাগ্‌লী নাই। কোথায় গেল? চাকর-লোকজনকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, কেহই জানে না। ভাবিলেন, পলাইয়াছে। মন অতিশয় ব্যাকুল ছিল, অবকাশমত চিত্র করিতেন। চিত্রগৃহে আসিলেন, দেখেন, তথায় সকলি লণ্ডভণ্ড। মনে মনে কল্পনা করিয়া সোমনাথের একখানি চিত্রপট আঁকিয়াছিলেন, সেখানিই নাই! কে নিল! কোথায় গেল? স্থির করিলেন, পাগ্‌লী লইয়া পলাইয়াছে। কিন্তু কেন নিল, কি নিমিত্ত চিত্রগৃহে আসিয়াছিল? অনুমান পরাজয় হইল, কিছুই স্থির হইল না।

এদিকে পাগ্‌লী লোকালায় পরিত্যাগ করিয়া ছুটিতেছিল। সহরের বাহিবে একটী গাছতলায় বসিয়া ছেলে আদর করিতে লাগিল। কতক্ষণ বসিয়া আছে, পশ্চাতে পদশব্দ—শিহরিয়া দেখে, কে একজন! স্ত্রী কি পুরুষ চিনিতে পারিল না, মনে মনে অনুমান করিল —স্ত্রীলোক, গঙ্গার চর, ছেলে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে! চীৎকার শব্দে কাঁদিতে লাগিল, ''আমি দিব না, কখন দিব না, আঠার বৎসরের পর পাইয়াছি, দিব না।'' আগন্তুক বিস্ময়াপন্ন হইল, দেখে, পাগ্‌লী একখানি সন্ন্যাসীর ছবি প্রাণপণে ধরিয়াছে, ছবির এক পার্শ্বে লেখা—'চন্দ্রা'। আগন্তুক নিঃশ্বাস ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল, ''এ ছবি কার?'' ''আমার ছেলে, আমি দিব না, যা তোর গঙ্গাকে বলগে যা, যদি ছেলে লইতে আসে, চোখ দুটো নখ দে উপাড়িয়া লইব।'' অপরিচিতা একজন

ভিখারিণী। নানা স্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, মাথার কেশগুলি ছোট করিয়া কাটিয়াছে। তাহার দীর্ঘ দেহের চামড়া শুষ্ক, গাল তুব্‌ড়িয়া গিয়াছে, বড় চক্ষু ও পাতলা নাসিকায় মুখ আবো শ্রীহীন হইয়াছে। হাসিয়া মনে মনে বলিল, এ একটা পাগ্‌লী, সংসারের স্রোতে ভাসিতেছে। কিন্তু মধুর বচনে বলিল, ‘‘তোমার ছেলে কোথায় পাইলে?’’ ‘‘ছেলে গঙ্গার কাছে রাখিয়াছিলাম, মাগী কিছুতেই দেয় না, চুরী করিয়া লইয়া আসিয়াছি।’’ ভিখারিণীর স্মরণ হইল যে, রাণীগঞ্জ হইতে আসিতে আসিতে, একজন পুরুষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, সে পথে যাইতে একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়াছে কি না?’’ পরে কথায় কথায় পরিচয় পায় যে, সে ব্যক্তির স্ত্রী পাগল হইয়াছে, রাত্রে কোথায় পলাইয়াছে, সন্ধান পায় না। ভিখারিণী তাহাকে বড় কাতর দেখিয়া বলিয়াছিল, ‘‘আমি নানা স্থানে বেড়াই, যদি কোথাও দেখিতে পাই, খবব দিব, কিন্তু কোথায় খবর দিব?’’ সংবাদ ঢাকার রমেশচন্দ্র ঘোষালের স্ত্রী। কৌশল করিয়া পাগ্‌লীকে বলিল, ‘‘আ মাগী! এ যে গঙ্গার বাগান!’’ ‘‘এ্যাঁ, গঙ্গার বাগান! তবে কি হবে? কোথায় যাইব?’’ ‘‘আমার সঙ্গে আইস।’’ পাগ্‌লী ভিখারিণীর সঙ্গে চলিল। ভিখারিণীর বাসা টালায় একটী কুঁড়ে ঘরে সেইখানে দুইজনে আসিয়া রহিল। পাঠক বুঝিয়াছেন, পাগ্‌লী রমেশ বাবুর স্ত্রী। চিকিৎসকেরা রমেশ বাবুকে উপদেশ দেন যে, কলিকাতায় ছেলে হাবাইয়াছে, স্ত্রীকে লইয়া কদাচ কলিকাতায় আসিবেন না, তাহা হইলে উন্মত্ততার বৃদ্ধি রাখিবে। তিনি স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিমে যাইতেছিলেন, পথে বাসা লন, রাত্রে তাহার স্ত্রী পলায়ন করে। অনেক অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। কলিকাতায় আসিতে বড় জেদ করিত, ভাবিলেন—কলিকাতায় আসিয়াছে। থানায় খবর দিলেন, কিন্তু সাত আট দিনে কিছুই কবিতে পারেন নাই। ভিখারিণী প্রতিজ্ঞামত রমেশ বাবু যে ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিলেন, পত্র লিখিল। পাগ্‌লী ভিখারিণীকে ছাড়ে না। বেশ নিভৃত স্থান, ভাবিল, হেথা হইতে গঙ্গা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। রমেশ বাবু কলিকাতায় ছিলেন, পত্র পাইতে দেরি হইল; সাত দিনের পর রমেশ ভিখারিণীর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। রমেশকে দেখিয়া পাগ্‌লী বলিতে লাগিল, ‘‘এই দেখ—এই দেখ, ছেলে দেখ! লও, কোলে লও! আঠার বৎসরের পর পাইয়াছি!’’ রমেশ বাবু স্ত্রীকে লইযা বাটী গেলেন।

ষষ্ঠ বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"O say not that my heart is cold
To aught that once could warm it,
That nature's form so dear of old
No more has power to charm it.
Or that the ungenerous world can chill
One glow of fond emotion,
For those who made it dearer still,
And shared my old devotion."

সুবর্ণগ্রামের নিকটস্থ পানিম নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে বাসিন্দারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমাদের গোঁসাইজী নিবিড় তেঁতুল বনের ছায়ায় ছায়ায় গ্রামের দিকে চলিলেন। হঠাৎ একজন যেন ভূমি হইতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি?' গোঁসাইজী উত্তর করিলেন, ''আমি সন্ন্যাসী, তোমার দলপতির নিকট যাইব।''

সে ব্যক্তি বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, ''দলপতির নিকট?''

গোঁসাইজী উত্তর করিলেন, ''হাঁ।''

''কি কাজে?''

''তাঁহার নিকট বলিব।''

''তুমি গোয়েন্দা।''

''তোমার দলপতি 'গোয়েন্দা' বলেন—আমি একা আছি, বধ করা বিচিত্র নয়। ফিরিতে দিও না।''

গোঁসাইজীর সাহসে সে আরও বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, ''কোন্ পথে যাইতে হয়, জানেন?''

''জানি না, তুমি সঙ্গে লইয়া যাইবে।''

''হাঁ, তোমায় সমস্ত সন্ধান বলিয়া দিই।''

''তা ত দেবেই।''

''তোমায় খুন করিব।''

''পারিবে না, তোমার দলপতি রাগ করিবে।''

''দলপতির সহিত তোমার কথা আছে?''

''কথা না থাকিলে আসিব কেন?''

সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। গোঁসাই বলিলেন, ‘‘চল, লইয়া চল।’’ ক্ষণেক ইতস্ততঃ কবিয়া দুস্য বলিল, ‘‘আইস।’’

পথ অতি অপ্রশস্ত, বাঁকিয়া গিয়াছে। কখন নিবিড় তেঁতুল-বন, কখনও সুপারী-বন, কোথায় বাঁশবনে সূর্য্যবশ্মি ঢাকিয়াছে, তার পর ঘোব বেত্রবন। ছুবিকার ন্যায় কাঁটা খাড়া হইয়া রহিয়াছে। এ স্থলে পথ আরও অপ্রশস্ত। একজন ব্যতীত যাওয় যায় না, কষ্টে বেতের কাঁটা বাঁচাইয়া যাইতে হয়। লোকটা আগে আগে যাইতেছিল, বেত্রবনের মাঝে জিজ্ঞাসিল, ‘‘তোমার ভয় হইতেছে না?’’ গোঁসাই গম্ভীরস্বরে বলিলেন, ‘চল।’ সত্যই ভয়ের স্থান, দিনের বেলা অন্ধকার, স্থানে স্থানে মশাল জ্বলিতেছে। গোঁসাই চলিলেন। ক্রমে দলপতির নিকট উপস্থিত। দলপতি গোঁসাইকে দেখিবামাত্র ভূমি হইতে তরবারিখানি তুলিয়া লইল—সে কেবল অভ্যাস বশতঃ; সে স্থানে শত্রুর ভয় নাই। চতুর্দিকে এক ক্রোশ বিস্তৃত বেত্রবন, একটী সুঁড়ি পথ, দুই তিনটি কামানে রক্ষিত। গোঁসাইজী আপনি আপনাকে অভ্যর্থনা করিয়া দলপতির পাশে গিয়া বসিলেন। দলপতি জিজ্ঞাসিলেন, ‘‘আপনি কে?’’

গোঁসাই উত্তর দিলেন, ‘‘আপনি ত দলপতি?’’

দলপতি বলিল, ‘‘অগ্রে আপনি উত্তব দিন।’’

গোঁসাই বলিলেন, ‘‘ভাল,—আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু আপনার সতর্কতা কিছু বেশী। এবাব বলুন—আপনি দলপতি?’’

দলপতি বলিলেন, ‘‘হাঁ, কিন্তু আপনার অসতর্কতা কিছু বেশী।’’

‘‘কেন ভাবিতেছ? একা আমি, ফিবিব না। এ স্থান হইতে কেহ ফেরে না।’’

‘‘তাই বটে।’’

‘‘আব তুমি যদি সঙ্গে লইয়া যাও?’’

‘‘বোঝা যাইবে। প্রয়োজন বলুন।’’

‘‘আমি আপনার একটি বিশেষ উপকাব করিতে পারি।’’ দলপতি উচ্চ হাস্য করিল—‘‘আমার উপকার?’’

‘‘স্থিব জানিলেন, কিছু উপকার করিতে পারি না? আর কিছু প্রয়োজন নাই, আমায বধ করুন।’’

‘‘সে এব পরে, তবু শুনি।’’ সন্ন্যাসী স্থির দৃষ্টে দলপতির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দৃষ্টির প্রখরতায় দলপতির নয়ন-জ্যোতি মলিন হইল। গোঁসাই গম্ভীরস্বরে বলিলেন, ‘‘রামচাঁদ! তুমি শান্তকে দেখিতে চাও না?’’

রামচাঁদ শিহরিয়া উঠিল!—‘‘আপনি কে?’’

‘‘বোধ করি, দেখিতে চাও। শোন, আমি দেখাইতে পারি, কিন্তু তোমার নিকটও আমি কার্য্যের প্রত্যাশা করি।’’

‘‘কি কার্য্য বলুন। অঙ্গীকাব করুন, শান্তকে দেখাইবেন, আমি আপনার কার্য্যে প্রাণ দিব। আমি নানা স্থানে সন্ধান কবিয়াছি, কিছুতেই তত্ত্ব পাই নাই।’’

''অগ্রে তুমি অঙ্গীকার কব, আমাব কার্য্য কবিবে?''

''কবিব, শান্তকে দেখাইবেন?''

গোঁসাই বলিলেন, ''হাঁ; আমাব কার্য্য কি শোন।—আমি ভাবতবর্ষ স্বাধীন কবিবার চেষ্টা করিতেছি।''

রামচাঁদ চমকিত হইল।

''এই মহাকার্য্যে আমায় দিল্লী থাকিতে হইবে, বাঙ্গালায় তুমি আমাব কার্য্য করিবে। আর তুমি অনেক অর্থ সঞ্চয় কবিয়াছ, যুদ্ধের ব্যয়ের নিমিত্ত অর্দ্ধাংশ দিতে হইবে।''

''বাঙ্গালায় আমি কি কার্য্য করিব?''

''কলিকাতা ও বারাকপুরের সমস্ত সিপাহী ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধবিবে, তুমিও দলবল লইয়া তাহাদের সহিত যোগ দিবে, সুযোগ সন্ধান তোমাকেই কবিতে হইবে।''

''বড় কঠিন কার্য্য।''

''কঠিন ভাবিলেই কঠিন। ডাকাতি কি কঠিন নয়? তবে তোমার অভ্যাস হইয়াছে। বামচাঁদ, মনের ভিতর বিবেচনা করিয়া দেখ, কে তোমাব শত্রু, কার অবিচারে জেল হইয়াছে? দেশস্থ লোককে মার্জনা কবিতে হয, কিন্তু তুমি দেশেব লোকের উপবই শত্রুতা সাধিতেছ। ধর্ম্মবিরোধী ম্লেচ্ছের বিপক্ষ হইতে সাহস কর না—যদি ম্লেচ্ছ তোমায় পায়, ছাড়িবে কি?''

রামচাঁদ হঠাৎ বলিল, ''কিরূপে জানিব, তুমি পুলিসের গুপ্তচর নও?''

''পরস্পর কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত এই সকল পত্র দেখ।''

রামচাঁদ পত্র পাঠ করিল। গোঁসাই বলিলেন, ''এ সকল কি তোমার জাল বিবেচনা হয়?''

রামচাঁদ বলিল, ''আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।''

''মনে করিয়া দেখ, সন্দেহ আমার উপব নয়, আপনার সাহসের উপর সন্দেহ করিতেছ! ইংরাজ বিপক্ষ, কথাটা শুনিতে বড় গুরুতর। আমায় গুপ্তচর বিবেচনা করিলেই বালাই চুকিয়া যায়, আর কিছুই ভাবিতে হয় না; কিন্তু তুমি আর ডাকাতি করিতে পারিবে না। আমায় চর বিবেচনা হয়,—বধ কর; কিন্তু শান্তকে দেখিতে পাইবে না। আর একটী কথা,—একটী শিশু কুড়াইয়া আনিযা শান্তকে পালন করিতে দিয়াছিলে, মনে আছে?''

''এ্যাঁ! এ্যাঁ! সে কি জীবিত? কোথায় আছে?''

''আমার মতাবলম্বী হইলে সকলই জানিতে পারিবে।''

রামচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, ''সত্য?''

গোঁসাই উত্তর করিলেন, ''যাহা বলিবার বলিয়াছি, এখন মত অপেক্ষা। বাঘের মত বেত বনে যদি বসিয়া থাকা অভিপ্রায় হয়, থাক,—আমার আপত্তি নাই। কিন্তু দেশহিতৈষী বীরপুরুষ নাম লইবার সময় উপস্থিত। আমায় উত্তর দাও।''

রামচাঁদ অনেকক্ষণের পর বলিল, ''আমি আপনার মতে চলিব।''

"আজই একটী কার্য্য করিতে হইবে। একজন কয়েদী কলিকাতা হইতে ভাগলপুর যাইবে, তোমাকে দলবল পাঠাইয়া তাহার উদ্ধার করিতে হইবে। প্রস্তুত হও, আজই লোক পাঠাও, কয়েদী পরশ্ব রওনা হইবে। তার পর তোমাকে শাস্তর কাছে লইয়া যাইব।" রামচাঁদ দলের একজন প্রধানকে ডাকিয়া, যেরূপ করিতে হইবে বলিয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"What cruel answer have I heard!
And yet, by Heaven, I love thee still!
Can aught be cruel from thy lip?
Yet say how fell that bitter word
From lips which streams of sweetness fill,
Which naught but drops of honey sip?"

সোমনাথ এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই। রমানাথ আজও জেলে আছে। সে মনে মনে এক ফন্দী ঠাওরাইল। "এক কাজ করি। জেলের কর্ত্তাকে বলিয়া সন্ন্যাসীর খাটিয়াটা আমার জায়গায় দিই, আর আমারটা এইখানে আনি।" টাকা পাইয়া হাঁসপাতালের কর্ত্তা সেইরূপই করিল। তাহার মনে কল্পনা, এবার যে দিন চন্দ্রা আসিবে, আমি ঐ সন্ন্যাসীর মত মুড়ি দিয়া থাকিব। কিছু না হ'ক, গায়ে হাত লাগিবে। আর যদি দুটো মিষ্ট কথা কহিতে পারি,—কহিব, টাকা কবলাইব। কিছু না হয়, কতক আলাপ থাকিবে। কিন্তু তাহার অদৃষ্টবশতঃ চন্দ্রা আর আসিল না। সোমনাথের বুকে আঘাত জন্য গলায় নম্বর ছিল না, শয্যার পার্শ্বেই ঝুলিত। রমানাথ বুদ্ধি করিয়া সেই নম্বরটী চুরি করিয়া আনিল, আর গলা হইতে আপনার নম্বরটী কাটিয়া সোমনাথের খাটিয়ায় ঝুলাইয়া দিল। অর্থবলে কারাগারে নিত্যই মদ খাইত। খালাসের আগের রাত্রে বেশী মাত্রায় মদ খাইয়াছিল। রাত্রে মদের ঝোঁকে সাতবার উঠিয়া দেখিয়াছে; সোমনাথের বিছানায় চন্দ্রা আসিয়াছে কি না। ভোরের বেলা অঘোরে নিদ্রা। প্রাতঃকালে তাহার খালাসের দিন। একজন আন্‌কোরা নূতন চৌকিদার—রমানাথের তিনের নম্বর ছিল—তেস্‌রা নম্বরের কয়েদীকে ডাকিতে আসিল। এ পাহারাওয়ালা আবার একটু চালাক, নম্বর পড়িতে জানে। সোমনাথ শুইয়া আছেন, বলিল, "এই তিন নম্বর আসামী, উঠ!" সোমনাথ উঠিলেন। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাইতে হইবে?"

"ফাঁসী! আউর কেয়া?"

সোমনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, রেজেষ্টারী ঘরে গেলেন। সাহেবের বড় মদের খোঁয়ারী। তিনি চোক মুছিতে মুছিতে সাপের মন্ত্র ঝাড়িতে লাগিলেন। নিয়মানুসারে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কয়েদী উত্তর দেয়, কিন্তু অত দেরি করিলে তাঁহার হাজিরের

সময় যায়। আপনি উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন, ''টোম্ রমানাথ, গোলডিগ্গিমে পাক্ড়া গিয়া, এই টোমরা কাপ্ড়া ?'' সোমনাথ দেখিলেন, গৈরিক বসন, পরিলেন। ধাক্কা দিয়া জেল হইতে বাহির করিয়া দিল।

বাহিরে আসিয়া সোমনাথ ভাবিলেন, ''আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই ভুল হইয়াছে, সতর্ক না হইলে, এখনি ধরা পড়িতে হইবে। কোথায় যাই ?'' একবার চন্দ্রাকে মনে পড়িল, অমনি ঘৃণা ও দ্বেষের উদয় হইল। ''কোথায় যাই ?'' একজন কোচ্মান সেলাম করিয়া বলিল, ''বাবুসাব, আইয়ে।'' সোমনাথ গাড়ীতে উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। জুড়ী গাড়ী তীরবেগে ছুটিল। কতক দূর যাইয়াই গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। পথে একজন ভিখারিণীর সহিত দেখা হইল। ভিখারিণী মুখ দেখিতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিল, ''কোথায় যাইবে ?''

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন ''তোমার বাড়ী কোথায় ?''

''আমি এইখানেই থাকি।''

''তোমার বাড়ীতে একদিনের জন্য স্থান দিতে পার ?''

ভিখারিণী সহজেই রাজি হইল। ইহারই বাসায় রমেশ বাবুর স্ত্রী ছিলেন।

এ দিকে জেলে তোড়জোড় পড়িয়া গেল। বেলা দশটা বাজিয়াছে, ডাক্তারসাহেব হাঁসপাতালে আসিয়াছেন। সোমনাথ নাই, রমানাথ চোখ পুঁছিতে পুঁছিতে বলেন, ''আজ আমার খালাসের দিন।'' সর্ব্বনাশ! জেলারকে তলব হইল। সে বলে কেন, তিন নম্বরে কয়েদী ছাড়িয়াছে মাপ সমান, ওজন কিছু ভারি হইয়াছে বটে, কিন্তু জেল হইতে সকলেই ভারি হইয়া যায়। জেলে একটা বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জেলের অধ্যক্ষ আপনার পরিত্রাণের জন্য রিপোর্ট লিখিলেন যে রমানাথ সড় করিয়া সোমনাথকে চালান দিয়াছে। রমানাথ মদ খাইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিবার যো নাই। মকদ্দমা হওয়াতে রমানাথ দোষী হইলেন, কিন্তু উকীল কৌন্সিলির সওয়ালে জজ বুঝিল, এটা বোকা, কি গোলমাল করিয়াছে; মিয়াদ আরও পনর দিন বাড়িল।

ভিখারিণীর গৃহে সোমনাথ শুইয়া আছেন, অকস্মাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল। মিট্ মিট্ করিয়া একটী আলো জ্বলিতেছে; ভিখারিণী কাঁদিতেছে, নাচিতেছে, ক্ষুদ্র একখানি ছবি সম্মুখে রহিয়াছে। ছবি একবার বুকে তুলিতেছে, একবার চুম্বন করিতেছে, একবার আছাড় দিয়া ফেলিতেছে। আবার দেখিতেছে, আবার নাচিতেছে, আবার কাঁদিতেছে। এবার কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—ছবিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, ''আরে আরে, তোর জিহ্বা পুড়িয়া গেল না? আমাকে অসতী বলিলি ? তুই কে, সন্ন্যাসী বই নয়, আমি তোর নিমিত্ত পিতা মাতা ভ্রাতা সকল ত্যাগ করিয়াছি; তবু তোর মন উঠে না ? আরে নির্দয়! আমি তোকে দেশে দেশে খুঁজিতেছি, তুই তবু আমাকে দেখা দিস্ না ? আমি তোর জন্য পাগল, তোর জন্য ভিখারিণী। দেখ্—চেয়ে দেখ্। আমায় কি দেখিয়াছিলি—এখন দেখ!'' অনেকক্ষণ পর ভিখারিণী শান্ত হইল। পোঁট্লা পুঁটলি বাঁধিল। অধিক কিছু ছিল না; কতকগুলি কাগজ, একখানা চিঠি, একটী নোটের তাড়া। ভিখারিণী কোথা হইতে পাইল ?

সোমনাথ জাগিয়াছিলেন, ভিখারিণীকে জানিতে দিলেন না। আবার নিদ্রা গেলেন। প্রভাতে দেখেন, ভিখারিণী একখানি ইংরাজী খবরের কাগজ আনিয়াছে। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি?"

"কি জানি? একজন দিল, লইয়া আসিয়া ছিলাম।"

"আজ ভিক্ষায় যাইবে না?"

"হাঁ যাই, বলিয়া ঝুলি পোঁট্‌লা লইয়া বাহির হইল। কাগজখানাও লইয়া যায়, সোমনাথ বলিলেন, "দাও না আমি পড়ি।"

"কাগজ ইংরাজী।"

"আমি ইংরাজী জানি।"

সোমনাথ পড়িতে লাগিলেন। ভিখারিনী বাহিরে গেল। পড়িতে পড়িতে একটা বিজ্ঞাপন দেখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"আরে নির্দ্দয়! কোথায় তুমি আছ, বল? আমি একটী কথা বলিয়াই তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব, একবার মাত্র দেখা দাও।" সে দিনও সোমনাথ ভিখারিণীর গৃহে রহিলেন।

রাত্রি আটটার সময় কলিকাতা হইতে চানকে সিপাহী যাইতেছে, সোমনাথ পোলের ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একজন হাওয়ালদার যাইতেছিল, কাছে গিয়া বলিলেন, "মাধব পন্থ!"

মাধব পন্থ বলিল, "তুমি হেথায় কেন?"

"শোন নাই, আমি জেলে ছিলাম, কাল আমার বিচারের দিন স্থির ছিল। বিচার-কর্তারা প্রাণদণ্ড করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভগবান্ প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আমাদের দলস্থ যদি কাহারও সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, সংবাদ দিও। আমি কাহিল আছি, একা যাইতে সাহস করি না।" সিপাহী সম্প্রদায় চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"Be that word our sign of parting, bird or
fiend! I shrieked upstarting,
Get thee back into the tempest and the
night's Plutonian shore!
Leave on black plume as a token of that
lie thy soul hath spoken!"

গোঁসাইজী ঠিক খবর পান নাই। তিনি সোমনাথের উদ্ধারের জন্য রামচাঁদকে বলিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভাগলপুরে চালান দিবে। কিন্তু তাহা নয়, তাঁহার সংবাদদাতা ভুলিয়াছিল। ভাগলপুর হইতে কয়জন কয়েদী আনিবেন, সোমনাথের সহিত তাহাদের বিচার হইবে। তাহাদেরও রাজদ্রোহী দোষ, কিন্তু তাঁহার দলভুক্ত নয়। সুতরাং রামচাঁদের দল ভাগলপুরে যাইবার আসামী পাইল না।

সন্ধ্যার সময় তাহারা চার পাঁচ জন একটা বৃক্ষের তলায় বসিয়া আছে। একজন দুইবার তাহাদের আশে পাশে ঘুরিয়া গেল। তাহারা ভাবিল গোয়েন্দা। আবার ঘুরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, ''দিল্লী।'' তাহারাও বলিল, ''দিল্লী।'' কাছে আসিল। কিছু পরে চারিজন মুসলমান সেই স্থানে উপস্থিত হইল, যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। কিছু বলিল না, ফিরিয়া গেল। ডাকাতের দলও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পত্র লইয়া রামচাঁদকে দিল। রামচাঁদ গোঁসাইকে দিলেন। গোঁসাই বলিলেন, ''কার্য্যের সম্পূর্ণ সুবিধা হইয়াছে, পত্র পড়। দিল্লীর বাদশার অনুমতি অনুসারে বক্‌রিদের দিন কলিকাতায় সমস্ত মুসলমান মিলিয়া কেল্লা আক্রমণ করিবে। কিন্তু তোমার সম্প্রদায় কিরূপ বলিল? ভাগলপুরের আসামী যায় নাই?''

''কই না। কিন্তু আমার দলস্থ একজন সংবাদ আনিয়াছে যে, ভাগলপুর হইতে কয়জন কয়েদী কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। কলিকাতার জেলে কে একজন সন্ন্যাসী আছে, তাহার সহিত ইহাদের বিচার হইবে। আর একজন খবর দিল, যাহার সহিত বিচার হইবার কথা ছিল, সে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে।''

গোঁসাই উত্তর করিলেন, ''আর আমার এখানে থাকা হয় না। আজি কলিকাতায় রওনা হইব, শীঘ্র দিল্লী যাইতে হইবে।, তুমিও সঙ্গে আইস, কি করিতে হইবে, জানিতে পারিবে।''

উভয়ে ঘোড়সওয়ার হইয়া বাহির হইলেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া রামচাঁদকে লইয়া গোঁসাই বারাকপুরে গেলেন। যে হাওলদারের সহিত সোমনাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; রামচাঁদের সহিত তাহার আলাপ করিয়া দিলেন। রামচাঁদকে বলিলেন, ''আমার একজন চেলা তোমায় শান্তকে দেখাইবে। আমি আর রহিতে পারিতেছি না। এই পত্র লও, দমদমায় গোরখনাথের মন্দিরে যাইলে দেখা পাইবে। কালই রওনা হইবে?''

''হাঁ, আমি সেইরূপ আদেশই দিয়া আসিয়াছি।''

''বক্‌রিদের দিন কামান, বারুদ, গোলা কলিকাতায় পৌঁছিবে, সন্দেহ করিবে না।''

রামচাঁদ গোরখনাথের মন্দিরে গিয়া সোমনাথের চেলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। চেলা তাহাকে শান্তকে দেখাইবার নিমিত্ত রমেশ ঘোষালের বাসায় সঙ্গে লইয়া গেল।

এ চেলার সহিত পূর্বে রামচাঁদের দেখা হইয়াছিল। সোণারগাঁর নিকট মাঠে ইনিই রমেশ ঘোষালের গুরুর কাছে বসিয়াছিলেন; পত্রে ইনিই শান্তর সমাচার গোঁসাইকে দেন, রামচাঁদের বৃত্তান্তও বলেন।

শান্ত রমেশ ঘোষালের বাড়ী নাই। পাগলিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপরই ছিল। পাগলী পলাইবার পর—রমেশের ত্রুটি ছিল না—শান্ত ভাবিল, 'এ স্থানে আর আমার থাকা নয়।' রমেশ কিছু কিছু দিতেন, কিছু সংস্থানও হইয়াছিল। শান্ত মনে করিল, 'আর এখানে কেন থাকি, বৃন্দাবন যাই।' সুতরাং শান্তর দেখা পাইল না।

রামচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, 'কৈ, শান্ত কৈ?'

"তাই ত, রমেশ ঘোষালের বড়ীতেই ছিল।"

রামচাঁদ বলিল, "মিথ্যা কথা! কেবল আমার টাকা ফাঁকি দিবার ফিকির।"

চেলা বলিল, "সাত দিন অপেক্ষা করুন, শান্তর সহিত দেখা করাইয়া দিব।"

কিন্তু শান্তর কোন সন্ধানই হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'What! keep a week away—
seven days and nights?
Eight score eight hours? And love's absent hours
More tedious than the dial eight score times?
O weary reckoning!'

মানব-হৃদয়ের কি অদ্ভুত প্রকৃতি বলিতে পরি না। সন্ন্যাসীর উপর রমানাথের বিদ্বেষ ছিলই ত, আবার চন্দ্রাকে তাহার শয্যাতে বসিতে দেখিয়া ঈর্ষ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল। কিন্তু তথাপি সে সন্ন্যাসীকে দেখিলে ভাল থাকিত। চন্দ্রা আসিবে, এই আশাতেই হউক বা চন্দ্রা ভালবাসিতে পারে, এই জ্ঞানেই হউক, বা অন্য যে কারণেই হউক, সন্ন্যাসী যত দিন কারাগারে ছিলেন, রমানাথের কারাগার তত ভার বোধ হয় নাই।

এবার কারাগারে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। এখনও হাঁসপাতালে খাটিতে হয় না বটে, কিন্তু দিন আর যায় না। দিনের মধ্যে শতবার সন্ন্যাসীর ছবি, শতবার চন্দ্রার মূর্তি তাহার হৃদয়মধ্যে উদয় হয়। কখন সন্ন্যাসীতে চন্দ্রাতে মিলন দেখে, কখন বিচ্ছেদ দেখে, কখন চন্দ্রা রাগ করিয়াছে—সন্ন্যাসী সাধিতেছেন, কখন সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতেছেন—চন্দ্রা বসন ধরিয়াছে,—এই সকল চিন্তায় যত যন্ত্রণা হইত, ততই চিন্তা করিত। বুঝি যন্ত্রণার ভিতর সুখ ছিল।

দিবাভাগে যে সময় চন্দ্রাকে দেখিয়াছিল, সেই সময় হইলে বার বার দ্বারের পানে চাহিত। নিশ্চয় জানিত, চন্দ্রা আসিবে না, চক্ষে জল আসিত। কিন্তু তথাপি বার বার চাহিত। কখন ভাবিত, চন্দ্রার নিমিত্ত এত দুঃখ পাইয়াছে, আর তাহাকে মনে স্থান দিবে না; তখনই সব শূন্য মনে হইত, জীবনের কোন আবশ্যক নাই বিবেচনা হইত। দিন দিন এই সকল চিন্তা আরও প্রবল হইতে লাগিল। আর মদে রুচি নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপে রুচি নাই, ভাল কথায় তুষ্ট নয়, রূঢ় কথায় রুষ্ট নয়, কেবল চন্দ্রা ও সন্ন্যাসী, চন্দ্রা ও সন্ন্যাসী এই ভাবনাই দিন রাত্রি। "আমি গুণহীন, চন্দ্রাব ভালবাসার যোগ্য নই! গুণ শিখিব। কি গুণ শিখিব? কিসে চন্দ্রা ভালবাসিবে?"

এই অকূল-চিন্তার মাঝে একটী ভাব মনে উদয় হইল। সন্ন্যাসীর সহিত চন্দ্রার যে দিন শেষ দেখা, সন্ন্যাসী রূঢ় কথা বলিয়াছিল; তদবধি চন্দ্রা আর আসে নাই। বোধ হয়, আর সন্ন্যাসী যায় না, সন্ন্যাসী ভালবাসে না। "জেল হইতে মুক্ত হইয়া

সন্ন্যাসীর কাছে যাব, সন্ন্যাসীকে মিনতি করিব, পায়ে ধরিব, যাহাতে চন্দ্রা আমার প্রতি অনুরাগিনী হয়, সন্ন্যাসীকে করিতে বলিব। যদি রাগ করে, আবার মিনতি করিব। সন্ন্যাসী যাহা বলিবে চন্দ্রা শুনিবে। অষ্টপ্রহর জ্বলিতেছে, সন্ন্যাসীকে জানাইব। চন্দ্রার নিমিত্ত যাহা করিয়াছি, আদ্যোপান্ত বলিব। ইহাতেও যদি সন্ন্যাসী দয়া না করে, তাহারই সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।''

এই কল্পনা অষ্ট প্রহর আন্দোলন, এই কল্পনায় জীবনধারণ ; এই কল্পনা শয়নে- স্বপনে। ক্রমে আশা বাড়িতে লাগিল। কারাগারে ততই চঞ্চল হইতে লাগিল। যে দিন মুক্তিলাভ করিল, উন্মত্তের ন্যায় চন্দ্রার বাটীর দিকে দৌড়াইল। আবার নূতন ভাবনা পড়িল, ''সন্ন্যাসীর দেখা কোথায় পাইব ?''

পুরাতন বন্ধু সকল যুটিল। কিন্তু রমানাথের আর সে ভাব নাই। হঠাৎ একদিন চাবুক খাইয়া সকলে বিদায় হইল।

সমস্ত দিন কলিকাতা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজে, কিন্তু সন্ন্যাসী নাই। শুনিল, দম্‌দমায় কয়জন সন্ন্যাসী আছে। দম্‌দমায় গেল। দম্‌দমায় সে সন্ন্যাসী নাই।

গাছতলায় বসিয়া ভাবিতেছে, হঠাৎ দেখিল, একজন দীর্ঘাকায় তাহার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। লোকের সহবাস ভাল লাগিত না ; রমানাথ উঠিল। সে ব্যক্তি বলিল, ''রমানাথ বাবু!'' রমানাথ দেখিল, ডাকাতের দলপতি। রমানাথের মনে উদয় হইল, ''এরাও অনেক সন্ধান রাখে ; সন্ন্যাসীর কথা জানে কি ?'' জিজ্ঞাসা করিল। রামচাঁদ বলিল, ''জানি।'' রমানাথ ব্যাকুল হইয়া বলিল, ''কোথায় বল ?''

''আমার একটী কাজ কর।''

''কি ?''

''বারাকপুরে যাও। সেখাকার সেনাপতিকে বল যে, রামচাঁদ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত বিশেষ কারণ বশতঃ সাক্ষাৎ করিতে চায়। আমি ট্রাঙ্ক রোডের বড় বটগাছের তলায় থাকিব। সাহেব যদি একা আসেন, সাক্ষাৎ করিব ; যদি না আসিতে চান, বলিও, সিপাহী-সম্বন্ধীয় কথা, তাহা হইলেই সাহেব আসিবেন।''

''তোমার কার্য্য করিব, সন্ন্যাসী কোথা বল ?''

রামচাঁদ বলিল, ''এলাহাবাদে।''

বাস্তবিক সন্ন্যাসীর কথা রামচাঁদ কিছুই জানে না। রামচাঁদের সত্যমিথ্যা এখন বিচার নাই। যারে পায়, পীড়ন করে ; কেবল নীল-রতন বাবুর গুরুকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার কারণ, তাহার ছেলের হাতে রামপদকটী দেখিয়া কিরূপ ভাব উদয় হইয়াছিল। শান্ত ব্যতীত সংসারে আর ভাল বাসিবার কেহ ছিল না ; কিন্তু সে কুড়ান ছেলেটীর কথাও অদ্যাবধি ভুলে নাই। হৃদয়ে এই দুইটী কোমল স্থান ছিল, এতদ্ভিন্ন সম্পূর্ণ কঠিনতাপূর্ণ।

রামচাঁদের কথা অনুসারে রমানাথ ক্যান্টনমেন্টে গেল ; কিন্তু সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছে, দেখা হইল না। সেই রাত্রি গুডস্‌ট্রেনে রমানাথ এলাহাবাদ যাইবার উদ্দেশে রাণীগঞ্জ রওনা হইল।

এলাহাবাদে পৌঁছিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু না, সে সন্ন্যাসী কোথাও নাই। প্রয়াগের ঘাটে বসিয়া ভাবিতেছে, একখানি নৌকা লাগিল, একটী স্ত্রীলোক নাবিল।

"এ কি! আমাদের বাড়ীর শান্ত না?"

পরিচয় লইয়া জানিল, শান্তই বটে। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হেথায় কেন?"

"আমি বৃন্দাবন যাইতেছি।"

তাদের কথোপকথন একজন লোক দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল। সে শান্তর কাছে গেল। সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "রামচাঁদ তোমার স্বামীর নাম?" ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসীর চেলা, কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ নাই। শান্ত চমকিত হইয়া উত্তর করিল, "হাঁ।"

"তোমায় আমাদের গোঁসাইজী ডাকিতেছেন।"

"কেন?"

"রামচাঁদ জীবিত আছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।"

এ কথায় শান্ত পাগলের মত হইল। বলিল, "কোথায় তোমার গোঁসাই, চল!" চেলা শান্তকে লইয়া প্রস্থান করিল। রমানাথের অল্প অল্প স্মরণ ছিল, শান্ত ভ্রষ্টা, পলাইয়াছিল।

ভাবিল, "দেখ, ভ্রষ্টা নারীর চরিত্র দেখ! কোথায় বৃন্দাবনে যাইবে—কে ডাকিল, সঙ্গে চলিল। বয়স নাই, তবু রোগ ছাড়ে নাই।"

দূরে রমানাথও পাছু পাছু চলিল। রমানাথ দেখিল, একটা সন্ন্যাসীর আস্তানায় শান্ত যাইতেছে। ভাবিল, "হেথায় যদি থাকে?"

শান্ত আস্তানা হইতে আসিলে পর রমানাথ তথায় গেল। রমানাথকে দেখিয়া গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

রমানাথ পরিচয় দিল।

"হেথায় কেন?"

"একজন সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে আসিয়াছি।"

"কোন্ সন্ন্যাসী?"

"আমি তাঁহার সঙ্গে হাঁসপাতালে ছিলাম।"

গোঁসাই বুঝিতে পারিলেন, সোমনাথ। বলিলেন, "তাঁহাকে কেন?"

কথার কৌশলে রমানাথের সমস্ত ভাব অবগত হইলেন। কিন্তু বুঝিলেন, লোকটা অকর্ম্মণ্য, বিশেষ কাজ কিছু পাওয়া যাইবে না। তথাপি তাহাকে আশ্বাস দিলেন, "এলাহাবাদেই থাক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"উল্টা বুঝিলি রাম।"

পত্র পড়িতে পড়িতে রামচাঁদ বলিল, "শালা, আবার ফাঁকি? তোমার মাথা খাই এই!" রামচাঁদ মেছোবাজারের একটী পোড়ো বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। পথে একজন

ভিখারিণী সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ''টালাব একজন সন্ন্যাসী আপনাকে ডাকিতেছেন, যাবেন কি?'' রামচাঁদ মনে মনে বলিল, ''কোন বেটা বাচ পড়িযাছে, দেখি। এ বেটাকে আগে ধরি।''

একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া বামচাঁদ ভিখারিণীর সঙ্গে আসিল। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ''মহাশয়ের নাম রামচাঁদ?''

বামচাঁদ বলিলেন, হাঁ।''

''আপনি কি করিতেছেন? বারাকপুরের সিপাহীবা এখনও উঠিতেছে না কেন?''

''তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে।''

''মহাশয়, সত্বর হউন, আর দিন নাই, দিল্লী আক্রমণের সময় নিকট।''

''আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।''

''কলিকাতার দুর্গে মঙ্গল পাড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?''

''হাঁ।''

''তাঁহারাই বা কি করিতেছেন? এমন সুযোগ আর হইবে না, বহরমপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এক সম্প্রদায় বই ইংরাজ সৈন্য আর নাই।''

''আমি এই সকলই বলিতে কলিকাতার দুর্গে যাইতেছিলাম, পথে তোমার লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল।''

''তবে যান, আর বিলম্ব করিবেন না।''

রামচাঁদ চলিয়া গেল।

ভিখারিণী সোমনাথকে বলিল, ''এই ব্যক্তি কে?''

''কোন আত্মীয় লোক।''

''তোমার বন্ধু?''

''হাঁ।''

''তবে সতর্ক হও।''

''কেন?''

''আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার শত্রু। দেখ, তোমরা ত ইংরাজবিরুদ্ধ?''

সোমনাথ নীরব হইয়া রহিলেন।

ভিখাবিণী বলিতে লাগিল, ''আমি বুঝিয়াছি, বিরুদ্ধ বটে। এ ইংরাজের পক্ষ; আমি তিন চারি দিনই ইহাকে সাহেবের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছি। তোমাদের সাহেবের সঙ্গে কি কিছু কার্য্য আছে?''

''না।''

''তবে পালাও।''

''কিরূপে পলাইব? তুমি কি জান না, আমার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক ঘুরিতেছে? আমি এখনও দুর্ব্বল। অঙ্গে অস্ত্রের চিহ্ন আছে, সহজে ধরা পড়িব।''

''এক উপায় আছে, আমার কাছে একটী পোষাক আছে, তাহাতে তোমার মূর্ত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে। দেখ, পোষাক দেখ।'' ভিখারিণী একটী অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত

পরিচ্ছদ বাহির করিল। সোমনাথ দেখিয়া অবাক্ হইলেন ; কিন্তু উত্তর করিলেন, ''আশঙ্কা করিতেছ কেন ?''

ভিখারিণী বলিল, ''এইখানে পোষাক রহিল। পঞ্চাশ টাকাব একখানি নোট নাও। যদি তোমাব ইচ্ছা হয় থাক, আমি থাকিব না। আমায় তোমার সম্প্রদায়ভুক্ত বিবেচনা করিয়া গ্রেপ্তার করিবে।''

ভিখারিণী পোষাক ও টাকা দিয়া আর তিলমাত্র রহিল না।

এ দিকে রামচাঁদ কেল্লায় প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, দুর্গাধিকারী নাই, বেথুন সাহেবের ফিমেল স্কুলে পুরস্কার দিতে গিয়াছেন। রামচাঁদ বেথুন সাহেবের স্কুলে আসিলেন। বালিকারা নাই, একটী ঘরে অপূর্ব্ব সঙ্গীত হইতেছে। দ্বারে, আরদালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''হিয়াবসে সাহেব আছেন ?''

আরদালী বলিল, ''হাঁ।''

''আমি ঘরে যাইব।''

''হুকুম নাই, যাইতে পারিবে না।'' রামচাঁদ শুনিল না, জোর করিয়া ঘবের ভিতব প্রবেশ করিল।

ঘবের ভিতব হিয়াবসে সাহেব, ডফ্ সাহেব, আর চন্দ্রা ছিলেন। বামচাঁদ বলিল, ''জাঁদরেল সাহেব, যে বদমাস সন্ন্যাসী জেল হইতে পলাইয়াছিল, সে টালায় লুকাইয়া আছে। তাহাকে ধরুন, নহে সমস্ত সিপাহী খাবাপ করিবে। উনিশ নম্বর সম্প্রাদায় খাবাপ করিয়াছে ; আব সকল দলই খারাপ করিবে। বোধ হয়, চৌত্রিশ সম্প্রদায় আজই ক্ষেপিবে।''

সে সময়ে বলদর্পে গর্ব্বিত ইংরাজ, কেহ সাবধান করিয়া দিলে শুনিতেন না। সিপাহীদিগেব উপব সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, কেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে পারিবে, কোনরূপে সম্ভব বিবেচনা করিতে পারিতেন না। যে কেহ তাঁহাদিগকে আশঙ্কার কথা কহিত, তাহাকে শাস্তি দিতেন।

হিয়াবসে বলিলেন, ''তুমি কে? তুমিও বদ্‌মাস। আমাব গাড়ীতে আইস। যদি তোমাব সংবাদ সত্য না হয়, কুক্কুবেব মত বধ করিব। তুমি মিথ্যা খবর দিতে আসিয়াছ। যে বদমাস টালায আছে, পুলিস দিয়া তাহাকে ধব নি কেন ?''

''ধর্ম্মাবতার আমি বদমাস নই, মাইকেল সাহেব আমাকে বিলক্ষণ জানেন।''

''ভাল, আইস।''

রামচাঁদ পুলিসে খবর দেয় নাই, তাহার কারণ পুলিস ধরিলে তাহাদেরই যশ হইবে, তাহাব বাহাদুরী থাকিবে না, এনামও পাইবে না।

দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া হিয়ারসে কেল্লার ভিতর আসিলেন। দেখেন মঙ্গলপাঁড়ে নামে চৌত্রিশ সম্প্রদায়ের একজন সিপাহী উন্মত্তের ন্যায় যার তার প্রতি বন্দুক ছুড়িতেছে। হিয়াবসেকে দেখিয়া আপনি গুলি করিয়া পড়িল। হিয়ারসে রামচাঁদের সঙ্গে দুই জন গোরা দিয়া বলিলেন, ''যাও, কোথায় বদমাস আছে, উহাদিগকে দেখাও।''

রামচাঁদের সমস্ত কথা চন্দ্রার সাক্ষাতে হইয়াছিল। চন্দ্রা শীঘ্র ডফ্ সাহেবকে বলিলেন, "আমার অসুখ করিতেছে, বাড়ী যাই।" ডফ্ সাহেব চন্দ্রাকে কন্যার অপেক্ষা ভালবাসিতেন। বেথুন সাহেব ও তাঁহারই উদ্যোগে স্ত্রী-শিক্ষা বাঙ্গালায় প্রচারিত হয়। চন্দ্রা একজন প্রধানা ছাত্রী। ডফ্ বলিলেন, "আমি ডাক্তার ডাকিতেছি, এ ঘরে শয্যা আছে, শোও।"

"না—না" বলিয়া চন্দ্রা উন্মাদিনীর ন্যায় বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া কোচ্‌মানকে বলিলেন, "টালায় চালাও, শীঘ্র চালাও।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে চন্দ্রা টালায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু ভিখারিণীর ঘর জানেন না। ইতস্ততঃ দাবদগ্ধা হরিণীর মত ছুটীতে লাগিলেন। ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন সন্ধান নাই। এ কুটীরে যান, ও কুটীরে যান, কোথাও পাইলেন না। ভাবিলেন, এতক্ষণ তাহাকে ধরিয়াছে।

ভিখারিণীর কথায় সোমনাথের সন্দেহ হইয়াছিল। ভিখারিণীপ্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিয়া তিনি গঙ্গাতীরে যান, একখানি নৌকা পাইয়া পলায়ন করেন। চন্দ্রা উন্মাদিনীর ন্যায় অনুসন্ধান করিতেছেন, একব্যক্তি সোমনাথকে যাইতে দেখিয়াছিল, সে বলিল, "কাবে খোঁজ? যার ব্যাবাম হইয়াছিল, সে খুব বাবু সাজিয়া গঙ্গার দিকে গিয়াছে।" চন্দ্রা ভাবিলেন, "সোমনাথ। কিন্তু পোষাক পাইল কোথা? যা হ'ক্ দেখা যাক।" গঙ্গার ঘাটে তত্ত্ব নিলেন, শুনিলেন, একজন খোসপোষাকী বাবু ভাউলে চড়িয়া উত্তরমুখে গিয়াছে। চন্দ্রাও একখানি ভাউলে করিয়া চলিলেন।

এ দিকে রামচাঁদ গোরাদের লইয়া সোমনাথের তত্ত্ব পাইল না। যে ব্যক্তি চন্দ্রাকে সংবাদ দিয়াছিল, রামচাঁদকেও সংবাদ বলিল। ঘাটে আসিয়া চন্দ্রা যাহা শুনিয়াছিলেন, শুনিল। অমনি নৌকা চড়িয়া তাহার অনুসন্ধানে চলিল। সোমনাথ বালিতে পৌঁছিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন; দেখিলেন, ট্রেণ যাইতেছে। একবার ভাবিলেন, 'উঠি'; আবার ভাবিলেন, 'না—পরিচ্ছদে ধরা পড়িব।' নৌকায় পোষাকটী খুলিয়া একটা চটীতে বহিলেন।

চন্দ্রা পিছু পিছু যাইয়া নৌকা ধরিলেন। মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ আসিয়াছে?

"একটা মস্ত বাবু; তাহার পোষাক রহিয়াছে।"

চন্দ্রা বলিলেন, "কোথায় গেল?"

"এখনি আসিবে বলিয়া গিয়াছে।" চন্দ্রা সেই নৌকায় বসিলেন।

চন্দ্রা বসিয়া আছেন, অনেকক্ষণ হইল, সোমনাথ ফিরিল না। পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। চন্দ্রা শিহরিয়া উঠিলেন—"এ কি! সন্ন্যাসী এ পরিচ্ছদ কোথায় পাইল?" গাঢ় চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিচ্ছদটী পুরাতন, কিন্তু বস্ত্র এবং কারুকার্য্যের গুণে এখনও নূতন রহিয়াছে। চন্দ্রা মাঝিদের বলিলেন, "তোমরা ফের, বাবু আর আসিবেন না।"

"কিরূপে জানিলে? বাবু কি আপনার ভাই?"

"হাঁ।" মাঝিকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া পোষাকটী লইলেন। আপনি পরিধান করিয়া নৌকার ছাদে বসিয়া মাঝিদের বলিলেন, "চল, কলিকাতায় চল।"

এ দিকে রামচাঁদ গোরাদের লইয়া প্রতি নৌকা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। "ওপারে ঐ না পোষাক ঝক্‌মক্ করিতেছে?" মাঝিদের বলিলেন, "যাও, ঐ নৌকা ধর!" চন্দ্রাও দূর হইতে অনুমান করিলেন রামচাঁদ। মাঝিদের বলিলেন, "দেখ বিশেষ পুরস্কার পাবে, ঐ যে নৌকা আসিতেছে, কোন মতে তোমার নৌকা না ধরিতে পাবে।" তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, রামচাঁদ তাহার পিছনে ধাবমান হইলে সন্ন্যাসী পলাইবার অবকাশ পাইবেন।

সেইরূপই হইল। উভয় নৌকার দাঁড়ীরা সজোরে দাঁড় বাহিতে লাগিল। দুইখানি নৌকা তীরের মত ছুটিতে লাগিল। চন্দ্রা অগ্রে আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেন। রামচাঁদের নৌকাও লাগিল। ঘাটের উপর গাড়ী ছিল, রামচাঁদকে দেখাইয়া চড়িলেন। রামচাঁদও অপর গাড়ী লইয়া পশ্চাৎ ছুটিল। গাড়ীর ভিতর চন্দ্রা পোষাক খুলিলেন! ডফ্ সাহেবের বাড়ীর ভিতর গাড়ী প্রবেশ করিল। রামচাঁদও গোরা সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল।

এই ধরে--গাড়ী হইতে একটি স্ত্রীলোক নামিল।

গোরাদের রাগের সীমা রহিল না। রামচাঁদকে বাঁধিয়া বলিল, "বদমাস!" হিয়ারসে সাহেবের কাছে লইয়া গেল; যেমন যেমন ঘুরাইয়াছে পরিচয় দিল। হিয়ারসে সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল, বদমায়েস বটে। রামচাঁদ কেল্লার ভিতর কয়েদ রহিল।

সপ্তম বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"And will I see his face again?
And will I hear him speak?
I'm downright dizzy--wi' the thought
In troth I'm like to greet."

বিদ্রোহানল চারিদিকে প্রজ্জ্বলিত। দিল্লী, কানপুর—বিদ্রোহীর করগত । বাঙ্গালা ও বিহার কাঁপিতেছে। কানপুরে বসিয়া সোমনাথ গোঁসাইকে বলিতেছেন, "আর তিরস্কার করিবেন না। এখন কি করিতে হইবে বলুন।"

"আমি তোমায় তিরস্কার করি নাই। স্ত্রীলোকের মায়া আমি জানি। আমি স্বয়ং যদি না মায়ায় পড়িতাম, এতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন করিতে পারিতাম। কিন্তু গত কার্য্যের অনুশোচনায় প্রয়োজন নাই। তুমি যাও, কতকগুলো সাহেব, বিবি ও ছেলে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছি, ঘাটে লইয়া তাহাদিগকে বধ কর।"

"প্রভু এ কার্য্য অন্য কেহ পারে না? নিরপরাধী বালক, স্ত্রী কিরূপে হত্যা করিব?"

"এ কার্য্য তোমাকেই করিতে হইবে। এখনও তোমার হৃদয়ে কোমলতা আছে। তোমার নিকট অনেক কার্য্য প্রত্যাশা করি, তোমার দয়াই আমার বিরোধী। যাও, বিলম্ব করিও না। আমরা অদ্য রাত্রেই সেনা সজ্জিত করিয়া কলিকাতা আক্রমণে যাইব।"

গোঁসাইয়ের আদেশ অনুসারে সোমনাথ চলিলেন। তাঁহার মস্তক দিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বহির্গত হইতে লাগিল। দুর্গমধ্যে যাইয়া দেখেন, সিপাহীরা উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছে। আজ সব সাহেব, বিবি বধ হইবে! আজ ধর্ম্ম বিরোধী ম্লেচ্ছো নানা যন্ত্রণায় নিপাত হইবে!—আনন্দের সীমা নাই! খঞ্জনী বাজাইতেছে, গান করিতেছে, সকলেই উন্মত্ত! শোণিত-পিপাসা সকলেরই বলবতী! গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে। বধকার্য্য কেবল সোমনাথের উপর অর্পিত হইয়াছিল এমত নহে, গোঁসাইয়ের অভিপ্রায় এই নির্দ্দয় ব্যাপার সোমনাথ দাঁড়াইয়া দেখেন।

সোমনাথ একজনকে বলিলেন, "হনুমন্ত! আমার দশজন বিবি চাই।" হনুমন্ত উত্তর করিল, "ভাল, ভাল! তুমি ত এ কাজ করিতে না, কে তোমায় বলিল? লও—বাছিয়া লও।" দশজনকে লইয়া মাঠের দিকে চলিলেন। পথে সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় লইয়া যাও?" সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন, "কার্য্য আছে নানা সাহেব চান। তার পর বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছি। তোমরা ততক্ষণ সাবাড় কর গিয়া।

সোমনাথ সহর ছাড়াইয়া পড়িলেন। বিবিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতে পারিলে নিরাপদ হও? আমি বন্ধু, শত্রু নহি।"

বিবিরা বিষণ্ণ বদনে বলিল, "কোথায় যাইব? কে আছে? তুমি আমাদের রক্ষা কর।"

"এই ঝোপের ভিতর বসিয়া থাক।"

নিকটে একটা ঝোপ ছিল, সকলে তাহার মধ্যে বসিল। সোমনাথ ফিরিলেন। বধ্যভূমিতে যাইয়া একজন অধ্যক্ষকে বলিলেন, "পাঁড়েজী! নানা সাহেবের খাঁই আর মিটে না, আরও দশ জন চাই।" আরও দশ জন বিবিকে সঙ্গে লইলেন। কতকগুলো হিন্দুস্থানী কাপড় লইলেন। সেই ঝোপের কাছে চলিলেন, বলিলেন, "এই কাপড় পর, মাটী মাখ, ভগবান রক্ষা করুন! আমার আর অধিক ক্ষমতা নাই।" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পথে যাইতেছেন, সহসা সেই ভিখারিণীর সহিত সাক্ষাৎ। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হেথায় কেন?"

"কেন? আমার কার্য্য আছে, তোমার গোঁসাই কোথা?"

"আমার গোঁসাইয়ের সহিত কি কার্য্য?"

"বিশেষ কার্য্য। দেখিব, তোমার গোঁসাই কত নির্দ্দয়, কত শোণিত-পিপাসু। স্ত্রীলোকের শোণিত কত ভাল বাসে দেখিব। আর কোথা যাবে, ধরিয়াছি। কত দিন পলাইবে? আমি জানি, জানি; একদিন তারে ধরিব জানি। তাই জীবিত আছি, এবারে পরিশোধ দিব।"

ভিখারিণী পাগলের মত উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। চক্ষু দুইটা ঠিকরিয়া আসিতেছে। একখানি ছুরী হাতে লইয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। আবার বলিতে লাগিল, "বল, তোমার গোঁসাই কোথা? বলিবে না? আমি জানি মঠের ভিতর আছে।" ভিখারিণী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"My spirits flag, my hopes decay,
Still that dread-death-bell smites my ear,
And many a boding seems to say,
countess! prepare, thy end is near!"

ডফ্ সাহেব যেখানে সেখানে চন্দ্রার সুখ্যাতি করিয়া বেড়ান। সকলকেই বলেন, "ভারতবর্ষে এমন স্ত্রীলোক আর দেখি নাই।"

একজন মেম তাঁহার বাড়ীতে অতিথি ছিলেন—তিনি দেশভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন —বলিলেন, "সত্য বটে, যেরূপ বর্ণনা করিলেন, এরূপ স্ত্রীলোক বিরল; কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ে যখন আউটরামের বাড়ীতে আমি থাকি, তখন আমি একটী অতি বুদ্ধিমতী হিন্দু স্ত্রীলোককে দেখি। যেমন রূপ, গুণ তাহার কিছু অংশে ন্যূন নহে।"

এই কথা হইতেছে, এমন সময় চন্দ্রা আসিয়া পৌঁছিলেন। ডফ্ সাহেব অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। চন্দ্রা বলিলেন, "সাহেব, আমি বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

"কোথায় যাইবে?"

"পশ্চিমে।"

"কেন, চন্দ্রা? পশ্চিমে এখন হুলস্থূল।"

"সাহেব, আমার বিশেষ কার্য্য।"

"কি বিশেষ কার্য্য? তুমি যাইতে পারিবে না।"

"সাহেব, আমার ঠিকুজিতে লেখা আছে, ঊনিশ বৎসর বয়সের সময় আমার মৃত্যু হইবে। প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া কাশীধামে প্রাণত্যাগ করিব।"

ডফ্ সাহেব উত্তর করিলেন, 'চন্দ্রা, তোমার কুসংস্কার গেল না। ঠিকুজি কি সত্য? প্রতারক ব্রাহ্মণেরা ঐরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।"

চন্দ্রা বলিলেন, "সাহেব, এ বিষয়ে আপনার সহিত চিরদিন আমার ভিন্ন মত।"

ডফ্ সাহেব বড় দুঃখিত হইলেন। বিস্তর বুঝাইলেন, চন্দ্রা স্থিরপ্রতিজ্ঞ রহিলেন। ডফ্ সাহেব অগত্যা বিদায় দিলেন; কিন্তু কন্যাকে বিদায় দিয়া পিতা যেরূপ ব্যাকুল হয়, মহাত্মা ডফ্ ছাত্রীর জন্য সেইরূপ ব্যাকুল হইলেন। বলিলেন, "চন্দ্রা, কোনরূপেই থাকিবে না?"

চন্দ্রা বলিলেন "না।"

"তবে যাও। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।"

চন্দ্রা চলিয়া গেলেন।

বিবি বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি যে স্ত্রীলোকের কথা বলিতেছিলাম, তাহার আকার ঠিক এইরূপ। প্রথমে তাহার ভগ্নী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।"

"না, এ একজন অনাথা। ভারতের কুসংস্কার কত প্রবল দেখুন! উহার মাতা সম্পত্তি অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটারের জিম্মা দিয়া কেদারনাথ যাইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।"

"আত্মহত্যা করে?"

"আত্মহত্যা, বটে। মন্দিরের একটী দ্বার খুলিয়া যায়; আর ফিরে না। জাতীয় সংস্কার বহু দিনে দূর হয়। এত লেখাপড়া শিখিয়াছে, তবু তীর্থে চলিল।"

চন্দ্রা গাঁটরি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলেন, এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন। যে পরিচ্ছদের কথা বলিয়াছি, তাহার ভিতর একখানি কাগজ পাইয়াছিলেন। সে একখানি ঠিকুজি, চন্দ্রারই ঠিকুজি। একজন দৈবজ্ঞ ঠিকুজি দেখিয়া বলে, উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার একটী মৃত্যুবৎ ফাঁড়া আছে। যদি কাটে ত দীর্ঘজীবি হইবেন।

অচেতনপ্রায় চন্দ্রাকে যখন আমরা সন্ন্যাসীর কুটীরে প্রথম দেখি, তখনই আমরা বুঝিয়াছিলাম, তাহার হিন্দুধর্ম্মে গাঢ় ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী যখন খাবার দেন, তিনি বলেন, 'আমি হিন্দু।' তাহার একটী কারণ ছিল; যখন কোম্পানীর বাগানে যান, তাঁহার সঙ্গে বিবিরা টিফিন করে। তাঁহাকেও খাইতে বলে, তিনি খান নাই।

চন্দ্রা সন্ন্যাসীর কাছে খেদ করেন, তিনি অনাথিনী, তাঁহার সংসারে কেহই নাই। কথাটী সত্য। তিনি পিতার মুখ কখনো দেখেন নাই; এবং তাহার দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার মাতা তীর্থযাত্রা করেন। পরে চন্দ্রা পত্র পান যে, তিনি মহাপথে যাত্রা করিয়াছেন। সংসারে একাকিনী, স্ত্রীশিক্ষার তখন প্রথম প্রাদুর্ভাব। মিশনারীরা তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখায়। সংগীত ও চিত্রবিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু দেখেন যে খৃষ্টান হইতে তাঁহাকে সকলেই অনুরোধ করে। "খৃষ্টান হইব" কথাটীতে তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিত। বাল্যকালে দেখিয়াছেন, তাঁহার মাতা প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত পূজা করিতেন। স্বর্গ-কামনায় মহাপথে প্রস্থান করিয়াছেন। খৃষ্টান হইলে মানিতে হয়, তাঁহার মাতা কুসংস্কারবশতঃ আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা হিন্দু ছিলেন, কুসংস্কারবশতঃ স্বর্গে যাইতে পারেন নাই।

"কখনই না! আমার পিতা মাতা স্বর্গে!"

বিশেষ যত্নে মিশনারীরা তাঁহাকে খৃষ্টান করিতে পারে নাই। যে সময় সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহাকে লইয়া মহা পীড়াপীড়ি। সকলে ভয় দেখাইত, অনন্তকাল নরক-ভোগ। তাহাতে বালিকার মনে ভয় জন্মিত। পিতামাতা কেহই নাই, কুলবধূর ন্যায় লজ্জা সরম ছিল না। কেহ কেহ তাঁহাকে বেশ্যা মনে করিত; অনেকে পত্র লিখিত। ইহাতে তিনি আপনাকে অতিশয় হতভাগিনী বিবেচনা করিতেন।

তৎপরে চন্দ্রার সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। নূতন আশা, নূতন ভরসা মনে স্থান পায়, জীবন সম্পূর্ণ রসশূন্য নয়, জ্ঞান হয়। যখন সোমনাথের রূঢ় বচন শুনিয়া জেল হইতে ফিরিয়া আসেন, সে দিন তাঁহার হৃদয় মধ্যে মহা বিশৃঙ্খল হইল। কিন্তু মানবহৃদয়ের আশ্চর্য্য নিয়মে জীবন উদ্দেশ্যশূন্য বোধ হইল না। মনে করিতেন, একদিন

না এক দিন, সন্ন্যাসীকে বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি অন্যায় রূঢ় বাক্যে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যদি না বুঝাইতে পারেন, তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য বাকী রহিল।

অকস্মাৎ গণনায় জানিলেন, তাঁহার জীবনের দিন সংক্ষিপ্ত। প্রয়াগে স্নান করিয়া কাশীধাম প্রাপ্তি আশয়ে কাশীধামে বাস করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও মনে মনে ছিল, যে দৈবে যদি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাকে বুঝাইবেন। সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ রাজদ্রোহীরা এখন পশ্চিমাঞ্চলেই আছে। কাগজে পড়িয়াছিলেন যে, ইংরাজ-সৈন্যাধক্ষ্য হেভেলক এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছেন। সন্ন্যাসীর দেখা পাইলেও পাইতে পাবেন। আর সে পরিচ্ছদটী সন্ন্যাসী কোথায় পাইল, জিজ্ঞাসা করিবেন। সে পরিচ্ছদ পূর্ব্বে তিনি দেখিয়াছিলেন, টালার কুটীর-ঘরে সন্ন্যাসী তাহা কোথায় পাইল? নানা চিন্তায় তাঁহার মন চঞ্চল হইতে লাগিল। "চল, এলাহাবাদে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" চন্দ্রা এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন।

হাবড়ায় যাইতেছেন, দেখিলেন, যে দীর্ঘাকার ব্যক্তি সন্ন্যাসী ভ্রমে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল, সেও রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত। সত্যই রামচাঁদ বটে। রামচাঁদ কারামুক্ত হইয়াছে। দিল্লী হইতে যে চিঠি আসিয়াছিল এবং অন্যান্য পত্র যে সকল সে পায়, তাহাতে ইংরাজ-সৈন্যাধ্যক্ষের প্রত্যয় জন্মে, যে তাহাকে লইলে বিশেষ কার্য্য হইবে। রামচাঁদ যে বিদ্রোহীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এ সংবাদ কেবল সোমনাথই জানিতেন। সুতরাং বিদ্রোহীর দল যত দিন না খবর পাইয়াছিল, তাহাকে চিঠি লিখিত, তাহার আলস্যের নিমিত্ত তিরস্কার করিত। বিদ্রোহীরা সংবাদ পাইয়াছিল, বাঙ্গালায় আর শীঘ্র কিছুরই সম্ভব নাই; সিপাহীরা নিরস্ত্র হইয়াছে। বিদ্রোহীরা আর রামচাঁদকে পত্র লিখে না, কিন্তু রামচাঁদ বলে —সে সব জানেন। তাহার মনের কথা, ইংরাজেরা জয়ী হইবে, সে একটা বড়লোক হইবে। বিশেষ গোঁসাই তাহার টাকা ঠকাইয়া লইয়াছে, যেরূপে পারে, গোঁসাইকে জব্দ করিবে। ইংরাজরা তাহাকে কয়েদ করিয়াছিল জানাইয়া আবার বিদ্রোহীর দলে মিশিতে পারিবে ভাবিয়াছিল।

এক পল্টন ইংরাজ বেনারস রক্ষার নিমিত্ত যাইতেছিল, রামচাঁদ তাহাদেরই সঙ্গী। ইংরাজ-সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাস ছিল, রামচাঁদ একজন বদমায়েস, বদমায়েসের দলে অনায়াসে মিশিতে পারিবে ও সংবাদ আনিয়া দিবে। রামচাঁদকে দেখিয়া চন্দ্রার মনে উদয় হইল, সে সেই সন্ন্যাসীকে ধরিতে যাইতেছে। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় হইল ; কল্পনায় আশঙ্কা বাড়িতে লাগিল। ভাবিলেন, "কি জানি ,যদি ধরে? কোথায় যাইতেছে?" একজন সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বেনারস। ভাবিলেন—"তবে কি বেনারসে সন্ন্যাসী আছে? আমিও বেনারস যাইব।" চন্দ্রা সেনাদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেনারস গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

''শূর হ'ল নব ধরি করাল কৃপাণ,
পদ্মমুখী প্রেমের আশায়।''

রমানাথকে গোঁসাই একটী ভার দিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু কাশীতে ছিলেন, গুরুকে একখানি পত্র দিবার আবশ্যক হয়। রমানাথকে ভার দিবার প্রয়োজন, কাশীতে গোবিন সাহেবের দবদবায় বিদ্রোহীদের অনেক পত্র ধরা পড়িয়াছে; ডাকে পত্র দিবার যো নাই; স্থানান্তর হইতে হিন্দুস্থানী আসিলে পুলিশ তাহাকে ধরে, খানাতল্লাশী করে। বাঙ্গালীর উপর সে পীড়াপীড়ি নাই। পত্রে এই মাত্র লেখা, ''যদি যুদ্ধে গোঁসাইয়ের মৃত্যু হয়, এক স্থানে তাহার গুপ্তধন আছে, গুরু গ্রহণ করিবেন ও তাঁহার পিণ্ড দিবার কেহ নাই, গয়ায় পিণ্ড দিবেন।'' রমানাথ যদি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, গোঁসাই সাহস দিয়াছিলেন তাহার চন্দ্রা লাভ হইবে। কিন্তু রমানাথ যখন কাশীতে পৌঁছিলেন, তখন গোঁসাইয়ের গুরুর ফাঁসী হইয়াছে; কোথায় খুঁজিয়া পাইবেন? তথাপি খুঁজিতে লাগিলেন।

একদিন দেখেন—চন্দ্রা! ''চন্দ্রা হেথায় কেন? এত রাত্রে কোথায় যায়?'' তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আগে রামচাঁদ যাইতেছে, চন্দ্রা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছেন। এমন দিন নাই, রামচাঁদ একটাকে না একটাকে আনিয়া ফাঁসী না দেওয়ায়। চন্দ্রাও নিত্য রামচাঁদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোথায় যায় দেখেন। সন্ন্যাসী ধরা পড়িবে তাঁহার বিশেষ আশঙ্কা।

সিক্‌রোলের ক্যান্টনমেন্টের নিকট কতকগুলি মুসলমানের ঘর আছে, রমাচাঁদ সেই পাড়ায় প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রা ক্যান্টনমেন্টের নিকট বসিয়া রহিলেন—একাকিনী, আর কেহ সঙ্গে নাই। রামচাঁদ ফিরিল। সঙ্গে আর দুইজন লোক, চাঁদামারীর অভিমুখেই চলিল। চন্দ্রাও পিছু পিছু চলিলেন। এখানে নির্জ্জন স্থান, মাঠের মাঝখানে চাঁদামারী, আর জনমানব নাই। হঠাৎ রামচাঁদ ও তাহার সঙ্গের লোকেরা চন্দ্রাকে আক্রমণ করিল। মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। রামচাঁদ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বলিল, ''হারামজাদি! নিত্য আমার পিছনে পিছনে কি নিমিত্ত আসিস্? আজ জানিতে পারিবি। তুই একজন বিদ্রোহীর চর সন্দেহ নাই; কিন্তু দাঁড়া!'' রামচাঁদ চন্দ্রাকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

ক্রমে মাঠ ভাঙ্গিয়া একটা গ্রামে উপস্থিত হইল। এ একটা মুসলমান বদমায়েসের আড্ডা। রামচাঁদের কল্পনা ছিল, এই বদমায়েসের দল গ্রেপ্তার করিয়া দিবে। পূর্ব্ব দিন তাহাদের দলের একজনকে বলিয়া আসিয়াছিল যে, সে নুন্নি নবাবের লোক। কানপুরের নুন্নি নবাব তখন বড় প্রবল। রামচাঁদ বলিয়াছিল , ''তোমরা জমায়েত হও, নুন্নি নবাব আসিতেছেন।''

বেনারসে বিদ্রোহীর দমন হইলে বদমায়েসেরা নিরুৎসাহ হইয়াছিল। এই সংবাদে তাহাদের উৎসাহ বাড়িল, চারিদিক হইতে বদমায়েস আসিতে লাগিল। রামচাঁদ একত্রে

ধরাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল, তাই এত দিন কিছু বলে নাই। আজও একটা হুজুগে যাইতেছিল। চন্দ্রাকে পাইয়া বলিল, ''বদমায়েসের দল স্ত্রীলোকটাকে পাইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে থাকিবে, আমিও লোকজন আনাইয়া বাঁধাইয়া দিব।''

প্রায় দুই শত মুসলমান জমায়েত। রামচাঁদ উপস্থিত হইল, চন্দ্রাকে দেখাইয়া বলিল, ''দেখ, একটা রেণ্ডি আনিয়াছি—দেখ! এ একটা ফিরিঙ্গি!'' রং দেখিয়াই সকলে ভাবিল ফিরিঙ্গিই বটে। ''বাঃ! বাঃ!'' করিয়া চারি দিকে করতালি দিতে লাগিল। রামচাঁদ বলিল, ''স্থির হও, আমোদ করিও। যাহারা যাহারা আসিবার কথা, সকলে আসিয়াছে?''

একজন উত্তর করিল, ''হাঁ!''

''নুনি নবাব আজ রাত্রেই পৌঁছিবার কথা আছে; তোমরা সকলে প্রস্তুত থাক, আমি সংবাদ লইয়া এখনই ফিরিব।''

এই বলিয়া রামচাঁদ চলিয়া গেল।

মুসলমানেরা চন্দ্রাকে দেখিয়া হৈ হৈ করিয়া নাচিতেছে। সকলেই ভাবিতেছে, মিন্নু বক্স মোড়লকে দিবে। হঠাৎ একজন আসিয়া বলিল, ''নুন্নি নবাব আসিয়াছে, চল, আর বিলম্ব করিও না।'' মুসলমানেরা হৈ হৈ শব্দে ছুটিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, ''স্ত্রী-লোকটাকে কোথা লইয়া যাব?'' যে খবর দিয়াছিল, বলিল, ''আমি নুন্নি নবাবের তাঁবুতে লইয়া যাইতেছি।'' হৈ হৈ শব্দে মুসলমানদল চলিয়া গেল। তখন সে সংবাদদাতা চন্দ্রাকে বলিল, ''আইস ভয় নাই।'' চন্দ্রা দেখিলেন, সে ব্যক্তি পরিচিত। সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল, ''চল, এ দিকে আইস। ওদিকে মুসলমানপাড়া, ধরা পড়িবে। তোমার বাসা কোথায় বল, লইয়া যাই।'' দূরে একখানা এক্কা যাইতেছিল, সংবাদদাতা ডাকিল। এক্কা নিকটে আসিল, দুই জনে এক্কা চড়িয়া প্রস্থান করিল।

পাঠক বুঝিয়াছেন, সংবাদ-দাতা আমাদের রমানাথ। যখন রামচাঁদ চন্দ্রাকে ধরিল, তাঁহার মস্তকে বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি পিছু পিছু চলিলেন। স্বভাবতঃ ভীত ছিলেন, সহসা ভয়শূন্য হইলেন। রামচাঁদকে চিনিয়াছিলেন। স্থির করিলেন, মন্দ অভিসন্ধিতে যাইতেছে, চন্দ্রার প্রতি অত্যাচার করিবে। উহারা বলবান, কিন্তু যেরূপে হয়, চন্দ্রাকে রক্ষা করিবেন। নুন্নি নবাবের কথা শুনিয়াছিলেন। রামচাঁদ যাইবার পর তাঁহার বুদ্ধি যোগাইল—তিনি সংবাদ দিলেন। পাঠক ভাবিতেছেন, বোকার এত বুদ্ধি? আমরা কি করিব, মন্মথের দোষ দিন।

চন্দ্রা রমানাথকে চিনিতেন, গোলদীঘির ধারে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। তাঁহার কত পত্র পাইয়াছেন, বিচারের সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দেখিয়াছেন, তার পর জেলে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, ''ভগবান, এক বিপদ হইতে আর এক বিপদে পড়িলাম।'

রমানাথ নিশ্বাসের মর্ম্ম বুঝিলেন। বলিলেন, ''কোন ভয় নাই, তোমার বাসা কোথায় এক্কাওয়ালাকে আপনি বলিয়া দাও''

রমানাথের কথায় চন্দ্রার ভরসা হইল। বলিলেন, "আমার বাসা কেদারনাথের মন্দিরের নিকট।"

"আমারও বাসা মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে।" একা চলিতে লাগিল। দুইজনে নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। কিন্তু একাওয়ালা নানাবর্ণের কথা কহিতে লাগিল। তাহার পুঁটে অতি শান্ত ঘোড়া, কেবল একদিন একটা ধোবাকে চাট মারিয়াছিল, আর একটা ছেলের হাত একদিন কামড়ায়। অনেকদূরে যাতায়াত করিতে পারে। দেখ না, কানপুর হইতে আসিয়াছে, আবার কানপুরে চলিয়া যাইবে। পথে ঘাস খাওয়াইবে, নদী পাইলে জল খাওয়াইবে। ঘোড়া শুক্‌নো ঘাস খুব খায়। তাহার একার বড় ভয় নাই, দেড় বৎসরের ভিতরে পাঁচবার বই উল্টাইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাহার পুঁটের আর একার কেহ বাহবা দিল না। একাওয়ালা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া নিরস্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"One struggle more, and I am free
From pangs that rend my heart in twain
One last long sigh to love and thee,
Then back to busy life again.
It suits me well to mingle now
Which things that never pleased before:
Though every joy is fled below,
What future grief can touch me more?"

দূরে কেদারনাথের মন্দির—রমানাথ বলিলেন, "তুমি একা কি করিতে গিয়াছিলে? ও ব্যক্তি বদমায়েস, ডাকাতের সর্দার, উহাকে লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলে কেন?"

চন্দ্রা উত্তর দিলেন না।

রমানাথ বলিলেন, "আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না, কেবল তোমায় সতর্ক করিয়া দিতেছি।"

চন্দ্রা বলিলেন, "সতর্ক হইয়াছি।"

চন্দ্রা বাসায় পৌঁছিলেন, রমানাথ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভিতরে যাইতে সাহস করিলেন না। চন্দ্রা বলিলেন, "মহাশয়! আসুন, বিশ্রাম করুন।"

রমানাথ ভিতরে গেলেন। কিয়ৎকাল উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। প্রথমে চন্দ্রা বলিলেন, 'মহাশয়ের ঋণ জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না।"

রমানাথ উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন, কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। চন্দ্রা আবার বলিলেন, "মহাশয়, আমার ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন, নচেৎ আমার দশা কি হইত? আমি আপনার কাছে চিরঋণী।"

এবাব বমানাথ উত্তর করিলেন, ''চন্দ্রা! ঋণী কি? কাহার নিকট ঋণী? আমি—আমাব দেহ, প্রাণ, মন আর কিছুই নাই! আমি পুত্তলির ন্যায় ফিবিতেছি। তোমার নিমিত্ত ডাকাত হইয়াছি, চোর হইয়াছি, সন্ন্যাসী হইয়াছি। একমাত্র তুমিই আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ। সংসারে আমার কিছুই নাই! তুমি আমার হইবে, তোমায় পাইব, এই আমার আশা। কি নিমিত্ত পশ্চিমে আসিয়াছি শোন, —যে সন্ন্যাসী তোমার প্রেমের পাত্র, তার পদে তোমায় ভিক্ষা লইব, এই ভরসায় বিদ্রোহীদিগেব সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। চন্দ্রা, তুমি কি আমার হইবে?''

চন্দ্রার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কি বলিবেন, কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির কবিতে পারিলেন না। বমানাথ আবারা বলিলেন, ''বল —নবক ও স্বর্গের মধ্যস্থলে প্রতীক্ষা কবিতেছি —বল, কোথায় যাইব? —তোমাব উত্তরের উপব নির্ভর!''

চন্দ্রা অতি বিনয়ে উত্তব কবিলেন, ''মহাশয়, আমার জীবনদাতা, ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা।'' চন্দ্রা জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, ''মহাত্মন! নিজগুণে মার্জ্জনা করুণ। আমি আমার নহি, আপনার হইব কি?''

রমানাথ হাত ধরিয়া তুলিতে যাইতে নিরস্ত হইলেন, বলিলেন, ''উঠ, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী —আরাধ্য দেবতা! আমার সম্মুখে জানু পাতিও না।''

চন্দ্রা উঠিলেন, রমানাথ বলিলেন, 'আসি।' দ্বাবেব নিকট গিয়া আবাব ফিবিলেন, বলিলেন, 'যদি কখনও আমার মৃত্যুসংবাদ পাও, একবাব মনে করিও—তোমায় ভাবিতে ভাবিতে মবিয়াছি।'

রমানাথ দীর্ঘপদে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

রমানাথ ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলিলেন। প্রভাত নিকট । নানাবিধ গান কবিতে করিতে কাশীবাসীরা গঙ্গাস্নানে যাইতেছে। 'শিব শিব' রবে বারাণসী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ক্রমে কোলাহল বাড়িল। যুবতী-বদনে লজ্জারাগের ন্যায় প্রভাত-গগন রঞ্জিত হইল; দিক্ প্রকাশ পাইল। রমানাথ ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে চলিলেন। ক্যান্টনমেন্টে একজন গোবা পাহারা ছিল, তাহাকে বলিলেন, 'ব্রিগেডিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিব।' ব্রিগেডিয়াব প্যারেড-ভূমিতে আসিতেছিল, রমানাথ সেলাম করিয়া বলিল, 'আমি যুদ্ধ করিব, সৈন্যভুক্ত কবিয়া নিন।' ব্রিগেডিয়ার সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ''বাবু বড়ই দুঃখিত হইলাম, আপনাকে লইতে পাবিলাম না'' হাসিতে হাসিতে ব্রিগেডিয়ার সাহেব চলিয়া গেল। বমানাথ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন, তাঁহার নামে একখানি পত্র আসিয়াছে। পত্রে লেখা, ''মহাশয়! কালি পরিচয় দিই নাই, কি নিমিত্ত মন্দলোকের পশ্চাতে রাত্রে ঘুরিতে ছিলাম। লজ্জায় পবিচয় দিতে পারি নাই। আমি কোন কারণে জানিয়াছিলাম যে, ঐ দস্যু সন্ন্যাসীর শত্রু। সন্ন্যাসীকে ধরাইয়া দিবে। কি জানি আমার মনে হইয়াছিল যে, সে সন্ন্যাসীও কাশীতে আছে। অধিক বলিবাব নাই, মার্জ্জনা করুন।—চন্দ্রা!''

রমানাথ সেই দিনই কানপুর যাত্রা করিলেন।

অষ্টম বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"—She, whom once the semblance of scar
Appall'd, an owlet's larum chill'd with dread,
Now views the column—scattering bay'ner jar,
The falchion flash, and o'er the yet warm dead
Stalks with Minerva's steps where
Mars might quake to tread."

রামচাঁদ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, গোঁসাই জানিয়াছিলেন। প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত শান্তকে যত্ন করিয়া রাখিলেন। কানপুরের নিকট একটী কুটীরে শান্ত অবস্থান করিতে লাগিল।

এদিকে ইংরাজ-সৈন্য এলাহাবাদে পৌঁছিল, রামচাঁদ সঙ্গে চলিল। জাঁদরেল হেভেলক রামচাঁদের প্রতি একটি ভার অর্পণ করিলেন, "দেখ, কানপুর হইতে বিদ্রোহী সেনা আসিতেছে; তুমি যদি সমস্ত সংবাদ আনিতে পার, বিশেষ পারিতোষিক পাইবে।" রামচাঁদের এ কার্য্যে কিছু ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু স্বীকার করিলেন। বড় সতর্ক হইয়া চলিলেন। পথে আমাদের পরিচিত ভিখারিণীর সহিত সাক্ষাৎ। ভিখারিণী দেখিবামাত্র রামচাঁদকে চিনিতে পারিল, রামচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও, কি তত্ত্ব অনুসন্ধান কর? আমি তোমায় সমস্ত সংবাদ দিতে পারি। বিদ্রোহীরা কোথায় জানিতে চাও? এলাহাবাদ অভিমুখে আসিতেছে। তোমার সাহেবকে সংবাদ দাও। যদি মিথ্যা আশঙ্কা কর, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। সাহেবের তাঁবুতে থাকিব, মিথ্যা হয়, সাহেব আমাকে ফাঁসী দিবেন।" রামচাঁদ ইংরাজের আচরণে বুঝিয়াছিলেন যে, মিথ্যা সংবাদ দিলে আর নিস্তার নাই। সুতরাং এ সংবাদের নিমিত্ত স্বয়ং দায়ী হইতে পারিলেন না। ভিখারিণীকে লইয়া হেভেলক সাহেবের নিকট গেলেন। ভিখারিণী বলিল, "সাহেব, আজই যাত্রা কর, নচেৎ বিদ্রোহীরা চারিদিক হইতে ফতেপুর আসিয়া জমায়েত হইবে। ফতেপুরের লোকেরাও তোমাদের বিরুদ্ধ। বিদ্রোহীরা আগে আসিলে সকলেই তোমাদের বিপক্ষ হইবে।"

হেভেলক ভাবিলেন, "সত্য, ফতেপুরের লোক সকলেই বিরুদ্ধ বটে।"

ভিখারিণী বলিতে লাগিল, "সাহেব কি ভাবিতেছ? তোমাদের কামান প্রস্তুত নাই, তোমার লেফ্‌টেনেন্ট সাহেবের সহিত মিলিত হও; তাহার নিকট কামান আছে। আজ না যাত্রা করিলে যাইতে পারিবে না।"

হেভেলক আরও আশ্চর্য্য হইলেন, সৈন্যের গতি ভিখারিণী ঠিক দেখিয়াছে।

ভিখারিণী বলিতে লাগিল, 'আকাশের পানে দেখিতেছ কি? সময় যাইলে আর ফিরিবে না। আরও শুন, তোমার লেফ্‌টেনেন্ট ফতেপুরের নিকট আড্ডা লইবেন। বিদ্রোহীর বহু সৈন্য আসিতেছে। তোমার লেফ্‌টেনেন্ট সাহেব ব্যতীত সসৈন্য মারা যাইবে।"

হেভেলক চমকিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তুমি কে?''

''আমি ভিখারিণী।''

''কিরূপে জানিব—তুমি শত্রুদলস্থ নও?''

''শত্রুর দলস্থ কে? কে আমায় ভিখারিণী করিয়াছে, কে আমায় কুসুম-শয্যা হইতে উঠাইয়া কণ্টক-শয্যায় বসাইয়াছে? সাহেব! তোমার বড় ভয়, আমি শত্রুর পক্ষ।'' ভিখারিণী উচ্চহাস্য করিয়া বলিতে লাগিল, ''আজ ৭ই, যদি দিন রাত চল, ১২ই তারিখে তোমার লেফ্‌টেনেন্টের সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে পারিবে।''

হেভেলক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন—যথার্থ। ঘোরতর অন্ধকার, মুখলধারে বৃষ্টি হইতেছে, হেভেলক সেনাদিগকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন। ইংরাজ-সৈন্য ফতেপুরের নিকট পৌঁছিয়াছে মাত্র, সংবাদ পাইল—শত্রু আসিতেছে। হেভেলক ভাবিল, ভিখারিণী মানুষ নয়।

বিদ্রোহীরা বায়ুবেগে আসিয়া আক্রমণ করিল। ঝড়ের মুখে যেমন ধূলারাশি উড়িয়া যায়, মেজর রেনল্ডের সৈন্যেরা শত্রু আক্রমণে সেইরূপ পলাইতে লাগিল। উৎসাহে বিদ্রোহীরা নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা সত্রাসে শুনিল, পশ্চাতে গভীরনাদে তোপধ্বনি হইতেছে। শত্রুরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। রেনল্ডের সৈন্য দলবদ্ধ হইবার সাবকাশ পাইল। অভ্রান্ত লক্ষ্যে মড্‌ সাহেবের পবিচালিত গোলন্দাজেরা শত্রুমধ্যে গোলা চালাইতে লাগিল। হেথা সেথা সর্ব্বস্থানেই গোলা,—বিরাম নাই, ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে, চারিদিকে মৃত্যু বিস্তার করিতেছে, তথাপি বিদ্রোহীরা সমর পরিত্যাগ করিল না। এবার বিদ্রোহীশ্রেণী হইতে উত্তর আসিল। অতি কঠোর নাদে কামানের প্রতিকূলে কামান গর্জ্জিল। শত্রুপক্ষে উত্তরোত্তর গর্জ্জন বাড়িতে লাগিল। হেভেলক সাহেব পদাতিক সৈন্য অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন। দৃঢ় লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পদাতিকদল বিপক্ষ গোলন্দাজেব প্রতি গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। শন্‌ শন্‌, ঝাঁকে ঝাঁকে, পক্ষের ন্যায় গুলি চলিল। ক্রমে এ কামানে শব্দ নাই—ও কামানে শব্দ নাই। শত্রুরা একে একে গুলি সমাকীর্ণ স্থান পরিত্যাগ করিল। তখন সেই ভীষণ রণভূমে ভীষণ কামানধ্বনি হইতে উচ্চৈঃস্বরে গোঁসাই চীৎকার করিতে লাগিল, ''পলাইও না! অল্পমাত্র শত্রু, এইক্ষণেই পরাজয় করিব।'' কোষমুক্ত তরবারিহস্তে শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভীমনাদে ফিরিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা আবার দাঁড়াইল, সহরের ভিতর, উদ্যানের আড়াল হইতে তোপ ছাড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মড্‌ সাহেব অসামান্য দক্ষতার সহিত পশ্চাদ্‌ভাগে কামান লইয়া স্থাপিত করিলেন। সম্মুখে প্রস্তর-প্রাচীরবৎ দাঁড়াইয়া পদাতিক গুলি বৃষ্টি করিতেছে; বিদ্রোহীরা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলাইল। এবারে অশ্বারোহী আক্রমণে ধাবিত হইল। সহসা দশ জন অশ্বারোহী ইংরাজ অশ্বারোহীর গতিরোধ করিল। বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় শত্রুর তরবারি চমকিতে লাগিল। অশ্ব, আরোহী কদলীর ন্যায় পড়িতে লাগিল। প্রাণপণেও ইংরাজ অশ্বারোহী সিপাহীদের পশ্চাৎ ধাবমান হইতে পারিল না। বিদ্রোহীরা পলাইবার সাবকাশ পাইল, অশ্বারোহীগণও বায়ুবেগে পলায়ন করিল। ইংরাজের প্রথম জয়লাভ হইল।

যুদ্ধ জয় হইয়াছে। হেভেলক অশ্বের ঘাড়ের লোমে শোণিতসিক্ত তরবারি মুছিতেছেন, দেখেন—সেই ভয়ঙ্কর ভূমে সেই ভিখারিণী।

"সাহেব কি সাবকাশ পাইয়াছ? পশ্চাদ্ধাবমান হও! শত্রুদিগকে দলবদ্ধ হইতে দিলে পাণ্ডুনদী কিরূপে পার হইবে?"

হেভেলক আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন, এ রণকৌশল কোথায় শিখিল?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"Was it is a vision, or a waking dream?"

পাণ্ডুনদী খরতর বেগে বহিতেছে। কূলে রুদ্ধশ্বাসে বিদ্রোহীসৈন্য ইংরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। গোঁসাই বলিলেন, "সোমানাথ! তুমি আমার দুইটী আজ্ঞা পালন কর নাই। প্রথম আজ্ঞা, আমি সেই পাপীয়সীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তোমায় মানা করিয়াছিলাম, কিন্তু শোন নাই, সাক্ষাৎ করিয়াছিলে।"

সোমনাথ কুণ্ঠিত হইযা উত্তর করিলেন, "প্রভু! বার বার লজ্জা দিবেন না।"

"দ্বিতীয় আজ্ঞা হেলন করিয়া বিবিদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলে, কিন্তু তোমার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হয় নাই। কেবল একজন বিবি পলাইয়াছে, আর সকলকেই বধ করিয়াছি। তৃতীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে কি? দেখ সোমনাথ! আমার মৃত্যু নিকট, চতুর্থ আদেশ করিতে পারিব না।"

"প্রভু, কি আজ্ঞা করুন। কিন্তু মৃত্যু হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন?"

"আমি 'কাল' দেখিয়াছি—কালরাত্রে 'কাল' দেখিয়াছি!"

"এ কি কথা:"

"কি কথা নয়, অনেক কথা। কাল রাত্রে ঐ বৃক্ষের তলায় আমার 'কাল' বসিয়াছিল। ঐ খানেই আমার মৃত্যু হইবে। শোন, আমার আদেশ শোন,—বিশ্বাসঘাতক রামচাঁদ ইংরাজসৈন্যের মধ্যে আছে। উহাকে তোমায় বধ করিতে হইবে।"

"প্রতিজ্ঞা কিরূপে করিব? জয়ী না হইলে ত উহাকে পাইব না?"

"উপায় আছে।"

"কি উপায় বলুন?"

"আগে প্রতিজ্ঞা কর, যদি তাহাকে পাও, তবে বধ করিবে?"

"অবশ্য করিব।"

"শোন, এই রামপদক নাও।"

রামপদক দেখিয়া সোমনাথ বিস্মিত হইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "বিস্মিত হইবার কথা নাই। আর শুন, এই পত্রখানি সঙ্গে রাখ। এই পত্রের সহিত এই পদকখানি পাঠাইয়া দিবে, তাহা হইলে তোমার নির্দিষ্ট স্থানে দুরাচার আসিবে। পত্র খুলিও না।"

সোমনাথ পদক ও পত্র লইয়া বুকের ভিতর রাখিলেন, বলিলেন, ''অনুগ্রহ করিয়া বলুন, 'কাল' কিরূপ দেখিয়াছেন ?''

''ঐ বৃক্ষের গায়ে দেখ, লেখা আছে, 'জনার্দ্দন, তোমার মৃত্যু নিকট।' যার হস্তাক্ষর, সে বহুকাল মৃত। আমার নাম জনার্দ্দন।''

''প্রভু! আপনার নাম জনার্দ্দন ?''

''হাঁ! কি জানি, কোথা হইতে আমার প্রাণে কোমলতা উদয় হইতেছে। যেন হৃদয় পরিপূর্ণ, অনেক মৃত ছবি সম্মুখে আসিতেছে। প্রথমে সেই কারাগার দৃশ্য!''

গোঁসাই করযোড় করিয়া, ''পিতঃ! পিতঃ!'' বলিয়া নমস্কার করিলেন।

''সে অস্পষ্ট স্বর এখনও শুনিতেছি। মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, সেই মলিন বদন এখনও দেখিতেছি। এখনও শুনিতেছি, 'জনার্দ্দন! বিনা অপরাধে কারাগারে আমার প্রাণ গেল। প্রতিশো ও—ও—ধ'!''

''প্রভু, আপনার পিতা কে ?''

''আমার জন্মদাতা পিতা নয়, কিন্তু অন্নদাতা জন্মদাতার অধিক।'' গোঁসাই করযোড়ে জানু পাতিয়া বলিতে লাগিলেন, ''পিতঃ! পিতঃ! কেবল একটী মাত্র অপরাধ করিয়াছি। চঞ্চল প্রাণ স্থির করিতে পারি নাই; যুবতীর বিলোল কটাক্ষে ভুলিয়াছিলাম—কে জানিত তাহার দংশনের জ্বালা চিরদিন ভোগ করিব ? পিতঃ! সে পাপের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।'' সোমনাথের পানে চাহিয়া কহিলেন, ''দেখ, আর একটি কাজ যদি পার।''

''মহাশয়, আজ্ঞা করুন।''

''আমার 'কাল' কে শুনিবে, শোন!—আমি সন্ন্যাসী হইয়া বেড়াই, প্রতিহিংসা-তৃষা প্রবল। পারস্যরাজ্যের বাৎসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, পাঞ্জাবে এক বাড়ীতে অতিথি হইলাম। আমি গান করিতেছি—যুবা বয়সে সুকণ্ঠ ছিলাম—সহসা দেখিলাম যেন, কোন দেবী আমার সঙ্গীতে মোহিত হইয়া স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। দেবীও গান গাহিল, দুটী গানই তোমাকে শিখায়াছি। যদি আমার মৃত-দেহ পাও, আমার শোণিতে আমার বুকে সেই গান দুইটী লিখিয়া দিও; আর যদি কখনও তোমার সুদিন হয়, আমাব মৃত্যু-তিথিতে গান করিও। পরে পরিচয় পাইলাম—দেবী নয়, সেই গৃহস্থের কন্যা। সন্ন্যাসী ছিলাম, গৃহী হইলাম, তাহাকে লইয়া পলাইয়া আসিলাম। আমার পিতার অর্থ ছিল, জায়গা জমী কিনিয়া সুখসচ্ছন্দে বাস করিব ভাবিলাম। প্রতিহিংসা ভুলি নাই, ভাবিলাম—সন্ন্যাসী হইয়া কার্য্য কবিতেছি, সমাজে মিশিয়া কার্য্য করিব। কিন্তু সমাজে মিশিতে পাবিলাম না। পাপ কথা চাপা থাকে না, লক্ষ্ণৌয়ে সমস্ত কথা প্রচার হইল।''

''আপনি তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই ?''

''বিবাহ করিয়ছিলাম। প্রথমে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া পরিচয় দিই। পাঞ্জাবী প্রকাশ হওয়ায় সকলে ভাবিল, বিবাহ করি নাই। এই সময় তালুক লইয়া সংরাজের সহিত বিবাদ হয়। একজন অত্যাচারী কর্ম্মাধ্যক্ষকে বধ করি। অযোধ্যার তালুকদারের প্রতি অত্যাচারের

কথা তোমায় বলিয়াছি। আমায় লুক্কায়িতভাবে অবস্থান কবিতে হইল। এক দিন রাত্রি দুই প্রহরে স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। ওহো! হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমার বসিবার ঘরে সেই পাপিনী ও একজন ম্লেচ্ছ বসিয়া কথা কহিতেছে। সেই অবধি আবার সন্ন্যাসী হইলাম। কয় বৎসর পরে সংবাদ পাই, সে পাপীয়সী মরিযাছে। কিন্তু তাহাব হস্তাক্ষব কাল রাত্রে আসিতে আসিতে দেখিলাম।''

সোমনাথ স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

হঠাৎ রণঢোলের শব্দ হইতে লাগিল। ঘোড়সওয়ার আসিযা সংবাদ দিল ''ঝালারাও সেনা লইয়া আসিতেছেন।'' সোমনাথ ও গোঁসাই ঝালারাওব সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইয়া যাইবেন ভাবিতেছেন, একখানি এক্কা আসিয়া পৌঁছিল। এক্কাব আরোহী রমানাথ। সোমনাথকে দেখিবামাত্র রমানাথ বলিলেন, ''সন্ন্যাসী, আমায় চিনিতে পার?'' দেখিবামাত্র সোমনাথ চিনিলেন; চন্দ্রাব কথা মনে পড়িল, মনে বিষ উদয় হইল। কিন্তু এরূপ আগ্রহের সহিত রমানাথ সৌহার্দ্দ্য যাচ্ঞা কবিলেন, সোমনাথ কিছুই বলিতে পাবিলেন না। রমানাথ বলিতে লাগিলেন, ''আমি তোমাদেব দলভুক্ত হইযা যুদ্ধ করিব।'' এই কথোপকথন হইতেছে, এক্কাওয়ালা একটা সোণাব ফুল দিযা বলিল, ''মহাশয়! সেই যে দিন আপানাকে ও সেই স্ত্রীলোপকটীকে মাঠ হইতে আনি, এই ফুলটী পড়িযা গিয়াছিল।'' ফুলটী হাতে দিল। সোণার ফুল, নাম লেখা ''চন্দ্রা।'' সোমনাথেব দৃষ্টি পড়িল, সোমনাথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''চন্দ্রাকে রাখিযা যুদ্ধ করিতে আসিযাছ?'' রমানাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ''তুমি কি বলিতেছ?''

''বলিতেছি, যাহার মাথার এই ফুলটী, যাহাব সহিত এক্কা চড়িযা মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলে, তিনি কি তোমার সঙ্গে আছেন?''

রমানাথ কি অবস্থায় চন্দ্রার সহিত এক্কা চড়িয়াছিলেন—বর্ণনা করিলেন, পত্র দেখাইলেন, কিন্তু সোমনাথের প্রত্যয হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'Strike, till the last warmed foe expires!
Strike for your altar and your fires!
Strike for the green graves of your sires!
God and your native land''

কানপুরের মাঠে আমরা ভিখারিণীকে উন্মত্তা দেখিয়াছিলাম। দূবে গোঁসাইকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতে দেখিতে একটা গলির বাঁকে গোঁসাই কোথা লুকাইযা গেল, ভিখারিণী আর দেখিতে পাইল না। আড্ডায় আড্ডায় খুঁজিতেছে; সকল স্থানেই উন্মত্ত সৈন্য, কেহ ধাক্কা দিল, কেহ মারিল। তাহার তত্ত্বের কেহ উত্তর দিল না। তাব পর সন্ধান পাইল, নানাসাহেবের তাঁবুতে; সেথায নাচ হইতেছে, সরাব চলিতেছে,

কার সাধ্য প্রবেশ করে? সেথাও মার খাইয়া ফিরিল, কিছু দূরে অপেক্ষা করিয়া রহিল, গোঁসাই বাহিরে আসিবে। দেখা পাইল না। একজনের নিকট শুনিল, গোঁসাই তাঁবুতে নাই। সৈন্য মধ্যে গিয়াছেন। তিল মাত্র অপেক্ষা না করিয়া তথায় চলিল। খবর পাইল, তথায় আছেন। বহুকষ্টে সংবাদ দিল, একজন ভিখারিণী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চায়। গোঁসাই এলাহাবাদ আক্রমণের উদ্যোগে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, বলিলেন, "দূর করিয়া দাও!" ভিখারিণী আবার সংবাদ পাঠাইল, "কোন মতে ছাড়ে না, একবার দেখা করিতে চায়।" "কিছু দাও, দিয়া বিদায় কর।" আজ্ঞামত অর্থ দিতে গেল, ভিখারিণী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, বলিল, "না, আমি দেখা করিব।" ইহাতে আবার প্রহার খাইল, তবু ছাড়িল না। সকলে পাগল বিবেচনা করিল। অনেক বিনয় করাতে আবার গোঁসাইকে সংবাদ দিল। এ সময়ে গোঁসাইয়ের মন বড় উদ্বিগ্ন ছিল, বলিলেন, "গাছে বাঁধিয়া প্রহার করিয়া বিদায় দাও।" সকলে সেইরূপ করিল। ভিখারিণীর রাগের সীমা রহিল না, আর সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিল না।

যখন বিদ্রোহী সৈন্য হেভেলককে আক্রমণ করিতে যায়, ভিখারিণী সন্ধান লইয়াছিল—কোথায় যাইতেছে, কিরূপে আক্রমণ করিবে। সিপাহীরা জয়োন্মত্ত, বাজারে বাজারে বলিয়া বেড়াইতেছে, "আমরা এলাহাবাদ আক্রমণে যাইতেছি।" ইহাতে ভিখারিণী সমস্ত সন্ধান পায় ও হেভেলককে সমস্ত সন্ধান দেয়। ফতেপুরের যুদ্ধের পর দেখিল এয়ং গ্রামে পলায়িত সৈন্য সমাবেশিত হইল; আবার সন্ধান নিল, ইংরাজরোধের কিরূপ কল্পনা। আবার হেভলককে সংবাদ দিল। কিন্তু যখন ইংরাজ-সৈন্য সিপাহীর কাছাকাছি হয়, ভিখারিণীর ভাবের পরিবর্ত্তন হইল,—"কি সর্ব্বনাশ করিতেছি! আর এ কাজ করিব না! যাই, গোঁসাইয়ের পায়ে ধরিয়া বলি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" আবার ক্রোধের উদ্রেক হইতে লাগিল, আবার নরম হইল।

একটী বৃক্ষের তলায় ভিখারিণী বসিয়া নানাবিধ ভাবিতেছিল। অশ্বের পদশব্দে চাহিয়া দেখে—হেভেলক। হেভেলক বলিল, "কি করিতেছ? যুদ্ধ নিকট, দেখিবে আইস। তুমি অতিশয় ইংরাজ-বৎসল। দেখিবে আইস, দুরাচারদিগকে কিরূপে দণ্ড দিই।"

ভিখারিণী বলিল, "না, আর আমি যাইব না। এবার আমি সিপাহীর দিকে।" হেভেলক মুখের উপর এই উত্তর শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, অভ্যাসবশতঃ তরবারে হস্ত পড়িল। পরক্ষণেই ভাবিলেন, "এ কি অদ্ভুত প্রকৃতি! জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এবার সিপাহীর দিকে হইলে কেন?"

"হই নাই, হইব ভাবিতেছি।"

"তোমার পিঠে দাগ কিসের?"

বলিবামাত্র ভিখারিণীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। বড় চোখ,—যেন ফাটিয়া পড়ে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। বিকট বদনে বায়ু টানিয়া মুষ্টিবদ্ধ কর উত্তোলন করিয়া চীৎকার লাগিল, "না—না, আমি সিপাহীর দলে না। তোমার তোপ নদীর ধারে

লইয়া যাইয়া কি করিবে? এয়ং গ্রামের উপর আন, নহে ত এখনই সর্ব্বনাশ হইবে, পাছু হইতে আক্রমণ করিবে।''

হেভেলক ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এয়ং গ্রামে বিদ্রোহী আছে? আমার সৈন্যেরা পাণ্ডুনদীর ধারে দেখিয়াছে।''

''উচ্চগ্রাম, কে গ্রামের ভিতর গিয়াছিল? ঐ দেখ না গ্রাম গাছে গাছে ঢাকিয়াছে।''

হেভেলক দেখিলেন সত্য, যদি বিদ্রোহীর মধ্যে কিছু রণ-কৌশল থাকে, সে গ্রামেই অবশ্য শত্রু আছে। বলিলেন, ''ভিখারিণি! তুমি বড় কার্য্য করিলে, কি চাও? যাহা চাও, গবর্ণরকে বলিয়া তাহাই দেওয়াইব।''

''তোমাদের জয়লাভ হউক—এই চাই, আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হউক—এই চাই। দেখিতেছ না, বিনা অপরাধে আমার পৃষ্ঠে শোণিত পড়িতেছে। শোণিত! শোণিত! শোণিত চাই।'' বলিতে বলিতে ভিখারিণী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল।

হেভেলক তৎক্ষণাৎ মড্ সাহেবকে আজ্ঞা দিলেন। কিছু পরেই ইংবাজ-তোপ মহানাদে এয়ংয়ের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা প্রস্তুত ছিল না, পাণ্ডুনদীর উপর আক্রমণ হইবে জানিত। বিদ্রোহীরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিল।

তোপধ্বনি হইতেছে, বিদ্রোহীরা তাঁবু, বারুদ, কামান, গোলাগুলি ফেলিয়া পলাইতেছে। সোমনাথ গোঁসাইকে বলিলেন, ''আমাদের কৌশল বিফল হইল, এয়ংএর উপর আক্রমণ। এ পারে থাকিলে সমস্ত সৈন্য নষ্ট হইবে। এখনও ইংরাজ দূরে আছে, তাহাদের অশ্ব সৈন্য মজবুত নহে, আমরা পার হইতে পারিব। নদীর যেরূপ অবস্থা, পোল ভাঙ্গিয়া দিলে শীঘ্র তাহারা এ পারে আসিতে পারিবে না।''

গোঁসাই ঝালারাওর সহিত পরামর্শ করিলেন। ঝালারাও বলিল, ''ঐ পারে চল।''

ধীরপদে ইংরাজ সৈন্য আসিতেছে, মধ্যাহ্ন-তপনে অস্ত্র সকল ঝক্-মক্ করিতেছে, দলে দলে চতুষ্কোণ হইয়া অগ্রসর হইতেছে। রমানাথ সোমনাথকে বলিলেন, ''যুদ্ধ নিকট, আমি তোমার নিকট থাকিব।''

''না—না, হেথায় থাকিও না। শীঘ্র সমবানল এই স্থানেই প্রজ্বলিত হইবে। এই স্থলে ইংরাজ কামান স্থাপন করিতে পারিলে আমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিবে। দেখ, দূরে দেখ! চতুর্দ্দিক হইতে এই স্থান লক্ষ্য করিয়াই সেনা আসিতেছে। ঐ দেখ, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ইংরাজের কামানশ্রেণী অগ্রসর হইতেছে। তুমি ওপারে যাইতে পারিবে না। পোল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে এ স্থান হইতে তাড়াইতে পারিলে ইংরাজরা ওপারে সহজে যাইবে। তুমি বিলম্ব করিও না, শীঘ্র এ স্থান হইতে যাও, ক্ষণমধ্যেই তোপ নিকটবর্ত্তী হইবে।''

রমানাথ সোমনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, ''আমি এই স্থানে মরিব, আমায় বাধা দিও না।''

দেখিতে দেখিতে কালানল চমকিতে লাগিল। ঝাঁকে ঝাঁকে সংহাররূপী গোলা আসিতে লাগিল। বিদ্রোহীশ্রেণী হইতে মহাদম্ভে কামান গর্জ্জিল। ইংরাজের গোলায় সোমনাথের

সৈন্যের বিশেষ হানি হইল না। উচ্চভূমি, চারিদিকে মৃত্তিকার প্রাচীর ও বৃক্ষ থাকায় ইংরাজ-গোলন্দাজের চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল, সাংঘাতিক লক্ষ্যে বিদ্রোহী-কামান তিন চারি দল চতুষ্কোণবদ্ধ শ্রেণী ক্ষয় করিল। পদাতিক এনফিল্‌ড বন্দুক হস্তে অগ্রসর হইল। তথাপি উচ্চভূমি,—কিছুই করিতে পারে না। এবার সঙ্গীন লইয়া ইংরাজ ছুটিল। সোমনাথ চীৎকার করিয়া সেনাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, "এই আক্রমণ নিবারণ কর, এখনই ইংরাজ পদানত হইবে।"

ইংরাজ পৌঁছিল। মিশামিশি মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। আর্ত্তনাদ সিংহনাদে রণস্থল ভরিয়া গেল। কেহই হটে না, যেন দলবদ্ধ মহিষে মহিষে যুদ্ধ হইতেছে। এক পদ ভূমির নিমিত্ত শত শত ব্যক্তি প্রাণ দিতে লাগিল। ক্রমে ইংরাজ প্রবল হইল, মহাবায়ুর ন্যায় বল বাড়িতে লাগিল। সোমনাথ চাহিয়া দেখেন, তখনও পোল ভাঙ্গে নাই। ইংরাজকে নিবারণের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন, চীৎকার শব্দে সেনাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, "ভয় নাই, এখনই ইংরাজ পরাজিত হইবে।" কিন্তু সকলই বিফল, বিদ্রোহী ভঙ্গ দিল। সোমনাথ দেখেন, তখনও পোল ভাঙ্গে নাই, ভগ্নশ্রেণী সিপাহী পোলের উপর দিয়া পলাইতেছে। সর্ব্বনাশ! পিছু পিছু ইংরাজ পার হইবে। দ্রুত অশ্ব-সঞ্চালনে পোলের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইংরাজেরাও দ্রুতপদে আসিতেছিল, মৃত্যু সঙ্কল্প করিয়া সোমনাথ অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন, যুদ্ধ প্রতীক্ষায় তরবারের ধার দেখিতেছেন—পাশে রমানাথ! সোমনাথ বলিলেন, "যাও, শীঘ্র ও পারে যাও! শীঘ্র ও পারে যাও, আমি এই স্থানে প্রাণ দিব।"

"আমি তোমার পাশে রহিলাম।"

বলিতে বলিতে ইংরাজ আসিয়া পড়িল। সম্মুখে পশ্চাতে অধ্যক্ষেরা গর্জ্জন করিতেছে, "কয়জন সৈন্যমাত্র, পদে দলিত করিয়া পার হও, এই কানপুরের পথ!" শত হস্তে সোমনাথ সৈন্যস্রোত প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি গাত্র ঘর্ষণ করিয়া, কাণের নিকট ডাকিয়া, মস্তকের উপর দিয়া চলিতে লাগিল, তথাপি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন না। হঠাৎ পোলের একধার ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া গেল।

মড্‌ সাহেবের বজ্রনাদী কামান সকল উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত হইয়া, ঝালারাওর সৈন্য বিদলিত করিতে লাগিল। ইংরাজ-সৈন্য এপারে ওপারে পার হইতেছে, পলায়িত সৈন্যের পশ্চাৎ আশোয়ার ছুটিতেছে। বিদ্রোহীদলস্থ এক ব্যক্তি দুই হস্তে দুইখান তরবারি লইয়া চালিতে চালিতে পোলের অপর পারে ইংরাজ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। চারিদিক হইতে অস্ত্র বরিষণ হইতে লাগিল, ভ্রূক্ষেপ নাই! অস্ত্র চালিতেছে, গুলি লাগিয়াছে, কাতর নয়! অস্ত্র চালিতেছে, আশে পাশে সম্মুখে শত্রু পড়িতেছে। শত্রু-শোণিত প্লাবিত, শত্রু-অস্ত্রলেখায় ভূষিত, শত্রু-শবের উপর গোঁসাই উপুড় হইয়া পড়িলেন—যেন পরাজয়ে লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডুনদীর সমর অবসান হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"Come to the bridal chamber, Death!"

যামিনী ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। অবিরাম পাণ্ডুনদী কূলে প্রতিঘাত করিয়া বহিতেছে। ক্ষীণ চন্দ্রালোক কাঁপিয়া কাঁপিয়া নামিতেছে। গাছের পাতা নড়ে না। কেবল মাংসজীবীব কলরব। গৃধ্রের চঞ্চুধ্বনি! কদাচিৎ কোন মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ! প্রেতের ন্যায় রণভূমে কে? বিভীষিকা মূর্ত্তি, হাতে মশাল, এখানে ওখানে খুঁজিতেছে। "এই, —এই আমার প্রাণনাথ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নীরব ভূমি প্রতিধ্বনিত হইল। কলনাদে পাণ্ডুনদী বহিতে লাগিল। "এই—এই আমার প্রাণনাথ!" ভিখারিণী গোঁসাইয়ের মস্তক কোলে লইয়া বলিল, "একবার চাও, একবার কথা কও। অনেকদিন বিরহ সহিযাছি, একটী কথা কও!" গোঁসাই এখনও জীবিত—যেন এই কথা বলিবার জন্যই জীবিত ছিলেন; ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কেও তারা?"

গোঁসাই মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

ভিখারিণী উন্মাদিনীর ন্যায় বলিল, "আবার কথা কও—আবার কথা কও! চল, একত্রে যাই।"

ভিখারিণী বুকে ছুরি মাবিয়া আনন্দে গাহিতে লাগিল,—

(রে শমন,) আমি পুনঃ সুখের বাসর,—
ঘুচিল, বিচ্ছেদজ্বালা পেয়েছিরে প্রাণেশ্বব!
আমোদে আসে গৃধিনী, মম বাসর-সঙ্গিনী,
কঠোর চঞ্চুর ধ্বনি সঙ্গীত সুন্দর!
ফুরাইল নিরানন্দ শব-গন্ধ মকরন্দ,
শোণিত-চন্দনে দোঁহে হিম কলেবর।

পোল ভাঙ্গিয়া সোমনাথ জলমগ্ন হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর স্রোতে বহু দূরে ভাসিয়া যান, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কূলে উঠিয়া ভাবিলেন, যুদ্ধস্থানে ফিরিয়া যাই। সিক্তবসনে আসিতেছেন, দূরে "হুর্‌রে" নাদে বুঝিলেন, ইংরাজেরা জয়লাভ করিয়াছে। আত্মীয় স্বজন কে কোথায় জীবিত আছে, দেখিতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সহসা সে রণ-ভূমিতে নারীকণ্ঠজনিত সঙ্গীত। শব্দানুসারে দ্রুতপদে আসিয়া দেখেন, বক্ষে ছুরি—ভিখারিণী গাহিতেছে! কোলে গোঁসাইয়ের মৃতদেহ, পাশে উল্কা জ্বলিতেছে। সোমনাথকে দেখিয়া ভিখারিণী বলিল, "আইস, আইস, আমাদের পুনর্ম্মিলন, দেখ!"

সোমনাথ বলিলেন, "দেবি, বুঝিয়াছি। আপনি আমার প্রভুর পত্নী!"

"আমি স্বামীর উদ্দেশে ভিখারিণী। আমি স্বামীর উদ্দেশে, ধন, জন সংসার, অপত্যস্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া ভিখারিণী হইয়া ঘুরিয়াছি। দেখ, দেখ!—এখনও আমার স্বামীর ছবি আমি বক্ষে ধারণ করিয়া আছি। এই ছবির সহিত কথা কহিতাম, এই ছবি দেখিয়া

জীবন ধারণ করিতাম, এই ছবি বুকে লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়াছি, বুকের ছবি বুকেই রহিল। আজ আমার সুখের দিন, তাই একজনকে দেখিতে সাধ হয়। দেখ—দেখ, সে পোষাকটী কোথায়? যদি কাছে থাকে তারে দিও।"

সতী পতি পাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

সোমনাথ রমানাথের তত্ত্ব করিতে লাগিলেন। রমানাথ অস্ত্রাঘাতে দারুণ পিপাসায় সেই গোলের একপার্শ্বে পড়িয়া "জল জল" করিতেছেন। সোমনাথ জল লইয়া মুখে দিলেন, রমানাথ জলপানে কিঞ্চিৎ সবল হইয়া বলিলেন, "সোমনাথ, মরণকালে আমার একটী কথা রাখ।"

সোমনাথ বলিল, "কি?"

"প্রতিজ্ঞা কর, রাখিবে?"

"যদি রাখিবার মত হয় রাখিব।"

"ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে কি যন্ত্রণা —আমি বুঝিয়াছি। চন্দ্রা তোমায় ভালবাসে। চন্দ্রা সতী, তুমি তাহাকে গ্রহণ করিও। যদি কথা না রাখ, একটী অনুরোধ রাখিও। বলিও, মৃত্যুকালে তার নাম আমার মুখে শুনিয়াছ।" কণ্ঠ ক্ষীণ হইল, বলিলেন, "জল দাও!" আবার জল পান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি সেই সোণার ফুলটী ফিরাইয়া দিবার জন্য গাছতলায় বসিয়া চন্দ্রাকে পত্র লিখিতেছিলাম, একজন ভিখারিণী হঠাৎ আমায় বলিল, "চন্দ্রা কে?" আমি যতদূর জানি, পরিচয় দিলাম। ভিখারিণী আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিল, "যদি কখনও চন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ হয়, দিও। চন্দ্রার হাতে দিও, অন্য কোন উপায়ে পাঠাইও না।" এই ঘটনাটী বর্ণনা করিয়া চন্দ্রাকে তুমি এই চিঠিখানিও দিও।"

রমানাথের কঠিন প্রেম-পরীক্ষার অবসান হইল। প্রাণবায়ু ভগ্ন-হৃদয় পরিত্যাগ করিল।

সোমনাথের বক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল। কত পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। গোঁসাই, তারা ও রমানাথের সৎকার করিলেন। গোঁসাইয়ের কথামত দুইটী গান* তাঁহার বুকে লিখিয়া সৎকার করিলেন। নব-ক্রিয়ায় স্বর্গগত আত্মা হাসিতে লাগিল।

---

*(১ম গীত)

(হের) গরল আগার—
নিবিড় তামসী ঢাক হৃদয় আমার!
বিরাম বিসর্জ্জন, রসহীন জীবন,
গগন ছাদন মম নিবাস কান্তার,—
ভুবন ভ্রমণ একা, পরিতাপ প্রাণে লেখা,
নীরবে নিরাশ আসি গাহে হাহাকার।

নবম বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"My parting breath shall boast you mine.
Good night! and joy be wi'ye a'!"

দৈবজ্ঞের গণনানুসারে চন্দ্রার দিন সংক্ষেপ হইতেছে। মনের সাধ মনে রহিল, সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সংসারে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ফুটিয়াছেন, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় মিশিয়া যাইবেন। একা আসিযাছি, একা রহিলাম, একা যাইব। চন্দ্রার অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। মাকে মনে পড়িতে লাগিল। জ্ঞানোদয় পর্যন্ত মাতার বিরসবদন দেখিয়াছেন। সেই বিরস বদনখানি এখন নয়নে নিত্য দেখেন। জীবন লক্ষ্যহীন, কাটিয়া গেল। সন্ন্যাসীকে সর্ব্বদাই মনে পড়ে, কখনও অভিমান হয, কখন ভাবেন, দেখা হইলে কি বলিবেন? কখনও যেন দেখা হইয়াছে, কি বলিতেছেন, সন্ন্যাসী যেন কি উত্তর দিয়াছে, আবার প্রত্যুত্তর দিতেছেন। এমনই কথায় কথায় মনঃকল্পিত সন্ন্যাসীর সহিত কথা কন। কখনও সন্ন্যাসী কথা বুঝে, কখনও অপ্রত্যয় করে। কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ন্যাসী পড়িয়াছে, কখনও রাজা হইযাছে, কখনও যেন তিরস্কার করিতেছে। নিত্য নিত্য কুটীরের কথা মনে পড়ে। অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, সন্ন্যাসী ঔষধ দিতেছেন। মানসনেত্রে দেখেন, তাঁহার শয়নগৃহে সন্ন্যাসী বসিযা আছে। কত অনুনয করেন, ভাবেন—এই কথা বলিলে সন্ন্যাসী যাইত না। দিন-রাত্রি সমভাবেই কাটে। একদিন একজন এক্কাওয়ালা একখানি চিঠি আনিযা দিল। রমানাথের চিঠি। পড়িয়া দেখেন, সন্ন্যাসী পাণ্ডুনদীর তীরে। অমনই প্রস্তুত হইলেন, অমনই যাত্রা করিলেন। আসিয়া দেখেন, পাণ্ডুনদীর সমর শেষ হইয়াছে। শুনিলেন, ভগ্ন-সৈন্য কানপুরে পলাইযাছে।

*(২য় গীত)

শশি-সোহাগিনী, মেদিনী যামিনী,
কুমুদ গন্ধ বিলায় বিলাসে,—
কার বাদ সাধে, কার প্রাণ কাঁদে,
মরি, কেবা মগন নিরাশে?
কেন হেন প্রাণ বিসর্জ্জন?
কেন বিমলিন সরস যৌবন?
জ্বালা নিদারুণ, দহে প্রাণ মন,
যদি ঢালি নয়ন-বারি—
সাধ নিবারি—
সযতনে রাখি কুসুম-বাসে,
যাহে প্রাণ বিকাশে।

কতই ভাবিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী অবশ্যই যুদ্ধ করিয়াছিল, যুদ্ধে কি মৃত্যু হইয়াছে? কিন্তু তথাপি দেখা উচিত।

চন্দ্রা কানপুরে চলিলেন। ইংরাজের বীবদর্পে কানপুর কাঁপিতেছে। রামচাঁদ হেথা সেথা বিদ্রোহীর অনুসন্ধান করিতেছে। চন্দ্রাব বিবাম নাই। কানপুরে পৌঁছিয়া নিত্য সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে এখানে ওখানে ভ্রমণ করেন, শঙ্কায় তাঁহার হৃদয় স্থিব নয়। তাঁহাব মনে মনে আশা ছিল, সন্ন্যাসী জীবিত আছে, যদি কোন গুপ্তচর তাঁহাকে ধরে, প্রতিহিংসাপরবশ ইংবাজ তখনই তাঁহাকে বধ কবিবে। ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন একটী কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় শোকসন্তপ্তা দীনা হীনা একটী বমণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দুঃখিনীকে দেখিযা দুঃখিনীর হৃদয় আকর্ষিত হইল। চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''মা, তুমি কে?''

কুটীববাসিনী বলিলেন, ''মা, আমাব নাম শান্ত।'' পাণ্ডুনদীব যুদ্ধেব সময় গোঁসাই শান্তকে এই কুটীরে বাখিয়া আসিযাছিলেন। তাহার স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন, নিদর্শন ভিন্ন তাহার স্বামী প্রত্যয় করে না, এই বলিয়া হারাণের গলার রামপদকখানি তাঁহাব নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন। প্রতারিতা শান্ত নিত্যই ভাবিত, তাহার প্রাণনাথের সাক্ষাৎ পাইবে। দিন আশায় যাইত, রাত্রি কাঁদিয়া কাটিত। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শান্ত তাঁহার দুঃখেব ইতিহাস সমাপ্ত করিল। চন্দ্রাও কাঁদিতে লাগিলেন। নীরবে নয়ন-ধাবা বক্ষ বাহিয়া পড়িতে লাগিল। নীরব স্থান, নীরবে পবস্পর পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিল।

সহসা গোল উঠিল, ''ওই ওই, এল, এল! ম্লেচ্ছের হাতে প্রাণ গেল!'' উভয়ে সচকিতে চাহিয়া দেখে, জনস্রোত উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রাণভয়ে পলাইতেছে। একটী স্ত্রীলোকের সহিত গঙ্গা-স্নান করিতে গিয়া শান্তর পরিচয় হইয়াছিল —সে বলিল, ''পালাও! পালাও এখনি পালাও, নহিলে ম্লেচ্ছের হাতে মারা যাইবে।'' মনে ভয় হইল, সকলে পলাইতেছে, শান্তও পলাইতে লাগিল। সহর হইতে লোক দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—''ওরে মারিল রে,—মারিল রে, কাহাবও আর নিস্তাব নাই!'' চন্দ্রার ভয় ছিল না। ইংবাজী জানিতেন, সাহেবেরা খৃষ্টান বিবেচনা করিত। তাহার সহরের ভিতর বাসা ছিল, ফিবিয়া চলিলেন। ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন—অন্য মনে চলিতে লাগিলেন। তখনও লোক দলে দলে পলাইতেছে। চন্দ্রা ভাবিলেন, সহর হইতে লোক আসিতেছে, তবে কি এদিকে সহর নয়? চন্দ্রা ফিবিলেন। এবার যে দিক হইতে লোক আসিতেছিল, সেই মুখে চলিলেন। বাস্তবিক, সে দিকে সহব নয়। জনস্রোত ভয়ে স্থির হইতে পারিতেছে না। একবার এদিক একবাব ওদিক করিতেছে। কথা এই, নীলসাহেব আসিয়া কানপুরে পৌঁছিয়াছেন। তিনি বিদ্রোহী কয়েদীর উপর অত্যন্ত কঠিন ব্যবহার করেন। জনরব তাহা বাড়াইয়া বলে,—''গোরা মাতাল হইয়া যারে পায় তারে কাটিতেছে, মুখে থুথু দিয়া জাতিনাশ করিতেছে।''

চন্দ্রা যতই যান, ততই পথ শূন্য, চারিদিকে বন। এবাব আবও বন। দূবে কাব কণ্ঠস্বর,—সন্ন্যাসীর্? শব্দ অনুসাবে গিয়া দেখেন, কেহই নাই। সহসা দূরে একজন স্থূলকার চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আমি পেশোয়া! আমি পেশোযা! আমার হুকুম কে না শুনিবে? এ্যাঁ! এ্যাঁ! কি, পরাজয়! কি পবাজয়! সর্ব্বস্ব হাবাইলাম! এবার বনের পশুর সহিত বাস করি, নহে ইংরাজের হস্তে কিরূপে পবিত্রাণ পাইব?" চন্দ্রা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহাব সঙ্গে আব একজন আছে, বৃক্ষেব আড়ে দেখা যাইতেছে না। চন্দ্রা ভাবিলেন, ইহাবা ডাকাত। পাশে ঝোপ ছিল, ঝোপেব ভিতব প্রবেশ করিলেন। যাহারা কথা কহিতেছিল, ক্রমে তাহারা নিকটে আসিল। যেখানে চন্দ্রা লুক্কাইত ছিলেন, তাহাব নিকটে একটা গাছেব তলায় বসিল। চন্দ্রা সভয়ে দেখিলেন, দস্যুসর্দ্দার রামচাঁদ ও তাহার সহিত একজন স্থূলাকাব পুরুষ। স্থূলাকাব বলিতেছে, "কি বল, এখনও উপায় আছে? আমার দলবল কোথায়?"

রামচাঁদ উত্তর কবিতেছে, "আছে। পেশোযা সাহেব এইখানে অবস্থিতি করুন। আপনাব সেনাপতিদিগকে লইয়া এইখানে আসিব।"

পেশোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কোথায় যাইবে?"

"সহরে।"

"সহরে কেন?"

"সাহেবদিগের সন্ধান লইতে।"

"যাও—যাও, আবার আক্রমণেব সুযোগ পাইব। কিন্তু আমি হেথায় আছি, তুমি কিরূপে সংবাদ পাইলে?"

"আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পলায়ন করি।"

"কি, তুমি কি যুদ্ধ করিয়াছিলে? কৈ তোমাকে ত দেখি নাই?"

"আমি মিরাট-সৈন্যে ছিলাম, দিল্লী হইতে সম্প্রতি আসিয়াছি।"

"মিরাট-সৈন্যে ছিলে?"

"হাঁ।"

"দিল্লী হইতে ত কোন দল আসে নাই?"

"আমি দিল্লী হইতে সংবাদ লইয়া আসিতেছিলাম। যে দিন কানপুরে পৌঁছি, সেই দিনই যুদ্ধ বাধে।"

"সংবাদ কারে দিলে? কই, পত্র ত দাও নাই?"

"নুন্নি সাহেবকে দিয়াছি।"

"যাও।"

রামচাঁদ যাইতে পারিলে বাঁচে। নানাসাহেব স্থূলাকার, তাহাকে ধরাইতে পারিলে জায়গীর পাইবে সন্দেহ নাই। রামচাঁদের প্রতি দৈব অনুকূল; ক্ষুদ্র বদমায়েস খুঁজিতে গিয়া সর্দ্দার পাইয়াছে। বিদ্রোহীদলে রামচাঁদ অনায়াসে মিশিতে পারে, গোঁসাইয়ের পত্র দেখাইয়া তাহার বিশেষ কার্য্য হইত। পাণ্ডুনদীর যুদ্ধের পর তাহার আর শঙ্কা ছিল

না। বিদ্রোহীদলের যাহারা যাহারা তাহাকে চিনিত কেহই জীবিত নাই। বিদ্রোহীদলের তিনজন মাত্র তাহাকে চিনিত। গোঁসাই আর তাহার দুই চেলা। পাণ্ডুনদীর যুদ্ধে তিনজনই মরিয়াছে। সোমনাথ যে জীবিত আছে, তাহা জানে না। যুদ্ধের পর গোঁসাই ও তাহার একজন চেলাকে রণভূমে পতিত দেখিয়াছে, আর যে পোল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, ইংরাজ-শিবিরে তাহার সাহসের সুখ্যাতি হইতেছিল, বর্ণনায় বুঝিয়াছিল, সোমনাথ। তবে আর কে চেনে, ভয় কি? একা হেথা সেথা যাইতে সঙ্কুচিত হইত না। যদি বিদ্রোহীরা ধরিত, গোঁসাইয়ের পত্র দেখাইলে, তখনই ছাড়িয়া দিত। রামচাঁদ মহা আহ্লাদে সহর অভিমুখে চলিল। নানাসাহেব আবার ডাকিলেন, "শোন, আমার অধ্যক্ষদিগকে বলিও, সোমনাথ জীবিত আছে।

বামচাঁদ জিজ্ঞাসা কবিল, "সোমনাথ কে?"

"সোমনাথ কে জান না? যে একা পাণ্ডু-নদীর যুদ্ধে ইংরাজের গতিরোধ করিয়াছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম, পোল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু না, যুদ্ধের দিন দেখি, আমার পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। যখন পলাই, আমার ঘোড়া নাই, সে আমাকে তাহার ঘোড়ার উপর তুলিয়া পলায়ন করিল। সে আমাব হৃদবন্ধু। যুদ্ধে জয় হইবে, এখনও সোমনাথ জীবিত আছে! আবাব পেশোযা হইব—আবার পেশোয়া হইব! সোমনাথ কে বুঝিয়াছ?"

"হাঁ, তাঁহাকেও থাকিতে বলিবেন।"

"হাঁ—হাঁ, অধ্যক্ষদিগকে লইয়া আইস!" রামচাঁদ চলিয়া গেল।

সহসা চন্দ্রা বাহির হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, পলায়ন করুন—ও শত্রু, আমি উহাকে জানি।"

"এ্যাঁ! এ্যাঁ! শত্রু? সত্য বলিতেছ?"

চন্দ্রা সকল কথা বিস্তার করিয়া বলিলেন। নানাসাহেব দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। —"আমায় কে ধরে? সে এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। আমি চিরদিন স্বাধীন থাকিব, বনে স্বাধীন থাকিব।" বলিতে বলিতে স্থূলকলেবর নাড়িয়া নানাসাহেব প্রস্থান কবিলেন।

রামচাঁদ যে পথে প্রস্থান করিয়াছে, সহরের পথ ভাবিয়া চন্দ্রাও সেই পথে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু পথ চিনিতে পারিলেন না। যে পথে যাইতেছেন, ইহাও অতি নির্জ্জন স্থান। বৃহৎ বট—অশ্বত্থেব শাখায় মিশামিশি। বন্যলতা বেড়িয়াছে, মাঝে মাঝে ঝোপ, বনফুল ফুটিয়াছে। কে এক জন গাছের তলায় অন্য মনে কি দেখিতেছে। ঐ সেই সন্ন্যাসী! চন্দ্রা দ্রুতপদে আসিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী, তুমি হেথায়?"

কথার উত্তর নাই। সন্ন্যাসী আপনার মনেই দেখিতেছে। কি দেখিতেছে? বুঝি কেহ ধরিতে আসিতেছে কি না—তাহাই লক্ষ্য করিতেছে। চন্দ্রা আবার বলিলেন, "এ স্থানে রহিও না। তোমায় ধরিবার জন্য লোক ফিরিতেছে। যাও, এস্থান হইতে পলাও।"

সন্ন্যাসী ফিরিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "ধরিতে আসুক। তুমি এ স্থান হইতে যাও। যাও, শীঘ্র যাও!"

চন্দ্রা তথাপি বলিলেন, "তুমি বুঝিতেছ না, সম্পূর্ণ বিপদের আশঙ্কা।"

সন্ন্যাসী এবার রূঢ় বাক্যে উত্তর করিলেন, "তোমার কি? তুমি যাও, আপনার পথ দেখ। যাও—যাও, বিরক্ত করিও না।"

চন্দ্রা আবার দীনবচনে বলিতে লাগিলেন, "তুমি জান না। কথা শোন, ইংরাজ ধরিতে পারিলে প্রাণবধ করিবে।"

এবার সন্ন্যাসী অতি কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তুমি যদি না যাও, তোমায় তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইব।"

চন্দ্রার চক্ষে জল আসিল, সংবরণ করিলেন। ধীরে ধীরে ফিরিলেন। যান, আবার ফিরিয়া চান। সন্ন্যাসী সমভাবেই আছে। আবার চান, সন্ন্যাসীর সেই ভাব, একমনে কি দেখিতেছে। ভাবিলেন, "ফিরিয়া যাই, আবার নিষেধ করি।"

কিন্তু সন্ন্যাসীর কঠোর কটাক্ষ, কর্কশ বচন নিরস্ত করিল। যাইতে প্রাণ চায় না, চলিলেন। পদ টানিয়া লইয়া চলিলেন। আর সন্ন্যাসীকে দেখা যায় না। সহরের অভিমুখে চলিলেন। দেখেন, লোক পলাইতেছে, বন্দুক হস্তে গোরা আসিতেছে। আর গেলেন না। গোরারা কোন্ দিকে যায়, দেখিতে লাগিলেন।

রামচাঁদ সহরে প্রবেশ করে, একজন মুটিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া দেখে, ভিতরে একখানি রামপদক। পত্রে লেখা—"নাথ! আমি এখনও জীবিত আছি। যদি অধিনীকে দর্শন দেওয়া অভিমত হয়, একবার এই লোকের সহিত আসিবেন। নিদর্শন এই রামপদক, স্মরণ থাকিবে, হারাণের গলায় ছিল। —শান্তমণি দেবী।"

রামচাঁদ অস্থির, উন্মাদ হইয়া উঠিল। "শান্ত! কোথায় শান্ত? আমায় লইয়া চল। হা হতভাগিনী! তুমি কতই দুঃখ পাইয়াছ!"

রামচাঁদের সকল কার্য্য পড়িয়া রহিল, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ নাচিতে লাগিল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া বাহকের পশ্চাৎ চলিল। হঠাৎ আর বাহককে দেখিতে পাইল না। হেথা বন, বটগাছের ছাওয়ায় অন্ধকার। সহসা একব্যক্তি তরবার হস্তে দিয়া বলিল, "যুদ্ধ কর!" রামচাঁদ চাহিয়া দেখিল সন্ন্যাসী। সে অবস্থায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "যুদ্ধ কর, নহে বিনা যুদ্ধে মর!"

রামচাঁদ বুক বাঁধিয়া তরবারি ধরিল। বলবান ছিল, যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধ হইতেছে, একবার সোমনাথ হটে, একবার রামচাঁদ হটে। এই তরবার তরবারে ঠেকে, ঐ তরবার তরবারে ঠেকে। তরবার ঝনঝনি, অগ্নিকণা ছুটিতেছে, তরবারের বেড়ার মধ্যে দুইজন ঘুরিতে লাগিল। বায়ুবেগে একজন স্ত্রীলোক দৌড়িয়া আসিয়া মধ্যস্থলে পড়িল, "হারাণ, কি কর! নাথ, কি কর!"

"শান্ত! শান্ত!" রামচাঁদ দৃঢ় আলিঙ্গন করিল। দূরে পিস্তলের আওয়াজ, রামচাঁদ কদলীতরুর ন্যায় পতিত হইল। অশ্বের পদশব্দে জানা গেল, হত্যাকারী বনমধ্যে পলায়ন করিল। হত্যাকারী নানাসাহেব, বিশ্বাস ঘাতকের দণ্ড দিয়া প্রস্থান করিলেন।

"শান্ত! শান্ত!"

শান্ত পাগলিনীর ন্যায় কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীনা —হায, কি হইল—পাইয়া হারাইলাম!"

"শান্ত, এই কি আমার হারাণ?"

ক্ষীণকণ্ঠে রামচাঁদ বলিতে লাগিল, "হারাণ, তুমি আমাব পুত্রের স্বরূপ। মরণে আমাব ক্ষোভ নাই। সংসার সুখপূর্ণ! আমি স্ত্রী-পুত্রেব সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিতেছি। হারাণ, কাছে এস! শান্ত কাছে এস। আ—আ—র কিছু দেখিতে পাই না—"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"Oh! blessed are the lovers and friends who shall live
The days of thy glory to see!
But the next dearest blessing that Heaven can give
Is the pride of thus dying for thee!"

"পট! পট্! পট্!" চতুর্দ্দিকে বন্দুকের আওয়াজ। "প্রাণ গেল! কাহারও রক্ষা নাই! পলাও পলাও!" চারি দিকে শব্দ।

চন্দ্রা দ্রুতপদে আসিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী, পলাও! গোরায় তোমার প্রাণ বধ করিবে। পলাও!"

বলিতে বলিতে সোমনাথের কাণেব গোড়া দিয়া একটা গুলি গেল। চন্দ্রা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "পলাও, রক্ষা নাই, পলাও!" দূরে একজন গোরা সোমনাথকে লক্ষ্য করিতেছে, বন্দুকের লক্ষ্যে আপনার দেহ দিয়া চন্দ্রা সোমনাথকে আবরণ করিলেন। গুলি আসিয়া চন্দ্রার গায়ে লাগিল,—ছিন্ন স্বর্ণলতার ন্যায় চন্দ্রা ভূমিতলে পতিত হইলেন।

এমন সময় হিন্দুস্থানীর পরিচ্ছদ-পরিধানা একটা বিকটাকার শ্বেত রমণী গোরাদিগকে তিরস্কার করিয়া ইংরাজিতে বলিতে লাগিল, "কারে বধ কর? আমার জীবনরক্ষাকর্ত্তাকে বধ কবিও না।" গোরা থামিল, বন্দুক মারিল না। কিন্তু সোমনাথকে আসিয়া ধরিল। বিবি চীৎকার কবিতে লাগিল, "বাঁধিও না—বাঁধিও না।"

গোরা উত্তর করিল, "জান না, এ বিদ্রোহী।"

তখন শান্ত সোমনাথকে ধরিল। আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, "কোথায় লইয়া যাও? আমার বাছাকে কোথায় লইয়া যাও? আমি বাছাকে বহুদিনের পর পাইয়াছি, কোথায় লইয়া যাও? একদিনে পতি-পুত্র পাইলাম, একদিনে হারাইব? হা ভগবান! এ কি সম্ভব! এ স্বপ্ন। আমি ছাড়িব না, আমায় বধ কর, আমার বাছাকে ছাড়িয়া দাও!"

গোরা ছাড়িল না, শান্তকে জোর করিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল; শান্ত দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়াছিল, কোন মতেই ছাড়াইতে পারিল না।

"কোথায় লইয়া যাও। কোথায় লইয়া যাও! আমার বাছাকে ছাড়। আগে আমায় বধ কর, তার পর লইয়া যাও। ওহো, কি হইল!"

শান্ত মূৰ্চ্ছাগত, কিন্তু তথাপি সোমনাথকে ছাড়ে নাই। গোরারা ছাড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যেন বজ্রে বজ্রে খিল লাগিয়াছে, কিছুতেই ছাড়িল না। বিবি বলিতে লাগিল, "ছাড়িয়া দাও—ছাড়িয়া দাও! এ বিদ্রোহী নয়, আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে। চল, তোমার সাহেবের কাছে আমি যাইতেছি, দেখি কেমন না ছাড়িয়া দেয়।" গোরাবা শুনিল না, টানিয়া লইয়া চলিল। শান্ত মূৰ্চ্ছাগত, কিন্তু হারাণকে ছাড়ে নাই। উভয়কেই টানিয়া লইয়া চলিল। চন্দ্রার বেশ যদিও হিন্দুস্থানীর মত, রং দেখিয়া গোরা মনে করিল, "এ একজন ফিরিঙ্গি, প্রাণভয়ে এরূপ বেশ করিয়াছে।" চন্দ্রাকে তুলিয়া লইল। কানপুরের নীল সাহেবের কাছে লইয়া উপস্থিত হইল।

নীল সাহেবের কেবল একটী কামিজ গায়ে, পেটীতে তরবার ঝুলিতেছে। গোরারা দশ পনেরো জনকে ধরিয়া তাহার সম্মুখে খাড়া করিল। তিনি চুরুট খাইতে খাইতে তরবার লইয়া এর মাথায় তার মাথায় দিয়া চার পাঁচ জনকে শেষ করিলেন। সোমনাথ—এখন হারাণ বলিব—হারাণকেও বধ করিতে যান, বিবি চীৎকাব কবিয়া বলিল, "বধ করিও না! নীল সাহেব বিস্মিত হইয়া ছাড়িলেন। বিবি বলিতে লাগিল, "এই মহাত্মা আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, আমাদের কুড়ি জনকে শত্রু-শিবির হইতে লইয়া ছাড়িয়া দেন। এই কাপড় ইনিই দেন, তাই বিদ্রোহীরা আমায় চিনিতে পারে নাই। আমি গাছের পাতা, লতার মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছি।"

নীল সাহেব বলিলেন, "ইহাকে কয়েদ রাখ, কলিকাতায় চালান দিবে।" চন্দ্রাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?"

গোরারা উত্তর করিল, "বোধ হয় একজন 'ফরিঙ্গি স্ত্রী।"

"আঘাত লাগিল কিরূপে?"

"বলিতে পারি না। আমরা পিস্তলের আওয়াজ অনুসারে গিয়া গ্রেপ্তার করি। বোধ হয় কোন বিদ্রোহী মারিয়া থাকিবে।"

"হাঁসপাতালে পাঠাও।"

বিবি বলিলেন, "না, আমার বাড়ীতে রাখিব।"

"এ স্ত্রীলোক কে?"

"কয়েদীর কোন আপনার লোক।"

"উহাকেও কলিকাতায় চালান দাও।"

দশম বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"Wilt thou draw near the nature of the gods?
Draw near there then in being merciful:
Sweet mercy is nobility's true badge!"

তিন দিনের পর চন্দ্রার চৈতন্য হয়। বিবি শিয়রে বসিয়া আছেন, চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

"আমি বন্ধু।"

"যদি বন্ধু হন, আমার প্রাণরক্ষা করুন—সন্ন্যাসীর কি হইল বলুন?"

বিবি বুঝিলেন, কোন্ সন্ন্যাসী। বলিলেন, "কলিকাতায় চালান হইয়াছে, বিচারের অপেক্ষায় কারাগারে রহিয়াছে।"

"তবে উদ্যোগ করুন, আজই কলিকাতায় যাইব।"

"বিবি উত্তর করিলেন, "আমি না গেলে বিচার হইবে না।"

"না—না, আমি আজই যাইব।"

"পথে মারা যাইবে, আমি ছাড়িতে পারিব না।"

চন্দ্রা বলিলেন, "যাইব।"

উঠিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল, আবার অচেতন হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রার ঘোরতর জ্বর হইল, দুই পক্ষের পর আরোগ্য লাভ করেন। ডাক্তারকে বলিলেন, "ডাক্তার সাহেব, আমায় কলিকাতায় যাইতে দাও, নচেৎ বাঁচিব না।" ডাক্তার দেখিলেন, যেরূপ মনের অবস্থা, কাহিল অবস্থায় যাওয়া আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু আটক করিলে আরও আশঙ্কা। চন্দ্রা ও বিবি উভয়ে কলিকাতায় রওনা হইলেন।

কলিকাতায় তখন লর্ড ক্যানিংকে কাগজে শত সহস্র তিরস্কার করিতেছে। তিনি বাঙ্গালায় মারস্যাল ল (Martial Law) প্রচার করেন নাই। নীল সাহেব বলিয়াছিলেন, বিদ্রোহীদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বধ করা হউক। তাহাতেও অসম্মত ছিলেন। আবার কাউন্সিলে তর্ক করিতেছেন, যাহারা শরণাগত হইবে, তাহাদের ক্ষমা করিবেন। সকলেই বিরূপ—সকলেই বিপক্ষ। কাউন্সিলের মেম্বরেরা বিরুদ্ধে তক্তা তক্তা কাগজ লিখিতেছে। কিন্তু দয়াবান্ ক্যানিং অটল! তিনি শরণাগতকে ক্ষমা করিবেন।

নিজ কক্ষে পায়চারি করিতেছেন, একটী স্ত্রীলোক জানু পাতিয়া সম্মুখে বসিল।

"পিতঃ ক্ষমা করুন!"

ক্যানিং সে স্থানে হিন্দু স্ত্রীলোক দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন; কিন্তু মুখে কোন ভাব প্রকাশ পাইল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

"আমি অভাগিনী।"

"কি চাও ?"

"এক ব্যক্তির জীবন দান।"

"কে সে ?"

"একজন বিদ্রোহী।"

"সে কিরূপে হইতে পারে ?"

রমণী সকাতরে বলিতে লাগিল, "পিতঃ, আপনি দয়ার সাগর!---বড় আশায় আসিয়াছি, নৈরাশ করিবেন না। আমি শুনিয়াছি, আপনার নাম লইলে শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে, ফাঁসীর রজ্জু ছিঁড়িয়া যায়, তরবারি ভগ্ন হয়! আমাকে নিরাশ করিবেন না। আমার প্রাণের প্রাণ যাচ্ঞা করিতেছি। আমি বড় অভাগিনী---পিতঃ, কৃপা করুন।"

"সে ব্যক্তি কোথায় ?"

"বিচার অপেক্ষায় কারাগারে আছে।"

"আমি তাহার বিষয় না শুনিলে বলিতে পারি না।"

রমণী সজল নয়নে লর্ড্ ক্যানিং-এর ভাবহীন বদন পানে চাহিয়া রহিল। স্থির শান্তমূর্ত্তি! দয়ান্ধ, কঠিনতার কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। যখন রাজ্য টল্ টল্ করিতেছে, তখনও সেই মূর্ত্তি; এখন করগত, এখন সেই মূর্ত্তি! অচল স্থির প্রস্তর মূর্ত্তি! রমণী আবার বলিতে লাগিল, "একজনের অপরাধে দুইজনের প্রাণবধ কি নিমিত্ত করিবেন ? সেই বিদ্রোহী, আমি আপনার প্রজা---কন্যা, আমার প্রাণবধ কি নিমিত্ত করিবেন ? পিতঃ আপনি দয়াগুণে শ্রেষ্ঠ, কেবল কি অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হইবেন না ? জগৎ আপনাকে দায়াবান্ বলিবে---সমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত আপনার গুণগানে প্রতিধ্বনিত হইবে, কেবল কি এই অবলা জানিবে, আপনার হৃদয়ে দয়া নাই। কেবল কি আমার প্রতি কঠিন হইবেন ? পিতঃ, অভাগিনী পিতার মুখ দেখে নাই, বাল্যকালে মা মমতা-ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সমাজে স্থান দেন নাই, ক...ও কোন সাধ পূর্ণ হয় নাই, অভাগিনী কেবল দুঃখ পাইয়া আসিতেছে। পিতঃ, তুমিই এই দুঃখময় জীবন সুখময় করিতে পার। রাজ্যেশ্বর, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, আমার প্রতি দয়া কর!" অতি কাতোরোক্তি, অতি মধুরস্বরে নিঃসৃত হইল। লর্ড ক্যানিং এর অবিচলিত বদন বিচলিত হইল ; বলিলেন, "যাও, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

মহানন্দে অবলা লাফাইয়া উঠিল। অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িল।

যখন চৈতন্য হইল, জননীরূপে লেডি ক্যানিং তাহার শয্যার পার্শ্বে মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "স্থির হও, কোন চিন্তা নাই, তোমার স্বামীর মার্জ্জনা হইবে।"

"আমার স্বামী! আমার স্বামী কে ?"

"তোমার স্বামীর নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা কর নাই ? তবে কি তোমার ভাই ?"

"না, কেহই নয়। একজন সন্ন্যাসী।"

"নাম কি ?"

"জানি না।"

লেডি ক্যানিং আরও বিস্মিতা হইলেন—"তবে কিরূপে জানিব?"

"একটী স্ত্রীলোকের সহিত কানপুর হইতে আসিয়াছে। সে স্ত্রীলোক বোধ হয় তার মা। আমি কারাগারে গেলে চিনিতে পারিব।"

"না, তোমায় যাইতে হইবে না।"

লেডি ক্যানিং আরদালীকে একটু পেন্‌সিলে লিখিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হেথায় কিরূপে আসিলে?"

"মেথরাণীকে মদ খাওইয়া, তাহাব পোষাক পরিয়া রাত্রে প্রবেশ করিয়াছি। খাটের নীচে লুকাইয়া ছিলাম।"

কিছু পরেই গবর্ণমেন্ট হাউস হইতে প্রাইভেট সেক্রেটারী বাহির হইলেন। খবর আনিলেন, "কানপুর হইতে মাতা পুত্রে আসিয়াছে, তাহার নাম সোমনাথ।" লেডি ক্যানিং হাসিলেন, 'তুমিও তাহার পাশে আহত হইয়া পড়িয়াছিলে?"

"হাঁ, জননী।"

"বুঝিয়াছি, তাহার নাম সোমনাথ। ক্ষমাপত্র লইয়া স্বয়ং যাও; স্বয়ং উদ্ধার করিয়া আন।"

"না মা, আমি যাইব না।"

"কেন, তুমি ত তারে ভালবাস?"

অবলা সজল নয়নে বলিতে লাগিল, "তাহার সহিত যে কার্য্য ছিল, সম্পূর্ণ হইয়াছে! আর দেখা করিতে চাই না।"

"এ বড় বিচিত্র কথা।"

"মাগো! স্ত্রীলোকের প্রাণে কত সয়? আমার যা বলিবার ছিল, কার্য্যে বলিয়াছি—আর দেখা করিব না।"

নয়ন-জলে চন্দ্রার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। জেলের দৃশ্য স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল; অভিমান প্রবল হইল। চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "মা আমার চক্ষে জল আর কেহ দেখিতে পাইবে না।"

"বৎসে, তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"মা, আমার মন আমি জানি না, কিরূপে বুঝাইব? বুঝিতে পারিতেছি না, কেনই সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলাম? তাহার সহিত কি প্রয়োজন ছিল, তাহাও বুঝিতেছি না। মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে, প্রাণ ঘুরিতেছে, সংসার ঘুরিতেছে! কিন্তু এই মাত্র স্থির, আমি আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। সাক্ষাৎ হইলে রোদন সংবরণ করিতে পারিব না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"I only know, we lov'd in vain.
I only feel—Farewell! Farewell!"

কলিকাতায় আসিবামাত্র শান্তকে ছাড়িয়া দেয। শান্ত নিত্যই কারাগারের দ্বারে বসিয়া থাকিত—যদি কোনরূপে একবার দেখিতে পায। হঠাৎ কারামুক্ত হইয়া হারাণ বাহির হইলেন। শান্তকে দেখিয়া বলিলেন, "মা, আমার মার্জ্জনা হইয়াছে।"

শান্ত আহ্লাদে গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, মস্তকে শত শত চুম্বন প্রদান করিল। হারাণ সেক্রেটারির নিকট অদ্ভুত সংবাদ শুনিয়াছিলেন। একটী হিন্দু স্ত্রীলোক তাঁহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইয়াছে। অনুমান করিতে লাগিলেন,—চন্দ্রা। চন্দ্রা তাঁহার পার্শ্বে গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়াছিল; জীবিত আছে কি না জানেন না। কিন্তু আর তাঁহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে কে? রামনাথের বাক্যে এখন তাঁহার সম্পূর্ণ প্রত্যয়। চন্দ্রা সতী ও তাঁহার অনুরাগিনী।

কানপুরে রামচাঁদের দেহ অনুসন্ধান করিতে যাইবেন ভাবিলেন। কিন্তু যদি চন্দ্রা থাকে, রমানাথ-প্রদত্ত চিঠি দিবেন। তিনি যে তাঁহার পিতা-স্বরূপ রামচাঁদের মৃত্যুর কারণ, ইহাতে তাঁহার বড়ই ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। চন্দ্রাকে দেখিতেও প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, চন্দ্রা কেবল তাঁহার নিমিত্তই কানপুরে গিয়াছিল, তাঁহার নিমিত্ত অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে। ভাবিলেন, একবার দেখা করিবেন। মন দুলিতেছে—"চন্দ্রা ভালবাসে, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী। যাহা হউক, চন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিব। চিঠি দিবারও ত প্রয়োজন আছে?" নানা ভাবে তাহার হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল।

শান্তকে বাসায় রাখিয়া হারাণ চন্দ্রার বাটীর অভিমুখে চলিলেন। দ্বারপালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, চন্দ্রা বাড়ীতে আছে। সেই চিঠিখানি পাঠাইলেন, খামের মোড়কের উপর লিখিয়া দিলেন, "সন্ন্যাসী।" প্রতীক্ষা করিতেছেন, চন্দ্রা আপনি আসিয়া উপরে লইয়া যাইবেন। না, কেহই আসিল না।

দ্বারবান চিঠি লইয়া চন্দ্রাকে দিল। চন্দ্রা নাম পড়িলেন, কিছুই বলিলেন না। চিঠিখানি পড়িতে লাগিলেন। চিঠি তাঁহার মাতার হস্তাক্ষর!—"বৎসে, মাতার শেষ আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পিতা নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন—আমার নিমিত্তই তোমার তত্ত্ব লন নাই। যে আউটরাম সাহেবকে পিতা বলিতাম—তোমার স্মরণ আছে কি? —তাঁহাকে আমার ঘরে দেখিয়া তোমার পিতার মনে বিকার জন্মে। আমি তাঁহারই উদ্দেশে তোমায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমি এতদিন মহাপথে যাত্রা করি নাই, এইবার পতিকে লইয়া যাত্রা করিব। সোমনাথ নামে একজন সন্ন্যাসীর নিকট তোমার পিতার একটী পোষাক আছে, তাহাতে কারুকার্য্য আমার হাতের,—আমার নাম লেখা আছে। সেই পোষাকটী লইয়া চিতাভূমিতে দগ্ধ করিও, তাহা হইলে তোমার পিতামাতার সৎকার

কবা হইবে। বৎসে, স্ত্রীলোকের সতীত্ব অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। আমি সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী হইয়া অপত্য-স্নেহ ত্যাগ করিয়াছিলাম। পত্রখানি নষ্ট করিও।—তারা।''

চন্দ্রা পড়িয়া নীরব হইয়া রহিলেন। চক্ষে এক বিন্দু জল আসিল না; কাষ্ঠের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন মাত্র। দ্বারবান দাঁড়াইয়া আছে, বলিলেন, ''এই পত্র লিখিয়া দিতেছি, সন্ন্যাসীকে দাও।''

লিখিলেন,—''সন্ন্যাসী, আমাব প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। তোমার সহিত আর আমার কার্য্য নাই। জেলে তোমার নিকট শুনিয়াছিলাম , তোমারও আমার সহিত কার্য্য নাই। পত্রের দ্বারা এই শেষ কথা। —চন্দ্রা।''

হারাণ পত্র পাইলেন। বজ্রের ন্যায় একটী একটী কথা বোধ হইতে লাগিল। কিছুই বলিলেন না। নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। অন্য মনে কোথায় যান—স্থির নাই। যাইতে যাইতে যে স্থান হইতে রামচাঁদ তাহাকে কুড়াইয়া লইয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত। স্তম্ভিত হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলেন, জানেন না। অকস্মাৎ একটী স্ত্রীলোক এক পুরুষের হাত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিল।

''এই আমার জেষ্ঠ পুত্র!—যমরাজ ফিরাইয়া দিয়াছে। যা! গঙ্গার ছেলে—গঙ্গায় যা!''

রমনী একখানা ছবি ফেলিয়া দিল। আশ্চর্য্য হইয়া হারাণ দেখিলেন, তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি! নীচে লেখা—''চন্দ্রা।''

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ ১৮৯৪): বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণার নৈহাটির কাঁঠাল পাড়ায় ১২৪৫ এর ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮ এর ২৬ শে জুন) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। এঁরা ছিলেন চার ভাই, যথাক্রমে শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিম হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮৫৩ সালে উক্ত কলেজ থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরিক্ষায় প্রথম স্থান পান। পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন বিভাগে ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে সেখান থেকে ১৮৫৭ সালে এন্ট্রান্স এবং ১৮৫৮ সালে বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। ১৮৬৯ সালে বি.এল. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। পবে সবকারী কর্মজীবন শুরু হয়।

হুগলী কলেজে পড়বার সময় তাঁর সাহিত্য রচনার সূত্রপাত। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' ১৮৫২ ৫৩ সালে তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশ পায়। পবে দুটি স্বতন্ত্র কাব্য একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে 'ললিত তথা মানস' নামক গ্রন্থে। এরপর তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস বাংলায় রচিত। এটি কোন একটি পুরস্কারের জন্য লেখা। কিন্তু পুরস্কার তিনি পাননি। এরপর ইংরাজীতে উপন্যাস রচনা করেন 'Raimohan's Wife'। এটি কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'Indian Field' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬২ সালে। কিন্তু ইংরাজী উপন্যাসে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করেননি। ফলে পুনরায় বাংলা উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন।

প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যের একটি নবদিগন্তের সূচনা করেন। তাঁর প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাসের নাম 'দুর্গেশনন্দিনী'। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৩), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮১, পূর্ণাঙ্গ চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'রাধারাণী' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৩), 'রজনী' (১৮৭৭), 'সীতারাম' (১৮৮৪)। 'সীতারাম তাঁর সবশেষ উপন্যাস রচনা।

এছাড়া প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সাম্য, বঙ্গদেশীয় কৃষক, কৃষ্ণচরিত্র, কৌতুক রহস্য, লোকরহস্য, বিজ্ঞানের রহস্য, বাঙ্গালার ইতিহাস, কমলাকান্তের দপ্তর, ভারতের ইতিহাস, মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত্র, (ব্যঙ্গ রচনা) প্রভৃতি। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেন 'বঙ্গদর্শন' নামক সাহিত্য পত্রিকা। এই পত্রিকায় তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 'নবজীবন', 'ভ্রমর', 'প্রচার', প্রভৃতি পত্রিকাতেও তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়।

তাঁব সাহিত্য বিষয়ক রচনাগুলি 'বিবিধ সমালোচনা' নামে ১৮৭৬ সালে এবং দর্শন-ইতিহাস সামাজিক তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধগুলি 'প্রবন্ধ পুস্তক' নামে ১৮৭৯ সালে সংকলিত হয়। পবে পরিমার্জনসহ প্রবন্ধগুলি 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০?—১৯৩২):— সেকালের পণ্ডিত মনীষী। ইনি সংস্কৃত কলেজেব ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃতে এবং আইনের ব্যাপাবে ইনি সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন কবেছিলেন। বিদেশী ভাষাতেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বিদেশী-ভাষা থেকে কাহিনী নিয়ে ইনি বাংলায় দু' একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'বিচারক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ কবেন। নিজের পত্রিকা ছাড়াও সেকালেব অনেক পত্র-পত্রিকায় এঁর বচনা প্রকাশিত হয়েছিল। পল ভার্জিনিযার কহিনী ফরাসী থেকে অনুবাদ কবে 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। রচনাটি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ কবেছিল বলে শোনা যায়। আর একটি বিদেশী কাহিনী নিয়ে রচনা করেন 'দূরাকাঙ্খেব বৃথা ভ্রমণ'। এটি সিপাই যুদ্ধের সময়ে (সম্ভবত ১৮৫৭ বা ১৮৫৮ সালে) প্রকাশিত। এই বইটির মধ্যে দেশপ্রেমেব প্রকাশ লক্ষ্যণীয়।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১):— ১৮৪৩-এব ৩১শে অক্টোবর নদিযা জেলার, বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁব সন্নিকট বাগআঁচড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পবিবাবে এঁর জন্ম। দশ বছর বযসে কলকাতার ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিতে ভর্তি হন। ১৮৬৩-তে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪-তে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৬৯ সালে ডাক্তারী পবীক্ষায় পাশ করে সরকারী কাজে যোগ দেন। বাইশ বছর সরকারী কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়েন।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি বোমান্সের অধিবাসী হন, তাহলে বলতে হয় তারকনাথ বাস্তব জগতের অধিবাসী। তারকনাথ মাত্র তিনটি উপন্যাস বচনা করেন। যথাক্রমে—'স্বর্ণলতা' (শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১২৭৯ থেকে ১২৮০ পর্যন্ত)। বই হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। এছাড়া 'হরিষে বিষাদে' (১৮৮৭) এবং 'অদৃষ্ট' (১৮৯২) নামে আরও দুটি উপন্যাস বচনা করেন। তাঁব গল্পের বইয়ের নাম—'তিনটি গল্প' (১২৯৫)। এই গ্রন্থের প্রথম গল্প 'ললিত ও সৌদামিনী' (১২৮২) স্বর্ণলতার পবে বচিত হয। গল্পটি 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায ১৮৮৩ সালে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল। এঁর শেষ রচনা এডোয়ার্ড টমসনের 'দি ব্রাদার্স-এর অনুবাদ। এবং অন্য দুটি গল্প হলো, 'সুখ ও দুঃখ' ও 'নিধিরাম' এই গ্রন্থের প্রথম গল্পটি ১৮৮২ সালেব অগ্রহাযণ-মাঘ সংখ্যাব 'জ্ঞানাঙ্কুব' ও 'প্রতিবিম্বে' প্রথম প্রকাশিত হয়। তারকনাথেব সর্বশেষ বচনা 'বিধিলিপি' নামে একটি অসমাপ্ত উপন্যাস। প্রমদাচরণ সেনেব 'সখা' পত্রিকায় এটি ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল, মার্চ,

১৮৯১—সেপ্টেম্বর, ১৮৯১। তারকনাথ Cowper-এর 'The Solitude of Alexander Selkirk' কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন এবং এটি 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কল্পলতা' নামে একটি মাসিক পত্রিকারও সম্পদনা তিনি করেছেন। এটির প্রকাশ কাল ১৮৮১-আগষ্ট। 'হরিষে বিষাদে' উপন্যাসটি এই পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

'স্বর্ণলতা' নাট্যাকারে মঞ্চস্থ হয় ১৮৮৮ সালে, তখন তার নাম দেওয়া হয় 'সরলা'। এটির ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। অনুবাদকের নাম দক্ষিণচরণ রায়। বইটির ইংরাজী নাম—'Scenes from Hindu Village Life on Bengal'।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) :— ইনি নব্য হিন্দু ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। যেমন শকুন্তলা—তত্ত্ব (১৮৮৮), ফুল ও ফল (১৮৯২), হিন্দু বিবাহ (১২৯৪), ত্রিধারা (১২৯৭), হিন্দু তত্ত্ব, (১৮৯২), কঃপন্থা (১৮৯৮), বংলা সাহিত্যের প্রকৃতি (১৩০৬), সাবিত্রী তত্ত্ব (১৯০০), পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ (১৩১৫)। উক্ত গ্রন্থগুলি বিভিন্ন তত্ত্ব বিষয়ক রচনা। চন্দ্রনাথ বসু একটি ব্যঙ্গ উপন্যাস রচনা করেছিলেন। উপন্যাসটির নাম 'পশুপতি সম্বাদ' (১২৯০)। এই গ্রন্থটির মধ্যে ইন্দ্রনাথের অনুসরণ বর্তমান। তবে রচনা রীতি অনেকটা বঙ্কিমের অনুসারী।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) :— সেকালের শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার, এবং বাংলা নাট্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। গিরিশচন্দ্রের ছিল অসাধারণ অভিনয় ও পরিচালন দক্ষতা। রামকৃষ্ণ দেবের সংগে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে বিনোদিনী, গঙ্গামণি, কুসুমকুমারী, তিনকড়ি দাসী প্রভৃতি অভিনেত্রী নিজেদের অভিনয় দক্ষতা জনসমক্ষে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবার অন্যদিক দিও বলা চলে উক্ত অভিনেত্রীদের জন্যেই তাঁর নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক নাটক 'আনন্দে রহো' (১২৮৮)। এটি গ্রেট ন্যাশনালে অভিনিত হয়েছিল। প্রথম দিকে তিনি অপেরা বা গীতিনাট্য জাতীয় রচনায় হাত দিয়েছিলেন। অবশ্য পরে মাঝে মধ্যে অন্যান্য নাটকের সংগে এ ধরনের নাটকও রচনা করেছেন। তাঁর অপেরা বা গীতিনাটধর্মী এবং প্রহসন গুলি হলো—'আগমনী' (১৮৭৭), 'অকাল বোধন' (১৮৭৭), 'দোল লীলা' (১৮৭৮), 'মায়াতরু' (১৮৮১), 'মহিনী প্রতিমা' (১৮৮১), 'ব্রজবিহার'-'ভোটমঙ্গল'-'মলিনমালা' (১২৮৯), 'হীরার ফুল' (১২৯১), 'বেল্লিক বাজার' (১৮৪১), 'বড়দিনের বখশিশ' (১৮৮৪), 'সভ্যতার পাণ্ডা' (১৮৮৪), 'পাঁচকনে' (১৮৯৬), 'স্বপ্নের ফুল' (১৮৯৪), 'ফণির মণি' (১৮৯৬), 'আবুহোসেন' (১৩০৩), সামাজিক নক্সা এবং আয়না' (১৩০৯), সৎনাম ও বৈষ্ণবী নাটক' (১৩১১) প্রভৃতি। গিরিশচন্দ্র রচিত পৌরাণিক নাকটকগুলি হলো—'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস' 'অভিমন্যু বধ' 'লক্ষ্মণ বর্জন' (একাঙ্ক), 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস', 'সীতাহরণ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', ধ্রুবচরিত্র', 'নল ও দময়ন্তী', 'কমলে

কামিনী', 'শ্রীবৎস্যচিন্তা', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'প্রভাসযজ্ঞ', 'বুদ্ধদেব চরিত্র', 'অবতার', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', পূর্ণচন্দ্র', 'পাণ্ডব গৌরব,' 'হরগৌরী', 'জনা' (এটি গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা)। এছাড়া বাংলাব মধ্যযুগেব চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে নাট্য বচনা কর্বেছিলেন। যেমন---'চৈতন্য লীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'রূপ ,নাতন' ও 'কালা পাহাড়'। তাঁব ঐতিহাসিক এবং দেশপ্রেম মূলক নাটক হলো—'সিরাজদ্দৌলা', 'মীবকাসিম', 'ছত্রপতি শিবাজী'। গিবিশচন্দ্রেব সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে 'প্রফুল্ল' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'হাবানিধি', এবং 'মায়াবসান' নামে আবও দুটি সামাজিক নাটক বচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁব আবও কয়েকটি নাটকেব নাম উল্লেখ কবা যেতে পাবে। যেমন—'মলিনা-বিকাশ', 'মহাপূজা' (রূপক নাট্য), 'মুকুল মুঞ্জুরা', 'বিষাদ', 'নসীবাম', 'অবতাব', 'চণ্ড', 'হীবক জুবিলি,' 'পাবস্য-প্রসূন', 'মহাপুরুষ', 'কবমেতি বাই', 'অশ্রুধাবা', (ভিক্টোবিযাব মৃত্যু উপলক্ষে বচিত), 'অভিশাপ', 'শাস্তি', 'ভ্রান্তি', 'শঙ্কবাচার্য', 'অশোক', 'শাস্তি কি শান্তি?', 'বলিদান' প্রভৃতি। গিরিশচন্দ্রেব শেষ নাটক 'তপোবন' (১৩১৮)।

এই নাটক বচনাব মাঝে সাহিত্য জগতে তিনি একটি ব্যতিক্রম ঘটিযে ছিলেন। ব্যতিক্রম হলো, হঠাৎ-ই একট ঐতিহাসিক উপন্যাস বচনা কবেন। উপন্যাসটির নাম হলো---'চন্দ্রা'। এই উপন্যাসটি 'কুসুমমালা' পত্রিকায ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয।